কবিতাসমগ্র ১

কবিতাসমগ্র ১

শামসুর রাহমান



অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা



প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

স্বত্ব ❑ লেখক
প্রচ্ছদ ❑ কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ ❑ হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা

দাম ❑ চারশত টাকা

ISBN 984 412 466 2

উৎসর্গ

আব্বা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী

এবং

আম্মা আমেনা খাতুনের

স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

তখন আমি পোগোজ স্কুলের ক্লাশ সিক্সের ছাত্র। একদিন বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি আমাদের বাড়ি কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে। জানতে পারলাম আমার ছোট্ট বোন নেহার বাসায় নেই। আমার অন্তর যেন বিরান প্রান্তর হয়ে গেলো। বসন্তরোগে জর্জরিত ছোট্ট মেয়ে নেহারকে আজিমপুর গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওকে দেখতে না পেয়ে অভিমান, হু হু বেদনায় হাতের বই-খাতা টেবিলে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে খালি চৌকিতে শুয়ে বুক-ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কাঁদতে-কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, টের পাইনি।

নেহার হাঁটতে পারতো না, কথা বলতে পারতো না ওর বয়সের কারণে, কিন্তু দু'পা আর দু'হাতে ভর ক'রে এদিক-সেদিক পৌঁছে যেতে পারতো। এভাবে সে আমার পড়ার টেবিলের কাছে এসে বসতো কখনোসখনো। আমার পেন্সিলের প্রতি ওর আকর্ষণ ছিল, পেন্সিল হাতে নিয়ে খেলতো আর আমার দিকে তাকিয়ে কী মধুর হাসিই না হাসতো। জুড়িয়ে যেতো আমার চোখ আর মন।

নেহারের মৃত্যুর পর কেন যেন আমি ওকে নিয়ে ছোট একটা গদ্য রচনা লিখে ফেললাম। তখন আমার সাহিত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলো না। যা হোক, সেই লেখাটি আমি আম্মা এবং আর দু'-তিনজন নারীর সামনে বসে লেখাটি পড়লাম। সেই আসরে নেমে এলো থমথমে স্তব্ধতা আর আম্মা হু হু করে কাঁদতে শুরু করলেন।

আম্মার কান্না দেখে নিজের উপর খুব রাগ হলো আর আমি নিঃশব্দে সেই স্থান ত্যাগ করলাম। বারান্দায় এসে লেখাটিকে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলাম। আমার জন্মদাত্রীকে কাঁদিয়েছি ব'লে নিজেকে শাসিয়েছি বটে মনে-মনে, তবে সেই সঙ্গে এ-ও মনে হয়েছে যে, আমার লেখায় এক ধরনের শক্তিও আছে হয়তো। এই ধারণা আরো খানিকটা ভিত্তি পেলো, ক্লাশ নাইনের পরীক্ষার পর। আমাদের ক্লাশ নাইনের বাংলার শিক্ষক বিনয় বাবু আমার পরীক্ষার খাতা খুলে আমার লেখা 'এক টুকরো কয়লার কাহিনী' প্রবন্ধটির খুব তারিফ করলেন। ছাত্ররা সবাই আমার দিকে তাকালো। আবার আমার মনে হলো, হয়তো সত্যি-সত্যি লেখার ক্ষমতা আমার মধ্যে বিদ্যমান যা উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে।

কিন্তু এর পরেও আমি অনেক দিন ক্লাশের বাইরের কোনো লেখা দিয়ে খাতার পাতা ভরিয়ে তুলিনি। অনেক পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পা' রেখেই

লেখা শুরু করি। তখন আমরা মাহুতটুলি থেকে সরে এসেছি আশেক লেনে। সেখানেই আমি আমার প্রথম কবিতা লিখি যেটি ঢাকার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোনার বাংলা'য় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় কবিতা দাখিল করার ব্যাপারে আমার বন্ধু হামিদুর রহমানের পীড়াপীড়ি সক্রিয় ছিলো। তার উদ্দীপনা না থাকলে হয়তো পত্রিকাটির দিকে আমি পা বাড়াতাম না।

'সোনার বাংলা'য় আমার কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর আমি পত্রিকাটি আমার মায়ের হাতে দিয়েছিলাম তাঁর পুত্রের কবিতাটি পড়ার জন্যে। ইতিমধ্যে আমার বাবা ঘরে ঢুকে ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিলেন। আমার বাবা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, "এসব আমি ঢের দেখেছি। পারবে সে হুমায়ুন কবিরের মতো কবি হতে?" আমি আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জোরালো কণ্ঠে ব'লে ফেললাম, "যদি আমি কোনোদিন কবি হই তাহ'লে হুমায়ুন কবীরের চেয়ে বড় কবি হবো।" এই দুর্বিনীত বাক্য উচ্চারণ করার পর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াইনি, পাশের ঘরে চলে যাই। এই কাণ্ডে আমি নিজেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম, যে-আমি বাবার সঙ্গে কথা বলতেই কেন যেন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম।

যা-ই হোক, শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন কবীরের চেয়ে বড় কবি হতে পেরেছি কিনা, তবে হুমায়ুন কবীর পরবর্তীকালে আমার কবিত্বশক্তির তারিফ করেছেন, কারো কারো কাছে এবং তাঁর পত্রিকা 'চতুরঙ্গে' আমার বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। জানি না, আমার কবিতা কত কাব্যপ্রেমীর কাছে আদৃত, যা-ই হোক এখনো আমি লিখে চলেছি এবং যতদিন বেঁচে আছি, লেখনীর গতিকে মুখ থুবড়ে পড়তে দেবো না। যদি ভবিষ্যতে কোনো সম্পাদক আমার কবিতা তার পত্রিকায় ছাপতে আগ্রহী না হন, তাহলে আমি স্বেচ্ছায় কোনোদিন কোনো সম্পাদকের দহলীজে গিয়ে ধরনা দেবো না। আমার কবিতার পাণ্ডুলিপি স্যুটকেশের ভেতর কিংবা বিছানার নিচে রেখে দেবো।

ইতিমধ্যে ধন্যবাদ দিই আমার পুস্তক প্রকাশকদের যারা আমার বই সোৎসাহে প্রকাশ করছেন। এই উৎসাহী প্রকাশকদের মধ্যে অন্যতম মনিরুল হককে ধন্যবাদ।

১/১/২০০৫ **শামসুর রাহমান**

সূচিপত্র

১. প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে

২. দুঃসময়ে মুখোমুখি

৩. এক ধরনের অহংকার

৪. বিধ্বস্ত নীলিমা

৫. রৌদ্র করোটিতে

৬. নিজ বাসভূমে

৭. বন্দি শিবির থেকে

৮. শূন্যতায় তুমি শোকসভা

৯. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে

১০. ইকারুসের আকাশ

১১. উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ

১২. কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি

১৩. আমার কোনো তাড়া নেই

১৪. হোমারের স্বপ্নময় হাত

১৫. ধুলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ

১৬. আমরা ক'জন সঙ্গী

প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে

প্রথম প্রকাশ	ফাল্গুন ১৩৬৬ [ফেব্রুয়ারি ১৯৬০]
প্রকাশক	বার্ডস এ্যান্ড বুকস, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী	কাইয়ুম চৌধুরী

উৎসর্গ-পত্র

আমার খামার নেই নেই কোনো শস্যকণা
আছে শুধু একটি আকাশ
তারই কিছু আলো-নীল আজো হে সুদূরতমা
ভালোবেসে তোমাকে দিলাম।।

প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
(পূর্বলেখ)

এই সেই পৃথিবী অপার মাটি যার এতকাল
সুপুষ্ট স্তনের মতো ফল আর ফাল্গুনের ফুল
করেছে উৎসর্গ নিত্য সন্তানের শ্রম প্রজ্ঞা প্রেমে
পূর্ণ হয়ে দীর্ণ হয়ে? এই সেই পৃথিবী সাবেকি?

দেখেছি সমুদ্রতীরে অস্তরাগে একদা হাওয়ায়
নর্তকী-শিখার মতো সফেদ তরুণ ঘোড়া এক
মেতেছে খেলায়– মনে পড়ে পিছনে এসেছি ফেলে
উজ্জ্বল হরিণ-দিন, উন্মুখতা সজীব গাছের।

এতদা যে-নদী নীলিমাকে ভালোবেসে চেতনায়
নিপুণ শিল্পীর মতো গড়েছে নিবিড় দুই তীর,
তাকে আর পাব নাকো দৃষ্টির রেখায় দীপ্ত, প্রাণে
হবে না মুখর ঝরনা বসন্তের বিফল সম্ভাষে।

যে-চেতনা এল ফিরে দুঃস্বপ্নের কুয়াশাকে চিরে
জীবনে আবার অন্ধ নিয়তির মতো দুর্নিবার
চাইনি এমন আলো অভিসন্ধি যার নিমেষেই
নরকবিলাসী শুধু লুব্ধ এক তৃষিত কোরাসে।

এখন যে-অগ্নিকুণ্ড দাহ আনে কে তাকে নেভাবে
প্রসন্ন রুপালি জলে? সূর্যহীন হয়েছে এখন
যে-হৃদয় অনেক অজ্ঞাতবাসে, অন্ধকারে তার
শুধুই প্রেতের গান– নেই কোনো সমুজ্জ্বল মুখ।

অন্ধকার ভয়-ব্যাপ্ত রক্তের ভিতর, সাড়া নেই
লোকালয়ে, এমনকি পাখির চিৎকারে অতর্কিতে
কাঁপে না হাওয়ার ঢেউ, ভয়াবহ স্তব্ধতা পথের।
'দাঁড়িও সেখানে তুমি'– বলেছিল কেউ– মনে পড়ে,

'নিঃশব্দে যেখানে শত হৃতদীপ্তি আত্মার মিছিল
রক্ত আর হলুদ পুঁজের ভাণ্ড তুলে ধরে মুখে।
দারুণ দুঃস্বপ্ন-বিদ্ধ বিকারের ঘোরে তমসায়।
ভুলতে-না-পারা অগণিত স্মৃতির করাল চিহ্নে
কণ্টকিত তাদের বিশীর্ণ সত্তা; দাঁড়িও সেখানে–

তারপর চলে যেও একা তুমি, কোরো না যাচাই।'
এ-দৃশ্যের বোধ যাকে পায় সে কি মৃত্যু নয় তবে,
মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়, মরণের অন্য মানে আছে?

মনে হয় আমি যেন সেই লোকশ্রুত ল্যাজারস,
তিনদিন ছিলাম কবরে, মৃত– পুনর্জীবনের
মায়াস্পর্শে আবার এসেছি ফিরে পৃথিবীর রোদে।
পোশাকের জেল্লা তবু পারে না লুকাতে কোনোমতে।

বিকৃত দেহের ক্ষত, লোবানের ঘ্রাণ সহজেই
ডুবে যায় প্রাক্তন শবের গন্ধে; নীল আঙুলের
প্রান্তে বিদ্ধ তিনটি দিনের ক্ষমাহীন অন্ধকার।
ভাস্করের অসম্পূর্ণ মূর্তির মতন ঘুরে ফিরি।

উল্লোল নগরে কত বিলোল উৎসবে; কিন্তু তবু
পারি না মেলাতে আপনাকে প্রমোদের মোহময়
বিচিত্র বিকট স্বর্গে। বিষাক্ত ফুলের মতো কত।
তন্ময় রহস্য জ্ব'লে ওঠে আজও দু'চোখে আমার।

সত্তায় এনেছি বয়ে অন্তহীন আশ্চর্য বিষাদ।
সেহেতু সে-বিষাদের বৃন্তে ফোটে আতঙ্কের ফুল,
আমার সান্নিধ্যে কেউ ঘেঁষে না সহজে, ভয়, পাছে
তাদের শিরায় নামে লিথির বিষণ্ন জলধারা।

স্বর্গদীপ্ত প্রাণ নিয়ে এসে এ কোথায় কোন দেশে
হারিয়ে ফেলেছি রূপ পশুর রোমশ অন্ধকারে?
এখানে মরার খুলি ধুলোয় গড়ায় চারদিকে,
খেলার ঘুঁটির মতো অসহায়, ভবিষ্যৎহীন।

মাঝে-মাঝে কৃষ্ণকায় বিকট পাখির লৌহচঞ্চু
মাংস ছিঁড়ে নিতে আসে– আমি তাকে পারি না ফেরাতে।
আর চেয়ে দেখি মৃত্তিকায় করোটিতে জ্যোৎস্না জ্বলে
বিষণ্ন স্মৃতির মতো, দ্বিতীয় মৃত্যুর ধ্বনি ভাসে।

রুপালি স্নান

শুধু দু'টুকরো শুকনো রুটির নিরিবিলি ভোজ

অথবা প্রখর ধু-ধু পিপাসার আঁজলা-ভরানো পানীয়ের খোঁজ
শান্ত সোনালি আল্পনাময় অপরাহ্ণের কাছে এসে রোজ
চাইনি তো আমি। দৈনন্দিন পৃথিবীর পথে চাইনি শুধুই
শুকনো রুটির টক স্বাদ আর তৃষ্ণার জল। এখনও যে শুই
ভীরু-খরগোশ-ব্যবহৃত ঘাসে, বিকেলবেলার কাঠবিড়ালীকে
দেখি ছায়া নিয়ে শরীরে ছড়ায়,– সন্ধ্যা-নদীর আঁকাবাঁকা জলে
মেঠো চাঁদ লিখে
রেখে যায় কোনো গভীর পাঁচালি– দেখি চোখ ভরে;
ঝিঁঝির কোরাসে স্তব্ধ, বিগত রাত মনে করে
উন্মন-মনে হরিণের মতো দাঁতে ছিঁড়ি ঘাস
হাজার যুগের তারার উৎস ঐ যে আকাশ
তাকে ডেকে আনি হৃদয়ের কাছে, সোনালি অলস মৌমাছিদের
পাখা-গুঞ্জনে জ্বলে ওঠে মন, হাজার-হাজার বছরের ঢের
পুরোনো প্রেমের কবিতার রোদে পিঠ দিয়ে বসি, প্রগাঢ় মদের
চঞ্চলা সেই রসে-টুপটুপ নর্তকী তার নাচের নূপুর
বাজায় হৃদয়ে মদির শব্দে, ভরে ওঠে সুরে শূন্য দুপুর
এখনও যে এই আমার রাজ্যে– এইটুকু ছিল গাঢ় প্রার্থনা–
ঈশ্বর! যদি নেকড়ের পাল দরজার কোণে ভিড় করে আসে,–
এইটুকু ছিল গাঢ় প্রার্থনা– তবুও কখনো ভুলব না, ভুলব না।

ভাবিনি শুধুই পৃথিবীর বহু জলে রেখা এঁকে
চোখের অতল হ্রদের আভায় ধূপছায়া মেখে
গোধূলির রঙে একদিন শেষে খুঁজে নিতে হবে ঘাসের শয্যা।
ছন্দে ও মিলে কথা বানানোর আরও কত তীক্ষ্ণ লজ্জা
দৃষ্টিতে পুষে হাঁটি মানষের ধূসর মেলায়!
চোখ ঠেরে কেউ চলে যায় দূরে, কেউ সুনিপুণ গভীর হেলায়
মোমের মতন চকচকে সুখী মুখ তুলে বলে এঁকেবেঁকে 'ইশ,
দিনরাত্তির মধুভুক সেজে পদ্য বানায়, ওহো, কী রাবিশ!'
আকাশের নিচে তুড়ি দিয়ে ওরা মারে কত রাজা, অলীক উজির
হেসে-খেলে রোজ। তবু সান্ত্বনা : আকাশ পাঠায় স্বর্গ-শিশির,
জোনাকি-মেয়েরা বিন্দু-বিন্দু আলোর নূপুরে ভরে দেয় মাঠ
গাঢ় রাত্তিরে বিষণ্ন সুরে : তোমার রাজ্যে একা-একা হাঁটি
আমি সম্রাট!
শিশিরের জলে স্নান করে মন তুমি কি জানতে
বিবর্ণ বহু দুপুরের রেখা মুছে ফেলে দিয়ে

চলে যাবে এই পৃথিবীর কোনো রুপালি প্রান্তে?
নোনাধরা মৃত ফ্যাকাশে দেয়ালে প্রেতছায়া দেখে, আসন্ন ভোরে
দু'টুকরো রুটি
না-পাওয়ার ভয়ে শীতের রাতেও এক-গা ঘুমেই বিবর্ণ হই,
কোনো-একদিন গাঢ় উল্লাসে ছিঁড়ে খাবে টুঁটি
হয়তো হিংস্র নেকড়ের পাল, তবু তুলে দিয়ে দরজায় খিল
সত্তাসূর্যে যেসাসের ক্ষমা মেখে নিয়ে শুধু গড়ি উজ্জ্বল কথার মিছিল।

হয়তো কখনো আমার ঠাণ্ডা মৃতদেহ ফের খুঁজে পাবে কেউ
শহরের কোনো নর্দমাতেই;– সেখানে নোংরা পিছল জলের
অগুনতি ঢেউ
খাব কিছুকাল। যদিও আমার দরজার কোণে অনেক বেনামি
প্রেত ঠোঁট চাটে সন্ধ্যায়, তবু শান্ত রুপালি স্বর্গ-শিশিরে স্নান করি আমি।

মনে মনে

জানি না কী করে কার মমতার মতো
শান্ত-শুভ্র ভোর এসে ঝরে
জানি না কী করে এত নীল হয় রোজ
ধ্রুপদী আকাশ। ঘাসে এত রং, রোদে
জীবনের সাড়া, বিকেল হাওয়ায় এত নির্জন ভাষা
(জানল না কেউ) তবু কী করে যে বেঁচে আছে তারা!
ভালোলাগা রং নিয়ে
সাধারণ-অপরূপ
কত ছবি আঁকলাম
নগরে ও বন্দরে
হিতকথা বুদ্ধের
শিখলাম, যত পাখি
সন্ধ্যার– জানলাম।

আমার কি সব তবু ঠিক জানা হল?

শিশুর চোখের বিস্ময়-আঁকা মায়াবী দৃষ্টি যার
প্রসারিত এই জীবনের গাঢ় মানচিত্রের রঙে,
সুদূর গাঁয়ের কুয়োতলা আর শহরের কোনো পার্কের মৃদু ঘাস,
পৃথিবীর কত রহস্যময় সোনালি রুপালি দ্বীপ

আবরণ খুলে জীবনের মানে এখনও জানায় যাকে
সে কি তবে তার মুখের ওপর বন্ধ দরজা দেখে
ফিরে যাবে একা, ভুলে যাবে গান, বলো?
হারিয়েছি কত বিকেলের মতো নারী,
বহুবার আমি হারিয়ে ফেলেছি
পাখির দেহের রঙে ঝিলমিল, স্নেহে-ছাওয়া ঘর;
হারাইনি তবু সুরের নূপুর, ভুলিনি আমার গান।

এখনও তো লুট করে আনে মন দিনের প্রবাল,
রাতের হীরের হার,
এখনও হাজার সহজ খুশির
নিবিড় ঝরনা-আলো,
এতটুকু ভালোলাগা
কুড়িয়ে ছড়িয়ে সহস্র ভিড়ে ডুবে যাই, ভেসে উঠি।

ফুলের মতন তারারা যখন অন্ধকারের স্রোতে
ভাসে, কাঁপে, জ্বলে– মনে পড়ে তার মুখ,
মনে পড়ে তার মুখ।

রাতের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যায়।
যে আছে দাঁড়িয়ে অতিদূর পাড়াগাঁয়ে
দীপ হাতে সেই অভাবের সংসারে
সত্যিমিথ্যে যদি ফিরে যাই হঠাৎ সেখানে তার
বিবর্ণ খেলাঘরে
সে কি আর ভাঙা পুতুল কুড়োবে
কাক-ডাকা রাতে একা?
দু'জনের কত গহন দুপুর
চলে গেছে সেই যোজন-যোজন দূরে।
যদি ফিরে যাই জামতলা আর পারুলডাঙার মাঠে,
যে যাবে সঙ্গে তার কথা কিছু জানি!

তার শয্যার পাশে

শুয়ে আছে একজন নিরিবিলি ভোরের শয্যায়
শীত-গোধূলির শীর্ণ শব্দহীন নদীর মতন
শিথিল শরীর তার লেগে আছে ফ্যাকাশে চাদরে,

দেয়ালে আলোর পরী। খোলা দরজা। ঘরে ঠাণ্ডা হাওয়া
খেলা করে, ঝরনা-হাওয়া ঝরে,
ঝরে একমাথা চুলে, ঝরে
করুণ ক্লান্তির ভারে বুজে-থাকা চোখের ওপর।
পাখা নেড়ে, শিস দিয়ে হলদে পাখি উড়ে গেল মেঘে
নির্জন বারান্দা থেকে। সারা ঘরে শান্তি স্তব্ধতার,
কখনো হঠাৎ তার নিমীলিত শুকনো গলা শুনি :
ছায়া-ছায়া-আলো-স্বর– হয়তো ডেকেছে জল দিতে।

শিরশিরে হাওয়ায় কাঁপে শরীরের মেরুন র‍্যাপার।

চৈতন্যের আলো পড়ে ঘুম-পাওয়া সত্তার পাপড়িতে,
সূর্যের চুমোয় লাল পাণ্ডু গাল। টেবিলের দুটি
তরুণ কমলালেবু চেয়ে আছে দূরের আকাশে,
চিকন সোনালি রুলি ম্রিয়মাণ শঙ্খশাদা হাতে
যেন বেদনায় স্থির– মনে হল– সেই দুটি হাত
মায়াবী নদীর ভেজা সোনালি বালিতে আছে প'ড়ে!
ফ্লাস্কে দুধ। শিশি। ওডি-কলোনের ঘ্রাণ উন্মীলিত
সারা ঘরে। পেশোয়ারি বেদানার ফিকে-লাল রস
কাচের গেলাসে ভরা– গোধূলি-মদির।
কাল সারারাত ছায়া-অন্ধকারে প্রতি পলে পলে
মোমের শিখার মতো ইচ্ছা তার জ্বলেছিল এই
ভোরকে পাওয়ার। চোখে ছিল
গাঢ় প্রার্থনার ভাষা, বুকে
উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা প্রীত জীবনের, সৌন্দর্যের সাধ।
কে যেন তারার মতো কাল রাতে ডেকেছিল তাকে
মূক ইশারায় দূরে তবু সেই একজন জানি
ভোরকেই চেয়েছিল উন্মথিত রক্তের ভিতর
যেমন সে পেতে চায় প্রেমিকের চুমোর আদর
রাত্রির জঠরলগ্না। ছায়াচ্ছন্ন অপদেবতার
অমর্ত্য চোখের নিচে রাত তার কাটে হরিণের
করোটির ছবি নিয়ে, সারাক্ষণ জেগে থেকে কাল
শুনেছে ধূসর ধ্বনি অবচেতনার অন্ধকারে।

এখন সে শুয়ে আছে ক্লান্তপ্রাণ সম্রাজ্ঞীর মতো
ভোরের আলোয় নেয়ে, ডুবে আছে মসৃণ আরামে।

জেগে উঠে হাত নেড়ে, সোনালি রুলির শব্দ করে
গোধূলি-মদির শান্ত বেদানার রস নিল চেয়ে,
হাসির আশ্চর্য জ্যোৎস্না তার
ঠোঁট চুয়ে ঝরে গেল (হায়,
অপদেবতার ক্রোধ) ঝরে গেল ভোরের শয্যায়।
অতল হৃদয় বেয়ে উঠল গান, শান্ত শব্দহীন,
চোখে তার উপচে-পড়া অপরূপ জয়ের উল্লাস।
ভোরকেই চেয়েছিল উন্মথিত রক্তের ভিতর।

সেই একজন।

জর্নাল, শ্রাবণ

১
তুমি আসবে না
নিঃশব্দে নিঃসঙ্গ এই চেনা
বাগানের দরজা খুলে ফাল্গুনের বিহ্বল দুপুরে
বাগানের দরজা খুলে ফাল্গুনের বিহ্বল সিঁড়ির নির্জন বাঁক ঘুরে
এসে শিশিরের মতো স্বেদকণা মুছে মিহি রুমালে, হাওয়ায়
প্রীত তুমি মৃদু টোকা দেবে না দরজায়;
গানের গুঞ্জনে আর উঠবে না ভরে
দক্ষিণের শূন্য ঘর প্রহরে প্রহরে।
যে-চোখে ফুলের ঝাড়, ফলের গুচ্ছের ভার দেখি
সেই চোখ চোখই থাকে অনাদি, সাবেকি;
যখন তোমার দিকে চাই, চোখ আর চোখ নয়,
থরথর কম্পিত হৃদয়।
দুপুরের ছায়া মনে, হালকা পর্দা তুলে
তুমি এসে দাঁড়ালে কি পিঠ-ছাওয়া চুলে?
শুধু ভুল ভেঙে দিতে ঘরময় বয়ে গেল বেনামি নিঃশ্বাস।
বাতাসের ঘূর্ণি নাচে বাগানের শুকনো পাতা ওড়ে পথে, পিচে–
তরতর সিঁড়ি বেয়ে সূর্য নামে পশ্চিমের, দোতলার নিচে
মশকের ভারে কুঁজো ভিস্তি, জলোচ্ছ্বাস। ভেজা ঘাস।

যাকে ভুলি, যোজন-যোজন দূরে যে যায় হারিয়ে
তাকে হাতড়িয়ে

আনা ফের স্মৃতির রোদ্দুরে–
অবিকল যেন ফুল হয়ে যাওয়া ভ্রমরের সুরে।

দূরত্বের তটরেখা ব্যাপ্ত জাগরণে
এই চরাচরে– সব ব্যবধান ঘুচে যায় মনে,
জানি ঘুচে যায়
অরণ্য মর্মরে দূরে স্বপ্নের ছায়ায় :
একই স্রোতে গ'লে গিয়ে, একই কামনার সুরে ভেসে
দু'দিকের অভিসারী দুই নদী মেশে।

পাখির মতন কেউ বলে–
'অজস্র তারার ধূলি ধুয়ে যাবে শিশিরের জলে
ঘুমহারা জানালার রাত শেষ চলে।
সন্ধ্যার হাটের মেলা ভেঙে গেলে যার
ভয় থাকে কিছু হারাবার
সে-ও অনুরাগে হাত ছোঁয় কত চেনা ও অচেনা
পথিকের–' ভোরের স্বপ্নের ডালে।

তুমি আসবে না।

২
পৃথিবী শেখায় বহু তত্ত্বকথা, সব টুকিটাকি
আশ্চর্য খবর জানা যায় গ্রন্থকীট সেজে ব'সে;
যেখানেই থাকি
কোথাও আকাশ থেকে দূরে তারা খ'সে
গেলে টের পাই;
সাংহাই জ্বলেছে কবে, কার চোখে ট্রয় জ্ব'লে পুড়ে হল ছাই,
রুশের বিপ্লবে কারা করতালি পেয়েছে প্রচুর,
জীবনের নানা ছলাকলা আর দূর
আকাশের পরপারে যা রয়েছে লেখা
একদিন সবি যায় শেখা।
শিল্পের জটিল সূত্র উন্মীলিত হয়,
রবীন্দ্রনাথের গান সময় সময়
হাওয়া দেয়, হাওয়া দেয় সত্তার গভীরে,
তবু জানি, মেয়ে, এত আলো মেখে মনের তিমিরে
কী আশ্চর্য আজও মনে হয়–
তোমার হাতের স্পর্শ, কপালের টিপ,

তোমার কণ্ঠের মৃদু গুনগুন ধ্বনি, হাসি, কালো
চুল আর অতল চোখের দুটি শিখা দিতে পারে যত আলো
তত আর দেয় নাকো অন্য কোনো জ্ঞানের প্রদীপ।

৩
জানি না রাত্রির কানে কার নাম প্রার্থনার মতো
বলো তুমি ঘন-ঘন অন্ধকার নিঃশ্বাসের স্বরে,
পুবের জানালা খুলে গুনগুন গান গেয়ে শেষে
যখন শয্যায় জ্বলে দেহ, কার মুখ ভেবে-ভেবে
তোমার চোখের হ্রদে নামে সব ঘুমের অপ্সরী,
কার স্বপ্ন দেখে, কার তীব্র চুম্বনের প্রতীক্ষায়
তোমার যুগল স্তন স্বর্গ হয় রাত্রির নরকে;
জানব না কার কোলে মাথা রেখে অন্তিম বিদায়,
শেষ ক্ষমা চেয়ে নেবে পরিচিত পৃথিবীর কাছে
কোন ক্ষণে জানব না কোনো দিন, কোনো দিন তবু ॥

১৩৫৭-র একটি দিন

দৈনন্দিন নগরে ও বন্দরের ভিড়ে যত মুখ
দেখি, ছুঁই যত হাত, রংছুট জীবনের যত
টুকরো ছবি তুলে নিয়ে মনে রোজ ফিরে আসি ঘরে,
বুদ্বুদের মতো সবি একদিন হারায় সুদূরে,
মিলায় কৌতুকী ধূপে। সবি মুছে যায়? তবু কিছু
সুবর্ণ ঘটনা
জমা থাকে জাদুকর সময়ের আশ্চর্য থলিতে।

বিস্ময়ের স্তব্ধ তটে দাঁড়িয়ে দু'জনে
মুখোমুখি পদ্মার স্টিমারে,
উন্মীলিত চোখের আকাশে
বিদ্যুতের মতো উঠল জ্বলে প্রিয়-সম্ভাষের শিখা।
ডেকের রেলিং ধরে সে-ও পদ্মাপারের সুদূরে
এক ফোঁটা কাজল গাঁয়ের দিকে, ধু-ধু শূন্য চরে
চেয়ে ছিল অপলক চোখে;
জেলেদের সরু ডিঙি চলে গেল ঢেউয়ের আড়ালে।

পদ্মায় সন্ধ্যার ছায়া। দূরযাত্রী পাখিকণ্ঠে সাড়া

দিগন্তের অদৃশ্য নূপুরে,
এখানেই একদিন ছিল নাকি রৌদ্র-ছায়া-আঁকা
কোনো গ্রাম,– কোমল শিশিরে আর ঘাসে পরিপাটি,
হয়তো মুখর হ'ত মানুষের উজ্জ্বল উৎসবে সেই গ্রাম
এখন যেখানে শুধু জলের ধূসর মরুভূমি।

মদির চুলের গাঢ় তিমির-সৌরভে
সহস্র রজনীগন্ধা হৃদয়ের উষ্ণ অন্ধকারে
উঠল ফুটি থরে-থরে, তখন হঠাৎ যদি নিতাম মুঠোয়
তুলে তার দুটি হাত, স্নিগ্ধ গালে উঠত জেগে লজ্জার আশ্চর্য রামধনু
আর যা হ'ত (বলা নয়) ভাবা যায় শুধু।

দুরন্ত পদ্মার
অজানা যাত্রীর সাথে সে-ও নেমে গেল
একফোঁটা গাঁয়ের স্টেশনে,
জলে তার পূর্ণ ছায়া, বাতাসে রুমাল, মেঘে-মেঘে ঝাপসা চোখ,
প্রৌঢ় পিতা বিব্রত শরীরে
জড়িয়ে পুরোনো শাল নামলেন ধূসর ডাঙায়
পিছনে আড়ষ্ট গিন্নি, শিশুপুত্র। কন্যা অষ্টাদশী।
সারেঙের তীব্র বাঁশি, নিচে ফের চাকার তলায়
উচ্ছল, ফেনিল জল– দূরে নীল কুয়াশায় সুখী পরিবার।

পেরিয়ে বাঁশের সাঁকো, মাঠ। মধ্যযুগী
অশ্বত্থের নিচে হেঁটে যেতে
হয়তো পড়বে চোখে পথের কিনারে
পাড়াগাঁর কোনো
দুরন্ত ছেলের কিছু ফেলে-যাওয়া ম্লান বুনো ফল,
কড়ি আর রাঙা নুড়ি : ছেঁড়াখোঁড়া খেলার সংসার।
কার কথা ভেবে-ভেবে সেই মেয়ে পৌঁছে যাবে শেষে
তার সাতপুরুষের দেশের ভিটায়? কত সুবর্ণ ঘটনা
জমা থাকে জাদুকর সময়ের আশ্চর্য থলিতে।

সগর-শিয়রে রোজ সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের ছবি
রং ঢালে, প্রজ্বলিত হয় দিনলিপি।
কে যেন ফুঁ দিয়ে
বারবার খুলে দেয় রহস্যের থলি;
ঝরায় বর্ষার জল প্রথামতো আষাঢ়, শ্রাবণে,

পথ চলি আশার উল্লাসে!
সব কলরব, সব গুঞ্জন ছাপিয়ে
মাঝে-মাঝে তাকে মনে পড়ার মতন
সমুজ্জ্বল বেদনায় হৃদয়কে ছিঁড়ে
জেগে ওঠে দুরন্ত পদ্মার সেই সফেন কল্লোল ॥

অতি পুরাতন বৃষ্টি

মেঘে-ঢাকা রাত্রি নয়, ভরা-দুপুরেই
যখন পরীর মতো গান গেয়ে ওরা আসে এই
বাংলার আকাশ থেকে নিচে
দিগন্তের ঘাসে দক্ষিণের শান্ত বিলে শহরের পিচে
আমারও প্রাণের ভাষা সুর হয়ে ঝরে
এ মাহ ভাদরে।
আবার তোমাকে পাই হৃদয়ের সৃজনী-উত্তাপে :
সমস্ত শরীর হয় দীপ্ত শিখা, অন্ধকারে কাঁপে।

মেঘে-ঢাকা এই ভরা-দুপুরের কাছে
হয়তো তোমার কিছু রহস্য-নিবিড় কথা আছে
শুধাবার, তাই চোখে অপার বিস্ময়
তরঙ্গের তরণীর মতো কাঁপে, মনের নিঃশব্দ লোকালয়
দূরগামী উত্তরমেঘের
নিত্যপথে ভাষা পায় বেদনার ব্যাপ্ত আনন্দের।

যে-পথে হাঁটিনি আমি কোনো দিন, সেখানে এখন
স্তব্ধতার সুরে সুরে নেমেছে বর্ষণ
শ্রাবণের। পথের যে-কোনো গাছ, পশু, একা পাখি, সারি সারি বাড়ি
মহাশ্চর্য মেঘ হয়ে যায়
বৃষ্টির ধোঁয়ায়।

কখনো যাবে না চেনা কে ছিল ঘুমিয়ে
না-দেখা পল্লীর
মাটির দেয়াল-ঘেরা দূর ঘরে স্বপ্ন মুড়ি দিয়ে
এমন বৃষ্টির
আচ্ছন্ন দুপুরে মিশে। পাশে তার কেউ
ছিল না কি জেগে একা রমণীর ঘুমের সৌরভে?

যখন প্রাণের সব ঢেউ
জেগে ওঠে, কথা বলে, রক্তের আশ্চর্য কলরবে
বৃষ্টির দুপুরে মনে পড়ে
বর্ষার মতন গাঢ় চোখ মেলে তুমি আছ দু'দিনের ঘরে ॥

যুদ্ধ

বারোমাস তুমি ক্ষ'য়ে গ'লে ঝরে
যা-কিছু পেয়েছ বর্ষার মেঘে বাতাসের স্বরে
দিগন্ত-কাঁপা রোদের সাড়ায়
শত বছরের কবির চোখের, প্রাণের তারায়
–নিত্য নিজেকে বলি বারবার–
বিনিময়ে তার
দু'দিনের যত সাধারণ সুখ
ছাড়ো হেসে-খেলে, শুধু এক-বুক
বেদনার রেণু ছড়িয়ে তোমার গানের ভাষায়
প্রগাঢ় অনেক অজানা আশায়
ভুলে গিয়ে ছেঁড়া হৃদয়ের ক্ষত
যেই ঝড় আজও না চাইতে আসে
মুছে ফেলে তাকে মেনে নাও এই বন্ধ্যা আকাশে
তারা ফোটানোর ব্রত।

কিছু নেই যার বিত্তের কণা
বাজিয়ে সে তার চিত্তের তারে আনে মূর্ছনা,
কত নেভা প্রাণে বাতি দেয় জ্বেলে
আবেগের নীল শিখা-শিহরণে, দ্যাখে চোখ মেলে
গ্রীষ্মকঠিন বর্ষাকোমল শহরের মুখ
প্রেমিকের মতো গাঢ় উৎসুক।
আমি যা-কিছুই করি আহরণ দিন-রাত্তির
উজ্জ্বল বহু গ্রন্থ অথবা দেশ-কাল আর ভোরের শিশির
পাখির বৃত্ত, কৃষ্ণচূড়ার রোদ্দুর থেকে
স্বচ্ছ মধুর মতো চেখে-চেখে–
ব্যর্থ হবে কি তা-ও একদিন?
পাতা ঝরে যাক, ব্যথা মর্মরে প্রাণ হোক লীন :

বিদ্যুৎজ্বলা সৃষ্টি-আগুনে ঝরুক ঝরুক ঘন অবিরল
হৃদয়ের মেঘ-জল।

বাঁকাচোরা পথ দু'পায়ে মাড়িয়ে দেখি উদ্ধত
কৃপাণের মতো
জ্বলছে প্রাণের রৌদ্রের শিখা রাত্রির খাপে;
যাকে ভালোবাসি তার ঠোঁটে কাঁপে
সূর্য-হাসির, সোনালি-চিকন বালি-ঝরা আভা–
তার জন্যেই কখনো বাঁচার আনন্দ বাড়ে।
জলের কুমির ডাঙার বাঘের দুরন্ত থাবা।
ক্রূর উদ্যত, হই না ছিন্ন পৃথিবীর দাঁত-নখের প্রহারে,
তবু জানি এত বিস্ময়-লাগা সভ্যতা আছে
জীবনের কাছে;
বিনিময়ে তার
তুচ্ছ মেনেছি খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের হার।
অস্ত্র আমার নেই কিছু শুধু গান নিয়ে আমি
সংসার রুখে দাঁড়ালে কঠিন প্রান্তরে নামি;
যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছি তবুও মরিনি থাবার
প্রহারে এখনও, সোনালি-চিকন সূর্য-হাসির, গ্রন্থ-আভার
পৃথিবীতে রোজ নতুন বোধের গাঢ় রূপাভাস,
বাঁচবার উল্লাস ॥

পুরোনো তৈলচিত্র

পৃথিবী ঘুরছে নিত্য, ডিঙিয়ে শীতের বেড়া বসন্তের শিশু
প্রথামতো হানা দেয় উড়িয়ে নিশান।
ফিরতি-পথে ফুল কিনে সন্ধ্যার পথিক
কড়া নেড়ে দরজায় যাকে পায় তার
আঁচলে প্রদীপ কাঁপে, প্রাণের হাওয়ায়
জানা কবিতার
উন্মীলিত ধ্বনি,
সামান্যের জিত :
দু'দণ্ড পুণ্যের জলে ডুবোও হৃদয়,
ধুয়ে নাও নরকের কালি।
তুমি আর পারবে না দাঁড়াতে সেখানে

জীবনের মুখর সারিতে
স্থানাভাবে,
দেয়ালেই আপন পৃথিবী।

বুক-ডোবা শান্ত জলে পাখি মেরে সূর্যাস্তের পরে
নিত্যসঙ্গী কুকুরের গলার শিকল শ্রান্ত হাতে
সুন্দরবনের রাতে ধোঁয়া-ওঠা তাঁবুর আরামে ফিরে আসা,
রহস্যসিরিজে ডুবে কাঁটা আর চামচের বিতর্কে উৎসুক
প্রহর কেটেছে যার জায়াপুত্রকন্যার সংসারে
অথবা চিল্কায় ছুটি সিমলায় ফগে আর পাহাড়ি হাওয়ায়
পত্নীর অভ্যস্ত প্রেমে তৃপ্ত মন (আপাতদর্শনে)
ব্যাঙ্কের অঙ্কের স্ফীতি ছিল যার স্বর্গ-সিঁড়ি, তার
প্রস্থানের নেপথ্য নাটকে

সে কি তবু জেনে গেছে পৃথিবীর শেষ কোনো শ্লোক,
স্বপ্নে তাকে করেছে কি তাড়া চন্দ্রবোড়া, অন্তরালে
কে জানে হৃদয়ে তার ছিল কি না কীটের উৎসব ॥

আত্মজীবনীর খসড়া

গলায় রক্ত তুলেও তোমার মুক্তি নেই
হঠাৎ আলোয় শিরায় যাদের আবির্ভাব,
আসবেই ওরা ঝড়ের পরের পাখির ঢেউ।
তাদের সুদূরে ফিরিয়ে দেবার মন্ত্র যদি
জানতে, তবে কি প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থতার
কাদাবালি মেখে সত্তা তারায় আত্মজ্যোতি
কখনো হারায়, লোকনিন্দার তীক্ষ্ণ হুলে
অচিরে বিদ্ধ অকালবৃদ্ধ সহজে ব'নে
কেটে যেত কাল আকাশকুসুম জল্পনায়?
তারা যাকে বলে সফলতা তার চিহ্ন তুমি
সারা পথ হেঁটে এখনও কিছুই পাওনি খুঁজে :
সহজ তো নয় স্বর্গসিঁড়ির আশায় বাঁচা।

যার দেখা পেয়ে চলতি পথের সূর্যোদয়ে
মুগ্ধ তরুণ অমরত্বের মন্ত্র পেল,
অচেনা মাঠের বিহ্বল থামে দাঁড়িয়ে একা

পেতে চাও ঐ নদীর নিবিড় শ্রাবণে যাকে,
ইচ্ছে-জোয়ারে ভেসে-ভেসে তুমি ট্রেনের পথে
নেমে যাও সুখে হঠাৎ বেঠিক ইস্টিশনে
খেয়ালি আশায় সন্ধানে যার দিনের শেষে
গ্রামান্তে কোনো, তাকেই তো বলো সুন্দর, না?

গোলকধাঁধায় তাকে খোঁজা ভার সত্য জেনো,
তার জন্যেই জপেছ গানের কত-না কলি,
পথ চেয়ে আছ সকল সময় প্রতীক্ষায়
কে জানে কখন আসবে সে তার শ্রান্ত পায়ে–
আসবে যেদিন কী দিয়ে বরণ করবে তাকে?
তোমাকে দীর্ণ করে যারা আসে, প্রস্ফুটিত
পদ্মের মতো সৃজনী আভায় কামসুরভি
ছড়ায় হৃদয়ে, কোটি জ্যোতিকণা বিলায় মনে,
সমস্ত রাত একা-একা ঘরে চার-দেয়ালে
মাথা খুঁড়ে তুমি মরছ যাদের প্রতীক্ষায়
চিনেছ তাদের বহুবার তবু কেন যে এই
লগ্নে রক্তে কুমারীর ভীরু চঞ্চলতা,
আসবেই ওরা– পারবে না তুমি ফেরাতে আর।
ভেবেছ কখনো সুরের সভায় আসন পাওয়া
সম্ভব হবে? এই যে ছড়ানো কথার কালো
দুরাশায় আজও জোনাকি-জীবন, কখনো তারা
দূরের শরতে স্মৃতিগন্ধার পাবে কি আলো?
এ-কথা কখনো জানবে না তবু মৃত্যু হবে।

শহর জেগেছে, দূরে ঘণ্টায় প্রাণের ধ্বনি,
রোগীর শরীরে নামল নিদ্রা হাসপাতালে,
যারা কোনো দিন ভুলেও পেল না আপন জন
ছেঁড়াখোঁড়া সেই কজন রাতের জুয়োশেষের
ক্লান্তিতে ফের ভিড়ল ধোঁয়াটে রেস্তোরাঁয়।
আস্তাবলের সহিস ঘোড়ার পিঠ বুলোয়,
শীতের শুকনো ডালের মতোই ভিস্তি বুড়ো
কেঁপে-কেঁপে তার জল-মসৃণ মশক বয়;
পথের কুকুর হাই তুলে চায় ধুলোয়, কেউ
জানল না ভোর ফুটল তরুণ ফুলের মতো,
খণ্ডিতা নারী এখনও আলোর আলিঙ্গনে।

আজও আছে চিরকস্তুরীটুকু লুকোনো মনে :
সেই সৌরভে উন্মন তুমি, তখন জানি
দেয়ালে তোমার কাঠকয়লার আঁচড় পড়ে ॥

পূর্বরাগ

জেনেছি কাকে চাই, কে এলে চোখে ফোটে
নিমেষে শরতের খুশির জ্যোতিকণা;
কাঁপি না ভয়ে আর দ্বিধার নেই দোলা–
এবার তবে রাতে হাজার দীপ জ্বেলে
সাজাব তার পথ, যদি সে হেঁটে আসে।
যদি সে হেঁটে আসে, প্রাণের ছায়াপথ
ফুলের মতো ফুটে তারার মতো ফুটে
জ্বলবে সারারাত, ঝরবে সারারাত।
জেনেছি কাকে চাই, বলি না তার নাম
ভিড়ের ত্রিসীমায়; স্বপ্ন-ধ্বনি শুধু
হৃদয়ে বলে নাম, একটি মৃদু নাম।

তোমাকেই বলি

ছায়া-করে-আসা দূরের পথের
সাঁকো পেরোবার ধীর-মুহূর্তে
পাশাপাশি শুধু হেঁটেছি দু'জন;
স্তব্ধ ছিলাম সারাবেলা তবু
দ্বিরুক্তি তুমি করনি কিছুই।
মনের কথাটি বলতে যাবার
লগ্নে আমার হৃদয়ে আজও তো
শত-পাখি-স্বর ফোটে নির্জনে,
সেই কাকলির তাড়ায় মধুর
আপন কথাটি কোথায় হারায়।

হয়তো ভেবেছ কোনো দিন কেউ
সেই ঢেউ মেখে হয়নি উতল
যার উতরোল ফেনার শীর্ষে

জ্বলছে আমার ভাষার মুক্তো।
দিনরাত্তির ভাবনার জাল
ফেলে শেষে তুমি কতটুকু পাবে
হৃদয়ের সেই অতল অমায়?
নতুন কথার অপরূপ মণি
তোমাকে যে দেব কৌটোয় তুলে
এমন আশায় কখনো জ্বলিনি।
প্রাকৃতিক মহাদানের মতোই
তোমার গানের শান্ত-মধুর
পুরানো কলিটি নতুন যেমন
–প্রতিবার বলি হৃদয়ের কাছে–
মনের কথাটি তেমনি আমার :
তোমাকেই চাই, তোমাকেই চাই ॥

শিখা

জানলাম
পোড়ায় সে নগর ও গ্রাম,
শত্রুর শিবির আর মিত্রের পাড়ায়
সমান প্রতাপ তার। অলক্ষ্যে কখন কী হারায়
পৃথিবী, কে জানে–
হাওয়ায় ঘোরানো ক'টি শুকনো পাতা, অথবা সভ্যতা, তার মানে
নিয়েছি নিজের মনে খুঁজে;
দেখি চোখ বুজে
সে যায় অনেক দূরে বনের হাওয়ায়
এবং মোমের মৃদু শিখা হয়ে কাঁপে তার খোলা জানালায়।

নির্জন দুর্গের গাথা

মানিনি জীবন সমুদ্র সন্ধানে
চোরাবালিতেই পরম শরণ নেবে।
আশার পণ্যে পূর্ণ জাহাজ সে-ও
ডোবা পাহাড়ের হঠকারিতায় ঠেকে
হবে অপহৃত– ভাবিনি কখনো আগে।

দিনের সারথি বল্গা গুটিয়ে নিলে,
যখন রাত্রি কৃষ্ণ কবরী নেড়ে
আনে একরাশ তারা-ফুল থরথর
দু'হাতে সরিয়ে শ্যাওলার গাঢ় জাল
চম্‌কে তাকাই আমিও মজ্জমান।
ভবিষ্যতের ঝাঁপির অন্ধকারে
যা-কিছু রয়েছে আমার জন্য শেষে
সবি নিতে হবে দৈবের দয়া মেনে?
ব্যঙ্গ-দৃষ্টি আড়ালেই ঝলসায়।
নির্জনতার কারাগারে সঁপে প্রাণ
আত্মদানের মহৎ দুর্গ গড়ি।
যদি সে প্রাকার-বিরোধী অশ্বখুরে
অচিরাৎ তার দৃঢ় নির্ভর ভোলে,
যদি দর্পের দর্পণ হয় গুঁড়ো,
ঝড়ের সামনে ভাগ্যের শাখা মেলে
কাকে পর ভেবে কাকে-বা আপন জেনে
সাধের শ্রমের দিব যে জলাঞ্জলি।

যদি হ'ত ঐ তারাদের মতো চোখ
তারার মতন নিবিড় লক্ষ কোটি
দু'দিনের ঘরে হয়তো পেতাম তবে
বেলা না ফুরাতে তাকে এই চরাচরে
চোখের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেখার সুখ।
অবুঝ আমার আশা উদ্বাহু তবু।

বিরূপ লতার গুচ্ছে জড়িয়ে শিং
কালো রাত্তিরে তৃতীয় প্রহরে একা
কাঁদে প্রত্যহ হরিণ-হৃদয় যায়
তাকে নেব চিনে : প্রাণের দোসর সে-যে।

সম্মুখে কাঁপে অমোঘ সর্বনাশ।
দিনের ভস্ম পশ্চিমে হয় জড়ো,
অনেক দূরের আকাশের গাঢ় চোখে
রাত্রি পরায় অতল কাজল তার।
এমন নিবিড় স্মৃতি-নির্ভর ক্ষণে
বলি কারো নাম, হৃদয়ের স্বরে বলি।

জ্বলি অনিবার নিজেরই অন্ধকারে।

এতকাল ধরে আমার আজ্ঞাবহ
ঘাতক রেখেছে তীক্ষ্ণ কুঠার খাড়া,
সেই যূপকাঠে নিজেই বলির পশু।

উঁচু মিনারের নির্জনতায় মজে
ভেবেছি সহজে বিশ্বের মহাগান
আমার প্রভাতে সন্ধ্যায় আর রাতে
ঝরনা-ধারায় আনবেই বরাভয়।
সেই বাসনার প্রভূত জাবর কেটে
শূন্যে ছুড়েছি দুরাশার শত ঢিল।

প্রতিপক্ষের কূটচক্রের তান
পশেনি কর্ণে, ওদের বর্ণবোধে,
সান্ধ্য ভাষায় করিনিকো দৃক্‌পাত।
কবন্ধ যারা নিত্য জন্মাবধি
অন্ধের মতো তাদের যষ্টি ধরে
দ্বন্দ্বের ঘোরে ছুঁইনি গতির বুড়ি।

বিরস গান

ইচ্ছা আর অনিচ্ছায় জীবনভোর কলম ঠেলে
হায়রে তুমি কী-ইবা পেলে?
দিনরাত্রি পুঁথির শত পাহাড় খুঁড়ে দেখলে শেষে
পোড়া কপাল! মূষিক মেলে।
কালের মেঘে অকাল সাঁঝ নিমেষে এল হঠাৎ ভেসে :
দেখলে শেষে যৌবনের পরম গতি নিরুদ্দেশে।

প্রেতের মতো একাকিত্বে সব পন্থা খুইয়ে এসে
কন্থা গায়ে বলবে কাকে মহান প্রভু?
যাকেই বলো হারানো গান পাবে না তবু।
কঠিন পথে আশার রথ তাড়িয়ে দ্রুত কোথায় এলে?
কার সে হাতে আত্মা সঁপে,
জীবনভোর ভীষণ সেই নামটি জ'পে
মনের যত হঠকারিতা গুঁড়িয়ে ফেলে
হায়রে তুমি কী-ইবা পেলে?

কোনো একজনের জন্যে

এতকাল ছিলাম একা আর ব্যথিত,
আহত পশুর অনুভবে ছেঁড়াখোঁড়া।
দুর্গন্ধ-ভরা গুহায়িত রাত নিষ্ফল ক্রোধে দীর্ণ,
শীর্ণ হাহাকার ছাড়া গান ছিল না মনে,
জানি প্রাণে ছিল না সতেজ পাতার কানাকানি
—এমনকি মরুভূমির তীব্রতাও ছিল না ধমনিতে,
স্বপ্ন ছিল না,
ছিল না স্বপ্নের মতো হৃদয়।

এই উন্মথিত সময়ের আকাশ চিরে যাব
—এমন সাহসী ডানা ছিল না আমার।
রাত্রিময় আকাঙ্ক্ষাগুলো বেড়ে ওঠেনি সজীব গাছের ছন্দে,
দমকা বাতাসের আনন্দে নেচে ওঠেনি বুকের তারা।
শুধু রূঢ় অনিশ্চয়তার পাথরে
এতকাল ধরে ক্ষয়ে গেছে দিনগুলি, রাতগুলি।
মৃত্যুপ্রতিম স্মৃতির সরীসৃপ নিয়ে
আমি বিব্রত, বিপজ্জনক।

বিশ্বাসের কোনো ঐন্দ্রজালিক তারা
আলো বিলোয়নি সত্তায়. তবু
উদ্ধারের বাসনায় গ'লে প্রার্থনা হয়েছি কতদিন।

অনিদ্রার বিভীষিকায় তুমি এলে
—অনন্তের একবিন্দু আলো—
বাহুতে উজ্জীবনের শিখা, উদ্ধারের মুদ্রা উন্মীলিত।
দমকা বাতাসের আনন্দে কেঁপে উঠল বুকের তারা;
শশকের উৎকণ্ঠা নিয়ে তোমাকে দেখলাম,
রুপালি উর্ণাজালের শত্রুতা সাধল
দুরন্ত উদ্দাম একরাশ চুল।

কে জানত এই খেয়ালি পতঙ্গ, শীতের ভোর,
হাওয়ায় মর্মরিত গাছ,
ঘাসে-ঢাকা জমি, ছায়া-মাখা শালিক
প্রিয় গানের কলি হয়ে গুঞ্জরিত হবে
ধমনিতে, পেখম মেলবে নানা রঙের মুহূর্ত।

কে জানত লেখার টেবিলে রাখা বাসি রুটি
আর ফলের শুকনো খোসাগুলো
তাকাবে আমার দিকে অপলক
আত্মীয়ের মতো?

ছিল সে-ও

ছিল সে-ও ধুলোর নিঃসঙ্গ পথে, ছিল কোলাহলে
সমর্পিতা চিরদিন। দিঘি তাকে চেয়েছিল বলে
সোনার শরীর নিয়ে ব্যর্থ হল নারী।
ডুবিয়ে পায়ের পাতা, সহচরী শাড়ি
ডুবিয়ে নিঃসঙ্গ জলে নামল যখন—
ঝাপসা চোখ, মেঘ হল মন।

অত শান্ত জলের কুহকে তার সমাজ সংসার হবে লীন :
কেই তাকে বলেনি সেদিন।

মাচায় অর্পিতা লতা জানে যার প্রীত পরিচয়,
ভুলব কি তার নাম? দূরে কাছে একই হাওয়া বয়?
প্রসারিত ধুলোয় নিঃসঙ্গ পথ-রেখা;
কাকে দেখে ঘুরে ঘুরে উঠানে কুকুর কাঁদে একা?

খাঁচার পাহাড়ি পাখি সে-ও যেতে চায়
অজানা কোথায়—
গাছে-গাছে মূর্ত ভাষা, পৃথিবীর সমস্ত আকাশে
বেলা প'ড়ে আসে ॥

অ্যাপোলোর জন্যে

অ্যাপোলো তোমার মেধাবী হাসির সোনালি ঝরনা
শিশু পৃথিবীর ধূসর পাহাড়ে এখনও কি রবে লুপ্ত?
আমরা এখানে পাইনি কখনো বন্ধু তোমার
সোনালি রুপালি গানের গভীর ঝঙ্কার,
শাণিত নদীর নিবিড় বাতাস মানবীর মতো ডাকে চেতনার রাত্রে,
তবুও এখানে আমরা সবাই বিবর্ণ রোগী পৃথিবীর পথে,
হৃদয়ের রং মনের তীক্ষ্ণ ক্ষমতা ফেলেছি হারিয়ে।

অ্যাপোলো তোমার মেধাবী হাসির সোনালি ঝরনা
শিশু পৃথিবীর ধূসর পাহাড়ে এখনও কি রবে লুপ্ত?

রাত্রি। রাত্রি। অথই রাত্রি। নীল সমুদ্র মনের কিনারে ফুলছে।
অতিদূর ধু-ধু সময়হীনতা সময়ের কোনো তন্দ্রাকে মুছে
নির্জন সেই আকাশপ্রদীপে, শিশিরে জলে কাঁপছে।
দেয়ালে টাঙানো হরিণের ছালে অরণ্যমতী জীবনের গাঢ় কান্না,
অরণ্য তুমি ক্ষমা করো শুধু– চেতনা প্রসারী।
মহতী গানের ধ্বনি বুকে পুষে তোমাকে ভুলেছি আমরা।
অতিদূর ধু-ধু সময়হীনতা সময়ের কোনো তন্দ্রাকে মুছে
নির্জন সেই আকাশপ্রদীপে, শিশিরের জলে কাঁপছে!

সান্ধ্যভাষার দীপ্তি জড়িয়ে কার যেন এক অপরূপ মুখ ক্ষুব্ধ
ক্ষুব্ধ আমার মনের ক্লান্ত গোধূলি-শিখায়, জানালার প্রীত আকাশে।
চোখের গভীরে সুদূর-অতল কাস্পিয়ানের টলটলে নীল কেঁদেছে,
অত্যাচারের হিংস্র ব্যথায় নিজের হাতেই ছিঁড়েছে বুকের
সোনালি হরিণ : দীর্ণ সে-নারী ফাল্গুনি মন হারাল?
তবুও একটি গভীর-রুপালি পূর্ণিমা জ্বলে মানবীর ছেঁড়া হৃদয়ে।
ক্লীব সমাজের প্রবীণ ক্ষমতা কেড়েছে অনেক
প্রণয়ী মনের উজ্জ্বল আর নরম রজনীগন্ধা।
রাত্রি। রাত্রি। অথই রাত্রি। নীল সমুদ্র মনের কিনারে ফুলছে!

অ্যাপোলো শুনছ? নামল এখানে যাদের ধূসর সন্ধ্যা,
পৌষ এসে ডাক দিয়েছে তাদের শূন্য ভাঁড়ারে
ঠোঁটে তুলে নিতে ইঁদুরের মতো মৃত্যু!
ধু-ধু প্রান্তরে আনাগোনা করে 'প্রাচী'র প্রাচীন ছায়ারা,
ম্লান ঘোড়াদের আর্ত চোখের বিষণ্ন রোদে
খুঁজব কি বলো মধ্যযুগের ক্লান্তি?
নেমেসিস-হাসি কেঁপেছে আবার প্রাণ ঝরে ফের জীবনের মানচিত্রে,
অ্যাপোলো! অ্যাপোলো! প্রবাল ঠোঁটের, চেতনা-প্রসূত–
সোনালি রুপালি মেয়েরা এখানে আসবে?

যে ছায়া আয়নায়

যে-ছায়া আয়নায় দ্যাখো সকাল-সন্ধ্যার অবসরে
তাকে কেউ কোনোদিন বলে কি রূপসী অনুপমা?

ভুলেও বলে না জানি কেউ তাকে রূপের আধার।
তোমার গালের কালো একটি তিলের বিনিময়ে
দেবে না বিলিয়ে কেউ অকাতরে সাম্রাজ্য বিশাল;
অথবা তোমার জন্য ভাসবে না শত রণতরী
তোমার শিখায় জ্ব'লে পুড়ে ছাই হবে না কখনো
প্রাচীন নগর কোনো– কোনো দিন হবে না কিছুই।

আক্ষেপ প্রচ্ছন্ন থাক, ক্ষমা করো এ সত্যভাষণ।
জেনেছি স্তুতির জাদু, কী দরকার মিথ্যাচারে মজে?
যা-কিছু অর্পিত এই কবিতার সামান্য আধারে,
নিশ্চিত এ নয় জানি প্রেমিকের উচ্ছ্বাস প্রপাত,
অথচ তোমার মনে নিত্য যে-অনল উন্মীলিত,
তাকে চাই দ্বিধাহীন প্রাণের সংসারে প্রতিদিন।

অলোকসামান্য নয় লেখনী আমার, তুমি তাই
পারবে না কখনো এড়িয়ে যেতে কালের তিমির।
তাকে কী? অন্তত ছিলে আমার নিভৃত অন্তর্লোকে
গানের মতোই ব্যাপ্ত চিরদিন : সে-ও তুচ্ছ নয় ॥

সে

প্রেম তাকে করে না আকুল। উদয়াস্ত তার প্রাণে
একটি মরুর জ্বালা উন্মোচিত– যেন সে দুর্জ্ঞেয় কোনো যন্ত্রণার গানে
ধুলোর বিজনে যাত্রী মোহাবিষ্ট আর হলদে পাতার বালিশে
মাথা রেখে অভীষ্ট সহজ গাঢ় ঘুমে যায় মিশে
ক্লান্তির মন্থর শ্লোকে,
অভিভূত হঠাৎ কখনো
ফুলের পাপড়ির মতো আকাশকে বলে, 'ঐ শোনো
কার যেন বাঁশি বাজে, স্পন্দিত পৃথিবী!'–শুধু তার মনে হয়
কোথাও অলক্ষ্যে কোনো নিঃসঙ্গ ফলের মতো একটি হৃদয়
গড়ে ওঠে। সারাক্ষণ ভাবনার কত ছায়া ঝরে,
সে কার স্পর্ধিত মাথা লোটে আজ ব্যথার পাথরে?

সোনার শিকল পায়ে পারেনি পরাতে কেউ তার
ত্রিলোকের ত্রিসীমায়। একটি অরূপ নদী প্রাণে বয় যার,
সে যায় চলার ধ্যানে, জনহীন বনে সে-ও পথভ্রষ্ট, জানে সব দিক

নির্দয় কালোয় মাখা, তবু এক তৃষ্ণা তাকে করেছে পথিক।
এবং অভ্যাসবশে
উদাসীন সে-ই আসে ফিরে
সাতপুরুষের জীর্ণ ভিটের তিমিরে
মাঝে-মাঝে, আলোর দাক্ষিণ্য নেই, তবু কিছু তুলে নিতে বাসনার ফুল
পুরোনো পিদিম জ্বালে। মনে পড়ে ছিল কার কালো চুল সুগন্ধে আকুল।

সে জানে নিজের কিছু পরিচয়, জানে তার বয়সী কপালে
ত্রুটির তিলক কাটা, একা-একা তাই শুধু জ্বালে
ব্যথার আগুন মনে। কোনো দিন অপরের দীপ্ত গুণে, জয়ে
হয়নি অসূয়া-দীর্ণ, তারও চোখ রূপ খোঁজে, অথচ আপন মুখ ভয়ে
কখনো দেখে না ভুলে। তাকে আর কে দেবে অভয়?
একটি অরূপ নদী (জানে সে-ও) প্রাণে তার বয় ॥

একান্ত গোলাপ

আমার হৃদয়ে নেই লোকাতীত একান্ত গোলাপ,
সৌরভের উন্মোচনে যার রূপসী মহিলা তুমি,
তুমি হবে প্রমোদের রাণী নেপথ্যে বসন্ত দিনে।
বরং হৃদয় আজ ভয়াবহ তীব্র তিক্ত গন্ধের অধীন। ভ্রমে যদি
নিষ্ঠুর দুর্গন্ধে ভরা এই হৃদয়েরে মনে করো
অলীক অম্লান ফুল, সে কার চক্রান্ত তবে, কার?

আমার হৃদয় যেন অতীতের বিধ্বস্ত নগর,
যেখানে প্রেতের মতো ভাঙা থামে নিশান্তের হাওয়া
মাথা কোটে অবিরাম, শূন্যতায় তারার বৈভব।

মানি না আত্মার আয়ু যতিহীন, স্বর্গ-নরকের
প্রাক্তন কাহিনী শুনে বিচলিত হইনি কখনো।
'দেহের বিনাশ চলে পরপারে পুনর্মিলনের
উৎসব উজ্জ্বল হবে'– করব না সে-কথা স্বীকার।
বিশ্বাসের ঝুলি ঝেড়ে অদ্যাবধি পাইনি তবুও
অন্তত একটি কণা সান্ত্বনার। তাই বলি, তুমি
আমার কামের ফুলে মঞ্জরিত হও দ্বিধাহীন,
তোমার অধর দাও দাও তুমি মধুর আলস্যে ভরা কেশের মিনার,
এবং বিশ্বাস করো তোমাকে যে ভালোবাসি, তার
চিহ্ন তুমি কখনো পাবে না খুঁজে প্রথাসিদ্ধ পথে ॥

মৃন্ময়

অনেক কিছুই জানা নেই আপন এ পৃথিবীর।
বিতরিত হতে পারে হাটে-মাঠে– এমন নিবিড়
আলো নেই আমার তামস করতলে,
অথচ নিত্যই দেখি নির্বিকার জোনাকিরা জ্বলে
ছায়ার প্রহরে আর মসৃণ স্তনের মতো ফলে
স্তব্ধ গাছ, শব্দ শুনি মৌমাছির অধীর ডানার।
কখনো খড়ের বিছানার
উষ্ণতায় মজে দেখি যায় বেলা যায় :
গোলাপি আকাশ ক্রমে হয় ফিকে, কাঁপি প্রত্যাশায়।

কারো শুভ্র মালা ছিঁড়ে করি না বড়াই
কোনো দিন আর রাজরাজড়ার লড়াই
বাঁধলে ঘেঁষি না তার ত্রিসীমায়, জানি না কোথায়
বাঘ-মোষ এক ঘাটে জল খায় কিংবা ইতিহাসের পাতায়
কারা কুশীলব,
তাদের বৈভব
আনে না বিভ্রান্তি মনে। শুধু জ্বেলে রাখি
ইচ্ছা-ব্যাকুলতা : যেন তাকে নিয়ে থাকি
দুর্জ্ঞেয় কান্নার পাকে, অভিন্ন হওয়ার ধ্যানীক্ষণে
দু'জনের আপন ধুলোয় এই শান্তিনিকেতনে ॥

কথার জন্যে

তা চলে কী করি?
একটি কথার জন্যে ভেবে মরি সারাক্ষণ, অথচ কথার
অন্ত নেই বিশাল ত্রিলোকে, প্রাণবন্ত শত কথা
–ব্যথার কান্নার জলে ভেজা,
অব্যক্ত আনন্দে আভাময়–
শুধু কথা ফোটে চিরকাল। এই মাটির সংসারে
নিতান্ত যে আটপৌরে লোক,
তারও চোখ দীপ্ত হয় কথার অনলে।
পথে-ঘাটে গঞ্জে কি বাজারে
হাজারে হাজারে তারা ধ্বনিময়। শ্রুতির জানালা খুলে রাখি।
কথা,

গাছের পাতার মতো সহজ-সবুজ;
কথা,
রহস্যের মেঘে-ঢাকা;
কথা,
তত্ত্বের ঘোরালো
আবর্তের মতো
নিষ্ঠুর-কুটিল;
কুমারীর কণ্ঠে-জাগা কুহকিনী কথা আছে,
আছে অফুরন্ত অর্ধস্ফুট কথা; আর আছে কথা
কবির চৈতন্যলোকে সুপ্ত, স্তব্ধ প্রতীক্ষায়।

শুধু তাকে বলা যায়– এমন কথার সাড়া নেই
অসংখ্য কথার ভিড়ে, হাটে-মাঠে। যেখানেই থাক
আসে না সহজে তারা এই অন্তর্লোকে ॥

খাদ

সেখানে গভীর খাদ আছে এক কুটিল, ভয়াল :
অতিকায় সিংহের হাঁয়ের মতো অদ্ভুত শূন্যতা
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত তার, আদিগন্ত বিভ্রমে বিহ্বল।
অতল গহ্বরে সেই আছে শুধু পাঁক, পুঞ্জীভূত
আবর্তিত ক্রুদ্ধ ক্রূর অন্ধ পাঁক, শুধু পাঁক।
আকাঙ্ক্ষিত ফুলদল, লতাগুল্ম, পদ্মের মৃণাল
অথবা চিকন মৃগ কিছুই হয় না প্রত্যাখ্যাত
গলিত শবের কীট, কৃমিপুঞ্জ– ঘৃণিত জটিল–
কিছুই জন্মে না তাতে, মৃত্যু ছাড়া জন্মে না কিছুই।

অপটু ডানার শীর্ণ পাখির শাবক, বুড়ো কাক,
মাঠের নিরীহ গোরু, দিনান্তের তৃষিত মহিষ
অথবা চিকন মৃগ কিছুই হয় না প্রত্যাখ্যাত
অতল গহ্বরে সেই। অতর্কিতে হয়তো কখনো
বিভ্রান্ত পথিক কোনো রাত্রির মোহিনী অন্ধকারে
পাঁকের আবর্তে ডোবে নিরুপায়, ব্যর্থ আর্তনাদ,
তিলে তিলে নিমজ্জন, যথারীতি অন্তিমে বিলোপ।
এবং আমিও আজ নিমজ্জিত অন্তহীন খাদে।

দুর্গন্ধের সুতীব্র পীড়নে রাত্রিদিন বিভীষিকা
সমপরিমাণে; ক্রমাগত কেবলি জড়াই পাঁকে।
নিঃশ্বাসে নরক ফোঁসে, আমার অধীর আত্মা সে-ও
গরলের বিন্দু হয়ে ঝরে সারাক্ষণ, আর দেখি
আকাশে নক্ষত্র-গুচ্ছ, আমি শুধু মরালের মতো
অন্তিম গানের ধ্যানে প্রজ্বলিত, গুঞ্জরিত খাদ ॥

নক্ষত্র-বিন্দুর জন্যে

কেন আমি নিমেষেই সর্পমুগ্ধ শশকের মতো
হয়ে যাই আবির্ভাবে তার? কেন শুধু উন্মুখর
একটি অনুরণনে প্রতি রক্তকণা হয় নক্ষত্র-চেতন?

শব্দের মোহন সুরে ঘর ছেড়ে নির্দয় সূর্যের
তৃণহীন প্রান্তরে হারাই পথ, চোরাবালিতেও
পা ঠেকে কখনো আর অরণ্যের জটিল বিভ্রমে
চুল ছিঁড়ি, মুহূর্তে মুহূর্তে মজি মৃগতৃষ্ণিকায়।

যখন মজুর মিস্ত্রি সান্ত্রী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই
ক্লান্তিহর আদিম নিদ্রায় মগ্ন অকাতরে, আমি কেন শুধু
শয়তানের মতো একা বন্ধ ঘরে করি পায়চারি?
অশান্ত জ্বলন্ত গুপ্ত, নিষ্করুণ জ্বরের মূর্ছায়
নিজেকে খনির মতো কেন খুঁড়ে আনি আজও শব্দের সম্ভার?
এমনকি নিদ্রার ঘোরেও করি কত দেবদুর্লভ প্রগাঢ়
উচ্চারণ, অথচ স্বগৃহে বহু বিবেকী মানুষ
সুখ-পরিমল পান করে কাটায় প্রহর কত
উজ্জ্বল রেশম যব আর তিসির হিসেবে।
তবে কেন, কেন আমি
এমন উত্তাল হই, এমন অধীর
ভূতে-পাওয়া মানুষের মতোই সুদূর আর প্রতিধ্বনিময়
আশৈশব সামান্য মিলের আর ছন্দের সংরাগে?
মাঝে-মাঝে নিরাপদ স্বর্গের মসৃণ অধিবাসী
আমাকেও বিদ্ধ করে দ্বিধাহীন ঘৃণার ত্রিশূলে,
যেমন সদলবলে তারা খাঁচার পশুকে তার
স্বপ্ন থেকে কৌতুকে খুঁচিয়ে তোলে অবলীলাক্রমে
প্রচ্ছন্ন হিংসায় মেতে গরাদের নিশ্চিন্ত আড়ালে?

দান্তে কি উন্মাদ তবে, বোদলেয়ার মাতাল শুধুই?

জেনেছি আমার পথ নয় কিছু নির্বিঘ্ন, সরল;
উপরন্তু সর্বনাশা ঘুঁটির নিহিত পরিণামে
বুকের নক্ষত্র ছিঁড়ে নিয়ে গেছে দুর্জয় শয়তান ॥

কাব্যতত্ত্ব

গনগনে চুল্লির আলোর খইয়ের মতো কথা ফোটে
অন্তর্লোকে, রাশি রাশি। আর আমি
তাদের ছড়িয়ে দিই ঢেউয়ের ফেনায়, সপ্তর্ষিমণ্ডলে,
পাহাড়ের চূড়ায়, উইয়ের ঢিবিতে, যেখানে খুশি।
গাছের সতেজ পাতায়, রৌদ্র-লাগা, বৃষ্টি-মোছা দেয়ালে,
ঘরের উন্মুক্ত কপাটে, রুটির বাদামি গড়নে,
শুকনো ফলে, অলিন্দে চড়ুইয়ের বুকে গাঁথা সেসব কথা
নক্ষত্রের অভিযাত্রার মতো বিন্দুতে বিন্দুতে
কম্পমান, মুহূর্তের অধীশ্বর। সেই মুহূর্তে
মাতাল ছাড়া কী-ই আর হতে পারি আমি?

রাত্রির পীড়নে উন্মথিত আমি নক্ষত্রের ঝড়ের মতো
শব্দপুঞ্জ থেকে ছিঁড়ে আনি কবিতার অবিশ্বাস্য শরীর
—সৌন্দর্যের মতো রহস্য-ঢাকা, নগ্ন আর উন্মীলিত।

আমার সেই নির্মাণে মাননীয়, পক্বকেশ পণ্ডিত
হন্তদন্ত হয়ে খোঁজেন গ্রিক পুরাণের উল্লেখ,
দেশী কিংবা বিদেশী কবির প্রভাব শুঁকে বেড়ান তাঁরা
নিপুণ গোয়েন্দার মতো, আর না-চাইতে বিলিয়ে দেন
ঝুড়ি ঝুড়ি মূল্যবান কথা,
হায় রে মূল্যবান কথা!
বলতেই হয় তাঁরা বুদ্ধিমান, মগজওয়ালা দামি মানুষ,
তাঁদের ভয়ানক বিদ্যের স্কেল দিয়ে মেপে দেখেন
সৌন্দর্য, কিন্তু কী মূঢ় তাঁদের বিবেক!
জানি সেই বুদ্ধির চত্বরে কোনো দিন ছিটিয়ে পড়বে না
প্রেমের মতো সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, জন্ম নেবে না
আগুনের শিকার মতো
রাশি রাশি অফুরন্ত সবুজ ঘাস, ভুলেও কোনো দিন

তাদের চোখে, মনে উড়বে না তারার ঝড়ের ধূলি,
এতই সাবধানি তাঁরা, এতই বিবেকী!

লোকে বলে বিজ্ঞজন সহস্রচক্ষু, অথচ প্রিয়তমা,
কী আশ্চর্য, কিছুতেই তাঁরা দেখতে পান না
আমার কবিতায় অর্পিত তোমার চুলের ছায়া,
নিঃশ্বাসের সুগন্ধি তাপ, আর আমার হৃৎস্পন্দন ॥

কোনো পরিচিতাকে

জানতাম একদা তোমার চোখে জারুলের বন
ফেলেছে সম্পন্ন ছায়া, রাত্রির নদীর মতো শাড়ি
শরীরের চরে অন্ধকারে জাগিয়েছে অপরূপ
রৌদ্রের জোয়ার কত। সবুজ পাতায় মেশা টিয়ে
তোমার ইচ্ছার ফল লাল ঠোঁটে বিঁধে নিয়ে দূরে
চরাচরে আত্মলোপী অলীক নির্দেশে। শাশ্বত সে

বৃক্ষের গৌরবে তুমি দিয়েছ স্বামীকে দীপ্ত কামের মাধবী,
শিশুকে সুপুষ্ট স্তন। দাম্পত্য প্রণয়ে সোহাগিনী
প্রেমিকার মতো হৃদয়ের অন্তহীন জলে, ঢেউয়ে
খর বাসনাকে ধুয়ে দান্ত সাধকের ধ্যানে তবু
গড়েছ সংসার। প্রত্যহের দীপে তুমি তুলে ধরো
আত্মার গহন নিঃসঙ্গতা, নকশি-কাঁথা-বোনা রাতে
স্বপ্নের প্রভায় জ্বলো। তোমার সত্তায় কী উজ্জ্বল
নিঃশঙ্ক অপ্রতিরোধ্য ফল জ্বলে, স্বর্গের সম্ভার।

এবং এখন জানি করুণ কাঠিন্য ভরা হাতে
আত্মায় নিয়েছ তুলে নগরের ফেনিল মদিরা,
আবর্তে আবর্তে মত্ত কাম, প্রাণে স্থির অন্ধ গলি।
হে বহুবল্লভা তুমি আজ কড়ায় ক্রান্তিতে শুধু
গুনে নাও নিষ্কাশিত যৌবনের অকুণ্ঠ মজুরি।
রূপের মলম মেখে সুচতুর মোমের ঊরুর
মদির আগুনে জ্বেলে পুরুষের কবন্ধ বিনোদ
কখনো জানিনি আগে এত ক্লান্ত, এত ক্লান্ত তুমি ॥

সুন্দরের গাথা

যেখানে সূর্যের তলে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরের গাথা
নিসর্গে মধুর মতো, ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে
অথবা যেখানে গাঢ় চন্দ্রবোড়া সঙ্গিনীর শাখায় আকুল,
ঋতুর মধুর রণে পরাক্রান্ত, সেখানে আমার অভিলাষ
অভিসারী। পিছনে থাকুক পড়ে অনেক দূরের
অনচ্ছ তারার মতো লোকালয়, তাকাব না ফিরে।

যে-চেতনা ভ্রমরকে মেখে দেয় ফুলের যৌবনে,
বসন্তের তরুণ গাছকে
দেয় মেলে অনাঘ্রাত নীলের আকাশে,
সমুদ্রের ঢেউয়ে আনে পাখিদের উদ্বেলিত বুক,
নিঃসঙ্গ কবিকে দেয় জীবনের গাঢ় মদ– শব্দের প্রাসাদ,
যে-চেতনা তৃষ্ণার্ত যাত্রীকে আনে ফের
স্মৃতির সৌগন্ধে ভরা শীতল ঝরনায়,
তারই প্রজ্বলনে
সমস্ত দুপুর ভরে জলের আলোর নিচে দেখলাম তাকে :
সঞ্চারিণী জলজ উদ্ভিদ যেন। এবং স্ফুরিত
অধরে বঙ্কিম মাছ, ফলের পূর্ণতা তার সমস্ত শরীরে।
সহসা উঠল ভেসে গভীর জলের সেই নারী
এবং সহজে তার করতলগত
নন্দিত ফুলের ঝাড় দিল সে বাড়িয়ে
আমার চোখের নিচে। দুর্লভ মণির মতো স্তন
ঘন হল বাসনার তাপে, যেমন গ্রীষ্মের ফল
গাঢ় হয় সূর্যের চুম্বনে। দেখলাম জনহীন তীরে সব
উৎকণ্ঠা উজিয়ে এসে প্রবীণ কচ্ছপ অকাতরে
তাপ নিল খুঁজে তার রৌদ্রের মসৃণ বালাপোশে।
সূর্যের জাহাজডুবি হলে সে-নারীকে বললাম,
'আমার জীবনে তুমি খেয়াল-খুশির প্রস্রবণে
প্রতিদিন যে-কুসুম দিয়েছ ছড়িয়ে,
সুতীব্র আনন্দে তার গড়েছি বাগান লোকোত্তর।
আমার ত্বকের নিচে অলৌকিক যে-কীট খেলায়
সারাক্ষণ মগ্ন তাকে ভুলে গিয়ে চেয়েছি তোমাকে,
যেমন মৃত্তিকা চায় সজীব গাছের ফল, সুপক্ব-সোনালি।'

ভেবেছি বিঁধব তাকে সহসা কৌশলে, অথচ সে
নিরুত্তর অধরে রক্তিম মাছ নিয়ে
স্বপ্নের চেয়েও আরও অধিক অতলে
গেল ডুবে নবতর কেলির তৃষ্ণায়।

তখন রাত্রির পূর্ণ আকাশে হঠাৎ এল চাঁদ–
অমূল্য, অপ্রাপনীয় মুক্তো। আর একটি শুয়োর
ইতস্তত পথ শুঁকে এসে গেল জ্যোৎস্নায়, যেখানে
তারার বুদ্বুদে ফোটে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরের গাথা।

মুছে গেল দৃশ্যাবলি চারদিকে, অনন্তর একা
আমি আর অকূল শূন্যতা ॥

অপাঙ্‌ক্তেয়

যেহেতু লৌকিকতার দড়িদড়া ছিঁড়ে বেপরোয়া
উঁচিয়ে মাস্তুল সুন্দরের ভাস্বর সে নীলিমায়
ভ্রমণবিলাসী তাই সম্মিলিত মুখর প্রস্তাবে
দিয়েছ উন্মাদ আখ্যা, উপরন্তু চিরশত্রু ভেবে
আমাকে করেছ বন্দি সন্দেহের অন্ধ ঊর্ণাজালে।

অথচ শরীর গর্ভে তমসায় নক্ষত্র-খচিত
আয়ুর অবোধ স্বপ্নে জন্মেছি আমিও, দন্তহীন
বাসনায় নিয়েছি অধীর মুখে স্তনাগ্র কোমল,
আর জুয়াড়ির মতো আপনাকে করেছি উজাড়
তীব্রতায় ধাতুর উজ্জ্বল মদে, ধুতুরার ঘ্রাণে।

মিথ্যাকে কখনো ভুলে সুন্দর ফুলের রমণীয়
স্তবকের মতো আমি পারিনি সাজাতে বঞ্চনায়,
বরং করিনি দ্বিধা কণ্ঠে তুলে নিতে আজীবন
সত্যের গরল। ফলত সে উন্নিদ্র তৃতীয় চোখ
অন্ধের বিমূঢ় রাজ্যে বাদ সাধে বলে ক্রোধ জ্বলে

বারবার আত্মতৃপ্ত এই অন্ধ কূপের গভীরে।
নেকড়ের মতো সব মানুষের দঙ্গল এড়িয়ে,
মাংসের মূঢ়তা ছেড়ে নৈঃসঙ্গে সম্পন্ন হয়ে চলি :
উত্তপ্ত তোমার মতো শরীরের পৌত্তলিক যেন

অর্পিত, গ্রথিত প্রাণ ভীষণের আগ্নেয় মালায়।

জীবনকে সহজ নিয়মে নেয়া যেত প্রথামতো,
কিন্তু তবু জ্যামিতির নেপথ্যে মায়াবী গুঞ্জরণে
মজেছি স্বতই দুঃখে অর্থ থেকে অর্থহীনতায়।
কুৎসার ধারিনি ধার, বরং নিজেরই আচরণে
বিপন্ন হয়েও শুধু সারাক্ষণ অস্তিত্বের ধার

রেখেছি প্রখর তীক্ষ্ণ আর ব্যালে নর্তকের মতো
চেয়েছি গতির ধ্যানে অনন্তের একটি মাধবী
উন্মোচিত আবর্তিত হৃদয়ের হলুদ আকাশে।
অথচ নিশ্চিত জানি জীবনের সুকান্ত আপেল
অলক্ষিতে রক্তিম চাঁদের মতো ঝরে সুনিপুণ

কীটের সুখাদ্য হবে যথারীতি। মাঝে-মাঝে তবু
নিজের ঘরের ছিদ্রে চোখ রেখে দেখি পৃথিবীকে,
যেমন বিকারী দেখে যুগলের মদির নগ্নতা,
কামকলা, অবসাদ, নিদ্রায় মধুর শিউরনো।
তোমরা সজ্জন সহৃদয়, বলি হৃদয়ের স্বরে :

আমাকে গ্রহণ করো তোমাদের নিকানো উঠোনে
নারীর আর শিশুর ছায়ায় আঁকা, রক্তকরবীতে।
আমার জীবনে নেই তৃপ্তির গৌরব, আর আমি
অর্থ খুঁজি চক্রে চক্রে, সমর্পিত মহাশূন্যতায়।

কী অর্থ নিহিত তবে নিপতিত গাছের পাতায়?

কবর-খোঁড়ার গান

মদের নেশা খাঁটি সারা জাহানে,
বাকি যা থাকে তার বেবাক ঝুট।
বাঘিনী যেন সেই মেয়েমানুষ,
যার আঁধারে কাল কেটেছে রাত।

যার আঁধারে কাল কেটেছে রাত
নেশার মতো তার স্মৃতির জ্বালা।
আলিঙ্গনে তার দুনিয়াদারি

নিমেষে ভুলে যাই অতল মোহে।

নিমেষে ভুলি সাধ অতল মোহে।
মোহিনী ও-মুখের মিথ্যা বুলি
সত্য সার ভাবি, এবং আমি
ধারি না ধার কোনো মহোদয়ের।

ধারি না ধার কোনো মহোদয়ের
আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।
নিপুণ বিদ্রূপে অন্তহীন
দূরের আসমানে জ্বলে দিনার।

দূরের আসমানে জ্বলে দিনার।
কোদালে অবহেলে উপড়ে আনি
মাটির ঢেলা আর মড়ার খুলি।
শরিফ কেউকেটা কী করে চিনি?
শরিফ কেউকেটা কী করে চিনি?
মাটির নিচে পচে অন্ধ গোরে
হয়তো সুন্দরী কুরূপা কেউ।
কোরো না বেয়াদবি বান্দা তুমি।

কোরো না বেয়াদবি বান্দা তুমি।
বাদশা নেই কেউ, গোলাম সব,
বেগম চায় পেতে বাঁদীর সুখ :
আউড়ে গেছে কত সত্যপীর।

আউড়ে গেছে কত সত্যপীর :
সমরকন্দ্ আর বোখারা তার
রূপসী মাশুকের যোগ্য নয়।
সেসব ছেঁদো কথা, মস্ত ফাঁকি।

সেসব ছেঁদো কথা, মস্ত ফাঁকি।
বিবেক বিলকুল লক্ষ্মীছাড়া,
মনের পশুটাও চশমখোর।
আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।

আমরা তিনজন খুঁড়ছি গোর।
হয়তো রুটি আর গোলাপ-কুঁড়ি

যুগ্মতায় জ্বলে চাওয়া-পাওয়ায়,
নেশার মতো খাঁটি নেই কিছুই।

নেশার মতো খাঁটি নেই কিছুই,
সাচ্চা শুধু এই দেহের দাবি।
মানতে নয় রাজি বেয়াড়া মন
দীন ও দুনিয়ার ধাপ্পাবাজি ॥

মর্মর প্রাসাদ শুধু

মর্মর প্রাসাদ শুধু ধসে যায়, সারি সারি থাম
মোমের মতন যায় গ'লে আর অজস্র জন্তুর
বিক্ষুব্ধ গর্জনে ব্যাপ্ত নৃত্যনাট্য সমূহ ধ্বংসের;
পথে পথে ঘোরে নিত্য লক্ষ্যহীন কবন্ধের দল।

আমিও নগরে এই মত্ত কোলাহলে
ক্রুশবিদ্ধ চেতনায় নিজেকে মেলাতে চাই
স্মৃতির পরম অধীশ্বরে।
এবং পাপড়ির মতো মুখ মনে পড়ে
সময়ের আঁধার অলিন্দে, যতবার সর্বনাশা
গোলকধাঁধায় ঘুরি অবিরাম ভবিষ্যৎহীন।

মৃত্যুকে লালন করে গহন সত্তায় রাত্রিদিন
দুঃস্বপ্নের নারকী বলয়ে ভ্রাম্যমাণ পথিকের
আজও তো তোমাকে
স্মরণ করার মতো মন বেঁচে আছে।

এবং কী দীর্ঘ এই প্রতীক্ষা আমার।

কতদিন ম্লান জনস্রোতে রেখেছি অধীর চোখ
তোমার সন্ধানে, তবু দেখিনি তোমাকে আর সেই
লোকশ্রুত অনন্য সাঁকোর ধারে। অথচ তুমিই
আমার ধ্যানের
সুনীল আকাশে কত পারিজাত হয়ে
জ্বলো সর্বদাই।

এ-নগরে কোলাহলে চেয়েছি একটি স্বর শুধু

ঝরুক ঝরনার মতো– সে পুণ্য ধারায়
নিশ্চল পাথর হোক প্রাণ, হে নায়িকা,
আমি চাই তোমার উজ্জ্বল আবির্ভাব।

একদা তোমার আবির্ভাব জানি ক্ষণিকের অপরাহ্নে সেই
চকিতে দিয়েছে জ্বেলে অলৌকিক প্রভা।
সত্তার নিহিত
কস্তুরীর ঘ্রাণ
তোমাকে উন্মন করে শরীরে তোমার
অলক্ষ্যে করেছে সৃষ্টি স্বপ্নচিত্র শাশ্বতীর।
ভাবিনি কখনো আগে
অন্ধ নিয়তির মতো নিশ্চিত, অপ্রতিরোধ্য, দ্রুত
পতন নির্মম, আর আমি তো চেয়েছি
মোহন মোমের ডানা মেলে নীল, বিশাল আকাশে
গর্বিত পাখির মতো অন্ধ করে দিতে
সূর্যের অনল-চোখ, কিন্তু সেই ডানা
তরল জ্যোৎস্নার মতো গেল শুধু গ'লে
অগ্রজের বিস্মিত দৃষ্টির নিচে শোচনীয় সৌন্দর্যের মতো।

দিনগত পাপক্ষয়ে কাটে
দারুণ দুঃস্বপ্ন-গাঁথা প্রহর আমার,
তারপর হয়তো কখনো
স্বপ্নে-দেখা অপ্সরীর মতো নেমে আসে
মোহিনী সৌজন্যময়ী রাত্রি, আর
তখনও তোমার শেষ দৃষ্টি
হীরের মতন জ্বলে মনের খনিজ অন্ধকারে ॥

ওই মৌন আকাশের

ওই মৌন আকাশের শবাধারে মৃতা সুন্দরীর
নিদ্রিত মুখের মত পাণ্ডু চাঁদ! কয়টি জোচ্চোর
নৈশ আস্তানায় জোটে, যেন খিন্ন মাছি ঊর্ণাজালে।
শিহরিত আমার শহর কত স্খলিত চরণে।

স্বপ্নে দেখি সিমেরীর রাজ্যে আমি যুবরাজ আর
বাহুলগ্না শাহজাদি আমার সপ্রাণ, দীপ্ত কামে

মঞ্জরিত। অথচ আবার ঘুঁটে-কুড়ানির হাত
সযত্নে সেলাই করে আমার মলিন পরিচ্ছদ।

কুকুরের দাঁতে বিদ্ধ হৃদয় আমার, উন্মোচিত
সবার চোখের নিচে, ছিন্নভিন্ন, নগ্ন, অসহায়।
চৌদিকে প্রেতেরা মত্ত ছায়ানাট্যে অফুরান, তবু
বাসনার নৌকো দোলে দুর্নিবার তরঙ্গ-শিখরে।
নাগরিক রাত্রি এই রজনীগন্ধার মতো ঘ্রাণে
উন্মীলিত অনন্তের বিশাল অরণ্যে। অন্ধকারে
প্রৌঢ় কবি হাতড়িয়ে ফেরে লোকালয়ে অবিরাম
নর্দমায় নোংরা জলে প্রজ্বলিত দুর্লভ মানিক।

শোণিতে তারার স্রোত খরশান, মাল্লাদের গানে
মাঝে-মাঝে সচকিত চৈতন্যের ভাস্বর নীলিমা।
মাস্তুলে গ্রথিত দেখি রক্তাক্ত শুশুক, ছেঁড়াখোঁড়া;
রঞ্জিত পাঁকের মাঝে উচ্চকিত কোকিলের স্বর!

আসার, শটিত ক্লেদে কলঙ্কিত অস্তিত্বের পট,
আর আমি প্রমত্ত জঙ্গলে এই চিহ্নিত, ধিক্কৃত
শিল্পের শহীদ। শাশ্বতীরে খুঁজে ফিরি, আর দেখি
নিয়ত রাত্রির চোখ সুশোভিত পাপের কাজলে।

সেই ঘোড়াটা

আস্তাবলে ফিকে অন্ধকার, ঝুলছে নিষ্কম্প স্তব্ধতা,
আর সেই বেতো ঘোড়াটা অনেকক্ষণ থেকে ঝিমোচ্ছে
নিঃশব্দে কোনো আফিমখোরের মতো, মাঝে-মাঝে শুধু
ফোলা-পা নাড়ছে ঘাড় ঝাঁকিয়ে।

আস্তাবলের ধারে নোংরা নর্দমা, তার পিছল জলে
একটা থ্যাঁতলানো ইঁদুর ক্রমাগত ধুয়ে-ধুয়ে
রূপান্তরিত : বিলীয়মান সনাতন স্বপ্ন-স্মৃতি যেন
মঞ্জরিত ওর বিকল্প অস্তিত্বে।

বিশাল আকাশে ফুটেছে পারিজাতের মতো চাঁদ,
হলদে খড়ের শয্যায় বুড়ো সহিস ঘুমিয়ে আছে সেখানে
ক্লান্ত দেহে, নিঃসন্তান, বিপত্নীক– নিদ্রিত

কাঠের নকশা যেন অবিকল।

ঘোড়াটাও ঝিমোচ্ছে, কিন্তু তার ক্ষত-নিঃসৃত মদিরা
মাতালের মতো অধীর আগ্রহে বুঁদ হয়ে পান করছে তিনজন মাছি;
এক কোণে নিস্তেজ কুপিটা কোনো প্রেমিকের বিলুপ্ত প্রেমের মতো
জ্বলছে এক বিষণ্ন আচ্ছন্নতায়।

এই তো এখানে নর্দমার ধারে কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন প্রৌঢ়
মাটির ভাঁড়ে ঢক্ ঢক্ শব্দ করে গিলেছে তাড়ি,
সব অনুতাপ হাওয়ায় উড়িয়ে, জ্যোৎস্নায় ভেজা ঠোঁটে
পান করেছে পূর্বপুরুষের স্মৃতি-বিষ!

আর রাত্রির তারাময় আঁধারে তারা হাতের মুঠোয়
কামনা করেছে অপ্সরীর স্তন, তারপর বিষাক্ত কোনো বাষ্পে
স্ফীত হয়ে ট'লে-ট'লে চলে গেছে যে যার গণিকার ঘরে।
এখন এখানে শূন্যতার ভার।

আস্তাবলের সেই বেতো ঘোড়াটা নিমেষে
তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে উঠল, আশ্চর্য এক ফুল হয়ে
জন্ম নিল তার ইচ্ছা, শিরায় শিরায়
সঞ্চারিত হল সে ফুলের সৌরভ।

চকিতে নোংরা নর্দমা হয়ে ওঠে অপরূপ সরোবর,
খড়কুটো, ছেঁড়া ন্যাকড়া থ্যাঁতলানো ইঁদুর, ফুলের তোড়া মণিরত্ন হয়ে
ঝলসে ওঠে ওর চোখে, আর সে নিজে উড়ে গেল
মেঘপুঞ্জে, নক্ষত্রগুচ্ছে, শূন্যের নীলিমায়।

মুহূর্তে মুছে গেল সময়ের সব ব্যবধান,
মেঘের বৈভবে সে ফিরে পেল তার অবলুপ্ত কান্তি,
আর ভেসে চলল আকাশ থেকে আকাশে অক্লান্ত গতিতে
কবির মতো নিঃশঙ্ক, সহজ, একা ॥

ক্ষত এবং ধনুক

বহুদূরে লোকালয় উন্মীলিত মাধবীর মতো।
অস্পষ্ট আঘ্রাণ তার স্মৃতিকে জোগাবে আমরণ
নিভৃতে উচ্ছিষ্ট মধু আর আমি দ্বৈপায়ন, রণ-

ছুট আজ, স্বেচ্ছাবন্দি; লোনা জলোচ্ছ্বাসে অবিরত
মেলাই বিষাদ-গাথা। চেয়ে দেখি সহযাত্রী কত
ভাসিয়েছে সহস্র উজ্জ্বল তরী; আমার চরণ
কৃমি-প্রসূ কাদায় প্রোথিত বলে নিয়েছি শরণ
পশুর দঙ্গলে আর জ্বলে শটিত আমার ক্ষত।

ক্ষতের দুর্গন্ধে ভীত পশু, দূরে মরালের বুক
স্বচ্ছ নীলিমায় খোঁজে স্বর্গসুখ; আর আমি এই
দুর্গম কণ্টকাবৃত বনে মাল্লার গানের প্রতীক্ষায়
জ্বলি শুধু হাতে নিয়ে যৌবনের মতন ধনুক।
জানি ঘৃণ্য প্রোজ্বল আমার ক্ষত, তবু নিমিষেই
অক্ষয় ধনু জ্বলে সবার উদ্বাহু আকাঙ্ক্ষায় ॥

পিতা

প্রাণে গেঁথে সূর্যমুখী-উন্মুখতা খুঁজি আজও তাঁকে
সর্বত্র অক্লান্ত শ্রমে। স্বপ্নের মৃণালে মুখ তাঁর
জ্যোতির্ময় কল্যাণের মতো ফুটে অভ্র-শুভ্রতার
অতল সমুদ্রে ডোবে– খুঁজি আজও বিদ্রোহী পিতাকে।
অজ্ঞাত, বিরূপ এই রুক্ষ দেশে মৌন বাসনাকে
নক্ষত্রের মতো জ্বেলে চাই তাঁকে দুর্নিবার
আতঙ্কের মুখোমুখি, যেমন সে মৃগতৃষ্ণিকার
নিঃসঙ্গ পথিক চায় পান্থপাদপের মমতাকে।

তিনি নন জন্মদাতা, অথচ তাঁকেই পিতা বলে
জেনেছি আজন্ম তাই মুমুক্ষু কালের অস্তরাগে
সমর্পিত তাঁরই কাছে। জীবনের সব মধুরিমা
করেছি নিঃশেষ শুধু অশেষ সন্ধানে জ্ব'লে জ্ব'লে।
তিনি নন বিধাতা অথচ ব্যাপ্ত সত্তার পরাগে–
তবে কি উপমা তাঁর চৈতন্যের ভাস্বর নীলিমা?

গোষ্পদ এবং মন

এখানে সমুদ্র নেই, আছে শুধু অন্ধ এঁদো ডোবা,
উইঢিপি সগৌরবে জুড়ে রয় পর্বতের স্থান,

আর ক্ষিপ্ত বায়সের গণ্ডগোলে কোকিলের গান
ডোবে অকস্মাৎ, দূরে ভাঙা চাঁদ একমাত্র শোভা।
এবং জ্ঞানীর পার্টে মূর্খ ভাঁড় কুড়োয় বাহবা
প্রতিদিন দ্বিধাহীন; নিমেষেই সাধের বাগান
ভরে ওঠে সকণ্টক ফণিমনসায়, অফুরান
দুঃস্বপ্নের প্রেত করে আনাগোনা; চেয়ে থাকি, বোবা।

অর্থাৎ কিছুই নেই, র'য়ে গেছে একখানি মন–
যেখানে গহ্বর অতল সমুদ্র জেগে রয়
পাশাপাশি, হাঙরে প্রবালে দ্বন্দ্বময়। কী ফসল
ফলবে সেখানে কল্পনার মন্বন্তরে? সারাক্ষণ
জপেছি প্রথম পাঠ জীর্ণ টোলে– জেনো সুনিশ্চয়,
আশার মৃণালে জ্বলে জীবনের সুবর্ণ কমল।

তিনশো টাকার আমি

আখেরে হলাম এই? আর দশজনের মতন
দৈনিক আপিস করা, ইস্ত্রিকরা কামিজের তলে
তিনশো টাকার এই পোষমানা আমিকে কৌশলে
বারোমাস ঝড়ে জলে বয়ে চলা যখন-তখন?
এই আমি? এবং প্রভুর রক্তনেত্র সারাক্ষণ
জেগে রয় ঘানিটানা জীবনের চৌহদ্দিতে; ফলে
ঠাণ্ডা চোখে ঠুলি এঁটে দশটা-পাঁচটার জাঁতাকলে
অস্তিত্বকে চেয়ে দেখি নিখুঁত গোলাম, নিশ্চেতন।

আমিও নিজেকে দেখি করেছি ঢালাই মাঝারির
স্পষ্ট ছাঁচে। যদি না অকালে ফস্কে যায় কিস্তি বিনে,
জীবনবীমাই জানি হে পান্থপাদপ মরুপথে।
তা চলে আমিও টেড়িকাটা ছা-পোষা বিজয়ী বীর?
হরলিক্স মিল্ক আর হাক্সলির নয়া বই কিনে
সাধের মানবজন্ম ধন্য করি তবু কোনোমতে।

ব্যবধান

আজও কি সেখানে যাও, যেখানে মায়াবী একদার
স্বর্ণমৃগ দেখা না-দেখায় মেশা? হয় কি সময়?

হয়তো সেখানে আজ নন্দিত, প্রোজ্জ্বল ফুল নয়,
বল্মীক ও রুক্ষ আগাছায় ছেয়ে গেছে চারধার।
তোমার সত্তার দীপে আজ আর আমার আঁধার
হয় নাকো দীপান্বিতা; শুধু মনে রাখার বিস্ময়
নিয়ে বেঁচে থাকি আজ। ইতিমধ্যে হয়ে গেছে ক্ষয়
রৌদ্র-ঝড়-জলে কত লঘুপক্ষ বছরের ধার।

পুনর্মিলনের সূর্য যেন না-ই জ্বলে দু'জনের
গোধূলি আকাশে আর; তুষারের তীক্ষ্ণ শুভ্রতায়
বাসনার শতদল যাক ছিঁড়ে– বিষাদের দান
সন্তপ্ত হৃদয়ে গেঁথে গাব গান নির্মোহ প্রাণের।
এই ভালো– তুমি আর আসো না যে চারু, মৃদু পায়,
কেননা দুর্লঙ্ঘ্য এই নির্দয় কালের ব্যবধান।

রজনীগন্ধার ঘ্রাণ

আজও দেখি আমাদের মর্ত্যলোকে রাত্রির আকাশে
খণ্ডিত রুলির মতো চাঁদ জেগে ওঠে দ্বিধাহীন,
এবং রজনীগন্ধা ফোটে কোনোখানে। বহুদিন
আসেনি এমন রাত ভর করে মধুর বাতাসে,
হয়তো এমন রাতে কবিতার লগ্ন ফিরে আসে
বৃত্তাবদ্ধ এ-জীবনে। বস্তু-গাঁথা দেউলে, কঠিন
জীবন ক্ষণিক স্বপ্নে হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ, অমলিন;
উন্মুখ সত্তায় শুধু রজনীগন্ধার ঘ্রাণ ভাসে।

আজ রাতে রজনীগন্ধার ঘ্রাণ করেছে উন্মন,
অধীর আমাকে আর মদির সৌরভে মনে পড়ে
একদা তোমার মায়া-স্পর্শে আমার প্রাক্তন মন
পাপড়ি মেলেছিল দু'দিনের জ্যোৎস্নার দুরন্ত ঝড়ে
অলীক পদ্মের মতো। আজ শুধু স্মৃতি-রোমন্থন
সম্বল আমার এই তুমিহীন ব্যথাদীর্ণ ঘরে।

দুঃসময়ে মুখোমুখি

প্রথম প্রকাশ	শ্রাবণ ১৩৮০ [জুলাই ১৯৭৩]
প্রকাশক	অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা
প্রচ্ছদ-শিল্পী	পূর্ণেন্দু পত্রী
উৎসর্গ-পত্র	হাসান হাফিজুর রহমান
বন্ধুবরেষু

স্যামসন

ক্ষমতামাতাল জঙ্গি হে প্রভুরা ভেবেছ তোমরা,
তোমাদের হোমরা চোমরা
সভাসদ, চাটুকার সবাই অক্ষত থেকে যাবে চিরদিন?
মৃত এক গাধার চোয়ালে, মনে নেই ফিলিস্তিন,
দিয়েছি গুঁড়িয়ে কত বর্বরের খুলি? কত শক্তি
সঞ্চিত আমার দুটি বাহুতে, সেও তো আছে জানা। রক্তারক্তি
যতই কর-না আজ, ত্রাসের বিস্তার
করুক যতই পাত্রমিত্র তোমাদের, শেষে পাবে না নিস্তার।

আমাকে করেছ বন্দি, নিয়েছ উপড়ে চক্ষুদ্বয়।
এখন তো মেঘের অঢেল স্বাস্থ্য, রাঙা সূর্যোদয়
শিশুর অস্থির হামাগুড়ি, রক্তোৎপল যৌবন নারীর আর
হাওয়ার স্পন্দিত ফুল পারি না দেখতে। বার বার
কী বিশাল দৃষ্টিহীনতায় দৃষ্টি খুঁজে মরি। সকাল সন্ধ্যার
ভেদ লুপ্ত; মসীলিপ্ত ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে চকিতে মন্দার
জেগে উঠলেও অলৌকিক শোভা তার থেকে যাবে নিস্তরঙ্গ
অন্তরালে। এমনকি ইঁদুরও বান্ধব অন্তরঙ্গ
সাম্প্রতিক, এমন নিঃসঙ্গ আমি। নিজ দোষে আজ
চক্ষুহীন, হৃতশক্তি, দুঃস্বপ্নপীড়িত। এখন আমার কাজ
ঘানি ঠেলা, শুধু ভার বওয়া শৃঙ্খলের। পদে পদে
কেবলি হোঁচট খাই দিনরাত্রি, তোমরা অটল মসনদে।
শত্রু-পরিবৃত হয়ে আছি; তোমাদের চাটুকার
উচ্ছিষ্ট-কুড়ানো সব আপনি-মোড়ল, দুস্থ ভাঁড়
সর্বদাই উপহাস করছে আমাকে। দেশবাসী
আমাকে বাসে তো ভালো আজো– যাদের অশেষ দুঃখে কাঁদি হাসি
আনন্দে। পিছনে ফেলে এসেছি কত যে রাঙা সুখের কোরক,
যেমন বালক তার মিষ্টান্নের সুদৃশ্য মোড়ক।

আমাকে করেছ অন্ধ, যেন আর নানান দুষ্কৃতি
তোমাদের কিছুতেই না পড়ে আমার চোখে। স্মৃতি
তাও কি পারবে মুছে দিতে? যা দেখেছি এতদিন–
পাইকারি হত্যা দিগ্বিদিক রমণীদলন আর ক্ষান্তিহীন
রক্তাক্ত দস্যুতা তোমাদের, বিধ্বস্ত শহর, অগণিত
দগ্ধ গ্রাম, অসহায় মানুষ, তাড়িত, ক্লান্ত, ভীত

–এই কি যথেষ্ট নয়? পারবে কি এসব ভীষণ
দৃশ্যাবলি আমূল উপড়ে নিতে আমার দু-চোখের মতন?

দৃষ্টি নেই, কিন্তু আজো রক্তের সুতীব্র ঘ্রাণ পাই,
কানে আসে আর্তনাদ ঘন ঘন, যতই সাফাই
তোমরা গাও না কেন, সবকিছু বুঝি ঠিকই। ভেবেছো এখন
দারুণ অক্ষম আমি, উদ্যানের ঘাসের মতন
বিষম কদম-ছাঁটা চুল। হীনবল, শৃঙ্খলিত
আমি, তাই সর্বক্ষণ করছ দলিত।

আমার দুরন্ত কেশরাজি পুনরায় যাবে বেড়ে,
ঘাড়ের প্রান্তর বেয়ে নামবে দুর্দমনীয়, তেড়ে-
আসা নেকড়ের মতো। তখন সুরম্য প্রাসাদের সব স্তম্ভ
ফেলব উপড়ে, দেখো, কদলী বৃক্ষের অনুরূপ। দম্ভ
চূর্ণ হবে তোমাদের, সুনিশ্চিত করব লোপাট
সৈন্য আর দাস-দাসী অধ্যুষিত এই রাজ্যপাট।

ক্ষমাপ্রার্থী

লতিফ, তোমার কাছে হাঁটু মুড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

এখনও এখানে আছ, মনে হয়, এই বারান্দায়,
বৈঠকখানায় কিংবা ছমছমে সিঁড়ির আঁধারে।
লতিফ তোমার হিমশীতল নিঃশ্বাস
আমার জুলফি ছুঁয়ে যায়। কড়িকাঠে,
দেওয়ালে চৌকাঠে কুলুঙ্গিতে,
যেদিকেই তাকাই তোমার
চক্ষুদ্বয় জলের ফোঁটার মতো ঝুলে থাকে বিষম নাছোড়।
না, তুমি অমন করে আমাকে দেখো না,
দেখো না লতিফ।

একদা তোমাকে আমি বড় বেশি ঈর্ষা করতাম;
তোমার সোনার সিগারেট কেস, সুট-টাই, আসবাব দেখে
কেমন টাটাত চোখ, সেসব ব্যসন
করতলগত
করার নচ্ছার লোভ লুকিয়ে শার্টের অন্তরালে,

বুকের তলায়,
আমি হাসতাম, তুমি 'নাও, সিগারেট খাও' বলে
সুদৃশ্য সোনালি কেস দিতে খুব ব্যগ্র-হাতে নিপুণ বাড়িয়ে।
অলীক দেরাজ থেকে তোমার বিশদ জীবনের
নীল-নকশা চুরি করে, নিজে ব্যবহার
করতে চেয়েছি কতদিন বস্তুত কাঁথায় শুয়ে।
লতিফ তোমার কাছে হাঁটু মুড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

এই তো তোমাকে আমি, কালকেও প্রবল
ঈর্ষা করতাম, আজ সেই
বিচ্ছিরি কুটিল পোকাটাকে নির্দ্বিধায়
দিয়েছি বিদায়।
নিজে বেঁচে আছি বলে তৃপ্তি। আজকেও,
যখন আমার বুক বোমা-ধ্বস্ত শহরের মতো
হুবহু হওয়ার কথা, বৈরাগ্যে অরণ্যে
মুখ লুকানোর কথা আজকেও আমি
আয়নায় নিজের পরিপাটি প্রতিচ্ছবি দেখে সুখে
ঈষৎ হেসেছি; স্ত্রীর সাথে খুনসুটি
করে কিছুকাল নির্লিপ্ত গলির মোড়ে
তোফা ধরিয়েছি সিগারেট।

তুমি আজ সব ঈর্ষা দ্বন্দ্ব সব কলহের পরপারে। তুমি
নিস্পন্দ তোমার খাটে। মনে হয় হয়তো চোখ মেলে
এক্ষুণি এগিয়ে দেবে তোমার সোনালি কেস আমার দিকেই
অবলীলাক্রমে, বলবে, 'নাও, সিগারেট খাও।' নাকি
রয়েছ দাঁড়িয়ে ঝুলবারান্দায় কিংবা বাথরুমে
ধুতে গেছ বাসি মুখ। ইতিমধ্যে তোমার রোরুদ্যমানা স্ত্রী-র
ব্লাউজ-উপচে-পড়া কম্পমান স্তন আড়চোখে
নিলাম বিষম দেখে, অবাধ্য অসভ্য রক্তে ডাকে বার-বার
লালচক্ষু তৃষিত কোকিল।
লতিফ তোমার কাছে হাঁটু মুড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

না, আমি উন্মাদ নই

না, আমি উন্মাদ নই, বিড়বিড় করছি ভাবেন
সর্বক্ষণ? এ আমার মুদ্রাদোষ, বন্ধুরা বলেন।
দেখুন সযত্নে আজও কামিয়েছি দাড়ি, আফটার

শেভ লোশনের ঘ্রাণ গণ্ডময়; দুটো চ্যাপটার
গোগ্রাসে গিলেছি আজও বাস্তবিক আগাথা ক্রিস্টির।
আমি তো জনৈক স্টাফ রিপোর্টার, ধ্বংসের সৃষ্টির
বিচিত্র সংবাদ আহরণে অতিশয় দক্ষ, তাই
নানান মহলে খ্যাত। প্রায়শ এয়ারপোর্টে যাই
ভিআইপি-দের বাণী টুকি কিংবা এঁদো মফস্বলে
ছুটি সংবাদের লোভে কালেভদ্রে। ঝিলে কি জঙ্গলে
খবর শিকার করি। কখনো জমাই পাড়ি জেটে...
রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সোভিয়েতে।

কখনো নেতার ঘরে, কখনো দুর্গত এলাকায়
খবরের ঘ্রাণ শুঁকে আমার অনেক বেলা যায়।
এবারও গেলাম যথারীতি ঘূর্ণিঝড়ে লণ্ডভণ্ড
উপকূলে; কত চরে, জনপদে, অতি দূর গণ্ড-
গ্রামে খুব শান্ত গ্রামে দৈনিক পত্রের লোভী পাতা
ভরিয়ে তুলবো বলে, কিন্তু খাঁ-খাঁ করে ঝানু খাতা।

যে বাতাস সাগ্রহে মানুষ টেনে নেয় বুকে তার,
যে জলে ডোবায় পলা, আঁকে নকশা, কাটে সে সাঁতার
ছিটিয়ে জলজ ফুল, নৌকা যায়, জাল ফ্যালে; হায়
হঠাৎ দারুণ রোষে তারাই জল্লাদ হয়ে যায়।

কোথায় এলাম আমি? পোড়া চোখে একি দেখলাম?
যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু শব; কার কী যে নাম
জানি না কিছুই; নয় ওরা শব নয়; রাশি রাশি
ভারা ভারা গলিত ফসল যেন। ভীষণ আগ্রাসী

শক্তি উন্মত্ত তাথৈ নাচে সব মিসমার। ভগ্নী-ভ্রাতা,
পিতা-মাতা, বরবধূ আছে পড়ে, নেই কোনো ত্রাতা।
বধূটির মেহেদির রঙ তখনো হয়নি ফিকে,
ভেলায় ভাসছে কত গলিত বেহুলা চতুর্দিকে।
বয়েসী পিতার লাশ থেকে ক্ষিপ্র ছিনিয়ে কাপড়
লজ্জা ঢাকে বেবস্তর উদ্‌ভ্রান্ত সন্তান সকাতর।

আমি তো জনৈক স্টাফ রিপোর্টার; জনহীনতার
কণ্টকিত বিস্ময়কে মগজের কোষে পুরে তার-
বার্তা কিছু পাঠাই সংবাদপত্রে; এবং পুনরায়

এ শহরে আসি ফিরে; ভিড়ে মিশি, সময় গড়ায়
যথারীতি। না, আমি উন্মাদ নই, হয়তো বেল্লিক,
কে যেন কলার চেপে বলে শুধু ধিক, তোকে ধিক।

না, আমি উন্মাদ নই; আজো সুস্থদের মাঝে ঠাঁই
রয়ে গেছে, শব্দ লিখি অফুরান, আশ্চর্য এটাই।

সহজে আসে না কেউ

সহজে আসে না কেউ আজকাল আমার নিকট,
একদা আসত অনেকেই। তথ্যে তত্ত্বে কিংবা গল্পে
কেটেছে প্রচুর বেলা, সারা ঘরে কখনো সমৃদ্ধ নীরবতা।
এখন আসে না কেউ, বড় ব্যস্তবাগীশ সবাই–
কেউবা পতিতালয়ে, কেউ মত্ত তাসের আড্ডায়,
মাতায় পাঁচটি পাড়া পিটিয়ে নিজের ঢাক কেউ,
কেউ কেউ গ্রন্থদাস, কেউ রাজনীতির কুমার
রাখছে সোনার কাঠি সন্তর্পণে বঙ্গের শিয়রে।

সহজে আসে না কেউ আজকাল আমার নিকট,
যেন আমি চিহ্নিত চাঁড়াল। দৃষ্টিপথে দেয়ালের
ছবি, ঘড়ি, আসবাবপত্র সব ম্লান হয়ে এলে
চোখ বুজে বসে থাকি। কখন একটি খাপছাড়া
সারস তারার মতো করে, আমি উচ্ছ্বসিত পালক নিকুঞ্জে
তার জ্বলজ্বলে নগ্নতায় করি চকিতে প্রস্থান।

অত্যন্ত বরদ হ্রদ আছে এক, যেখানে পাখির বংশাবলি
পালক ঝরিয়ে গেছে যুগে যুগে, সেখানে শব্দেরা
ধ্যানী, জাতিস্মর, আমি তার বুকে কাটবো সাঁতার
এবং পুলিনে তার পাতবো আসন সিদ্ধার্থের।

আমার হৃদয় ফুঁড়ে জেগে ওঠে জলজ প্রাসাদ,
চিত্রিত মিনারে যার বয় শুধু বাতাসের স্বর,
ঝরে নীল। শূন্যে গাছ, শূন্যে টেলিগ্রাফ তার, ভুরুর সাঁকোয়
ক্ষুধিত পাখিরা শুধু নিরুপম সূর্যাস্তকে খায়,
নিঃসঙ্গতা অবিরাম আমাকে গভীর করে চায়।

তুমি অন্তর্হিতা

তুমি অন্তর্হিতা, আমি যেন সেই নিঃসঙ্গ ঘোটক,
রিল্‌কে যাকে সন্ধ্যায় দেখেছিলেন স্তব্ধ রাশিয়ায়।
তুমি অন্তর্হিতা, আমি মানিকবাবুর হারু, সন্দিগ্ধ শেয়াল
মরা শালিকের বাচ্চা মুখে নিয়ে যাচ্ছে ছপছপ,
কিছুই পাচ্ছি না টের। তুমি অন্তর্হিতা,
ঘরপোড়া মানুষের মতো আমি রৌদ্রবৃষ্টি, বাতাসের করুণার পাত্র,
একেবারে আর্ত আর নগ্ন।
শহরের সব রাস্তা, লেন-বাইলেন, কী চিত্তির বিচিত্তির
দোকানপাটের ফুল্ল রঙিন সাইনবোর্ড, যাবতীয় সামগ্রী, পোস্টার,
দিনের ট্রাফিক আর রাতের নিয়নমালা, স্বপ্নের মতন বিজ্ঞাপন
সবাই বলছে সমস্বরে?–
তুমি অন্তর্হিতা।

সমস্ত শহর আমি স্যান্ডেলের আঘাতে আঘাতে
বিক্ষত করছি শুধু, হাঁটছি হাঁটছি সঙ্গীহীন।
যে-লোকটা এইমাত্র আমার পাঞ্জাবি ঘেঁষে গেল,
তাকে দেখে মনে হল (হয়তো বা অকারণ এই মনে-হওয়া)
কখনো রবীন্দ্রনাথ লেখেননি এক ছত্র কবিতা অথবা ঋদ্ধ বড়ে
গোলাম আলীর কণ্ঠে কোনো দিন জ্বলজ্বল করেনি খেয়াল
নানা বর্ণে। যে-মহিলা ধাঁধিয়ে অনেক চোখ গটগট হেঁটে
মোটরে আহ্লাদী এক বেড়ালের মতো
বসলেন, তাঁকে দেখে মনে হলো গর্ভপাতে অতীব নিপুণা।
অন্ন চাই, বস্ত্র চাই বলে এক ঝাঁঝালো মিছিল শহরের
প্রধান সড়ক আলো করে এগোচ্ছে কেবলি;
'তুমি অন্তর্হিতা', এক নতুন স্লোগান তুলে সেই
মিছিলে শামিল হতে ভারি ইচ্ছে হল।
পোস্টারে পোস্টারে আর প্রতিটি ব্যানারে দেখলাম,–
বড় বড় রক্তাক্ত অক্ষরে আছে লেখা :
তুমি অন্তর্হিতা, তুমি অন্তর্হিতা, তুমি অন্তর্হিতা।

ভাদ্রের আকাশ ছিঁড়ে, মাটি খুঁড়ে ভদ্দর লোকের
শৌখিন বাগানে ঢুকে ফুলের গহন অভ্যন্তরে
দৃষ্টি মেলে, দৃষ্টি মেলে আপেলের ত্বকের ভেতর,
গাছতলা, পুকুরের ঘাটে, সতেজ মাছের পেটে,

শহরের প্রতিটি বাড়ির কড়া নেড়ে,
এরোড্রামে, যে-কোনো মার্কেটে,
সকল ঘুপটি কোণ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে অত্যন্ত
লোভ হল। স্বচক্ষে দেখতে চাই তুমি আছো কি না
অন্তরালে লুকিয়ে কোথাও।

ঘরে ফিরে দেখি বন্ধ দরজায়, খোলা জানালায়,
টেবিলে দেয়ালে আছে লেখা :
তুমি অন্তর্হিতা।
সমস্ত রহস্য নিয়ে তার রবরবা রাত্রি এলে
পুরোনো টেবিলে ঝুঁকে খাতার পাতার জনপথে
কখনো হোঁচট খাই, থমকে দাঁড়াই দেখে শত হিজিবিজি।
কবিতা রচনাকালে প্রতিটি পংক্তির ফাঁকে ফাঁকে খামোকাই
কে যেন লিখিয়ে নেয় অবিরত, তুমি অন্তর্হিতা।
আমার বর্বর ক্রোধ উঠোনে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ানো খয়েরি
পোষা হাঁসটাকে
হঠাৎ মারলো ছুড়ে ঢেলা, হাঁস খোঁড়াতে খোঁড়াতে
যেন তীব্র অভিমানে তাকাল আমার দিকে, লুকাল সভয়ে
মর্চে-পড়া টিনের আড়ালে!
পরমুহূর্তেই আমি তাকে খুঁজে নিয়ে
দিলাম ব্যান্ডেজ বেঁধে আর্ত লাল পায়ে,
অথচ আমার ক্ষত র'য়ে যায় অন্তরালে শুশ্রূষাবিহীন।
সে-ক্ষতের প্রতি রক্তবিন্দু ঝরে ঝরে
বলে বারবার–
তুমি অন্তর্হিতা,
তুমি অন্তর্হিতা,
তুমি অন্তর্হিতা ...

স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী কবিতার মতো

সে এক সময় ছিল আমাদের, সন্ত্রাসের কন্টকিত হাতে
সমর্পিত সারাক্ষণ। আমরা কখনো
আহত পশুর মতো নিজস্ব গুহায় স্বেচ্ছাবন্দি, কখনোবা
পলাতক গ্রাম-গঞ্জে, মফস্বলে, নদীতীরে, রাইফেল আর
বেয়নেট থেকে দূরে। গেরস্ত কুটিরে, স্কুলঘরে গাদাগাদি

অনেক সংসার একাকার। দুর্বিপাকে
হয়তো এমনই হয়। কোথাও নিস্তার নেই; থাকি
সন্ত্রাসে আচ্ছন্ন হয় নদীতীর, সর্ষেক্ষেত, তাল-সুপুরির
গাছ, বাঁশবন, বেতফল আর বাবুইপাখির বাসা। প্রহরে প্রহরে
রাইফেল গর্জে ওঠে, যেন বদমেজাজী মোড়ল
ভীষণ শাসাচ্ছে অধস্তন পাড়া-পড়শিকে। আবার গুটিয়ে
পাততাড়ি ফিরে আসি বিকলাঙ্গ শহরেই যূথচারী লেমিং যেমন
ছুটে যায় দুর্নিবার ধ্বংসের চূড়ায়।

সে এক সময় ছিল আমাদের। লুপ্ত স্বাভাবিক
কথোপকথন, হাসি তামাশা ইত্যাদি।
কেবল ভয়ার্ত চোখে চাওয়া,
কড়িকাঠ গোনা,
অন্ধকার ঘরে
কখনো নিঃশব্দ ব'সে থাকা, কখনোবা
রুলিপরা একটি হাতের
বন্দরে ভিড়িয়ে
ঝঞ্ঝাহত নিজের একলা হাত আবার চমকে ওঠা অভ্যাসবশত–
সে এক সময় ছিল আমাদের ভয়ানক আহত ঢাকায়।

তখন খেলার প্রতি ছিল বড় বেশি উদাসীন
বালক-বালিকা;
করাল বেলায় নিমজ্জিত
আপাদমস্তক
সন্ত্রাসে ওরাও যেন আমাদের সমান বয়সী!
আমাদের দিনগুলি, আমাদের রাত্রিগুলি শেয়াল-শকুন
ক্রমাগত খেল চেটেপুটে
দিব্যি সভ্যতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে।

একটি গণ্ডার, শিং যার রক্তমাখা, বারবার
হানা দেয় ঘরে,
দরজা-জানালা ভাঙে; আসবাবপত্র
করে তছনছ,
চালায় ধারালো শিং উদরে আমার;
বন্য পদতলে, হায়, দলিত সন্তান,
দ্বিখণ্ডিতা জীবন-সঙ্গিনী।

পরদিন সে গণ্ডার আবার উদিত হয় সগৌরবে সব
সংবাদপত্রের
প্রথম পৃষ্ঠায় চমৎকার ফটোরূপে,
ফটোর তলায় নামাঙ্কিত টিকা খান।

কখনো নিঝুম পথে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে কেউ গুলির আঘাতে,
মনে হয়, ওরা গুলিবিদ্ধ করে স্বাধীনতাকেই।
দিনদুপুরেই জিপে একজন তরুণকে কানামাছি করে
নিয়ে যায় ওরা;
মনে হয়, চোখ-বাঁধা স্বাধীনতা যাচ্ছে বধ্যভূমিতে।
বেয়নেটবিদ্ধ লাশ বুড়িগঙ্গা কি শীতলক্ষ্যায় ভাসে;
মনে হয়, স্বাধীনতা লখিন্দর যেন,
বেহুলাবিহীন,
জলেরই ভেলায় ভাসমান।
যখন শহরে ফাটে বোমা, হাতবোমা, অকস্মাৎ
ফাটে ফৌজি ট্রাকের ভেতর,
মনে হয়, স্বাধীনতা গর্জে ওঠে ক্রোধান্বিত দেবতার মতো।
এরই মধ্যে মৃত্যুগন্ধময় শহরে যখন খুব
কুঁকড়ে থাকি, কোনো শীর্ণ গলির ভেতর
আঁধারের নাড়ি ছেঁড়া নবজাতকের
প্রথম চিৎকার জেগে ওঠে,
মনে হয়, স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী
কবিতার মতো
তুমুল ঘোষণা করে অলৌকিক সজীব সংবাদ।

বিচ্ছিন্ন

এখন তোমরা কেউ আমার কথায় করবে না কর্ণপাত।
এখন তোমরা কবিতার লেজ ধরে
আছড়াতে আছড়াতে অলৌকিক বিস্ফোরণ চাও
রুটিন মাফিক।
এখন তোমরা কেউ আমার কথায় করবে না কর্ণপাত।
এখন তোমরা সব পাড়ায় পাড়ায়
ক্রোধের আগুন জ্বেলে কেবলি উঠছ মেতে গার্হস্থ্য কলহে,
মস্তানি হননে

ফেলে যাচ্ছ রক্তাপ্লুত লাশ
প্রকাশ্যে রাস্তায়।

এখন তোমরা কেউ আমার কথায় করবে না কর্ণপাত।
এখন তোমরা তোমাদের ভুবনকে
দুগ্ধপোষ্য কিন্ডারগার্টেন করে ধূর্ত কোনো হেডমাস্টারের
ছত্রচ্ছায়া চাও।

'ডালপালা, লতাপাতা, কীটপতঙ্গকে কাছে ডাকে
বলেই না তারা রাঙা আমন্ত্রণ রক্ষায় তৎপর
হয়ে ওঠে ভোর-সন্ধে বুকে নিয়ে'– আমার এ অসমাপ্ত বাক্য
কাঁপে থরথর। 'থামো হে গাড়ল' বলে
আমাকে নিক্ষেপ করো গার্বেজ ডাম্পের অন্ধকারে।
আড়ালে হাঙর জেগে ওঠে নানাবিধ,
মাংস কণ্টকিত।

এখন তোমরা কেউ আমার কথায় করবে না কর্ণপাত।
গেরেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে
ছুটছ করুণা প্রেম প্রমুখের পেছনে পেছনে,
সোৎসাহে পরাচ্ছ হাতকড়া কল্যাণকে
ফাঁসি-মঞ্চে লটকাচ্ছ বিবেককে, শান্তিকে করছ একঘরে।

দূরের আকাশ থেকে আসে হাঁস, তাকে
টেনে নিয়ে বুকে ভাবি, বরং শেখাব
ভালোবাসা পশুপাখিদের আর ঝোপ আত্মা নিয়ে
আদিবাসী হয়ে যাবো দূর যৌথ স্মৃতির মায়ায়; বৃক্ষ দেখে
জাগবে নিবিড় ভ্রাতৃভাব।

হায়,
পাথর, পতঙ্গ, গাছ, পশুপাখিদের যা বলি বোঝে না তারা,
তারাও বলে না কিছু আমাকে কখনো।

চেগুয়েভারার চোখ

যেখানেই যাই, অলিতে-গলিতে,
গ্রন্থবিতানে, কাফেটারিয়ার ভিড়ে,
কী যেন তীব্র, অপ্রতিরোধ্য

জ্বলজ্বল করে আমার সত্তা ঘিরে।

চুরুট রঙের সন্ধ্যায় মনে
ভেসে ওঠে শুধু দূর বোলিভিয়া-বন।
ভাবি উচাটন বিশ শতকেও
ঈশ্বরহীন সন্ত শহীদ হন।

সন্তের চোখ, শহীদের চোখ
কে যেন দিয়েছে হৃদয়ে আমার সেঁটে,
রক্তাপ্লুত একটি শরীর
সকল সময় কী ঋজু যাচ্ছে হেঁটে।

আমার প্রহর হাঁটু মুড়ে বসে
অবাধ জাগর তাঁর জীবনীর পাশে।
কবিতায় ছুঁই হাত দুটি তাঁর,
আত্মার ঘ্রাণ টেনে নিই নিঃশ্বাসে।
তিনি মৃত তবু জীবিতের চেয়ে
অনেক সজীব এবং কান্তিমান।
ভবিষ্যতের জন্যে হেলায়
দিয়েছেন ছুড়ে আপন বর্তমান।

বুলেটবিদ্ধ মোহন গেরিলা
প্রসারিত আজ নিখিল ভূমণ্ডলে।
লেখার টেবিলে, কপাটে, দেয়ালে
চেগুয়েভারার সুবিশাল চোখ জ্বলে।

পালা

আমরা সবাই দেখি, গ্রাম্যজন, ক্ষিপ্র নাগরিক,
সবাই প্রত্যহ দেখি একই পালা। চির-চেনা সব
কুশীলব, পোশাকের বেবাক ভাড়াটে জেল্লা আর
স্টেজময় পায়চারি, মুখভঙ্গি, কোমরে ঝুলন্ত
তলোয়ার, সিংহাসন ইত্যাদি ইত্যাদি দেখে দেখে
এমন মুখস্থ হয়ে গেছে সব-কে কোথায় কত
উঁচিয়ে-নামিয়ে পর্দা গদ্যে-পদ্যে জুড়বে সংলাপ
কতক্ষণ, ঠিক বলে দিতে পারি আমরা সবাই।

বস্তুত সবাই দেখি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের
পালা রোজ। কেউ দিই শিস, কেউ ফুঁকি খাকি বিড়ি,
হাই তুলি মাঝে-মাঝে। বিশ্রামের ঘণ্টা বাজলেই
বাইরে বেরিয়ে এসে কখনো ফুলুরি কিনি, খিস্তি
খেউরে ভীষণ মাতি, প্রস্রাব ছিটিয়ে ঝোপেঝাড়ে
ফিরে আসি, পুনরায় একই পালা বাদ্যসহকারে
শুরু হয়, বস্ত্রহরণের পালা। এই পালা আর
বেশিদিন, বুঝেছ হে অধিকারী, দেব না চলতে
বলে গনগনে কেউ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বুক
টান করে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখি
লোকটাকে, মনে হয়, দুঃশাসন পালাবে এক্ষুণি।

আসুন আমরা আজ

আসুন আমরা শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করি আজ,
আমরা সবাই যারা কেমন দৈবাৎ বেঁচে গেছি;
আসুন আমরা আজ নীরব দাঁড়াই যথারীতি
সকাতর কিছুক্ষণ লক্ষ লক্ষ মৃতের সম্মানে,–
আমাদের বহুকাল এমন দাঁড়াতে হবে বুঝি!
চলুন শামিল হই আজ শোক-মিছিলে সবাই,
পথে মেলি কালো বস্ত্র 'ভিক্ষা দাও পুরবাসী' বলে–
শহরে উঠুক বেজে শোকাতুর হারমোনিয়াম।

খোলা ছাদ, কবুতরময় মসজিদের গম্বুজ,
জীর্ণ বাস, গার্বেজের ডাম্প আর পোস্টার, ব্যানার,
নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো, পুরোনো পাঁচিল শোক নয়,
জ্যোৎস্নারাত, ফুটপাত, ডাকবাক্স, পিয়নের খাকি
জামা, নদী-নালা কিংবা পিয়ালের ডাল শোক নয়,
কচুরিপানাও নয়, বাবুইপাখির বাসা, সর্ষেক্ষেত,
নৌকোর নয়ন, ডুরে শাড়ি, অথবা নয়ানজুলি
শোক নয়; শোক জানি বাস্তবিক অবয়বহীন।

তবু শোক হয়ে যায় অকস্মাৎ অনেক কিছুই।
মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমার একান্ত ছায়াখানি
শোক হয়ে ব'সে থাকে এক কোনে, পথ হাঁটে আর

হাতের তালুতে বারবার দেখে নেয় জলোচ্ছ্বাসে
কর্দমাক্ত দ্বীপপুঞ্জ, জনপদ, উদগ্র শকুন।

চাদ্দিকে সতেজ ঘ্রাণ কাফনের; অনেক জায়গায়
দাফনের জন্যে কোনো লোক নেই। আমার পকেটে
দুটি মৃত গ্রাম্য শিশু, গলায় ঝুলছে যুব-লাশ,
আঙুলে জড়ানো লজ্জাবতী বিবস্ত্র বধূর চুল।
আমার হৃদয় হয় অগোচরে রুক্ষ মরুভূমি,
যোজন যোজনব্যাপী অতিশয় উদার শ্মশান।

ভোরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর সংবাদ প'ড়ে
আর ফটোগ্রাফারের একান্ত বাস্তবপ্রীতি দেখে
রেডিওতে কবিতা আবৃত্তি করে ডবকা দুপুরে
পঁয়ত্রিশ টাকার একটি সবুজাভ চেক নিয়ে
সিনেমার বিজ্ঞাপন, নির্বিকার ভিড় দেখে বাড়ি
ফিরি একা প্রতিশ্রুত চকোলেট ছাড়াই উদাস।
খেতে বসি, রাত হলে শুতে যাই, অভ্যাসবশত
নিবিড় জড়াই ক্লান্ত গৃহিণীর নিদ্রাপ্লুত গলা।
অকস্মাৎ খাঁ-খাঁ কাফনের ঘ্রাণে স্বপ্নের মধ্যেই
মেলায় হারিয়ে-যাওয়া বালকের মতো কেঁদে উঠি।

আমার ভালোবাসা

সমস্ত নৈরাশ্যের গলায় পা রেখে অ্যানিমার প্রতারণায় ভ্রূক্ষেপ না করে
শিরায় শিরায় লক্ষ তারাময় রক্তের দোলায় আন্দোলিত হয়ে আমি বলছি
আমি বলছি লেখার টেবিল ঘরের চৌকাঠ সাক্ষী রেখে বলছি ঘুরঘুট্টি
অন্ধকারে হাজার পিদিম জ্বালিয়ে বলছি এই সময়ের পাঁকে
ফুটুক আমার ভালোবাসা ফুটুক কালো কারাগারের
দেয়াল ফুঁড়ে খুব হল্লা করে বসন্তের কাঁধে
যারা পেতেছে মেশিনগান তাদের হেলমেট
ফুঁড়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক
সিগন্যালে সাইনবোর্ডে বস্তির
জীর্ণ চালায় কবরের কাঁচা
মাটিতে হাসপাতালের নিঃশব্দ
ছাদে হাসপাতালের ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে

বিনোদের শব্দে আমার
সূর্যমুখী ভালোবাসা
নবজাতকের মতো
চিৎকার করে
অম্লান ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক ফুটুক
আমার ভালোবাসা সবুজ পাতার মতো গান গায় গান গায় গান গায়

অনিদ্রা

ঘুম,
যেন মা দিলেন ডাক আদুরে মাদুরে,
ঘুম, পিতা দিলেন বুলিয়ে মাথা অলীক আঙুলে।
ঘুম, কারো সুরভিত কালো চুলে চোখ মুখ একান্ত ডোবানো,
ঘুম, গাঢ় গোধূলির থিরথিরে হ্রদ,

ঘুম,
জলজ উদ্ভিদ যেন, ভুল অনন্তের ধু-ধু দিকে ভাসমান।
ঘুরে দেয়ালে মানিপ্ল্যান্ট, উচ্ছ্বসিত রঙিন পাখির
মাতাল ভ্রমণ;
ঘুমের দেয়ালে ডাক-পিয়নের নীল হলদে খাম বিলি,
নিরিবিলি ঘরে ফেরা, কৃপণ উঠোনে
পা রেখে স্পাইয়ের মতো মাটির গভীর থেকে স্মৃতি খুঁড়ে তোলা,
কাউকে কোথাও খুঁজে না পাওয়া কখনো,
অচেনা অথচ অতি মনোরম রাস্তা, টুপি-পরা
একজন স্মার্ট পেঙ্গুইন
দ্রুত যান হাইকোর্টে। ক্যালেন্ডার প্রবল হাওয়ায়
দোলে শুধু দোলে
তারিখবিহীন।
ক্যালেন্ডার থেকে এক ঝাঁক হরিয়াল
চকিতে বেরিয়ে আসে, কারো হাত রাজহংসীর গ্রীবার মতো
হয়ে ফের মিশে যায় গাছের শাখায়।
ঘুমের দেয়ালে তুমি নিবিড় লতানো আসো ভিন্ন অবয়বে,
শিয়ামিজ বেড়ালকে বিলাও আদর, যাও ম্যাজিক লণ্ঠনে,
সেতারের মতো বাজো। হাই সোসাইটি তোলে হাই মধ্যরাতে।
আজকাল কী যে হচ্ছে, ঘুম গৃহস্থের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, বাস্তুত্যাগী।

চলেছি অজস্র ভেড়া গুনে গুনে, বেড়া ডিঙানোর খেলা, তবু
আবেশে আসে না বুজে চোখ।

অনিদ্রা মরুর খাঁ-খাঁ কিংবা পোড়া ভাদ্রের দুপুর,
অনিদ্রা প্রস্রাবখানা, দারুণ দুর্গন্ধে ভেজা, বিচ্ছিরি হলুদ
দেয়ালে অশ্লীল লিপি, চিত্র কদাকার।
অনিদ্রা ভ্যানগগের আত্ম-প্রতিকৃতি
কিংবা কাক-ওড়া ফসলের ক্ষেত,
অনিদ্রা তুমুল নজরুল ইসলামী
পদ্য জ্বালাময়ী,
অনিদ্রা কণ্বের তপোবনে
রুদ্র, রুক্ষ, কট্টর দুর্বাসা।

আজকাল কী-যে হচ্ছে, সারারাত ধরে,
শুনছি প্রতিটি শব্দ দেয়ালঘড়ির, শয্যা ছেড়ে
দেখি না আয়নায় মুখ, পাছে বোদলেয়ারের মতো
নিজেকেই অন্য কেউ ভেবে
জানাই অভিবাদন, বলি, 'হ্যালো, কেমন আছেন?'
অনিদ্রা আমার শত্রু, তবু তার শত্রুতাই ঠেকে সহনীয়
কেননা নিশ্চিত জানি তুমিই জননী অনিদ্রার।

বহু কিছু থেকে ছুটি

বহু কিছু থেকে ছুটি নিতে পারি কখনো-সখনো।
আপিসের কাজকম্ম, রক আর সরব রেস্তোরাঁ,
রাস্তার অথই ভিড়, মনোহারি দোকান, ব্যাংকের কাউন্টার,
ইয়ারবকসির আড্ডা, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়তম শব্দাবলি
রেডিও, টেলিভিশন, ব্রিজ থেকে বক্তৃতার মঞ্চ কিংবা কবিতা পাঠের
স্মার্ট আসরের শোভা; সিনেমা সার্কাস
ইত্যাদি ইত্যাদি থেকে ছুটি নিতে পারি নির্দ্বিধায়;
অথচ তোমার কাছে আজীবন ক্ষণিক ছুটির
দরখাস্ত পারব না করতে দাখিল।

একদা শৈশবে গাঢ় গোধূলি বেলায় কোনো রঙিন মেলায়
একটি পুতুল থেকে কিছুতেই বহুক্ষণ ফেরাতে পারিনি
দুটি চোখ, এত ভালো লেগেছিল। এবং তোমার ভাবনায়

নিমগ্ন হলেই, হে স্বদেশ; সেই পুতুলের মুখ মনে পড়ে।

তোমার রূপের খ্যাতি পরাক্রান্ত প্রবাদের মতো
এখনও ছড়িয়ে আছে হাটে মাঠে ঘাটে; এখনও তোমার মুখ,
সর্ষে ক্ষেতের মতো মুখ,

সোনলী আঁশের মতো চুল,
জেলের ডিঙির মতো ভুরু,
মেঘনার মতো কালো টলটলে চোখ

আনন্দ জোগায় মনে এবং জীবনানন্দ তোমার সংসর্গ
ছেড়ে অন্য কোথাও চাননি যেতে। এমনকি আধুনিক তুখোড় কবির
উচ্ছল রক্তেও বাজে অপরূপ তোমার নূপুর মাঝে মাঝে।

তোমাকে নিবিড় ভালোবাসে অনেকেই।
সংখ্যায় ক'জন তারা? কী লাভ বলো-না এই হিসেব-নিকেশে?
কেউ তারস্বরে; কেউ মৃদু
মনে মনে তোমাকেই জপে; সঁপে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল
তোমার একান্ত ঘাটে। অনেকের মতো
আমিও সহজে পারি হাজার হাজার শব্দে, জ্বলজ্বলে শব্দে
তোমার স্তুতির মালা গেঁথে দিতে। কিন্তু আমি শুধু
নিঃশ্বাসের মতো লৌকিকতাহীন মা বলে ডাকতে
ভালোবাসি তোমাকেই হে দেশ আমার।

তোমাকে দেখলে মন আজকাল হয় উচাটন।
তোমার সুদীর্ঘ চুল ভাসে জলে, তুমি ভাসো সরলা সুন্দরী,
কখনো অত্যন্ত মৃদু সুরে গাও গান, স্তব্ধ হও কখনোবা,
যেন ওফেলিয়া ॥

ইলেকট্রিকের তার ছেড়ে

ইলেকট্রিকের তার ছেড়ে গেলে কাক কম্পনের
সৃষ্টি হয়, অতিবর্ষণের পর পথে জমে জল,
কিংবা মিষ্টান্নের ঘ্রাণ পেলে যূথচারী পিপীলিকা
বহুদূর থেকে আসে সম্ভাবনাময় আহরণে,
অথবা পুরোনো কড়িকাঠে প্রজাপতি থাকে সেঁটে
রঙিন কাগজবৎ– এই দৃশ্যাবলির সহিত

তোমার সম্পর্ক আছে? তবুও তো শুধু তোমাকেই
মনে পড়ে, ভেসে ওঠো প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গ সমেত,
তোমাকে ভাবার জন্যে উদ্যমের প্রয়োজন নেই।
গহন রাত্রির পর যেমন ভোরের প্রসন্নতা
আসে অনায়াসে, তুমি তেমনি জেগে ওঠো
বক্ষের একান্ত কক্ষে। আহারের পর হাত ধুয়ে
শোঁকার সময় মৃদু যে-ঘ্রাণ উত্থিত হয়, তারই
অনুরূপ যেন স্মৃতি; কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাই।
অলৌকিক কাউন্টারে গিয়ে চাই একটি টিকিট
হাত পেতে; তুমি থাকো দূরে, আমি ভূতগ্রস্ততায়
ঘুরে মরি দিগ্বিদিক। আমার জীবনে তুমি আজও
ঠিক হৃৎস্পন্দনের মতোই অপরিহার্য, তুমি।

সাধ

ওষুধের শিশি, থার্মোমিটার ইত্যাদি অপসৃত
আমার শিয়র থেকে। রৌদ্রের বার্নিশে ঝকমকে
সারা ঘর, ছাদের কার্নিশে পরগাছা, কী প্রফুল্ল,
ছড়ায় আপন শোভা। খবরের কাগজের পাতা
টেবিলে দিয়েছে মেলে সারা বিশ্ব। হাওয়া ফিসফিসিয়ে

বলে কানে কানে, 'তারপর কী খবর? যাক, ফাঁড়া
এ যাত্রা কেটেছে তবে।' সাদা পাঁউরুটির মাংসের
ভেতরে প্রবেশ করে রোদ, করে হৃদয়ে আমার।

স্মিত কাঁচা-পাকা চুল কুড়ায় আদর চিরুনির
মধ্য-দিনে, আয়নায় দেখছি সদ্য-রোগমুক্ত মুখ,
পথ্য-সমর্থিত। কী একটা শব্দ হল অকস্মাৎ,
হয়তো পাশের ঘরে। সজনে গাছের কাছে কেউ
দাঁড়িয়ে রয়েছে বুঝি। মাঝে মধ্যে দ্বৈত গুনুনের
ঢেউ ছোঁয় আমার সত্তাকে। আপাতত নিরিবিলি
নিজেকে রেখেছি মুড়ে কবিতায় আপাদমস্তক
'কাল ধর্মঘট হবে', কখনো মাইকে র'টে যায়,
কখনোবা মিছিলের কলরব রাস্তার ওপারে।

হঠাৎ তোমাকে দেখি, নিবিড় দাঁড়িয়ে আছ একা,

শরীরে মোহন ঋতুরাজ; হয়তো তোমার ঘাটে
এখনও বসেনি কেউ, ভরেনি আঁজলা রাঙা জলে
উল্লসিত ব্যগ্রতায়। এখন তোমাকে দেখে ফের
সদ্য-যুবকের মদির সাহস পেতে সাধ জাগে।

ম্যাজিক

হচ্ছে, হতে থাকবে দিনের পর দিন, এইমতো,
কখনো ভিন্ন রকম।
লোকটা চায়ের দোকানে বসবে, চা খাবে, সঙ্গে
দুটো খাস্তা বিস্কুট,
ওল্টাবে খবরের কাগজ, দেখবে ম্লান হাতঘড়ি।
তরতাজা তরকারি নিয়ে ছুটবে মুটে, কাক
খুঁটে খুঁটে খাবে ইঁদুর।
সিঁদুর-রাঙা শার্ট-পরা একজন যাবেন এই পথে
রোজকার মতো,
যার কাছে দিন আর রাত্রির ব্যবধান লুপ্ত, সময়
অচিহ্নিত, তার
মনের ভেতর নানান মন্টাজ। এখানে ফাটবে
টিয়ার গ্যাসের শেল, গুলির শব্দ হবে,
মন্ত্রোচ্চারণের মতো
কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে ফিরবে স্লোগান। কেউ
মুখ থুবড়ে পড়বে রাস্তায়,
কারুর স্যান্ডেল যাবে ছিঁড়ে হঠাৎ চিৎকারে
চমকিত গলির মোড়ে।
হচ্ছে, হতে থাকবে দিনের পর দিন, এইমতো,
কখনো ভিন্ন রকম।

কাঁদবো,
কাঁদাবার লোক থাকবে বিপুল বেরাদরিতে।
হাসব,
হাসাবার লোক থাকবে বিপুল বেরাদরিতে।

আমার শহরে, আগে যেখানে ছিল মাঠ কিংবা
কালো জঙ্গল,
এখন সেখানে আলিশান দরদালান, পিঠাপিঠি।

আমার পাড়ায়, আগে যেখানে ছিল গ্রন্থবিতান,
এখন সেখানে হেয়ার-কাটিং সেলুন,
সস্তা রঙিন শাড়ির মতো
সাইনবোর্ড দাঁত কেলিয়ে হাসে সর্বক্ষণ।
আমার মা, আগে, বহুদিন আগে, সংসার
নিকিয়ে বিকেলে
চুল আঁচড়াতেন হাড়ের কাঁকই দিয়ে।
এখন তিনি
প্লাস্টিকের চিরুনিতেই অভ্যস্ত।
আমার মাথার বস্তিতে আগে ছিল কালোর
একচ্ছত্র আধিপত্য,
এখন সেখানে ওড়ে সাদা নিশান।
টেবিলে প্রাচীন একটা মুখোশ– কোথাকার
কবেকার, কে জানে–
একবার দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায় পুনরায়।
আমার চেনা এক ভদ্রলোক, একদা ছিলেন
দীক্ষিত অহিংসায়,
এখন তাঁর মুখে শুনি 'হিংসা ইতিহাসের ধাত্রী'
ইত্যাকার বাণী।

মনের গভীরে জোনাকি-অচেতন,– দেখি
প্রাচীন এক শয্যায়
আছেন শুয়ে এক রাজা, অসুস্থ,
হীনবল আর বুড়ো।

বদলে যাচ্ছে, পাল্টে যাচ্ছে অনেক কিছু–
পায়রাময় স্টেজ,
স্টিকের ডগায় টকটকে গোলাপ কখনোবা
মাটিতে কিশোরের
মুণ্ড, কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন, আবার লাগে জোড়া।
ম্যাজেশিয়ান
কী ম্যাজেস্টিক বলে দিচ্ছি হাততালি। হঠাৎ
স্টেজের পর্দা আসবে নেমে
বন্ধ হবে চেল্লানি, হাততালি, সিটি ইত্যাদি
যাবে থেমে,
থেমে যাবে, থেমে যাবে, থেমে যাবে সব ম্যাজিক।

শয্যায়

তাসের তাঁবুর মতো ঘরের দেয়ালগুলি খসে,
আমাদের শয্যা যায় উদোম উঠোনে, শহরের
শীর্ষে চুরুটের আগুনের মতো নক্ষত্রবাসরে।
একটি কেমন সাপ, তুমি শুয়ে চিত্রবৎ খাটে।
মেঘময়তায় দেখি ঝুঁকে তোমার মুখের দ্বীপ,
আমার তন্ময় চক্ষুদ্বয় হয় নব্য ক্রুসো; তুমি
এমন উদ্যান এক, যেখানে পাখিরা সহজেই
নির্ভয়ে আশ্রয় পারে নিতে, মৃদু ঠোঁটে খড়কুটো
সযত্নে সাজাতে পারে। সুগভীর গীত জেগে ওঠে
অকস্মাৎ, লয়-তানে ঝংকৃত স্নায়ুর ঝোপঝাড়।
কান পেতে শুনি, ভাবি, তোমার শরীর সেই গীত-
উত্থিত সংগীতে বেজে উঠি, কভুবা সাঁতার কাটি
বিস্ময়-জাগানো সুরে, সেই গীত টেনে নেয় দ্রুত
আমাকে তোমারই দিকে। যুগলবন্দিতে ক্রমাগত
শিশিরের সৃষ্টি হয় আর অবগাহনকালীন
তুমি তো মাংসল পুণ্য ক্রুশে বিদ্ধ, যিশু হও নারী।

কোন দিকে?

কোন দিকে নিয়ে যেতে চাও আমাকে? কোন দিকে গাইড?
আমার পদদ্বয় প্রোথিত স্বপ্নভূমিতে,
আমাকে কেন উপড়ে নিতে চাও?
কেন তোমরা মায়াবৃক্ষের ছায়া থেকে
সরিয়ে নিতে চাও আমাকে? কেন
উদ্বাস্তু করতে চাও স্বপ্নভূমি থেকে?
দিব্যি আছি আলেখ্যবৎ, গায়ে লাগে না ধুলো,
নেই শরীরী অশরীরী কারুরই সাতেপাঁচে।
কেন আমাকে টইটম্বুর সরোবর থেকে
তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাও ঐখানে
যেখানে হাজার হাজার মানুষ
প্রস্তুত হচ্ছে,
পেশি নাচাচ্ছে চরম রৌদ্রে?

আমি মৌমাছি হয়ে ফুলে ফুলে

অলৌকিক সঞ্চয়ে বিভোর হতে চাই,
আমি ছুটতে চাই দরাজ প্রান্তরে,
ধাওয়া করতে চাই পরীদের পেছনে।
কেন তোমরা
আমার সেই গোপন খেলা পণ্ড করতে চাও?
কেন শুনতে চাও না সোনালি রেফারির হুইসিল?
কেন আমার মারহাবা স্বপ্নিল জার্সি খুলে নিয়ে
বিষম নগ্ন করে দিতে চাও আমাকে?
আমি প্রাণপণ ছুটে পালাতে চাই,
তোমাদের মুঠোর মাঠ থেকে
আমি চম্পট দিতে চাই।
বাধা দিও না।
তোমাদের মতো প্রস্তুত নই আমি,
আমার পেশি ঝলসায় না চরম রৌদ্রে।
আমার অক্ষমতার মুখ লুকাতে চাই ঝটপট
পাখির বুকে,
বিপন্ন ঘাসে,
দিঘির শ্যাওলায়,
রেললাইনে,
অনেক উঁচু বাড়ির ছাদে।
কোন দিকে নিয়ে যেতে চাও আমাকে? কোন দিকে গাইড?
শেষ অব্দি
তোমাদের কাট্টি মেরে যেতে পারব তো?

সাধারণ বাড়ি

কাকপক্ষী, প্রজাপতি, পারাবত, পেলব বেড়াল
ইত্যাদির প্রতি আমি ঈর্ষান্বিত, কেননা তোমার
বাড়িতে তাদের গতি উন্মুক্ত অবাধ; কিন্তু আমি
সেখানে পারি না যেতে নির্দ্বিধায় যখন-তখন
হলেও ইচ্ছায় সকাতর। ইচ্ছা কুকুরের মতো
লোভী আর এমন সুদৃঢ় চেন, বকলস নেই
যা দিয়ে বাঁধবো তাকে, রাখবো স্ববশে। ইচ্ছা হয়,
ভারি ইচ্ছা হয় যাই তোমার বাড়িতে বার বার।

সেখানে ড্রইংরুমে নেই সুশোভন টিভি,

দামি আসবাবপত্র কিছু নেই, এমনকি হায়
চায়ের বাটিও ঠুঁটো, ডানাভাঙা নিঃসঙ্গ মৃন্ময়ী
পরী তাকে, যেনবা বালিকাবধূ সংকোচে দাঁড়ানো।
তবুও তো সে-বাড়ির চতুঃসীমা, কৃপণ উঠোন,
সংকীর্ণ বিবর্ণ ঘর বড় ভাল লাগে, বার বার
চৌকাঠে দাঁড়াতে চাই, ব্যাকুল দেখতে চাই তুমি
হাসলে কেমন হাসো, কাঁদলে বালিশ কতটুকু
ভিজে ওঠে ব্যথাবাষ্পে, মেজাজের তেজিমন্দি তো-ও।
আমার ইচ্ছাকে আমি কিছুতেই পারি না দমাতে।

সে-বাড়িতে তুমি থাকো বলে অতি দরিদ্র উঠোন
নিমেষে উদ্যান হয়, ক্ষয়রোগীর মুখের মতো
কাঠের দরজা রাজ-তোরণের স্বপ্নময়তায়
কথা বলে অলৌকিক এবং কলের বিন্দু বিন্দু
জল কৃশ সাধকের জপমন্ত্র; সমস্ত বাড়িটা
জ্যোতিষ্কের বর্ণাকৃতি পেয়ে যায়, দূর থেকে দেখি।

সাঁকো

বাঁধতে পারিনি কোনো সাঁকো,
যদিও উদ্যমে থরোথরো আমি সাঁকো
বাঁধতে গিয়েছি ফাঁকা জায়গায় কখনো
সাজ-সরঞ্জামে টান প'ড়ে গেছে সকল সময়।
বানর অথবা কাঠবিড়ালির পাইনি মদদ
কোনোদিন। সাঁকো
নিপুণ বাঁধতে গিয়ে আমি শুধু ব্যর্থ হয়ে যাই,
বার বার ব্যর্থ হয়ে যাই।

বাঁধতে পারিনি কোনো সাঁকো
অথচ আমার আশেপাশে
সাঁকো নেই বলে আমি মূক হয়ে থাকি,
নিজেকেই প্রিয়-সম্ভাষণে করি প্রীত, নিজের হাতেই
হাত রাখি। কিন্তু শুধু আয়নায় নিজের মুখ দেখে,
নিজের সঙ্গেই মেতে কথোপকথনে
নিজেকে আদর করে চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে সকল সময়

থাকা দায়। অন্য কারো হাত
ছোঁয়া চাই, শোনা চাই অন্য কারো স্বর–
মানে সাঁকো থাকা চাই।

অথচ বাঁধতে গিয়ে সাঁকো
আমি শুধু ব্যর্থ হয়ে যাই,
বার বার ব্যর্থ হয়ে যাই।
উদাস ডাকছি আমি বিপন্ন গলায় বারবার,
যদি কেউ ছুটে আসে, কথা বলে অন্তরঙ্গতার
প্রশস্ত সুচারু রোদে চেয়ারের মসৃণ হাতলে হাত রেখে
অথবা পা নেড়ে মৃদু হেসে।
বুঝব কি তার ভাষা?
সে আমার কথার গলির
পাবে কি হদিশ কোনো? দ্রুত খুলে যাবে কি জানালা সবদিকে?

কী করে বানাব সাঁকো শূন্যে
এক লহমায়?
আমি তো ম্যাজিকঅলা নই।
বর্ণমালা শব্দাবলি দিয়ে চমৎকার স্বপ্নময়তায় সাঁকো
বাঁধা যায় হাসতে হাসতে,
কুলকুচো করতে করতে।

নিপুণ বাঁধতে গিয়ে সাঁকো তবু আমি
ব্যর্থ হয়ে যাই,
বার বার ব্যর্থ হয়ে যাই...

আক্রান্ত হ'য়ে

'কী আছে তোমার কাছে? বের করো চটপট' বলে
ক'জন উঠতি গুণ্ডা রাখল রিভলবার বুকের ওপর
আচমকা, আমি প্রায় অকম্পিত স্বরে বললাম, 'এই তো
এখানে আমার বুকে শ্যামলিম শৈশবের নেবুতলা, নানান রঙের
প্রজাপতি, হৈ-হৈ মেলা
পাখির পেলব বাসা, কারো গাঢ় চুম্বনের রঙিন উষ্ণতা,
উনিশ শো বেয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ, দুর্ভিক্ষের ছায়া,
ব্যক্তিগত নানাবিধ ক্ষুধা,

এবং দ্বিতীয় বিশ্ব সময়কালীন ঝিকঝিক মালুম ইত্যাদি শব্দাবলি;
আমার পাঁজরে বহু লাশ পলাশ রঙের বিভিন্ন মিছিল,
শ্রাবণ-সন্ধ্যায় ভেজা করুণ শহর,
আমার মুঠোয় কতো কান্না, নিয়নের ঝিকিমিকি
এবং হিরোশিমার নিদারুণ লণ্ডভণ্ড ল্যান্ডস্কেপ, দ্বিখণ্ডিত বঙ্গ,
সংখ্যাহীন উদ্বাস্তুর মুখ এবং আপনাদের পিস্তলের
রঙের মতন তীব্র হতাশা অথবা
রঙিন শার্টের মতো আশা,
কবিতার জন্যে অন্তহীন ভালোবাসা, শুনুন পকেটে
অসমাপ্ত কবিতার পাণ্ডুলিপি, আইবুড়ো বোনের একটি
চিঠি ছাড়া আর কিছু নেই।
এসব ফালতু বস্তু আপনারা নেবেন কি করুণানিধান?'

হঠাৎ ছিটিয়ে থুতু আমার একান্ত নির্বিকার মুখে ওরা
ধাঁ করে উধাও হল ঝাঁ-ঝাঁ ধোঁয়া ছেড়ে কালো জিপে।
আমার ভেতর কিছু শব্দাবলি ম্যাজেশিয়ানের
তাসের মতন নেচে নেচে
কেবলি কবিতা হতে চায়। সটান নির্ভীক হেঁটে চলি পথ
বক্ষলগ্ন অলৌকিক একটি তালিকা নিয়ে অলক্ষ্যে সবার।

বারবার ফিরে আসে

বারবার ফিরে আসে রক্তাপ্লুত শার্ট,
ময়দানে ফিরে আসে, ব্যাপক নিসর্গে ফিরে আসে,
ফিরে আসে থমথমে শহরের প্রকাণ্ড চোয়ালে।
হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে, ঘোরে হাতে-হাতে,
মিছিলে পতাকা হয় বারবার রক্তাপ্লুত শার্ট।
বিষম দামাল দিনগুলি ফিরে আসে বারবার,
বারবার কল্লোলিত আমাদের শহর ও গ্রাম।

'আবার আসব ফিরে' বলে সজীব কিশোর
শার্টের আস্তিন দ্রুত গোটাতে গোটাতে
স্লোগানের নিভাঁজ উল্লাসে
বারবার মিশে যায় নতুন মিছিলে, ফেরে না যে আর।
একটি মায়ের চোখ থেকে

করুণ প্লাবন মুছে যেতে না যেতেই
আরেক মায়ের চোখ শ্রাবণের অঝোর আকাশ হয়ে যায়।
একটি বধূর
সংসার-উজাড়-করা হাহাকার থামতে না থামতেই, হায়,
আরেক বধূর বুক খাঁ-খাঁ গোরস্থান হয়ে যায়,
একটি পিতার হাত থেকে কবরের কাঁচা মাটি
ঝরে পড়তে না পড়তেই
আরেক পিতার বুক-শূন্য-করা গুলিবিদ্ধ সন্তানের লাশ
নেমে যায় নীরন্ধ্র কবরে।

বারবার ফিরে আসে রক্তাপ্লুত শার্ট,
ময়দানে ফিরে আসে, ব্যাপক নিসর্গে ফিরে আসে,
ফিরে আসে থমথমে শহরের প্রকাণ্ড চোয়ালে।
উনিশ শো উনসত্তরের
তরুণ চিৎকৃত রৌদ্রে যে-ছেলেটা খেলত রাস্তায়,
বানাত ধুলোর দুর্গ, খেত লুটোপুটি নর্দমার ধারে
বিস্ময়ে দেখত চেয়ে ট্রাক, জিপ,
রাইফেল, টিউনিক, বেয়োনেট, বুট, হেলমেট,
এখন সে টলমল পদভরে শরিক মিছিলে।
লজ্জানম্র যে-মেয়েটি থাকত আড়ালে সর্বক্ষণ,
যে ছিল অসূর্যম্পশ্যা, এখন সে ঝলসায় মিছিলে মিছিলে।
তাদের পায়ের নিচে করে জ্বলজ্বল নীল-নকশা নব্য সভ্যতার।

বারবার ফিরে আসে রক্তাপ্লুত শার্ট,
ময়দানে ফিরে আসে, ব্যাপক নিসর্গে ফিরে আসে,
ফিরে আসে থমথমে শহরের প্রকাণ্ড চোয়ালে।
হতাশাকে লাথি মেরে, ভয়কে বেদম লাঠিপেটা করে
সবখানে শ্লোগানের ফুলকি ছড়াই।
বারবার আমাদের হাত হয় উদ্দাম নিশান,
বারবার ঝড়ক্ষুব্ধ হই আমরা সবাই।
আমাকেই হত্যা করে ওরা বায়ান্নোর রৌদ্রময় পথে,

আমাকেই হত্যা করে ওরা
উনসত্তরের বিদ্রোহী প্রহরে,
একাত্তরে পুনরায় হত্যা করে ওরা আমাকেই,
আমাকেই হত্যা করে ওরা

পথের কিনারে
এভেন্যুর মোড়ে,
মিছিলে, সভায়–
আমাকেই হত্যা করে ওরা, হত্যা করে বারবার।
তবে কি আমার
বাংলাদেশ শুধু এক সুবিশাল শহীদ মিনার হয়ে যাবে?

এক মহিলার ভাবনা

কোনো কোনো মধ্যরাতে কিছু ঘাস, কিছু কালো মাটি
কারুর জীবন্ত অবয়ব হয়ে আমাকে জড়ায়,
মুঠোয় সজোরে ধরে চুল, গালে গাল ঘষে, আমার পাহাড়ে
অরণ্যে উপত্যকায় ঘোরে মাতাল বেঘোর।

একমাত্র মেয়ে
করছে স্বামীর ঘর, ছেলেটা কখন আসে, আবার কখন
ফেরে ঘরে টের পাওয়া দায়। কাছে ধারে কেউ নেই। 'ওগো' বলে
ডাকে না এখন কেউ আর। যার সঙ্গে সহবাসে
ছিলাম একান্ত ডুবে বিশটি বছর, হাড় তার
এখন মাটির নিচে ভয়ানক ধবধবে হয়ে গেছে বুঝি
আমার শাড়ির মতো। হায়, যদি পারতাম হতে
লাশবাহী ভেলার বেহুলা!
শয্যায় লাগে না পিঠ কোনো কোনো রাতে,
কখনো বুলোই চোখ বইয়ের পাতায়, জানালার বাইরে তাকাই,
কখনো ফ্লাওয়ার-ভাসে রাখি গাল, কখনো মরুর
মতো সরু বারান্দায় করি পায়চারি, অঙ্গে অঙ্গে
জ্বলে যে অঙ্গার তার দাহ নিরীহ করার ছলে
নির্জন স্নানের ঘরে যাই বার বার। দেয়ালের
ছবিটার দিকে রাখি উষ্ণ দৃষ্টি, আমার স্বামীর
ফটোগ্রাফ কী শীতল, কী সুদূর; এইমাত্র সবুজ পোকার
লোভে বালিরঙ টিকটিকি ওঁর প্রজাপতি-গোঁফ ছুঁয়ে গেল।
এ নীরন্ধ্র ঘরে আমি উঠি বসি, বসি উঠি, কখনো দাঁড়াই,
কখনো এলিয়ে পড়ি কৌচে, বয়সকে বড় বেশি ঘেন্না করি,
যেমন বিক্ষুব্ধ চাঁদ সদাগর মনসাকে। এ ঘরের অন্ধকার
অথবা বাল্‌বের অত্যধিক আঁচ-দেয়া দুধের মতন আলো

পারে না কি হতে মানবিক?
সে কেন আমার পুত্র আসে না আমার কাছে, কেন
রাখে না সবল হাত, মুখ তার আমার যুগল থরোথরো
উরুর সোফায়? কেন উদ্বেল আমার স্তন তার
মুঠোয় দেয় না ঢেকে, ঢাকত যেমন
শৈশবে আমার পাশে শুয়ে, আমি গাঢ় ঘুমোতাম!

স্কুটার ড্রাইভার

স্কুটার চালানো কাজ। মিটারের ওঠা-নামা খিস্তি-
খেউড়, বচসা, দৌড় ইত্যাদি নিয়েই বেলা যায়।
নিত্য ওঠে কতজন আমার স্কুটারে, ক্ষণিকের
অতিথি সবাই। ভাড়া চুকিয়ে যে যার ঠিকানায়
নেমে পড়ে– পার্কে, মাঠে, সিনেমায়, রাস্তায়, দপ্তরে
কেউবা পাড়ায় কেউ বেপাড়ায়। কারুর গন্তব্য

নিয়ে মাথা ঘামাই না কোনো দিন। পকেট উজ্জ্বল
হলেই আমার দিন আহ্লাদিত, রাত্রি উচ্ছ্বসিত।
কখনোবা একেকটি মুখ খুব মনে গেঁথে যায়,
কিছুতেই পারি না ভুলতে। রগরগে ফিল্মে হর-
হামেশা যেসব মেয়ে নাচে গায় বাগানে পাহাড়ে
রুপালি ঝর্নার ধারে, এমনকি গোরস্থানে– যেন

তাদের মতোই কেউ আমার স্কুটারে ফিসফিস
কথা বলে উদ্বেল সঙ্গীর কাঁধে ঢ'লে। হাবুডুবু
খাচ্ছে প্রেমে হয়তো দুজন। সত্যি প্রেম? নাকি শুধু
বিছানায় একসাথে ঘুমোনোর জন্যই এমন
ঢলাঢলি, এত খুনসুটি? বাদ দিন, আমি ছাই
কী বুঝি প্রেমের? ইতরামি, খচরামি, মাজাকির

সমাহার এ জীবন। কখনো বিবির পান-রাঙা
ঠোঁট রক্তে জাগায় বলক, ছোট্ট মেয়েটার হাসি
আমার ক্লান্তির কালি করে সাফ, দোস্তের দরাজ
দিল বুকে কেমন ভরসা দেয়, ফিল্মি গান গাই।

স্কুটার চালানো কাজ। শালা, দুনিয়াটা নাট আর

বল্টুর সংযুক্ত কেরামতি। কোনো দিন একজন
বুড়ো-সুড়ো যাত্রী, দেখি, ভীষণ চিন্তিত, জীর্ণ-প্রায়
জুতোর সোলের মতো গালের খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি,
চশমাটা নাকের ডগায়, তার ছোঁড়া পাঞ্জাবিটা
চোখে পড়তেই ফের ঘরের বেড়ার কথা মনে

হল; বিড়বিড় করে লাঠি হাতে নামলেন তিনি
কেমন অন্যমনস্ক। একদিন একটি মহিলা,
কান্না-ভেজা চোখ তার, হাত নেড়ে ডেকেও স্কুটারে
ওঠেননি; বিরক্তিতে পাড়লাম গাল। বুঝি তার
কনস্কামনার ভীরু হরিণ হারিয়ে গেছে এই
শহরের ভিড়ে; মাঝে-মাঝে বিছানায় শুয়ে ভাবি–

নানা মুখ ভিড় করে আসে চোখের সম্মুখে, যেন
মেলায় ঘুরছি আমি। ওরাও ঘুরছে সর্বক্ষণ
ক্ষণিক অতিথি সব, যদি পারতাম সবাইকে
সব সমাধানের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে কোনো দিন।

একজন জেলে

সমুদ্রে যাব না আর কোনো দিন, সমুদ্রে হাঙর,
ঘূর্ণি গরকি সেই রাক্ষুসীর পেটে আমার ডাঙর
ছেলেমেয়ে; বউ আর জোয়ান ভাইটা গেছে, শুধু
আমি একা প'ড়ে আছি। মাথার ভেতর কী যে ধু-ধু
করছে ক'দিন ধরে। এদিক ওদিক ছুটি, ভিটেমাটি
কোথাও পাই না খুঁজে। চারদিকে শূন্যতার ঘাঁটি।

সেই ছেলেবেলা থেকে জলের দিকেই ছিল মন;
জলে জলে গেছে বেলা, মুগ্ধতায় যখন তখন
ছুঁয়েছি সাগর-জল আর আয় মাছ ধরি আয়
বলে ভাসিয়েছি ডিঙি নদীতে রঙিলা দরিয়ায়।
এই লোনা সমুন্দুর ছেড়ে আমি কোথাও যাইনি,
অথচ আমারই সব নিল কেড়ে মাতাল ডাইনী।

এসব বলছি কী-যে! না, না, ঘর-দোর সবই আছে।
এই তো ছেলেটা দৌড়ে উঠোন পেরুল, লম্বা গাছে

ডাকছে কুটুম পাখি, বউ রাঁধে, মেয়েটা তেঁতুল
খাচ্ছে আর ভাই জাল দিচ্ছে মেলে। হায়, শুধু ভুল
হয়ে যায়, যেন ফের সামুদ্রিক ঘন কুয়াশায়
হারিয়ে ফেলছি সব, মাথা কেমন গুলিয়ে যায়

আচ্ছা, আপনারা কেউ দয়া করে আমার সঠিক
নামটি দেবেন বলে? কেবলি ঘুরছি দিগ্বিদিক,
পড়ে না নিজেরই নাম মনে। নিজেকে কী নামে ডাকি?
আমি কি রসিক দাস? বিশু? জগদিন্দ্র মালো? নাকি
আলী মৃধা? কতো না বয়স হল? সবদর গাজী
হয়তোবা এই আমি। আসলে সকলই ভোজবাজি।

কী যেন লাফিয়ে ওঠে অগোচরে মনের ভেতর–
অত্যন্ত উজ্জ্বল কিছু, কী করে ভাবব তাকে পর?
ত্রাণসামগ্রীর ঝলকানি? সে যে সু-স্বপ্নের মতো,
একটি বিশাল মাছ সামুদ্রিক, শূন্যে কেলিরত।
এখনও মাছের চিন্তা! ভুলি না জালের কীর্তি, মাছ
আমাকে উড়িয়ে নেয় মেঘে, রাঙা গাঙে, দেখি নাচ
একজন মৎস্যরমণীর, আমাকে কোমল ডাকে।
প্রকৃত আশ্চর্য নয় তারা, স্মৃতিবৎ ভেসে থাকে।

আমি তো জলেরই লোক, চুপচাপ থাকা দায় ঘরে,
ডিঙি বেয়ে বার বার যাব আমি সুনীল সাগরে।

তোমার নাম

তোমার নাম মেয়ে গহন রাত্তিরে
ছাদের কার্নিশে শব্দ শিশিরের।
তোমার নাম মেয়ে শান্ত ভোরবেলা
মাটিতে ঝরে-পড়ে লাজুক শিউলির।

তোমার নাম মেয়ে পাখির বুকে যেন
প্রেমিক বাতাসের ব্যাকুল নিঃশ্বাস
তোমার নাম ধু-ধু সদ্য-জাগা চরে
জাগর জোছনার মদির শেক নাচ।
তোমার নাম ডালে চকিতে নুয়ে পড়া

রক্তগোলাপের গোপন শিহরণ।
তোমার নাম খাঁ-খাঁ অনিদ্রায় দুটি
চোখের পাতা-জোড়া ঘুমের গুঞ্জন।

তোমার নাম সাদা বিপুল ক্যানভাসে
চিত্র-জাগানিয়া রঙের চুম্বন।
তোমার নাম মেয়ে গুণীর বেহালায়
ছায়ার নিরালায় গভীর কোনো গৎ।
তোমান নাম মেয়ে টেবিলে ঝুঁকে-থাকা
কবির উদ্বেল বুকের স্পন্দন।
তোমান নাম খর-দুপুরে নির্জনে
তৃষিত পথিকের ব্যগ্র জলপান।

তোমার নাম ঝাঁ-ঝাঁ বোশেখি রোদ্দুরে
ব্যাপ্ত পতাকার হিরণ হিল্লোল।
তোমার নাম কালো জেলের খুপরিতে
আঁধার-তাড়ানিয়া আলোর অভিষেক।

তোমাকে দেখে

এই তো আবার তুমি আগুন রঙের শাড়ি প'রে
দাঁড়ানো অথবা
ছড়িয়ে যুগল উরু ব'সে আছ গৈরিক ডিভানে,
তুমি, শুধু তুমি।
তোমার গ্রীবার জ্বলজ্বলে কালো তারা,
ঠোঁটের কার্নিশে জমে মদির শিশির।
চতুর্দিকে বস্তু ধু-ধু, চেয়ার টেবিল, বইপত্র
পোশাক-আশাক,
জানালায় হলদে পর্দা, রেডিওর নিস্পৃহ ঘোষক
রটাচ্ছে খবর : মধ্যপ্রাচ্য, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম,
সহসা সুকর্ন মৃত, মহান প্রেমিক।

এই তো আবার সেই তুমি, সব বস্তু, সব কিছু
ছাপিয়ে উঠেছ তুমি, নাইছ নিয়নে খুব, কোনো রাঙা
মিলনাঙ্গুরীয়
এগিয়ে দিইনি তবু মিলনের ইডেনে দুজন।

হৃদয় উজাড় করে তোমার একান্ত নাম ধরে
ডেকে ডেকে ডেকে ডেকে ওস্তাদের মতো
সারা পৃথিবীকে বস্তুহীন
একটি প্রগাঢ় সুরে মুঞ্জরিত করে দিতে ভারি
ইচ্ছে হয়েছিল। আমাদের
চৌদিকে বস্তুর ভিড়– বস্তুই তো মাঝে মাঝে মানবের
সংযোগ সাধনে
ঐন্দ্রজালিকের মতো অনুপম চাতুর্য দেখায়।
তোমাকে দেখছি আমি নিষ্পলক, তুমি
এখনও দাঁড়ানো;
যেন উদ্যানের সবচেয়ে তন্বী গাছটিকে কেউ
করেছে রোপণ এই তকতকে ফ্লোরে।
পুরো রাতদিন ধরে শুধু একটি শব্দের জন্যে
অশ্রান্ত ভ্রমণ করে একটি কবিতা কিছুতেই
শেষ করতে না-পারার দুঃখ,
বিকেল বেলায় কোনো হলুদ বাড়ির কাছে একটি পাখিকে
শুকনো, মৃত প'ড়ে থাকতে দেখার দুঃখ,
সারাদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে ঘুরে কারুর কাছেই
একটি পয়সাও ধার না পাওয়ার দুঃখ,
বিদেশী দূতাবাসের কাছে
একটি ছাত্রকে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে দুঃখ,
একজন বালককে পুকুরের কালো জলে ডুবতে দেখেও
তাকে বাঁচানোর ক্লীব উদ্যমহীনতা,
তার জন্যে দুঃখ,
নিমেষে গেলাম ভুলে তোমাকে দেখেই।

রাজহংসী

একজন রাজহংসী, যেন সে ডেসডেমোনা, এলো
আমার অত্যন্ত কাছে। শুনল কাহিনী অগণিত
বললাম যেসব তাকে। শব্দ গেঁথে গেঁথে বানালাম
তার জন্যে এ্যাডভেঞ্চারের এক অলৌকিক ভোজ।

রইল চেয়ে মুগ্ধতায়; গাছের পাতারা গান গেয়ে
ওঠে, পাখি হয় ফুল, চতুর্দিকে গহন উদ্যান

বহু জায়গা জুড়ে রয়। কী করে দস্যুর জাহাজের
নিশান ছিঁড়েছি কিংবা শুনেছি সমুদ্রে বরফের

নেকড়ে-চিৎকার– জানালাম তাকে সবি একে একে।
বাড়ালো মদির চঞ্চু রাজহংসী, জড়াল আমাকে
গাউনের মতো ফুল্ল ডানায় ডানায়। আমি তার
বুকে মুখ রেখে রাঙা উষ্ণতায় হলাম মাতাল।

হঠাৎ একটি কাক, ধূর্ত আর বেজায় হিংসুটে,
স্নিগ্ধ রুমালের মতো সবচেয়ে সুন্দর পাতাটি
ছিঁড়ে নিয়ে গেল উড়ে। 'আমারই রুমাল' বলে আমি
দারুণ চিৎকারে নৈঃশব্দকে করলাম তছনছ;
যেন মস্ত হল-এ ঝাড়লণ্ঠনের দীর্ণ হাহাকার!

'কী করে পেল সে ওই আমার নিজস্ব রুমালের
অধিকার?' বলে রাজহংসীটির দিকে তাকালাম,
আমার দু'চোখ জুড়ে সবুজ আগুন। অকস্মাৎ
সাঁড়াশির মতো চেপে বসে রাজহংসীর গ্রীবায়
আমার দু'হাত আর ছিন্নভিন্ন নিজেরই হৃৎপিণ্ড
অদৃশ্য বর্শায়; দেখি, কী দারুণ নীল গলা তার,
চোখে নিদ্রা তীব্র এঁটে দিয়েছি, গাউন ছেঁড়াখোঁড়া।

অতিবর্ষণের পর

অতিবর্ষণের পর ঝলসিত রৌদ্রের শ্লোগান
অন্ধকারে টর্চলাইটের মতো। মগ্নতায় দেখি,
হৃদয়ের উঠোনে চন্দনা খাচ্ছে খুঁটে খাদ্যকণা।
আকাশ-গড়ানো রোদ ভালো লাগে, চক্ষুস্থিত আভা
বাতাসে উড্ডীন পায়রার ঝলসানি দেখে আরও
দীপ্তিময় হয়। প্রতিবেশীর কলহ, আপিসের
খাটুনি, গ্রেডের মোহ, খিস্তি, কম্বোডিয়া,
মধ্যপ্রাচ্য, প্রাথমিক শিক্ষককুলের কিছু মুখ,
দুর্ভিক্ষ-শাসিত মুখ, আমার নিজের ছেঁড়া জুতো,
মুদির দোকানে খ্যাঁচামেচি, বাজারের ফর্দ, ভিড়,
বীমার প্রাণান্তকর কিস্তি কেমন তলিয়ে যায়
অদূর পায়রাময় বাতাসের স্নিগ্ধ স্বর শুনে।

ভাগ্যিস কয়েক দিন একঘেয়ে বর্ষণের পর
আবার উঠেছে রোদ খিলখিলিয়ে, আকাশের নীল
ব্যানারে কী যেন দেখে চক্ষুদ্বয় প্রীত, হৃদয় তো
প্রজাপতি হতে চায়, মধ্যবিত্ত ছা-পোষা মানস
চায় না বিরোধ কোনো, হাঙ্গামা-হুজ্জতি চক্ষুশূল।
বাজারের থলি হাতে পথ চলি শাক মাছ কিনে
বাড়ি ফিরি, রেশনের লাইনে দাঁড়াই, কখনোবা
ছেলেমেয়েদের ফাঁকি দিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে সিনেমায়
যাই, রেস্তোরাঁয় খাই। অতিবর্ষণের পর রোদ
কিংবা নীল দেখে মধ্যে মধ্যে খুবই আহ্লাদিত হই।
কখনো চাইনে যুদ্ধ, শবগন্ধময় জনপদ
বিভীষিকা অতিশয়, শ্মশানে নিবাস চায় কেউ?
ব্যাকুল প্রার্থনা করি, পৃথিবীর সব অস্ত্রাগার
কোমল উদ্যান হোক, বোমারু বিমান পারাবত।

অনাবৃষ্টি

আকাশ ভীষণ খাঁ-খাঁ, একরত্তি মেঘ নেই, শুধু
তরল আগুন গ'লে পড়ছে চৌদিকে। এই ধু-ধু
আকাশের দিকে চোখ রাখা দায়। হঠাৎ কখনো
জমে মেঘ; মনে হয়, হয়তোবা বৃষ্টি হবে ঘন,
হৃদয়-ডোবানো বৃষ্টি। কোত্থেকে ডাকাত এসে সব
কালো মেঘ লুট করে নিয়ে যায়; দিগন্ত নীরব।
উঠোনে সজিনা গাছ রৌদ্রাক্রান্ত, আকাশ আবার
বড় খাঁ-খাঁ, দেয়ালে হাঁপায় কাক। বন্ধ্যা রুক্ষতার
অট্টহাসি; এখন আকাশে যদি কোনো গাছ ফুল
ঝরাত অজস্র, ধরো, জুঁই, বেলী, টগর, বকুল
কিংবা কিছু মনোহারি হরিণ করত ছুটোছুটি
তা হলে ঝাঁঝালো রোদে অন্তত জুড়োত চোখ দুটি।
টেবিলে রয়েছি ঝুঁকে, আমিও চাষীর মতো বড়
ব্যগ্র হয়ে চেয়ে আছি– খাতার পাতায় যদি জড়ো
হয় মেঘ, যদি ঝরে ফুল্ল বৃষ্টি। অলস পেনসিল
হাতে, বকমার্কা। পাতা-জোড়া আকাশের খাঁ-খাঁ নীল।

জাল

খুব কালো জাল পড়েছিল ঠিকই চতুর্দিকে, আমি
আটকা পড়িনি ভাগ্যবলে। বোকা হাবার মতন
বেঁচে আছি অপ্রস্তুত। মৃত্যুর প্রতীক্ষা সর্বক্ষণ
জুড়ে রয় চেতনায়। মৃত্যুর আতঙ্কেরই অনুগামী।
এখনও তো বেঁচে থাকাটাই হাস্যকর ভয়ানক।
কখন যে দৃষ্টি থেকে পৃথিবীর সমস্ত আলোক
মুছে যাবে, দেহ থেকে তাপ। কাকের মতোই চোখ
বন্ধ করে জীবন গচ্ছিত রাখি ফাটলে নিছক।

কী ক'রে লুকাবে?

কী করে লুকাবে বলো এই সব লাশ?
এই সব বেয়নেট-চেরা
বিষম নাপাম-পোড়া লাশ?
এ তো নয় বালকের অস্থির হাতের
অত্যন্ত প্রমাদময় বানানের লিপি,
রবারে তুমুল ঘষে তুললেই নিশ্চিত
মুছে যাবে। অথবা উজাড় ঠোঙা নয় মিষ্টান্নের,
কিংবা খুব ক্ষ'য়ে-যাওয়া সাবানের টুকরো,
অথবা বাতিল স্পঞ্জ, দূর
ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিলেই বেবাক
চুকে-বুকে যাবে।
কী করে লুকাবে বলো এত বেশি লাশ?

জানতে কি তোমরা
এত লাশ আপাদমস্তক মুড়ে ফেলবার জন্যে
ক' হাজার গজ
লাগবে মার্কিন
পোড়াতে ক' মণ কাঠ? তুখোড় চাতুর্যে
ভেবেছিলে এই সব লাশ গাদাগাদি
মৃত্তিকায় পুঁতে রাখলেই
অথবা নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিলেই বেপরোয়া
তোমাদের হত্যাপরায়ণ

দিনরাত্রি মুছে যাবে বিশ্বস্মৃতি থেকে।

যখন রাস্তায় জঙ্গি জিপ ছুটে যায়,
আগলে দাঁড়ায় পথ মৃতদের ভিড় সবখানে–
নিরস্ত্র নিরীহ যারা হয়েছে শিকার
মেশিনগানের, মর্টারের। অশ্বারোহী

যেন ওরা, হাওয়ায় সওয়ার,
আবৃত সুনীল বর্মে, পেতে চায় করোটির ট্রফি।
আদালতে, সরকারি দপ্তরে
বেরোয় দেয়াল ফুঁড়ে অবিরল গুলিবিদ্ধ লাশ,
ঝুলে থাকে গলায় গলায়।

দোকানি সম্মুখে মেলে দিলে
কাপড়ের থান,
আলোকিত পরিপাটি মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে লাশ;
যেনবা লুকিয়েছিল কাপড়ের ভাঁজে।

অথবা বিদেশী প্রতিনিধিদের ভোজসভায় হঠাৎ
প্লেটে ডিশে চিকেন সুপের পেয়ালায়
ন্যাপকিনে নিহত পুরুষ, নারী, শিশু
উদ্ভিদের মতো লেগে থাকে সারাক্ষণ,
রক্তাক্ত নাছোড়।

কী করে লুকাবে বলো এত বেশি লাশ
শোকার্ত মাটির নিচে, গহন নদীতে?

হে বঙ্গ

হে বঙ্গ তোমার মুখ নিবিড় ফটোজেনিক বলে
সবাই তুলতে চায় ছবি নানা পোজে, কেউ চায়
নামুক চুলের ঢল অমল শ্যামল গ্রীবা বেয়ে,
কেউবা টিপের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী। কস্তাপেড়ে
শাড়িতে তোমাকে খুব মানাচ্ছে সম্প্রতি ভেবে কেউ
ক্যামেরা বাগায় পটু ব্যগ্রতায়, ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক।
মাইরি বিষম তাক লেগে যায় কেরদানি দেখে,
আমি তো তুলি না ফটোগ্রাফ কোনো, দেখি শুধু দেখি।

তোমার উদ্দেশে ভাব-গদ্‌গদ কতজন ইনিয়ে-বিনিয়ে
লেখেন সুচারু পদ্য রাশি রাশি, অনেক নিপুণ
চিত্রকর রাতারাতি ব'নে যান পটুয়া তোমার।
আমি তো লিখি না পদ্য, পটে রঙ মাখি না কখনো।
অক্ষম বিবর্ণ আমি, ক্লান্ত এবং গৌরবছুট–
কেবলি তোমাকে দেখি চোখ ভরে, তোমাকেই দেখি।

তুমি কি প্রান্তর ধু-ধু অথবা কাজল দিঘি শুধু?
কিংবা বনরাজিনীলা? না কি প্রেতভূমি? তুমি ধান
ভানো, গাও গান ঘুমপাড়ানিয়া নিঝুম রাত্তিরে,
প্রত্যহ ভাসাও ঘড়া, এলেবেলে গল্প করো ঘাটে,
কখনো বানাও পিঠা, কখনোবা কঙ্কালপ্রতিম
অভুক্ত সন্তান নিয়ে তোমার দুঃখের বেলা যায়।

তোমার শরীর দেখি ছিঁড়ে খায় শকুন শেয়াল,
তোমার উদাস বুকে পদধ্বনি শোকমিছিলের।
কখনো তোমার খাঁ-খাঁ বিবস্ত্র শরীর ঢেকে দেয়
পতাকা ব্যানারে ওরা লজ্জাতুর তোমার সন্তান।
মারিতে মরোনি তুমি, ম্যাক্সিম গোর্কির জননীর
মতো তুমি সংগ্রাম ও শান্তি করো হৃদয়ে ধারণ।

দোলনা নয়

দোলনায় নয় কিংবা নয় মুখরিত খেলাঘরে,
পেয়ারা গাছের নিচে কাজল মাটিতে আছে প'ড়ে,
যেনবা পুতুল কোনো, ফেলে যাওয়া। নখভরা ধুলো,
হয়তো মাটির কাছে চেয়েছিল স্নেহকণা। হুলো
বেড়াল দেখলে অকস্মাৎ পেত ভয়, কিংবা কোনো
পেঁচার আঁধার-চেরা ডাকে কেঁদে উঠত কখনো।
অথচ এখন তার বেয়নেট-বিদ্ধ শরীরের
লোভে ঝোপ থেকে ক্ষিপ্র বেরুচ্ছে শেয়াল। খোকা টের
পাচ্ছে নাকো কিছুতেই। কে জানত এমন অনড়
হয়ে যাবে এই রাঙা চঞ্চলতা? শূন্য সারা ঘর,
সারা গ্রাম, শক্ত মৃত্তিকায় শুধু সে রয়েছে প'ড়ে।
তার তো থাকার কথা সস্নেহ কবোষ্ণ মাতৃক্রোড়ে।

কতো মাই লাই

মাই লাই গ্রাম
তাকে চিনলাম
রক্তপাত আর নারকীয় ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। বারবার
মাই লাই জ্বলে দাউদাউ মগজের মানচিত্রে।
ঘরপোড়া মানুষের লাশ অবিরত
হানা দেয় চেতনার শোকার্ত পাড়ায়।
মাই লাই তার সব বাসিন্দা হারায়
হিংসার সংকেতে;
মৃত্যু কালো বৃষ্টির মতোন ঝরে ঘরে, মাঠে, ক্ষেতে।
মাই লাই গ্রাম
একটি শোণিতস্নাত, ভস্মমাখা নাম।
সেখানে খেলত শিশু বৃদ্ধ, গ্রাম্যজন
কাটাতেন অতীতের সুস্নিগ্ধ জাবর, অঘটন
ঘটলেও রাখতেন আস্থা ভবিষ্যতের ওপর।
পাখির টোপর
দেখে শিশু দিত করতালি, গ্রামবাসী
শ্যামল শান্তির ঘন ছায়ার প্রত্যাশী।
প্রণয়ে বিশ্বাস রেখে যুবক-যুবতী
ভুলেছিল জীবনের খুচরা কিছু ক্ষতি
নানাবিধ। শিশুরা উৎসবে চেয়ে কেক, পুতুলের ভেট
পেল আগুনের জ্বালা, অজস্র বুলেট,
বোমারু প্লেনের কত ঝাঁঝালো ধমক। ভাঙা পাত্র, টিন, ছাই,
চুলের রঙিন ফিতে, পোড়া মাংস, সেফ্‌টিপিন– এই-ই মাই লাই।

আজকাল যেদিকেই উদাস তাকাই,
বাংলাদেশে দাউদাউ কতো মাই লাই।

চোরকুঠরির বাসিন্দা

তার মগজের কোষে মধু নেই ঝরবে যা মৃদু ফোঁটা ফোঁটা
শহরের ঠোঁটে।
পায়ে তার স্পর্শ নেই নক্ষত্রের, দেখামাত্র চমকে ওঠার

মতো নয় কিছু, স্মার্ট সুমসৃণ, রজক-দুরস্ত
জামা গায়ে, পায়ে চোখা চকচকে জুতো–
প্রফুল্ল পড়শি বলে মনে হবে কিংবা কোনো সুদূর স্বজন।
প্রত্যহ কামায় দাড়ি, বাস স্টপে দাঁড়ায় কখনো,
কখনোবা ঘোরে বাণিজ্যিক এলাকায়, ট্যাক্সি চেপে
হাওয়া খায়, যায় সিনেমায়।

'এবার শহরে বেশ গোলাপ হয়েছে... ভদ্রলোক
আখের গুছিয়ে নিয়ে ধ্যানস্থ এখন ... মাড়ি ফুলে
গেছে ভায়া... মাতাহারি রমণীয় গোয়েন্দা ছিলেন...
সর্দি সারছে না কিছুতেই...'
এসব কথার মাছ কেলিরত তারও
মুখের পুকুরে।

কখনো সে স্বপ্ন দ্যাখে– অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
নিজে নেমে যায় ক্রমে। চোরকুঠরির শীতলতা
মজ্জায় প্রবেশ করে। দরজা, জানালা বন্ধ সবি;
গোলকধাঁধায় ঘোরে, ফ্যাকাশে মুখের
ভিড় চতুর্দিকে।

প'ড়ে যায় ঊর্ণাজালে, যেন সে বিপন্ন
মাছির চেয়েও ক্ষুদ্র, অসহায়। কখনো বিস্তর যাত্রাশেষে
পৌঁছে যায় ভুল ঠিকানায়, কখনোবা
ঘুমায় অস্পষ্ট কৌচে মেদুর চাদর মুড়ি দিয়ে।

তীক্ষ্ণ ছোরা তার বড় শোণিতপিপাসু আর তার
পিস্তল ধোঁয়ায় ঘন ঘন।
অথচ আবার সে-ও টববন্দি রজনীগন্ধার
চোখে রাখে চোখ,
কুকুরছানার মুখে দেয় পেতে সুখে
দুধের পাত্তর।

সফেদ পাঞ্জাবি

শিল্পী, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবিকা,

নিপুণ ক্যামেরাম্যান, অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানি,
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা-প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহাপ্লাবনের পর নুহের গভীর মুখ
সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি
উত্তুরে হাওয়ায় ওড়ে। বুক তাঁর দক্ষিণ বাংলার
শবাকীর্ণ হু-হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের
দৃশ্যাবলিময়; শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জনসমাবেশে
সখেদে দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ-খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।
সবাই দেখল চেনা পল্টন নিমেষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হয়ে যায়, ঝুলছে সবার কাঁধে লাশ
আমরা সবাই লাশ, বুঝিবা অত্যন্ত রাগী কোনো
ভৌতিক কৃষক নিজে সাধের আপনকার ক্ষেত
চকিতে করেছে ধ্বংস, প'ড়ে আছে নষ্ট শস্যকণা।

ঝাঁকা-মুটে, ভিখিরি, শ্রমিক, ছাত্র, সমাজসেবিকা,
শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, ফিরিঅলা, গোয়েন্দা, কেরানি,
সমস্ত দোকান-পাট, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রাফিক পুলিশ,
ধাবমান রিকশা, ট্যাক্সি, অতিকায় ডবল ডেকার,
কোমল ভ্যানিটি ব্যাগ আর ঐতিহাসিক কামান,
প্যান্ডেল, টেলিভিশন, ল্যাম্পপোস্ট, রেস্তোরাঁ, ফুটপাত
যাচ্ছে ভেসে, যাচ্ছে ভেসে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরে।
হায়, আজ একী মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী!

বল্লমের মতো ঝল্‌সে ওঠে তাঁর হাত বারবার
অতি দ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয়, মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবি,
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত বেআব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান।

পাশাপাশি

চুপচাপ ব'সে আছি শোভিত ড্রইংরুমে একা
এবং স্নানের ঘরে তুমি
শাওয়ারের নিচে নগ্ন। কব্জি-ঘড়িটার দিকে চোখ
বারবার রাখছি ব্যাকুল, আমি নিজের মনের
একপ্রস্থ খসখসে পোশাক খুলেই
সার্কাস দেখার মজা পেলাম পেল্লায়।

শো-কেসে গান্ধারা মুণ্ডু, জাপানি পুতুল, একজন
ব্রোঞ্জ মূর্তি, দেবী-টেবী হবে, হয়তোবা
মহেঞ্জোদারোর নটী কোনো।
কতদিন এইরূপ ছিমছাম পরিবেশে বসবার সুযোগ পাইনি।

হয়তো স্নানের ঘরে নিজেকে দেখছ অনাবৃতা,
জানালার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টিভেজা নর্তকীর মতো
গাছটিকে তীব্র দেখছিলাম তখন।
সাবানে ঘষছ তুমি বগলের সবুজাভ ভূমি
সরার মতন স্তন, নাভিমূল, উরু
এবং ত্রিকোণ মাংসপিণ্ড, কী মঞ্জুল।
আমি কাল সারা রাত জেগে লেখা কবিতার কিছু
অত্যন্ত বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর পংক্তি
তুমুল মার্জনা করে নিচ্ছিলাম মনের ভেতর।
যখন আঁটছো তুমি ব্রেসিয়ার, আমি
আমার দারুণ নগ্ন ইচ্ছাকে আবৃত
করার চেষ্টায় ক্লান্ত হচ্ছিলাম বড়।
যখন সুদীর্ঘ চুল বাঁধছিলে তুমি চূড়ো করে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর মধ্যে দ্রুত
ধবল চিরুনি চালাচ্ছিলাম কেবল।

তুমি এলে গুনগুনিয়ে, সারা ঘরে বিদেশী পারফিউম; বললে,
বলো তো কখন থেকে ব'সে আছ? তারপর
সোফায় বসলে চমৎকার, শাড়িতে সবুজ লতা,
খোঁপায় গোলাপ টকটকে, চলে হার্দিক সংলাপ; এরই মধ্যে
হঠাৎ পড়লে মনে, স্যান্ডেল বগলদাবা করে
বন্যার আবিল জল ঠেলে যেতে হবে, যেতে হবে বহুদূর।

দুঃসময়ে মুখোমুখি

বাচ্চু তুমি, বাচ্চু তুমি, চলে যাও, চলে যাও সেখানে
ছেচল্লিশ মাহুৎটুলীর খোলা ছাদে। আমি ব্যস্ত, বড় ব্যস্ত,
এখন তোমার সঙ্গে, তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মতন
একটুও সময় নেই। কেন তুই মিছেমিছি এখানে দাঁড়িয়ে
কষ্ট পাবি বল?

না, তোকে বসতে বলব না
কস্মিনকালেও,
তুই যা, চলে যা।
দেখছিস না আমার হাতে কত কাজ, দু'-ঘণ্টায় পাঠক-ঠকানো
নিপুণ সম্পাদকীয় লিখতেই হবে, তদুপরি
আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় দেশ-বিদেশের বহু চিঠির জবাব
এবং প্রুফের তাড়া নিত্য-নৈমিত্তিক
কবিতার সোনালি তাগিদ।
স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্যে কিছু ঘণ্টা
বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আমার সময় প্রতিদিন
সুমিষ্ট পিঠের মতো
ভাগ করে নিয়মিত খাচ্ছে হে সবাই।
তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মতন, বাচ্চু তুই
বল তো সময় কই? কতক্ষণ থাকবি দাঁড়িয়ে,
রাখবি ঝুলিয়ে ঠোঁটে দুষ্টু হাসি?
তুই তো নাছোড় ভারি, গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে
এক্ষুণি চলে যা
শরৎ চক্কোত্তি রোডে, ছেচল্লিশ মাহুৎটুলীর খোলা ছাদে।
চকোলেট দেব তোকে, দেব তালশাঁস,
তুই যা, চলে যা।
অবুঝ তুই না গেলে আমার সকল কাজ রইবে প'ড়ে।

পাশের বাড়ির তেজপাতা-রঙ বুড়িটার ঘরে
মাঘের সকালে
মায়ের কল্যাণী হাতে-বোনা হলদে সোয়েটার প'রে
যেতাম কিনতে পিঠা মোরগের ডাক-সচকিত
চাঁপা ভোরে, তোর মনে নেই?

মেহেরের সঙ্গে, নতুন মামির সঙ্গে নানির সাধের
আচারের বৈয়ম করেছি লুট দুপুর বেলায়,
তোর মনে নেই?
চকবাজারের ঘিঞ্জি গলির কিনারে
ম্যাজিকঅলার খেলা দেখেছি মোহন সন্ধেবেলা,
তোর মনে নেই?
মিছিলে নাদিরা ছিল, আমি তাকে দেখে চটপট
মিছিলের আলো নিতে হলাম আগ্রহী, চৌরাস্তায়
সুদিনের জন্যে ব্যগ্র দিলাম শ্লোগান অবিরাম,-
তোর মনে নেই?
আমিও সাঁকোর ধারে গোধূলি বেলায়, সঙ্গী পিতা।
চকিতে অদৃশ্যে সাঁকো, জায়গাটা ভীষণ ফাঁকা, খাঁ-খাঁ
মনে হল, যেমন অত্যন্ত শূন্য লাগে ক্যানভাস
চিত্রকর ফেললে মুছে ভুল ছবি তার।
চিকন দিগন্তে হাম্বা রব, বলুন তো পাড়াতলি কতদূর?
সঙ্গে তিনি, হেঁটে যেতে যেতে দিতেন ফুলের নাম বলে;
বলতেন ঐ যে ছোট্ট খরগোশ, অনেক দূরের বিল থেকে
সদ্য-আনা শিকারের বোঝাটা নামিয়ে
রঙবেরঙের পাখিগুলো
শনাক্ত করতে ভিন্ন ভিন্ন নামে কী যে মজা পেতেন শিকারি।
দীর্ঘকাল সত্যি আমি মসজিদে যাইনি, শৈশবে
বাজান যেতেন নিয়ে হাত ধরে মনে পড়ে। ইমামের সূরা
অবোধ্য ঠেকত বলে ঝাড়লণ্ঠনের
শোভা কিংবা দেয়ালে শোভন লতাপাতা, ঠাণ্ডা টালি
দেখে, হৌজে রঙিন মাছের খেলা দেখে
কাটত সময় মসজিদের, তোর মনে নেই?
কখনো ঝড়ের রাতে উথালপাথাল রাতে, ব্যাকুল বাজান
দিতেন আজান, যেন উদাত্ত সে স্বর রুখবেই
অমন দামাল ঝড়, বাঁচাবে থুত্থুড়ে ঘরবাড়ি- তোর মনে নেই?
কী বললি? এসেছিস দেখতে আমাকে?
এখন কেমন আছি? কত সুখে আছি? নাকি তুই
চতুর ছুতোয়
আমার ইন্টারভিউ নিতে চাস এতদিন পর?
চিঠির খামের গায়ে আমার নামের আগে 'জনাব' দেখে কি
তোর খুব পাচ্ছে হাসি? শোন,

আমি শামসুর রাহমান, মানে ভদ্রলোক, দিব্যি
ফিটফাট, ক্লিন গাল ব্লেডের কৃপায়
আর ধোপদুরস্ত পোশাকে
এখানে-সেখানে করি চলাফেরা বড় ঝলমলে
সামাজিকতায় ভরপুর,
কখনো উদাস ঘুরি চোরকুঠরিতে।
আমি শামসুর রাহমান, সাংবাদিক, ক্ষিপ্র ভাষ্যকার;
আমি শামসুর রাহমান, মানে কবি...
আইডিয়াভিযানে আমিও
কখনো সমুদ্রে ভাসি, পর্বতশিখরে আরোহণ
করি কখনোবা, পার হই রুক্ষ মরুভূমি, মেরুপথে পুঁতি
আপন নিশান।
একটি অদ্ভুত ঘোড়া আমাকে পায়ের নিচে দ'লে
চলে যায় দূরে তার কেশর দুলিয়ে,
কখনো শিকার করি, হরিণ শিকার করি ঘরে।
আমার অ্যানিমা স্বপ্নে সুদর্শনা হয়ে
আমাকে অনেক কাছে ডাকে মত্ত নদীর ওপারে। আমি তার
সান্নিধ্যের লোভে
আপ্রাণ সাঁতার কাটি। তীরে প্রেতভূমি, সুদর্শনা
অকস্মাৎ পেঁচা হয়ে উড়ে যায়। নদী পেরুনোর
শক্তি লুপ্ত, কেমন তলিয়ে যাই পরিণামহীন।
চিনতিস তুই যাকে, সে আমার মধ্য থেকে উঠে অন্তরালে
চলে গেছে। তুই বাচ্চু, তুই বড় ছেলেমানুষ, অবুঝ।
কী বললি? শামসুর রাহমান নামক ধূসর
ভদ্রলোকটির
সমান বয়সী তুই? তবে কোন ইন্দ্রজালে আজও
অমন সবুজ র'য়ে গেলি, র'য়ে গেলি এগারোয় হাঁ রে?
এই যে আমাকে দ্যাখ, ভালো করে দ্যাখ, দ্যাখ
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে–
আমার জুলফি সাদা দীর্ঘশ্বাসে ভরা, দন্তশূলে
প্রায়শ কাতর হই, চশমার পাওয়ার
দ্রুত যাচ্ছে বেড়ে...
এখন এই তো আমি, ব্যস্ত অবসন্ন, বিশ্রামের
নেই মহলত।
উজার মাইফেলের প্রেত ঘুরি হা-হা বারান্দায়।

এখন আমিও খুব সহজে ঠকাতে পারি, বন্ধুর নিন্দায়
জোর মেতে উঠতে লাগে না দু-মিনিটও; কখনোবা
আত্মীয়ের মৃত্যুকামনায় কাটে বেলা, পরস্ত্রীর
স্তনে মুখ রাখার সময় বেমালুম ভুলে থাকি
গৃহিণীকে। আমাকে ভীষণ ঘেন্না করছিস, না রে?
এখন এই তো আমি। চিনতিস তুই যাকে সে আমার
মধ্য থেকে উঠে
বিষম সুদূর ধু-ধু অন্তরালে চলে গেছে। তুইও যা, চলে যা।

এক ধরনের অহংকার

প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৮১ | জানুয়ারি ১৯৭৫
প্রকাশক বইঘর, চট্টগ্রাম
প্রচ্ছদ-শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী
উৎসর্গ-পত্র আবু সয়ীদ আইয়ুব
শ্রদ্ধাস্পদেষু

এক ধরনের অহংকার

এখনও দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার এক ধরনের অহংকার।
বেজায় টলছে মাথা, পায়ের তলায় মাটি সারাদিনমান
পলায়নপর,
হাঁ-হাঁ গোরস্থান ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না
আপাতত, তবু ঠিক রয়েছি দাঁড়িয়ে
প্রখর হাওয়ায় মুখ রেখে।
অত্যন্ত জরুরি কোনো আবহাওয়া ঘোষণার মতো
দশদিক রটাচ্ছে কেবলি : হাড়ে ঘাস
গজাতে গজাতে
বুকে হিম নিয়ে তুমি বড় নির্বান্ধব, বড় একা হয়ে যাচ্ছ।
আমার ভূভাগ থেকে আমাকে উৎখাত করবার জন্যে কতো
পাই পেয়াদা

আসছে চৌদিক থেকে, ওরা তড়িঘড়ি
আমার স্বপ্নের
বেবাক স্থাবর-অস্থাবর
সম্পত্তি করবে ক্রোক, কেউ কেউ ডাকছে নিলাম
তারস্বরে, কিন্তু আমি উপদ্রুত কৃষকের মতো
এখনও দাঁড়িয়ে আছি চালে,
ছাড়ছি নে জলমগ্ন ভিটে।

আমার বিরুদ্ধে সুখ সারাক্ষণ লাগায় পোস্টার
দেয়ালে দেয়ালে,
আমার বিরুদ্ধে আশা ইস্তাহার বিলি করে অলিতে-গলিতে,
আমার বিরুদ্ধে শান্তি করে সত্যাগ্রহ,
আমার ভেতর ক্ষয় দিয়েছে উড়িয়ে হাড় আর
করোটি-চিহ্নিত তার অসিত পতাকা।

আমার জনক এত ব্যর্থতার শব আজীবন বয়েছেন
কাঁধে, বঞ্চনার মায়াবী হরিণ তাঁকে এত বেশি
ঘুরিয়েছে পথে ও বিপথে, আত্মহত্যা করবার
কথা ছিল তাঁর, কিন্তু তিনি যেন সেই অশ্বারোহী
জিনচ্যুত হয়েও যে ঘোড়ার কেশর ধরে ঝুলে থাকে জেদী,
দাঁতে দাঁত ঘষে।

আমার জননী এত বেশি দুঃখ সয়েছেন, এত বেশি
ছেঁড়াখোঁড়া স্বপ্নের প্রাচীন কাঁথা করেছেন সেলাই নিভৃতে,
দেখেছেন এত বেশি লাল ঘোড়া পাড়ায় পাড়ায়,
এতবার স্বপ্নে, জাগরণে
ভূমিকম্পে উঠেছেন কেঁপে, তার ভয়ানক কোনো মাথার অসুখ
হওয়া ছিল স্বাভাবিক; কিন্তু ঘোর উন্মত্ততা তাঁর
পাশাপাশি থেকেও কখনো তাঁকে স্বাভাবিকতার
ভাস্বর রেহেল থেকে পারেনি সরাতে একচুলও।

বুঝি তাই দুঃসময়ে আমার আপন শিরা-উপশিরা জেদী
অশ্বক্ষুরে প্রতিধ্বনিময়। সেদিকেই বাড়াই না পদযুগ,
কোনো দিন কোনো
গন্তব্যে পৌঁছুতে পারব না। আমি সেই অভিযান-
প্রিয় লোক, যার পদচ্ছাপ মরুভূমি ধরে রাখে
ক্ষণকাল যার আর্ত উদাস কংকাল থাকে প'ড়ে
বালির ওপর অসহায়, অথচ কাছেই হৃদ্য মরূদ্যান।

কী-যে হয়, একবার রক্তস্রোতে অন্যবার পূর্ণাঙ্গ জ্যোৎস্নায়
ভেবে যায় হৃদয় আমার। যেদিকে বাড়াই হাত
সেদিকেই নামে ধস, প্রসারিত হাতগুলো তলহীন গহ্বরে হারায়
আর আমি নিজে যেন পৌরাণিক জন্তুর বিশাল
পিঠের ওপর একা রয়েছি দাঁড়িয়ে; চতুষ্পার্শে
অবিরাল যাচ্ছে বয়ে লাভাস্রোতে, কম্পমান ভূমি,
প্রলয়ে হইনি পলাতক,
নিজস্ব ভূভাগে একরোখা
এখনও দাঁড়িয়ে আছি, এ আমার এক ধরনের অহংকার।

শত্রু

বস্তুত তাদেরই একজন আমি যারা মধ্যরাতে
অভ্যাসবশত
একাকী ঘুমন্ত হাঁটে বারান্দায়, ছাদের কিনারে
ভীষণ বিপজ্জনকভাবে চলে গিয়েও আবার ফিরে আসে
স্বকীয় নিঃসঙ্গতায়। দরজা ককিয়ে উঠলেই
আমি মেরুমণ্ডলের কেউ; অকস্মাৎ কী একটা চোখে পড়ে, ছমছমে কিছু,

রোমকূপগুলো কদম রেণুর মতো হয়ে যায়।

বারান্দায় ছায়াচ্ছন্ন কোণে, ভাবি, কেউ
ওৎ পেতে নেই তো আবার?
ভোজালি উঁচিয়ে কেউ আসছে কি দেয়াল টপকে?
বারংবার মনে হয় শুধু :
ঘরে যেন কার রাগী নিঃশ্বাস বিষম হিসহিস
করে সারাক্ষণ। কালো রাজা শবের ওপর ব'সে
বিষণ্ন করছে পান প্রাচীন কারণ; সে কি এতেবারের কাবিল?

না, পথে যাবো না, গেলে শরীরে প্রচুর অস্ত্রাঘাত
নিয়ে ফিরতে হবে কিংবা মর্গে হবে ঠাঁই।
কী করি? কী করি?
চতুর্দিকে সমমুখো অরি, তবে কোন দিকে যাই?

কে আমার শত্রু বোঝা দায়; কাছে দূরে, সবাইকে
শত্রুতায় অত্যন্ত তুখোড় মনে হয়। পড়শির
সঙ্গে দেখা হলে তাকে জানাই না হেসে অভিবাদন কখনো।
এমনকি সুহৃদের হাতেও, আমার কী-যে হয়, সুতীক্ষ্ণ কিরিচ
ঝলসে উঠতে দেখি ছায়ানাট্যে, দেখি,

সে আমার খণ্ড খণ্ড হৃৎপিণ্ডের শোভা দেখে তোফা
মেতে ওঠে জয়োল্লাসে। নাকি যার চোখের পাতায়
ভুরুর সাঁকোয় বাঁচি, দুলে উঠি তন্বী বুকের স্পন্দনে, যার
পদধ্বনি শিরায় জোয়ার আনে ফসফরাসের,
আমার চরম শত্রু সে-ই?

যে আমার টুঁটি চেপে ধরে অ্যালসেশিয়ানের মতো
পুরোনো আক্রোশে, যে আমার বুকে কিরিচ ঠেকিয়ে
দেয়ালের দিকে নিয়ে যায় বার-বার, যার মত্ত আচরণে
সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাই, সে-ই তো আমার শত্রু, সবচেয়ে
ক্রূর শত্রু, ধাম যা-ই হোক, নাম তার শামসুর রাহমান।

স্বীকারোক্তি

উত্তরচল্লিশ আমি; পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি কিংবা
তারও কম উচ্চতা আমার। চুলের শ্বেত পতাকার

কী বাহার ইদানীং, নানান ব্যাধির গলাগলি
এ শরীরে এবং আয়ুর ভেলা নিত্য কম্পমান।

তা'বলে ছাড়িনি হাল, নৈরাশ্যের পংক্তি অনর্গল
করি না আবৃত্তি যত্রতত্র; বরং চরম রৌদ্রে
অকুণ্ঠ বেরিয়ে পড়ি বার বার, নিজেকে জড়াই
উদার অমিত্রাক্ষরে জীবনের, কড়ি ও কোমলে।

যখন বাড়ায় ঠোঁট নিঃসঙ্গতা, আমিও চুম্বন
করি তাকে, নিই শুষে অবিরাম অস্তিত্বের রুক্ষ
প্রান্তরের প্রতিধ্বনিগুলি। অগোচরে অনুভূতি
শেফালির মতো ভেজে গোপন শিশিরে চিরদিন।

লুকিয়ে কী লাভ আর? প্রায়শ ভাঁড়ারে পড়ে টান,
অথচ স্বপ্নের নকশি পিঠে প্রত্যহ আহার করি।
কবিত্বের উৎসে দোলে স্বপ্ন কিবা দুঃস্বপ্নের ছায়া,
সুখের পাখির ডাক শুনি শুয়ে দুঃখের ছায়ায়।
নিজেই অবাক মানি আজকাল, কী নির্লজ্জ আমি।
জনসমক্ষেই তুলি আমার মনের চিটচিটে
খুশ্‌কি ইতস্তত আর ব্যক্তিগত রাখি না কিছুই–
দিয়েছি প্রকাশ্যে মেলে অন্তর্গত সব ডালপালা।
আমার প্রিয়ার চোখ, চুল, বুক, হৃৎস্পন্দনের
ঢেউ পরিচিত অনেকের কাছে আমারই কৃপায়।
নিজেকে রেখেছি নগ্ন করে সাধারণ্যে আজীবন,
বিনিময়ে লভ্য কিছু খ্যাতি আর মুদ্রা কতিপয়।

এ-ও তো বাংলাই এক

এ-ও তো বাংলাই এক, তোমার ধ্যানের বাংলাদেশ
হোক বা না হোক; আজও এখানে এ-বাটে দৈনন্দিন
চলে আনাগোনা নানা পথিকের, মাঠে বীজ বোনে
ধান কাটে কর্মিষ্ঠ কৃষক আর মাঝি টানে দাঁড়।
অবশ্য নিরন্ন মনমরা রাখালের দল ভাঙা
বাঁশি ফেলে, দিগন্তের হাম্বারব থেকে খুব দূরে
সহসা শহরে ছোটে কারখানার ভেঁপুর মায়ায়।

দুঃস্বপ্নে বাঁচাই সার, অগণিত অজ্ঞাত করুণ

কংকালে শিউলি ঝরে। দেশব্যাপী লুটেরা জোচ্চোর
স্ফূর্তিতে বিহ্বল; কেউ কেউ ওরা ভাটিয়ালী গায়,
অনেকে ট্যাঙোর তালে কোমর দোলায়, কখনোবা
চাঁটি মারে পরস্পর, স্বদেশী বর্গীরা দেয় হানা
পাড়ায় পাড়ায়, কখন যে কার থলে থেকে, হায়,
বেড়াল বেরিয়ে পড়ে আচমকা। বস্তুত এখানে
জন্মান্ধেরা পথপ্রদর্শক এবং নির্বোধ যারা
তারা দ্রুত ধাবমান যতত্র বাধাবন্ধহীন
আর যারা মেধায় মননে ধনী, আড়ালেই ফোটে
তাদের স্বস্তির ফুল; মনে নিয়ে অনাস্থার কাঁটা
খোঁজেন বাঁচার মানে কীর্কেগার্ড অথবা মার্ক্সের
পুঁথির পাতায় কিংবা কাফকার জগতে কখনো।

অথচ আস্থার শান্তিনিকেতনে ছিলে তুমি কবি,
বিশ্বাসের বিশ্ব ছিল নিজস্ব তোমার। কোনো কোনো
মুহূর্তে হঠাৎ সেই ভূমি কেঁপে উঠলেও তুমি
সুস্থ মননের সব ভূদৃশ্যের ছিলে অধীশ্বর।

এবং শিল্পের ঘাটে দিয়েছ ভাসিয়ে কতদিন
বহুধা বিরোধ আর ইস্তিপত্রে স্বপ্নের নতুন
জমিজমা গেছ লিখে বংশধরদের নামে আর
তোমারই দাক্ষিণ্যে ব্যাপ্ত আমাদের নান্দনিক সীমা।

সবই তো বেসুরো বাজে আজকাল, অথচ তোমার
গানের অজস্র জলে যোজন যোজন রুক্ষ ভূমি
হয়ে যায় নিমেষেই গোলাপ বাগান আর রুগ্ন
মজা নদী ফিরে পায় তরঙ্গিত তুমুল যৌবন।

বাংলার আকাশ তুমি, তুমি বনরাজি, সমুদ্রের
নির্জন সৈকত তুমি অন্তহীন, তুমি বাউলের
বিজন গৈরিক পথ, গৃহস্থের মুখর প্রাঙ্গণ,
আমাদের ষড়ঋতু তুমি, তুমি বাংলার প্রান্তর।
কী পুণ্য স্তব্ধতা তুমি মানবিক, তুমি রাগমালা;
তুমি তীর ছেড়ে দূরে যাওয়া, তুমিই প্রত্যাবর্তন।

বুদ্ধদেব বসুর প্রতি

বারবার স্বেচ্ছাচারী জ্যোৎস্না কেটে গিয়েছেন হেঁটে
সম্পূর্ণ একাকী, সঙ্গী মুক্তবোধ। চোখে নাগরিক
দৃশ্যাবলি গেঁথে নস্টালজিয়ায় মেদুর গলায়
কবিতার ডাকনাম ধরে ডেকেছেন কী ব্যাকুল।

জলের গভীরে ব্যালে উজ্জ্বল মাছের, দেখে দেখে
কেটেছে অনেক বেলা আপনার। সে-ও এক খেলা,
যা' নেয় গোপনে শুষে মেদমজ্জা, জীবনের মধু।
জলের ঈষৎ নড়া অথবা ফাৎনার ডুব দেখে

বুক করত ধুক পুক। জল ভাগ করে আচমকা
কখনো গিয়েছে বেঁকে ছিপ মধ্যরাতে, তুলেছেন
কত মাছ একান্ত শিল্পিত প্রক্রিয়ায়; মেরুদণ্ডে
গিয়েছে শিরশিরে স্রোত বয়ে অগোচরে কখনোবা।

সহসা আপনাকেই নিল গেঁথে অদৃশ্য বড়শিতে
আরেক খেলায় মেতে অন্য একজন, কায়াহীন,
অথচ কী শঠ, ভয়ংকর। যখন লুকিয়ে ছিল
সে অদূরে বারান্দায় কিংবা বাথরুমে অন্ধকারে,

তখন না-লেখা কবিতার পংক্তিমালা আপনাকে
ঘিরে ধরেছিল বুঝি জোনাকির মতো, হয়তোবা
লন্ড্রির রঙিন মেমো, কবিতার পাণ্ডুলিপি বুকে
করছিল গলাগলি নাকি সুধীন্দ্রনাথের স্মৃতি
অকস্মাৎ জেগে উঠেছিল দীপ্র, যেমন ঢেউয়ের
অন্তরালে দ্বীপ, হয়তো অসমাপ্ত বাক্য সে মুহূর্তে
মগজের কোষে কোষে হয়েছে মায়াবী প্রতিধ্বনি।
শব্দেই আমরা বাঁচি এবং শব্দের মৃগয়ায়

আপনি শিখিয়েছেন পরিশ্রমী হতে অবিরাম।
অফলা সময় আসে সকলেরই মাঝে মাঝে, তাই
থাকি অপেক্ষায় সর্বক্ষণ। যতই যাই না কেন দূরে
অচেনা স্রোতের টানে ভাসিয়ে আমার জলযান,

হাতে রাখি আপনার কম্পাসের কাঁটা; ঝড়ে চার্ট
কখন গিয়েছে উড়ে, চুলে চোখে-মুখে রুক্ষ নুন,

অস্পষ্ট দিগন্তে দেখি বৌদ্ধ মুখ। আপনার ঋণ
যেন জন্মদাগ, কিছুতেই মুছবে না কোনো দিন।

নিদ্রাতুর আঙুলের ফাঁক থেকে কখনো হঠাৎ
সিগারেট খ'সে গেলে চম্‌কে উঠে দেখি মধ্যরাতে–
স্মৃতির মতন এক অনুপম স্বপ্নিল বারান্দা
থাকে পড়ে অতরালে অন্তহীন, কবি নেই তার।

আমি চাই আজ

আমার গলার অন্ধকারের পর্দাটা ফুঁড়ে
বেরিয়ে আসছে কথার রৌদ্র কয়েক ঝলক।
সেই রোদ্দুর হয়ে যায় ফের গিটারের সুর,
গিটারের সুরে ভেসে ওঠো তুমি আড়ালে আমার
আত্মার হ্রদে, যেন একরাশ গোলাপ-পাপড়ি।
আমার বাসনা যাত্রা করেছে তোমার দিকেই।

অলক্ষ্যে কবে হৃদয়ে আমার ফুটল চকিতে
প্রেমের মাতৃভাষা অপরূপ। আমার স্বপ্ন
ঘুমায় তোমার চোখের পাতায়, স্তনের ছায়ায়।
কৃষক যেমন নিজস্ব ক্ষেত দ্যাখে অপলক,
রমণী আমার, তেমনি তোমাকে দেখি বারবার।
আমার মাটিতে তুমিই সোনালি ফসলের শীষ।
তোমার শরীরে আনন্দ বুঝি পেয়েছে নিবাস,
অথচ বিষাদ চোখের দু'কূলে যায় বয়ে যায়।
পাখির মতন ঠোকরাতে চাই তোমার সুহাস
শরীরের ফল এবং আমার আঙুলের ছোঁয়া
লাগল তোমার নিবিড় সত্তা কড়ি ও কোমলে
নিশ্চিত হবে মুখর বাদ্যযন্ত্রের মতো।

তুমি তো আমার সতেজ সকাল, তুমিই আমার
দিনান্ত বেলা। তুমি যে আমার অমাবস্যার
গোপন আঁধার, তুমিই আমার রাঙা পূর্ণিমা।
তুমিই আমার মরীচিকা আর তুমিই আমার
মরূদ্যানের সুশীতল শোভা; তুমিই আমার

অকূল তৃষ্ণা, তুমিই আমার তৃষ্ণার জল।

পথের মতন তোমার শাড়ির পাড়ের জন্যে,
তোমার ব্লাউজ, তোমার কানের দুলের জন্যে,
তোমার চোখের পাতার জন্যে, ফুল-ঝলসিত
খোঁপার জন্যে আমি চাই আজ নিটোল শান্তি।
তোমার চলার পথের জন্যে, তোমার হাঁটার
ছন্দের আর ব'সে থাকবার ভঙ্গির জন্যে,
নীরবে তোমার জেগে থাকা আর স্বপ্নে-ভরাট
ঘুমের জন্যে আমি চাই আজ নিটোল শান্তি।
তোমার কণ্ঠস্বরের জন্যে, হাসির জন্যে,
এ-ঘরে তোমার আসার জন্যে, নিরাপদে দূরে
যাওয়ার জন্যে আমি চাই আজ নিটোল শান্তি।
তোমার গহন নৈঃসঙ্গ্যের জন্যে এবং
ঘরের ভেতর গোধূলির মেঘ, অকাল জ্যোৎস্না
এবং গহন বৃষ্টি নামানো তোমার অমন
গানের জন্যে আমি চাই আজ নিটোল শান্তি।

হে সুদীপ্তা মোহিনী আমার

কী করে তোমাকে ভুলি? সৌন্দর্যের মতো আছ ব্যেপে
হৃদয়ে আমার।
আমার মন্ময় ঘরে দেখি
তোমার চকিত চাওয়া, হাত নাড়া, হাঁটুতে থুতনি রেখে একা
ব'সে-থাকা, ভাসমান মনখারাপের মেঘমালা
এদিক ওদিক।
তোমার চুলের কালো উদ্দাম প্রান্তরে স্বপ্নবৎ
রৌদ্র আর ছায়ার জেব্রারা ছোটে অবিরাম, দেখি,
সুখের যৌবন ছুঁয়ে ব'সে আছ বিষাদের সঘন শৈশবে।

কখনো নদীর বাঁকে, বনে, দ্বীপে, কখনো পাহাড়ে,
কখনো বা কার্পেটের মতন উপত্যকায় খুঁজেছি তোমার
নিভৃত দৈহিক রেখা। দেখেছি পাথরে, বাদ্যযন্ত্রে
অকস্মাৎ তোমারই প্রতিমা।
পাখি, মাছ কিংবা সুপুরির গাছ, সারি সারি, চোখে

পড়লেই মনে পড়ে তোমার সত্তার দৃশ্যাবলি,
স্বদেশের মুখ আর তোমার সজীব প্রতিকৃতি
অভিন্ন জেনেছি।
স্বদেশে আমার প্রিয়জনদের কেউ কেউ পাগলাগারদে
এখন বইয়ে দিচ্ছে বেলা এলোমেলো
চুলে বিলি কেটে,
নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলে আঙুলের ফাঁকে
ওরা সূর্যোদয় দেখে ওঠে, কেউ কেউ কয়েদখানায়
ব'সে সূর্যাস্তের রঙে দ্যাখে ডুবছে শৌখিন খাট।
তোমার জন্যেই
আমাকে গাইতে হবে গান আজও আগেকার মতো,
করতে হবে জড়ো কবিতার জাগর ভগ্নাংশগুলো,
যেমন প্লাবন চলে গেলে কৃষক কুড়িয়ে নেয় শস্যকণা তার।
তোমার জন্যেই
দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ঘরের চৌকাঠ ধরে এই অবেলায়।

যেমন ক্ষুধার্ত লোক চায় ঈষদুষ্ণ স্বাদু রুটি,
যেমন নিঃসঙ্গ অন্ধ চায় চোখের পবিত্র জ্যোতি,
যেমন বিচ্ছিন্ন পাখি চায় মৃতা পক্ষিণীর প্রাণ,
যেমন কর্মিষ্ঠ হাত চায় কাজ প্রহরে প্রহরে,
যেমন বিদেশী চায় পরবাসে নিষ্কণ্টক একটি আশ্রয়,
যেমন বিধ্বস্ত রণক্ষেত্রে ক্লান্ত বিবর্ণ সৈনিক চায় শান্তি,
যেমন ভরাট কোনো স্বপ্ন চায় অনিদ্রার রোগী,
যেমন সাধক চায় সর্বক্ষণ ধ্যানের মুহূর্ত,
আমিও তোমাকে তেম্নি চাই
হে সুদীপ্তা মোহিনী আমার।

তুমি যে আমার অলংকৃত কারাগার
এবং তুমিই
আমার রৌদ্রের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় এক অবাধ প্রান্তর।

নিঃস্ব কৃষক যেমন

কখনো নিশ্চিন্ত থাকি, ভুলে থাকি; হঠাৎ আবার
বুকের ভেতর কাঁপে চৈত্রের দুপুর, হৃদয়ের

অন্তহীন পথে ক্রমাগত গলে পিচ; খড়কুটো,
পশুর কংকাল থাকে পড়ে ইতস্তত। ধূমায়িত
নির্দয় সে-পথে তুমি ধু-ধু মরীচিকার মতন
বার বার দেখা দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যাও দ্রুত।

আমার চিৎকার তুমি শুনতে কি পাওনি এখনও?
অথচ তোমাকে দেখি আশেপাশে, দেখি দূর থেকে
ঘরময় নারী-পুরুষের চক্রে, কখনো তাকাও, চোখে
রহস্যের ভাষা হয় ঘন, কখনোবা নৈঃশব্দের
বুক তোলপাড় করে তোলো দীপ্র হাসির সরোদে।
তোমার বিচ্ছেদে হচ্ছে খরশান শরীর আমার।

মনেরই ব্যাপার প্রেম, জানি; কিন্তু এমন আঁধার
ব্যাপ্ত অস্তিত্বের তটে যার ঘূর্ণাবর্তে জন্ম নেয়
অজস্র নক্ষত্রপুঞ্জ, আজও কী প্রবল তার দাবি।
একটি ফসল থেকে অন্য ফসল অবধি নিঃস্ব
কৃষক যেমন টিকে থাকে, একটি মিলন থেকে
অন্য মিলনের ক্ষুব্ধ তৃষিত সীমায় তেমনি আমি।

বিন্যাসের সপক্ষে

তোমার মতোই আমি বিন্যাসের সপক্ষে এখনও।
মানুষের স্বরচিত মূর্তি, খিলানের কারুকাজ
কিংবা কোনো গাঢ় চতুর্দশপদী– যা কিছু প্রসূন
ঐকান্তিক বিন্যাসের আমার আনন্দ তাতে আজও
অবাধ অটুট; কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক কিছুই
অবিন্যস্ত হয়ে যায়, অকস্মাৎ এলোমেলো।

মানুষ সঙ্গমকালে বিস্মৃতি লালন করে বুঝি
অগোচরে সারাক্ষণ। বেশবাস প'ড়ে থাকে কোণে,
অগোছাল, সুস্মিত সুগোল টিপ অলক্ষ্যে কখন
কপালে ছড়িয়ে যায়। বুকে, নাভিমূলে, থুতনিতে
অথবা গ্রীবায় লেগে থাকে থরো থরো চুম্বনের
ম্যাজেন্টা স্বাক্ষর, সেই দাগ ক্রমান্বয়ে নীল হয়,
তবে কি মানুষ ওষ্ঠে পুষে রাখে বিষ অন্তরালে?

সংগমের কাল শেষ হলে আমরা দুজন একা

দু'দিকে বিচ্ছিন্ন প'ড়ে থাকি, অবিন্যস্ত, যেন তীব্র
বিস্ফোরণ হেতু দ্বিখণ্ডিত একটি প্রধান সেতু।
অথচ কেমন সুবিন্যস্ত রয় আমাদের প্রেম।

সুরের আড়ালে

আমার ক'জন নিত্য জুটে যাই নিঃসঙ্গে প্রাণের
হু হু টানে কোথাও না কোথাও, যেমন ক'টি নদী
মেশে মোহনায়। কথা বলা, খুব রাত্তির অবধি
চাঁদার চায়ের পাট চলে যথারীতি, কখনোবা
নৈঃশব্দ ফলের মতো পেকে ওঠে, কখনো গানের
গুঞ্জনে রূপান্তরিত ঘর, কী রহস্যময় শোভা।
নিপুণ গায়ক নয় বন্ধু, তবু মাঝে মাঝে তার
হৃদয়ের অত্যন্ত নির্জন কূপ থেকে উঠে আসে

সুর, হাঁস-শাবকের অপটু ওড়ার মতো, আর
আমরা প্রবেশ করি যে যার ভেতরে অগোচরে।
বন্ধুর গলায় সুর নর্তকীর ভঙ্গিমায় ভাসে
যেন, কখনোবা তালভঙ্গ হয়, কিন্তু সেই ঘরে
সুরের আড়ালে জেগে ওঠে সুদূরতা, দুঃখ শোক–,
ছাওয়া দৃশ্যাবলি, কারো চুলে, একা-বসে-থাকা, চোখ।

তার চোখে আমি

লোকটার চোখে চোখ পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই জেনে গেলাম
কোথায় সুখের ধাম
জানে না সে আর তার কাছে
যারা দেবে ধরা তিন ভাগ কালো জলের মতোই দুঃখ আছে
তাদেরও কপালে সুনিশ্চিত।
দরজা-জানালা যার হতচ্ছাড়া, যার ভিত
খুবই নড়বড়ে,
এক যুগ আগে তপ্ত অনুরাগে আমি তো স্বেচ্ছায় রেখেছি পা সেই ঘরে।
এতকাল পরেও সে দুর্বোধ পুঁথির মতো
রয়ে গেছে আমার নিকট। অবিরত

পাঠ করে কখনো সখনো মনে হয়, হয়তোবা
উদ্ধার করেছি লিপি; পরমুহূর্তেই আরে তোবা
অবলীলাক্রমে সে লেখন হয়ে যায় দুঃস্বপ্নের
হিজিবিজি এবং সে নিজে কী রত্নের
আশায় কাটায় কাল গ্রন্থ হাতে রাত্রিদিন। থাকে সর্বক্ষণ
এভাবে, স্বগৃহ যেন পান্থশালা, মনের মতন
ঠাঁই মানে প্রকৃত গন্তব্য তার অন্যত্র কোথাও।
কখনও আমার প্রতি মনোযোগী অতিশয়, প্রায়-প্রেম, তা-ও
মনে হয়, সত্তায় মাখিয়ে দেয়; কখনো নিস্পৃহ উদাসীন।
যখন সে দস্যুতায় প্রবল জড়িয়ে ধরে, জিভ দিয়ে জিভ ছোঁয়, রিন-
ঝিন বাজে শিরা-উপশিরা, রুপালি তরঙ্গ হয়ে
এক ঝাঁক হাঁস ওড়ে মগজে আমার। কী করে যে, হায়, ক্ষয়ে
যায় সে মুহূর্তগুলো
অতি দ্রুত, স্বর্ণরেণু চকিতে বদলে হয় মুঠো মুঠো ধুলো।

কোনো কোনো মধ্যরাতে জেগে দেখি, আমার যুগল
ঊরুর একান্ত মোহনায় মুখ গুঁজে রয়েছে সে, ছলচ্ছল
নড়ে উঠলেই আমি, চেপে ধরে স্তন; জিভ তার,
যেন মাছ, মারে ঘাই, কী-যে ঘেন্না লাগত আমার
প্রথম প্রথম। আজ উপভোগই করি, বলা যায়, যথারীতি।
শরীরে আলোর মতো অন্য শরীরের গলে যাওয়া, এ বিস্মৃতি
অনুপম, এ বিলয়, একেই কি বলে ঠিক ঠিক
ভালবাসা? আমি এতই কি অন্তরঙ্গ তার বাস্তবিক?
অথচ যখন দেখি তাকে সুখে তন্ময় ফুঁকতে সিগারেট,
জ্বলন্ত সে বস্তুটিকে মনে হয়, আমার চেয়েও বেশি অন্তরঙ্গ তার।
মাথা হেঁট করি সে মুহূর্তে নিরুপায়। কখনও সে ঘরময়
করে পায়চারি, কখনোবা নিজস্ব অলিন্দে আর সকল সময়
ঠোঁট কাঁপে তার, যেন প্রজাপতি হয়ে উড়ে যাবে
ঘাসের ডগায়; কী-যে আওড়ায় মনে মনে, জ্বলন্ত সদ্ভাবে
টেনে নেয় খাত, লেখে টেবিলে অত্যন্ত ঝুঁকে, বুঝি
সদ্য কোনো ডাইনী করেছে ভর, যার হাতে পরমায়ু-পুঁজি
করেছে স্বেচ্ছায় সমর্পণ, যার ডাকে
সংসার কুটোর মতো ভাসে; বীণাপাণি তার বাহুলগ্ন থাকে
দেখে লক্ষ্মীঠাকরুন দুয়ার থেকেই ফিরে যান।
আমি তো ফেরাতে চাই তাকে, চাই এখনও আপ্রাণ।

কিস্তি জোগায় না বলে বীমার কাগজ এই নিয়ে কতবার
হল অর্থহীন, কিন্তু আবার গুছিয়ে আনে, দায়িত্বে ভার
নামায় সত্বর, যেন এক্ষুণি কোথাও যেতে হবে,
নইলে ফেল করবে শেষ ট্রেন। অন্তর্গত কলরবে
অকস্মাৎ সেতারের তার ছেঁড়ার মতোই হয়ে যায় ফের সব
উল্টা-পাল্টা; গোরস্থানে বসে শুধু দেখে যাব উদ্ভট উৎসব?

কখনো বিকেলে সেজেগুঁজে ওর পাশে এসে
দাঁড়ালে সে হেসে
'শাড়িটা তোমাকে দিব্যি মানিয়েছে', এ মামুলি কথাটাও তার
ঠোঁট থেকে ভুলক্রমে দেয় না ঝরিয়ে, বলে নাকো 'কী বাহার
তোমার খোঁপার', অথচ আমাকে আমুল ছিনিয়ে
এনে কাজ থেকে বলে, 'দ্যাখো, কী সুন্দর দুটি পাখি খুশি নিয়ে
এসেছে উঠোনে আমাদের।' আমি পাখি নয়, তাকে
দেখি এই জীবনের অগ্নিশুদ্ধ অখ্যাত বৈশাখে।

আমার লাব্যণ্য চুরি করে
পাঁচটি সন্তান বড় হচ্ছে কেবলি হোঁচট খেয়ে রুক্ষ পাথরে পাথরে।

এ কেমন মানুষ বুঝি না, রক্তে কী-যে শরারতি
করে তার শিরায় শিরায় মাঝেমধ্যে আর রতি
অকস্মাৎ চোখে আনে রত্নের ঝলক, সে আমার সামনেই
অন্য মহিলাকে হানে কুকুর-নজর, ভেজা সেই
দৃষ্টি অপমান করে বস্তুত আমাকে বার-বার।

পেছনে অস্পষ্ট রেখে স্বপ্নের খামার
কোনো কোনো ভোরে
সঙ্গমস্পৃহায় কাতর সে স্তনে, আমার কোমরে
রাখে হাত এবং দুর্গন্ধময় মুখ চেপে ধরে মুখে,
আমি সহ্য করি শুধু নাকি মুহূর্তের স্পর্শসুখে
ভালবেসে ফেলি তাকে চরম ঘেন্নায়?
বাসি বিছানায়
যখন কুঁকড়ে পড়ে থাকে, বড় মায়া হয়, ভাবি–
আমার সকল ওম দিই তাকে, আছে তার দাবি।

পাশাপাশি শুতে হয়, এটাই তো রীতি চিরদিন;
আমাকে জড়িয়ে ধরে হয়তো সে দিকচিহ্নহীন

কেমন অদৃশ্য পথে ঘোরে ঘুমঘোরে, ভাবে অন্য
কারো কথা, হয়তো আবৃত্তি করে কারুর শরীর। আমিও কি অতি বন্য
স্বপ্নের ঝালর নিয়ে চোখে হু হু শূন্যতায় শুনি আর কারো
পদধ্বনি? তখন দেখলে কেউ আমাদের বলবে, প্রগাঢ়
ছাপ নিয়ে রহস্যের খাটে প'ড়ে আছ দুটি মৃতদেহ। এমন কন্দর
আড়ালেই থাক; আমি তো বেহুলা নই, সে-ও নয় লখিন্দর।

অমলের মতো

অমলের মতো জানালার ওপারের দৃশ্যাবলি
অক্লেশে মুখস্থ রেখে আজও চাই আমার ঘুমিয়ে
পড়ার আগেই সুধা ফুল নিয়ে আসুক এখানে,
স্বপ্নস্থিত প্রচেষ্টায়। সে আসুক। আমার একান্ত
স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার সমানবয়সী সুধা আর
আমার দুঃখের সখী, সুখের নির্ভুল সহচরী।

যে কোন উদ্যানে সুধা কুড়াতে গিয়েছে ফুল? দাও,
তোমরা আমাকে বলে দাও। আজকাল, যতদূর
জানি, বাগানের কাছে গেলে বিষপিঁপড়ের কামড়
সবাই শরীরে নিয়ে আসে। প্রতীক্ষায় অপলক
একটি পাখির দিকে তাকাতে তাকাতে আমি হই
রঙিন মাংসের পাখি আর ভালোবাসতে বাসতে
ভালোবাসা হয়ে যাই। মাদকদ্রব্যের আস্বাদন
ব্যতিরেকে অগোচরে সাইকেডেলিক চিত্ররাজি
ভেসে ওঠে কী প্রবল বর্ণময়– নিজেরই মগজে
ভ্রাম্যমাণ, মিশরীয় মূর্তির সান্নিধ্যে পৌঁছে যাই।

অতিশয় দ্রুত নব ঘোরাতে ঘোরাতে আর্ত বলি,
ট্রানজিস্টার হে দাও ডেকে দাও সুধাকে আমার।
মৃত্যু, কোনো পত্রহীন লেফাফা যেনবা, প'ড়ে আছে
অদূরে আমার গৃহকোণে; সুযোগ পেলেই ক্ষিপ্র
অন্তর্গত ছটফটে পাখিকে আমার পুরে উড়ে
যাবে হিম শূন্যতায়। ট্রানজিস্টার হে হৃদয়ের
মুঞ্জরিত স্থানীয় সংবাদ ফুলে ফুলে মেঘে মেঘে
ঈষৎ রটিয়ে দাও, যেন সুধা দ্রুত চলে আসে।

এ কোন প্লাবন আসে ব্যেপে? ভাসে জগত-সংসার,
রাজা তো অনুপস্থিত, সুধা সে-ও অন্তরাগে লীন।

এখন আমি

এখন আমি কারুর কোথাও যাবার কথা
শুনলে হঠাৎ চমকে উঠি,
এক নিমেষে ছলছলিয়ে ওঠে কেমন বুকের পুকুর।
কোথায় যাবে? কেন যাবে? এমনিতরো প্রশ্ন শুধু
চোখের তারায়, ঠোঁটের রেখায়
কাঁপতে থাকে।

কারুর দিকে হাত বাড়ালে হাত স'রে যায়।
দুঃখভেজা মেঘ-আড়ালে।
যখন-তখন
মনের আপন ঘাঁটি ভীষণ প্রকম্পিত।
এখন আমি কারুর কোথাও যাবার কথা
শুনলে হঠাৎ চমকে উঠি।

এখন আমি একটা কিছু ভেঙে যেতে দেখলে বিষম
ভেঙে পড়ি।
গোলাপ ফুলের চারাটা তার সজীবতা
খোয়ালে খুব ভয় পেয়ে যাই–
বালক বেলার দূর দুপুরে কাটা ঘুড়ির দৃশ্য আবার
যখন-তখন মনে পড়ে।
অনেকগুলো মৃত ঘোড়া শৈশবেরই ভুবনজোড়া
দীর্ঘ ঘাসে উল্টো পাল্টা থাকে পড়ে–
এখন আমি এমন কিছু ভাবলে ভীষণ
ভয় পেয়ে যাই।
বেশ তো থাকি সময় সময় আবছা আলোয় গৃহকোণে
বইয়ের পাতায় মাথা গুঁজে।
মাঝে মাঝে ঝরা পাতার ফিসফিসানি
বয়স বাড়ার খবর রটায়।
বয়স্য কেউ সূর্য ডোবার মতো হঠাৎ ডুবে গেলে,
অন্ধকারে মনের সঙ্গে

এক্কা দোক্কা খেলে কাটাই ক্লান্ত বেলা।
দুঃখ কেবল দুঃখ হয়ে ফেলে গভীর দীর্ঘ ছায়া
মুখের রেখায়–
তখন বুকের ভেতর শুধু একলা লাগে,
একলা লাগে।

বাড়ি ফেরা

বাড়ি ফিরতে রোজ আমি দেরি করে ফেলি,
বড় বেশি দেরি করে ফেলি।
চেনা রাস্তা অলিগলি যতই জটিল হোক, পথ
ভুল করবার কথা নয়, নয় কখনো নিজের বাড়ি
মনে করে অন্য কারো দরজার কড়া নাড়া অস্থির ব্যাকুল।
তবু বাড়ি ফিরতে রোজ দেরি করে ফেলি,
বড় বেশি দেরি করে ফেলি।

কোনো পিছুটান নেই, সূর্যাস্ত দেখার লোভে কোনো
নদীতীরে অথবা টিলায় দাঁড়ানোর অবসর
আজকাল মেলা ভার। পার্কে ব'সে কিংবা ঘাসে শুয়ে
ভাবনা বিলাসে মেতে উঠবো যে, তারও জো নেই সম্প্রতি, তবু
বাড়ি ফিরতে রোজ আমি দেরি করে ফেলি,
বড় বেশি দেরি করে ফেলি।

সে কবে আড্ডার পাট গেছে চুকে, ইদানীং মতান্তর
দাঁত-নখ-বের-করা মনান্তরে বদলে যায় খুব সহজেই,
এমনকি বন্ধুর কাছেও মন খোলা দায়। বার বার
দায়সারা বাক্যালাপে শেষ হয় চতুর আসর।
মাঝে-মধ্যে আমি নিজে কী দারুণ খল হয়ে যাই;
ইতরামি শুঁয়ো পোকা যেন, আমার ভেতর থেকে
ক্রমাগত অতিষ্ঠ বেরিয়ে আসে ভব্যতার পলেস্তারা ঠেলে।
প্রত্যেকে কপট ভেবে প্রত্যেককে কেবলি বিচ্ছিন্ন
হয়ে যাই ঝরে-পড়া পাখিদের মতো দিগ্বিদিক।
এ কেমন সময় করছে গ্রাস দ্রুত আমাদের?
আড্ডার কোটরে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শুনে প্রতিদিন
কাটে না আমার বেলা কিংবা কোনো মোহিনীর ডাকে

তাকাই না ফিরে; ইঁদুর-দৌড়েরও আমি কেউ নই,
তবু বাড়ি ফিরতে রোজ দেরি করে ফেলি,
বড় বেশি দেরি করে ফেলি।

বাড়ি ফিরে দেখি, সেখানে কোথাও কোনো
ঘরবাড়ি নেই; অন্ধকারে হাসে বুভুক্ষু শূন্যতা।

আমার কবিতা জুড়ে শুয়ে আছ

এ জীবন চড়িভাতি নয় বলে মধ্যপথে এক ঝটকায়
তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বুঝলাম কী ভুল করেছি।
কোনো কোনো উচ্চারণ, হায়, এভাবেই মানুষকে
আজীবন কুরে খায়, এমনকি নদীর, বৃক্ষের কাছে
করে অপ্রস্তুত বার বার। এখন তো দেখছি বিষম ঠেকে–
পারে না খারিজ করতে কোনোমতে, স্মৃতিও তোমাকে।

আমার নিকট থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হলেই, মানে
দূরে স'রে গেলে
হৃদয় শ্মশান হয়। কোথায়? কোথায় তুমি? এই
নাছোড় জিজ্ঞাসা
উন্মত্ত পাখির মতো, যতদিন বেঁচে আছি, চঞ্চুর আঘাতে
আমাকে করবে ছিন্নভিন্ন। এরপর
নিশ্চিন্তির কুটিরে বিশ্রাম করা চেষ্টার অতীত।

এই যে এখন আমি সুন্দর বন্দরপ্রিয় নৌকোর মতন
প্রবেশ করছি এই অজ্ঞাত ভেতরে অগোচরে,
এই যে এখন আমি পোকাকীর্ণ শব আর নক্ষত্রের শুদ্ধ
মিলন ঘটিয়ে পরিপক্ক রাত্রির গম্বুজে ব'সে
লিখছি কবিতা– এই কবিতার ডানদিকে তোমাকে দেখছি,
এই কবিতার
বামপার্শ্বে কম্পমান তোমার বিশদ ছায়া, একা;
আমার কবিতা জুড়ে শুয়ে আছ তুমি, শুধু তুমি।
এবং তোমার হৃৎস্পন্দনের পদ্ধতিতে প্রতি শব্দ
ঈষৎ কম্পনে
জেগে থাকে, তোমার নিঃশ্বাস লেগে বাক্যরাজি দ্রুত মগ্ন হয়
হাঁসের বুকের মতো রাঙা উষ্ণতায়।

এক ধরনের উপস্থিতি এও, হয়তোবা দূর
ভবিষ্যের পদচ্ছাপে পাবে ঠাঁই। অথচ তোমার
এমন নিরাবয়ব উপস্থিতি প্রকৃত সান্ত্বনা
নয় কিছুতেই।
সর্বদা তোমাকে চাই একান্ত নিকটে টাই, দ্যাখো,
আমার প্রতিটি রোমকূপ কী উৎসুক হয়ে রয়,
যেমন কর্কশ ঘাস শিহরিত হয় ঘন ঘন
বৃষ্টির আশায়।

এক্ষুণি আমার কিছু কেনাকাটা করবার আছে

এখন তোমরা কেউ আমাকে খামোকা দেরি করিয়ে দিও না,
এক্ষুণি আমার কিছু কেনাকাটা করবার আছে।
পকেটে রয়েছে যাবতীয় সামগ্রীর ফর্দ সুদীর্ঘ, উজ্জ্বল,
অবশ্য তালিকা না হলেও চলে। কী কিনতে চাই,
আপাতত কী কী কেনা দরকার
তার পাক্কা একটা হিসেব
গোপনে করছে খেলা মনের ভেতর।

এখন তোমরা কেউ আমাকে খামোকা দেরি করিয়ে দিও না।
তোমাদের একজন কেউ হাত বাড়িয়ে দিলেই
আমাকেও ধরতে হবে হাত,
আসন জোটাতে হবে তোমাদের সোনালি আড্ডায়।
আসবে কথার পিঠে কথা,
সন্ধ্যা নেবে শুষে
দিনের গালের রং, গুলতানি, হো-হো-হাসি, অবাধ হুল্লোড়,
চরিত্রহনন, কবিতার শব-ব্যবচ্ছেদ, কবির প্রণয় নিয়ে
ঈষৎ মস্করা
ইত্যাদিতে ক্ষয়ে যাবে অনেক প্রহর, পুনরুক্তিময়, কিন্তু,
এক্ষুণি আমার কিছু কেনাকাটা করবার আছে।

দ্যাখো, ভালো করে দ্যাখো, আমার ভুরুর এলাকায়
এখন শিশির নেই ফোঁটা ফোঁটা, আমার শরীরে
বস্তুত তোমরা কেউ আর
বকুলের গন্ধ খুঁজে পাবে না এখন। আজকাল

আমি আর মধ্যরাতে ধীরে সুস্থে ঘুরে বেড়াই না ইতস্তত
রাস্তায় রাস্তায়,
ফেলি না পা বন্ধ দোকানের ছায়ায়, স্তম্ভিত মাঠে।
এখন ব্যস্ততা কাঠরিড়ালীর মতো সারাদিন
লাফায় আমার শিরা-উপশিরাময়; আমাকে অনেক দূর
থেকে দেখে আমার শৈশব
সকৌতুক খোলা ছাদে পা দোলাচ্ছে ফকফকে জ্যোৎস্নায় কেবলি।

অকস্মাৎ একজন বিপন্ন পথিক
বাঁচাও বাঁচাও শব্দে
আমার মুখের রোদ মুছে নেয়, ভেঙে ফ্যালে আমার বুকের
গোলাপের ঝাড়।
আমি তো পুলিশ নই নাগরিক দ্বীপে,
তবু সে শব্দের পিছু পিছু
ছুটে যাই, দিগ্বিদিকে ঘুরে কিছুক্ষণ ফিরে আসি ক্লান্ত, ব্যর্থ।
আমার তো খুব বেশি দেরি করা চলবে না। অথচ অমন
আচমকা বিপন্নতা কিছু
কখনো না কখনো আড়ালে
আমাদের প্রত্যেকের জন্যে জমা থাকে।

একজন বলেছিল, 'আমাকে মনের মতো কিছু দাও তবে',
আমি দশ দিক তন্ন তন্ন করে দুঃখকে একাকী
তার মুখোমুখি এনে বাসিয়ে দিলাম।
একজন আমার নিকট
রোদ্দুরের পূর্ণিমার পদাবলি চেয়েছিল শুনতে একদা,
আমি তাকে কেবলি আবৃত্তি
করিয়েছি রাত্রিদিন আঁধারের ভাষা। আমি আর
কারুর জন্যেই কিছু করবার কথা ভাবি না কখনো।
শুধু ভাবি অবেলায়,
এক্ষুণি আমার কিছু কেনাকাটা করবার আছে।

কী কিনবো আমি? তরমুজ ডাব অথবা আঙুর,
কফির উজ্জ্বল কৌটো, স্বপ্নবৎ টেরিলিন শার্ট, ট্রাউজার?
এই তো দেখছি কাছে দূরে শহরের
প্রতিটি দোকান
বারবনিতার মতো অপেক্ষমাণ অথচ বড় উদাসীন–
আমি যা' কিনতে চাই কখনো তা নয় লভ্য কোনো দোকানেই।

পতন

কখনো না কখনো সবাই প'ড়ে যায় অতর্কিতে।
ব্যাপক রোদ্দুর ভেঙে, অন্ধকারে ঢেউ তুলে যারা
পথচারী, পড়বো না কখনও হোঁচট খেয়ে আদাড়ে-বাদাড়ে,
এ ফখর তাদের সাজে না।

কখনো না কখনো সবাই প'ড়ে যায় অতর্কিতে।

সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে কিংবা বাসের হাতল ধরে
বাদুড় সাজার ক্ষিপ্ত প্রতিযোগিতার
মাশুল অনেকে দেয়, কেউ কেউ খানাখন্দে প'ড়ে,
হায়, কেউ কেউ খাদেও তলিয়ে যায়।
কখনো না কখনো সবাই প'ড়ে যায় অতর্কিতে।

শৈশবে যখন হাঁটি হাঁটি পা পা
চলার আবৃত্তি করতাম ট'লে কালো-সাদা বরফি-আঁকা
মেঝেতে মাতাল, তাল সামলাতে না পারলে পিতা
তড়িঘড়ি ধরতেন তাঁর আত্মজের হাত দৃঢ় হাতে আর কৈশোরেও
কখনো বাইরে গেলে প্রফুল্ল সকালে কি বিকেলে
সহসা ঠোকর খেলে পথে পতনোন্মুখ পুত্রকে
নিতেন সামলে অবলীলাক্রমে, বলতেন, 'তোর
হুঁশ নেই এতটুকু, দেখেশুনে পথ চলা দরকার, বুঝলি?
নইলে দুর্ঘটনা ফাত্রা ছোকরার মতো উঠবে হেসে
হো হো তোর আহম্মকি দেখে।'

ইদানীং তাঁর কথা খুব কমই বলা হয়, অকস্মাৎ
দেয়ালের ফটোগ্রাফে নির্বিকার দৃষ্টি প'ড়ে যদি,
অতীত ককিয়ে ওঠে কখনোবা, মনে হয়, একদিন পুরোনো
এ বাড়িতে তিনিও ছিলেন।
এখানে এ ঘরে কিংবা পথের কিনারে, শুনি, শিহরিত, একা,
আজও ক্লোরোফর্মের মতন ভাসে তার আত্মা আত্মা স্বর।

মনে প'ড়ে, যখন নামানো হল কবরে পিতার
তেয়াত্তর বছরের উদাস শরীর গমগমে পুণ্যশ্লোক
উচ্চারণে, আমি প'ড়ে যাচ্ছিলাম খুঁড়ে তোলা মাটির ওপর
কী বিশদ নিঃস্বতায়! বোমাধ্বস্ত বাড়ির মতন
প'ড়ে যাচ্ছিলাম।

কখনো না কখনো সবাই প'ড়ে যায় অতর্কিতে।

আমি
প'ড়ে
যাচ্ছি
প'ড়ে
যাচ্ছি
অতি দ্রুত প'ড়ে
যাচ্ছি
প'ড়ে যাচ্ছি
ক্রমাগত, ভাবি আমার জনক ঐ
পবিত্র গাছের রূপে দেখাবেন লাল কি সবুজ সিগন্যাল;
কিন্তু আমি
প'ড়ে যাচ্ছি
প'ড়ে
যাচ্ছি
প'ড়ে
যাচ্ছি
পাবো না কখনো আর পৌরুষ-প্রবল তাঁর হাতের নির্ভর
প'ড়ে যাচ্ছি
প'ড়ে যাচ্ছি
শুধু প'ড়ে যাচ্ছি ...

আঘাটায়

এ কেমন জায়গা? এখানে তো আসতে চাইনি কোনো দিন।
কখনো কি বাস্তবিক এই আঘাটায়
রেখেছি পা এমন জমিনে? ভেবেছিলাম এখানে
গোলাপের চারা
প্রচুর থাকবে পথে পার্কে গেরস্তবাড়ির টবে
ব্যক্তিগত উদ্যানে, অথচ
নরভুক গাছ শুধু কর্কশ, বিদ্বেষপরায়ণ, চতুর্দিকে
ভীষণ দিয়েছে মেলে হিংস্র ডালপালা।
আকাশ দু'ফাঁক করে একটি পা, অতিকায়, লাল,
নেমে আসে ছিত্তিছান করতে এ শহর। অভিশাপ

রেলপথে, নদীপথে, চরে চরে, বকুলতলায়, বারান্দায়
অভিশাপ, প্রহরে প্রহরে
ফুলের প্রতিটি কুঁড়ি কীট হয়ে সুপক্ব জামের মতো ঝরে।

পুরোনো গলির মোড়ে, টার্মিনালে, দরদালানের
ছায়াচ্ছন্ন কোণে
কপট বন্ধুর মতো আপাদমস্তক রহস্যের টোগা প'রে
নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু। ঘাতক প্রতিটি ঝোঁপ,
ল্যাম্পপোস্ট, প্রত্যেকটি দেয়াল এক্ষুণি
দেয়ালের গায়ে টলে পড়তে পারে।
বিপুল হাঁ করে
পথঘাট গিলে নিতে পারে ঘরবাড়ি, পথিক দোকানপাট,
ক্ষিপ্রগতি মোটরের ঝাঁক, বাস; ঘাতকের গন্ধ
ভাসে রেস্তোরাঁয়, সিনেমায় আর বিবাহ বাসরে।
আথিবিথি তাকাই অন্যত্র, তবু সেই ক্রুর গন্ধ।
ভেসে আসে সবখানে ধুলায় ঘাসে ঘাসে;
তবে কি লুকাবো মুখ ধ্বনিময় আদিম গুহায়?
চাই না এখানে কোনো শিশু কখনো ভূমিষ্ঠ হোক,
হলে সে নিশ্চিত আঁতুড়েই হবে ভীষণ দণ্ডিত।
চাই না এখানে কোনো তরুণীর বুকে ভালবাসা
একগুচ্ছ কৃষ্ণচূড়া হয়ে মদির উঠুক জ'লে,
জ্বললে তা মিশমিশে অন্ধকার হবে নিমেষেই।
চাই না এখানে কোনো কবি লিখুন কবিতা আর,
লিখলে তা গাধার পায়ের নিচে কিংবা
নিষ্ঠীবনে, বিষ্ঠায় গড়াবে, ভস্ম হবে বহ্ন্যুৎসবে।

একটি কান্নার দিকে হাঁটতে হাঁটতে কী ব্যাপক
ধ্বংসের ভেতর চলে যাই। আমার তো দহলা নহলা করে
কাটে কাল, উপরন্তু শূন্যের সহিত শূন্য ক্রমাগত
যোগ দিয়ে চলি ফলাফলহীন; আমার মনের মতো জায়গা
তবে কি অকূল আয়েন্দায় কোনো শূন্যের উদ্যান?

আমি ভারি লোভাতুর

আমি ভারি লোভাতুর, একটা নাছোড় লোভ আমার আপন
প্রতিবেশী, আমাকে সে বারবার আয়নার সম্মুখে

নিয়ে যায়, মগ্ন হতে বলে নিজেরই ছায়ায়। আমি চাই
সূর্যোদয় আমার আত্মায় হোক পলেস্তারা, সূর্যাস্তের আভা
আমার সকল নিঃস্বতাকে বর্ণাঢ্য করুক।

মাটি ফুঁড়ে যে-অংকুর চারা হয় কোমল স্পন্দনে,
আমি তার শিহরণ আপন শিরায়
পেতে ভালোবাসি
এবং রহস্যময় মাঝরাতের বৃষ্টির অন্তরালে খুব
মুখর যে বৃষ্টি তারই ধ্বনি আমার প্রতিটি রোমকূপে ধরে
রাখতে লোভ হয়, হঠাৎ হাওয়ায় স্নিগ্ধ পায়রার
বুকের স্ফুরিত ঈষদুষ্ণ রোমরাজি আমার আপনকার
চোখের পলকে অতিশয় নম্রতায়
মিশিয়ে নেয়ার জন্যে প্রতীক্ষায় থাকি।

একটা নাছোড় লোভ আমাকে প্রত্যহ
ভুলিয়ে ভালিয়ে
নিসর্গের স্নেহ কিংবা ব্যাপক ক্রোধের দিকে নিয়ে যায় আর
মাঝে-মাঝে গেরুয়া রঙের মতো শুধু
অপার ঔদাস্য এক অস্মিতায় কেমন নিঃস্ব বাজে, সাদা
পাথরে অদৃশ্য মিনারের শোভা চাই কখনোবা,
এ-ও তো প্রখর লোভ ভিন্নতর। নক্ষত্র গোষ্ঠীর
আতশি মায়ায় মরীচিকা ডেকে যায় বারংবার।
আমার জীবন যেন পুরোনো রেশন কার্ড, দেখে
ঘেন্না হয়, অথচ হেলায় দূরে ছুড়ে
ফেলে দিতে পারি না কখনো।
বুঝি তাই হঠাৎ তেতলা থেকে পড়ি না ঝাঁপিয়ে
অথবা ঘুমের বড়ি মাত্রাধিক করি না সেবন।
একটা সেয়ানা লোভ গেরস্ত বাড়িতে তেজী কুকুরের মতো
চিৎকারে চিৎকারে
আমাকে জাগিয়ে রাখে রৌদ্রালোকে, গহন জ্যোৎস্নায়।

আমার লোভের সীমা-পরিসীমা নেই।
আমি তো আপনকার থেকে
ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে চেয়ে
কেবলি জড়িয়ে ফেলি নিজেকে নিজের অন্তর্গত
লতাগুল্মে, কিছু ভেঙে ফেলতে গিয়ে গড়ে ফেলি,

গড়তে চেয়ে ভেঙে করি চুরমার ঝাঁ ঝাঁ উত্তেজনায় সহসা।
মুঠোয় প্রবল চেপে ধরি জল, নিমেষে গড়িয়ে
ধুলোয় বিলীন হয়, শোকার্ত শোকার্ত চেয়ে থাকি।
আর নিরুপমা তুমি দূর
মরুভূমি পরিবৃত নৈঃসঙ্গের দুর্গ থেকে খুব টলটলে
মদির মুহূর্তগুলো ঠোঁটে নিয়ে যখন দাঁড়াও এসে কাছে
অগস্ত্য মুনির মতো চকিতে তোমাকে
গণ্ডুষে গণ্ডুষে পান করে ফেলতে ভারি লোভ হয়।

শান্তির এলাকা

তবু, তবু, ধন্যবাদ জানাই তোমাকে, সবাইকে।

যখনই বাড়াই হাত হাতের সান্নিধ্যে,
শীতের সাপের স্পর্শ পাই কিংবা মনে হয় কোনো মাঘ-নিশীথের
জানালা ছুঁয়েছি ভুল করে,
যাকে আলিঙ্গন করতে যাই তার ছায়াও থাকে না কাছে।
যখন কারুর সঙ্গে কথা বলবার পুষ্পল স্পৃহায়
জলতরঙ্গের মতো বেজে ওঠে আমার ব্যাকুল সত্তা, আমি
কথোপকথনের লোভে প্রতীক্ষায় থাকি,
কখনো পাই না সাড়া, যেন পাথরের সঙ্গে জুড়েছি আলাপ।
বার-বার ক্ষেতে গিয়ে দেখি
প্রতিবার দেরি করে ফেলেছি বিষম,
আমার হাতের বীজ হাতেই বেবাক থেকে যায়, হয় নাকো বোনা।
তবু, তবু, ধন্যবাদ জানাই তোমাকে, সবাইকে।

সকাল বেলায় আমি দাড়ি কাটার সময় দেখি,
বিবর্ণ সংবাদপত্রে জাতিসংঘ ক্লিষ্ট নপুংসকের মতন
উবু হয়ে ব'সে আছে;
দেখি মুক্তিযুদ্ধের পুরোনো ফটোগুলো নিষ্পলক;
জানালায় এক পাল লাল পিঁপড়ে একটি পোকার
শব বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আস্তে-সুস্থে যৌথ
ভোজের উৎসবে।
চকিত সে কার মুখ নিয়ে এলো রাত্রিময় জানালা এবং
নিঃসঙ্গতা, যা আমি সহজে ছুঁতে পারি?

কোথায়ও এমন জায়গা নেই এতটুকু, যেখানে অষ্টপ্রহর
আশান্তির ধেই ধেই নৃত্য নেই, নেই বিরোধের
কাড়া-নাকাড়ার হট্টরোল।
আমার ভেতরে পাখি-পাখিনীর মদির চঞ্চুতে
চঞ্চু রাখে, জেগে থাকে পোকামাকড়ের
প্রচ্ছন্ন সমাজ,
আমার ভেতরে সাদা খরগোশ হেসে খেলে বেড়ায় কেমন
ঘাসে ঘাসে, খড়ের গাদায়;
বিভিন্ন মরাল ওড়ে একটি মরাল হয়ে আমার ভেতর।
অশান্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার
হৃদয়কে আজ শান্তির এলাকা ঘোষণা করছি।

একজন কবির প্রয়াণ

একজন কবির প্রয়াণে শহরের পথঘাট গমগম
করে না মিছিলে– সে সংবাদ কেউ কেউ শোনে কম
বেশি; কারো শ্রুতির আড়ালে থেকে যায়। গাছপালা
স্তব্ধ হয়, ফুরায় ফুলের আয়ু আর নদীনালা
কালো মেঘ রাখে বুকে, পাখিরা মর্শিয়া করে পাঠ
আর কতিপয় শব্দ-প্রেমিকের প্রাণের কপাট
খুব হুহু খুলে যায়, হৃদয়ের সব গুল্মলতা
অলৌকিক শিশিরে শিশিরে ভিজে ওঠে সান্দ্র ব্যথা
ব্যক্তিগত বাজে, ওরা অলক্ষ্যেই করে মাল্যদান।
একজন অডেন দেখুন কী প্রচ্ছন্ন মারা যান।

বেলুন, বেলুন

দৌড়ে যায় পথের সে বালক
ডাইনে বাঁয়ে ক্লান্তিহীন একা;
রৌদ্রে তার শরীর চমকায়,
গ্রীবায় স্বেদ, বাতাসে ওড়ে চুল।

বিরামহীন ছুটছে সে বালক,
দৃষ্টি শুধু সামনে লীলায়িত।

রক্তের নাচে কী-যে অস্থিরতা,
রঙিন এক বেলুন তার হাতে।

চোখের্র কোণে চড়ুইভাতি আর
স্বপ্নে দেখা সুদূর হ্রদ নিয়ে
ছুটছে শুধু, ছুটছে সে বালক।
অবাক মানে শহুরে সব লোক।

ছায়ার দিকে দৃষ্টি নেই, কড়া
রোদের তাপে চামড়া খরশান।
এ রং শুধু আফ্রিকার কিবা
সূর্য-সেঁকা তীব্র এশিয়ার।

কেউ না কেউ হাত বাড়াবে বলে
বেলুন তার আড়াল করে ছোটে,
দিগ্বিদিক; পেছনে লোকালয়।
কিন্তু একি পাহাড় ভয়ানক!

যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে সে বালক
কেমন দ্রুত পাহাড়ে অস্ত্রের।
কোথাও আর চিহ্ন নেই তার,
শূন্যে একা বেলুন ওড়ে দূরে।

কিছুই অচেনা নয়

কিছুই অচেনা নয়, এই ক্রোধ, ভাগবাটোয়ারা,
এ কুচকাওয়াজ, টিউনিক, এই প্রবল উত্থান,
কিছুই অচেনা নয়। মুখের বদলে অন্য মুখ,
চোখের বদলে চোখ, এখনও তো সেই চেনা রীতি।
এতটুকু স্বস্তি নেই; কনকচাঁপার দিকে চোখ
মেলে রাখলেও সাপ ফুঁসে ওঠে সর্বত্র কেবলি,
প্রাক্তন সন্ত্রাস পায় পরমায়ু নতুন সন্ত্রাসে।
নানান কংকাল আসে, বসে পাশে, কি করে বাঁচতে
হবে তারই পাঠ বারবার মুখস্থ করায় শুধু।

এই যে আপনি যান আপনিও যান মিছিলের
পুরোভাগে, আমি ঠিক থাকব পেছনে, বেগতিক

দেখলে চম্পট দেব যথারীতি। আমার তো আছে
ঘরময় পুষ্যি আর শেষাবধি যে কোনো কসরৎ
করে ক্ষ্যাপা ঘোড়ার কেশর ধরে ঝুলে থাকলেই
বাঁচবে আপন মাথা। অতএব পলায়ন, শুধু
পলায়ন জিন্দাবাদ বলে দেব ডুব সরোবরে?

কোথায় পালাব? স্বপ্নে? নাকি মনোহারি নিসর্গের
সবুজ কেল্লায় খুঁজব আশ্রয় নিরুপায়?
কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হয় ক্ষণে ক্ষণে, নিসর্গ নিজেও
সর্বদা অহিংস নয়, উপরন্তু এই জীবনের
আড়ালে জীবন যাপ্প্যা করাটাই শিল্পিত বিকার
বলে কেউ লেখেন থিসিস, কিন্তু প্রাণ ধারণের
স্বাদ বাসি খাবারের মতো অম্ল লেগে রয় জিভে।

অথচ কাটে না ভয় কিছুতেই, প্রহরে প্রহরে
আঁতকে উঠি পদশব্দে, চতুর্দিকে কী ভীষণ শক্তি,
অসুস্থ, উন্মত্ত, তোলে মাথা, যেন টিরানোসরাস।
ছাড়ুক হুংকার যত, আঁচড়াক মাটি, তছনছ
করুক নিসর্গ স্বেচ্ছাচারে, জানে না সে নিজে ক্ষয়-
চিহ্ন বয় নিজেরেই অস্থির খাঁজে খাঁজে অগোচরে।

মাইক

ভেবেছেন আপনারা আমাকে এভাবে কোণঠাসা
করে রাখবেন চিরকাল? ক্ষিপ্র অর্ধচন্দ্র দিয়ে
সরিয়ে দিলেই আমি সুড়সুড় লেজটি গুটিয়ে
সটকে পড়ব স্টেজ থেকে? মাইরি জবর খাসা
লোক আপনারা, এ আপদ গেলে, জিলিপি-বাতাসা
বিলোবেন গণ্ডা গণ্ডা, আছে জানা। ইনিয়ে বিনিয়ে
জপিয়েছেন যা এই শ্রোতাদের এ্যাদ্দিন তা নিয়ে
তৃপ্ত থাকা দাম, আর কত খেলবেন ভুল পাশা?

উইংস-এর আড়াল থেকেই ফিরে যাব বার বার
তা হবে না, মাইকটা ছেড়ে দিন, মানে মানে স'রে
দাঁড়ান বলছি, নইলে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে ঘোর।
অধুনা আমার কণ্ঠস্বরে মর্চে ধরে গেছে, যার

মানে, আমি এতদিন চুপচাপ নিজের ফোকরে
ছিলাম, আনব কণ্ঠে আজ দীপ্র জোয়ারের তোড়।

ছেলেবেলা থেকেই

ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি
ভারি দুঃখ পাই।
একটি রঙিন বল একদা কলকাতা থেকে এনে
আব্বা উপহার দিয়েছিলেন আমাকে,
একদিন সে-বল কোন শীতের বিকেলে
ছাদ থেকে প'ড়ে
গড়াতে গড়াতে
গড়াতে গড়াতে
কোথায় অদৃশ্য হল, পাইনি কখনো আর খোঁজ।
ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি
ভারি দুঃখ পাই।

একটি সফেদ হাঁস ছিল ভ্রাম্যমাণ
উঠোনে অথবা বারান্দায়,
ছিল শৈশবের ছায়ায় আমার গৃহপালিত রোদ্দুরে আর
আমার সবুজ স্নেহ খেত প্রতিদিন খুদকুড়োর সহিত।
ক্ষুধার্ত প্রহরে
একদিন সহসা তার পালকবিহীন
কতিপয় লালচে ভগ্নাংশ
খাবার টেবিলে এলো ভয়ানক বিবমিষা জাগিয়ে আমার।
ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি
ভারি দুঃখ পাই।

নেহার, আমার বোন, সত্যেন দত্তের ছিন্নমুকুল পড়ার
বয়সে আঁধারে ঝরে আমার ভেতর
অতিশয় কালো বৃষ্টি সে কবে ঝরালো,–
কিছুদিন আমি খুব একা বোধ করেছি একেলা।
ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি
ভারি দুঃখ পাই।

অরুণ, সুনীল, সুবিমল, সূর্যকিশোর, তাহের,

শিশির, আশরাফ আজ কয়েকটি নাম, শুধু নাম,
মাঝে-মধ্যে জোনাকির মতো জ্বলে আর নেভে।
ধূসর কিশোর সব সহপাঠী কোথায় যে করেছে প্রস্থান।
ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি
ভারি দুঃখ পাই।

আমার মনের সাদা ক্রমাগত কালোর দখলে
যাচ্ছে চলে, যাবে।
সম্প্রতি পীড়িত পাপবোধে; হে সময়,
কখনো তোমার প্রতি উদাস বিলাপ
করি নিবেদন।
ভাঙা মিছিলের মতো একেকটি আমি
দিকচিহ্নহীন পথে পলাতক, আজ অন্য আমি হয়ে আছি।
ছেলেবেলা থেকেই কিছু না কিছু সহসা হারিয়ে ফেলে আমি।
ভারি দুঃখ পাই।

তোমার সান্নিধ্যে কিংবা তুমি হীণতায়
কাটে বেলা; পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ সৈনিক
যেমন কম্পিত হাতে রণক্লান্ত ঠোঁট রাখে শেষ সিগারেট
তেমনি আঁকড়ে ধরি আজকাল একেকটি দিন আর ভাবি,
সহসা তোমাকে হারানোর দুঃখ যেন, হে মহিলা,
কখনো না পাই।

স্যানাটোরিয়াম

কী এক অসুখ আজ আমাদের অস্থিমজ্জায় বেঁধেছে বাসা।
সত্তায় ধরেছে ঘুণ, এতদিনে জেনে গেছি, বস্তুত এ রোগ
সহজে সারার নয়। চৈতন্যের এলাকায় এ কেমন ওলটপালট
চলছে সর্বদা বেলা-অবেলায়– দেখি, সব বৃক্ষ খর বানে
যাচ্ছে ভেসে শিকড় সমেত; পাখিগুলো মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে
কাদা জলে। একরাশ পচে-যাওয়া পাতা, কতিপয় ভাঙা ডাল,
একদা যা ছিল বৃক্ষ তার করুণ ভগ্নাংশ, মৃত্তিকাস্থ;
আমি সেই বৃক্ষটিকে বৃক্ষের চেয়েও বেশি ঋদ্ধ কিছু ভাবতাম।

দীঘল ঘোমটা টানা বউ, বরযাত্রী, সাপুড়ে, জুয়াড়ী আর
ভবঘুরে ধোপা আর নব্য যুবা ইত্যাদি সমেত এক সাঁকো

কোথায় তলিয়ে যায় অকস্মাৎ। দেবতুল্য মানুষের মুখ
কুকুরের অবয়বে হতেছে বিলীন। বার বার অনুরূপ
দৃশ্যাবলি ওঠে ভেসে চতুর্দিকে– এ রোগের এই তো লক্ষণ।

আমি তো কাদায় আজ ভীষণ ডুবিয়ে পদযুগ কী ব্যাপক
শূন্যতায় চেয়ে থাকি আর আলো বিশ্বাসঘাতক বলে খল
অন্ধকারে মশানের অভ্যন্তরে থেকে যাই, মাথায় আগুন
নিয়ে ঘুরি, পোড়া কাঠ অথবা করোটি বেজে ওঠে পায়ে লেগে
ইতস্তত, ফিরি শোক গাঁথা হয়ে; ব্যাপ্ত অস্থিমজ্জায় বীজাণু।
অসুখ সারাব বলে যেতে চাই নিরঞ্জন স্যানাটোরিয়ামে।

অথচ পাহাড়ে কিংবা নদীতীরে কোনো স্যানাটোরিয়াম নেই।

পান্থজন

আমিও রেখেছি নগ্ন পদযুগ্ম, ফোস্কাময়, এ জগতে। জলে
আয়না আছে বলে নিয়ত এড়িয়ে গেছি জলাশয়,
জলজ দর্পণে মজে সমাজ-সংসার কী অতলে
ডুবিয়ে পুরাণ হতে চাইনি কখনো। বড় ভয়

ছিল সেই লতাগুল্মময় জলাশয়কে আমার, কিন্তু তবু
মায়াবী বাণিজ্যে নিঃসঙ্গতা আমাকে নিয়েছে কিনে
কেশাগ্র অবধি, তাই বৈশাখের তীব্র দাহে প্রভু
তন্ন তন্ন করে জল খুঁজি। টলটলে অমন দর্পণ বিনে

বাঁচা দায়; প্রভু, তুমি সেই জল? আমি ছলচ্ছল আকাঙ্ক্ষায়
কখনো নিজেকে কখনোবা দূরে পদযাত্রা করে বারংবার
পাখির পালকে পাথরের দিকে চোখ রেখে দেখি শূন্যতায়
বিপন্ন উধাও তুমি, দর্পণে আমার মুখ কতিপয় হাড়।

এ কোন বৈশাখে আমি অকস্মাৎ পৌঁছে গেছি দীপ্র
জলাশয় খুঁজে খুঁজে? চতুর্দিকে বালি ভয়ানক
জান্তব, ক্ষুধার্ত; আমি, রুক্ষ, তৃষ্ণাতুর, খুঁড়ি ক্ষিপ্র
ক্রূর বালি ফোয়ারার লোভে। আমার দশটি নখ
ব্যর্থ, কালো; ওষ্ঠে গণ্ডে বালুকণা আর সীবন-রহিত জামা
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে খসে বিচূর্ণিত স্মৃতির মতন।

এক পাল উন্মাত্ত উটের শব্দ মাথার ভেতর, তপ্ত তামা

চতুষ্পার্শ্বে তরঙ্গিত সর্বক্ষণ। গুপ্ত মায়াবী বাণিজ্যে ধন-
রত্ন পাব বলে এই কংকাল কণ্টকময় পথে
চলেছি সন্তের মতো উপবাসে। জলাশয় না পেলেও হেঁটে
হেঁটে যেতে হবে চিরদিন; কেননা কাঙাল আমি এ জগতে
স্বেচ্ছায় চেয়েছি হতে পান্থজন, যতই ঝরুক রক্ত পদযুগ ফেটে।

তোমার স্মৃতি

বুকের ভেতর সাঁকো ভাঙে, ঘর পু'ড়ে যায়, ইতস্তত
ভস্ম ওড়ে কিংবা কোনো
প্রাচীন গানের রেশ থেকে যায়।
বুকের রুক্ষ ধূসর পথে এখন কে যে উদাস ডাকে।
দেয়াল থেকে চোখ ফিরিয়ে ফের কখনো
অন্ধকারে দেখি মৃত শিশুর মতো
ছিন্নভিন্ন একলা বাদুড় হিম মেঝেতে প'ড়ে থাকে।
জ্যোৎস্নামাখা ঊর্ণাজালের মতো স্মৃতি, তোমার স্মৃতি
হৃদয় জুড়ে কেমন হু-হু বিষাদ গীতি।

রাস্তাজোড়া হাঁসের মিছিল, দোলা যেন হাজার হাজার
শুভ্র ঢেউয়ের; হঠাৎ লোকে
পথ ছেড়ে দেয় সবিস্ময়ে।
ট্রাফিক পুলিশ ঠোঁটের কোষে বাঁশি গুঁজে শূন্যে ভাসে।
ছিন্ন মেঘে ব্যান্ড মাস্টার লাঠি ঠোকে,
বাদ্যরবে পথ হয়ে যায় ফুলের বাজার।
পাখির সঙ্গে শ্বেত করোটি মত্ত নাচে নীল আকাশে।
জ্যোৎস্নামাখা ঊর্ণাজালের মতো স্মৃতি, তোমার স্মৃতি
হৃদয় জুড়ে কেমন হু-হু বিষাদ গীতি।

সুদূর আমার ছেলেবেলার ম্যাজিকঅলা ফুল্ল ঢোলা
কোর্তাপরা বানর হয়ে
ডুগডুগিটা বাজায় হেসে।
স্বপ্নাবেশে সিগারেটের শরীর পোড়াই কয়েকখানা;
হঠাৎ দেখি ভিয়েতনামের জলাশয়ে
কার সে শরীর আছে প'ড়ে কাদায় ঘোলা;
মগজে তার শূন্য বোবা হাত-পাগুলো দিচ্ছে হানা।

জ্যোৎস্নামাখা ঊর্ণাজালের মতো স্মৃতি, তোমার স্মৃতি
হৃদয় জুড়ে কেমন হু-হু বিষাদ গীতি।

আততায়ী

এ নিবাসে কে আছেন? দরজা খুলুন। অগ্নিক্ষরা
দুপুরে দাঁড়িয়ে ঠায় গলা ফাটিয়ে ডাকছি, কড়া
নেড়ে নেড়ে ক্লান্ত; বহুক্ষণ
পর দরজাটা খুলে দাঁড়ালেন এসে একজন,
সমুন্নত, স্মিত তেজ সত্তাময়, পরনে পোশাক ধবধবে,
সেই কবে কুয়াশার মতো এক অস্পষ্ট শৈশবে
খুব দীপ্ত তাকে দেখেছিলাম তখন, মনে পড়ে।

'এই কি নিবাস বিশ্বাসের?' প্রশ্ন করলে তিনি, উদাসীন অকম্পিত স্বরে
বললেন, 'হ্যাঁ, আমাকেই সবাই বিশ্বাস বলে ডাকে।'
তার সুরে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের ছিল না বিরোধ, আমি তাকে
পুনরায় করি প্রশ্ন, 'আপনার বুক থেকে কেন রক্ত ঝরছে বলুন
অবিরল?' 'কবে কোন তামসিক সজারু সন্ধ্যায় আমি খুন
হয়েছি তোমার হাতে, পঞ্জরে খঞ্জর তুমি মেরেছিলে দারুণ হেলায়',
বলে তিনি আনলেন অভিমানী ভরসন্ধ্যা মধ্যাহ্নবেলায়।

যে খেলা আমার সঙ্গে

যে খেলা আমার সঙ্গে খেলে যাচ্ছ অবলীলাক্রমে
বাস্তবিক আমি তার নিয়ম জানি না। অতএব
এ খেলায় কোনো দিন আমার জেতার আশা নেই।
আমি যে তোমার কাছে প্রথম থেকেই পরাভূত
তা জেনেও তুমি খুব নেড়েচেড়ে ফেলছ দান, যেন
বুঝতে দেবে না এই অসম প্রতিপক্ষকে, কার
জিৎ কার হার হবে কোথায় কখন। বোকা পাখি
ধরেছ অনেক তুমি চতুর চালের হের ফেরে–
আমিও পড়েছি ধরা। তবু এই খেলা যতক্ষণ
পারি খেলে যাব, হায়, বাজি রেখে সর্বস্ব আমার।

কেন যে আমার এই ঘরে

অকস্মাৎ একদিন দুপুরে নাকি মধ্যরাতে তোমার সহিত
দেখা হলে পর, হিতাহিত
জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি নগ্ন দাঁড়িয়ে ছিলাম বহুক্ষণ
একা ঘরে। তোমার গহন চোখে চোখ পড়তেই একজন
বাউল আমার বুকে পদযাত্রা করলেন শুরু,
আমার গলায় তার একতারা গভীর দোলালো ছায়া,
যেন-বা অগুরু

বিলালো সুঘ্রাণ সত্তাময়।
কী মুদ্রা দেখালে তুমি শূন্যতায় বাহু মেলে, পেলাম অভয়।

রঙধনু আর মেঘেদের সঙ্গে দিব্যি দহরম মহরম করে
কেন যে আমার এই ঘরে
এলে তুমি মিছেমিছি? দেখছ না এখনও কোথাও
মেহগনি পদ্মখাট নেই কোনো, কী আনন্দ পাও
এখানে মাদুর পেতে বসে? ঝলমলে
ব্রোকেড জর্জেট আমি পারব না পরাতে তোমাকে। কোন ছলে
কী মধুর কথা বলে মন পেতে হয়, তা-ও শিখিনি কখনো।
হে দামিনী, হে ভামিনী শোনো,
আমি এক কৃশ, নষ্ট উত্তরাধিকারী, দ্যাখো, বহু দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃখের বর্ষায় ভিজে সন্তের মতন উপবাসে
এনেছি তোমার জন্যে বুনে এই থান, কখনো আনন্দে আমি উন্মাতাল
একগাছি নিরিবিলি চিন্ময় সুতোর জন্যে আকাশ-পাতাল,
হায় রে, করেছি এক। এ নিরাভরণ
বস্ত্রে ঢেকে অমন বিদ্যুৎ শরীরের তুমি ফেলবে চরণ
আমার এ আঙিনায় তারপর, হায়,
বিলিয়ে ক্ষীণায়ু শোভা যাবে ঝরে ব্যর্থ নিরালায়।

একটা কেমন তক্ষশিলা

যখন থাকি সত্তা ঢেকে বেহুদা সন্তাপে,
হঠাৎ করে বুকের ভেতর তক্ষশিলা কাঁপে।
প্রাচীনতার গুমরোনো সেই আলো-আঁধার ছিঁড়ে
তোমার মুখের সিলুএট্‌টি জাগে বাসের ভিড়ে।

কখন যে ফের শেয়াল-রঙের আঁধারমাখা গলি
আমার কাছে অন্তরালে মেলে দেয় অঞ্জলি।
বিস্মরণও তরঙ্গিত একলা পাখির ডাকে,
সবার বুকে একটা কেমন তক্ষশিলা থাকে।

জীবন কাটে দুঃখ সুখের প্রান্তরেখা মেপে;
বিষণ্নতা, দোষ কি আমার? তুমি এলে ব্যেপে।
রাতবিরেতে এই নিবাসে চলছে খোঁজাখুঁজি;
অস্মিতারই যমজ ভ্রাতা বিষণ্নতা বুঝি।

বাড়ি ফেরা ভুল হয়ে যায়, ঊর্ণাজালে ফিরি,
দেয়াল-জোড়া নিজের ছায়ার আহাম্মুকে ছিরি;
চকিতে এক বেয়াড়া ফাঁস জাপ্‌টে ধরে গলা,
চেনাজানার বাইরে যাচ্ছি কার সেয়ানা ছলায়?

হঠাৎ কোনো মধ্যরাতে ঘুমের ঘরে একা
উঠলে জেগে আদিমতায় পাব তোমার দেখা?
হাট-করা এই কপাট ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছ ভেবে
দৌড়ে আমি স্বপ্নপ্রবণ, হৃদয় জ্বলে নেভে।

তোমার কথা ভেবে ভেবে রাত্রি আমার খাঁ-খাঁ
দুপুর হয়ে চক্ষু ভাজে, পোড়ায় প্রাণের শাখা।
দুই গণ্ডূষ জলের খোঁজে খুঁড়ছি বেবাক ভূমি,
এমন মরুর রুক্ষ ঝড়ে মুখ লুকালে তুমি।

ফুরফুরে এক প্রজাপতি এসে নিথর দ্বারে
ছড়িয়ে দিয়ে সপ্ত রেণু দৃষ্টি কেমন কাড়ে।
'এই তো আমি খুঁজছ যাকে', বলল প্রজাপতি,
'তোমার হাতের শূন্য মাঠে হবে আমার গতি।'

ছন্নছাড়া প্রজাপতি কিংবা শালিক পাখি
ঝলমলিয়ে বাঁধতে আসে আমার হাতে রাখি।
তোমায় আমি পাখির বুকে, মাছের চোখে পাব?
নইলে আমি মনস্তাপে নির্বাসনে যাব।

আমার ভারি আস্থা ছিল গোলাপের সদ্ভাবে,
কিন্তু গোলাপ উঠল ফুঁসে, যেন আমায় খাবে।
তক্ষশিলা জীবন্ত ফের ব্যাপক হাহাকারে,
রিক্ততারই ফক্কা ঝুঁটি ধরি অহংকারে।

প্রতীক্ষায় থাকি

আমার বুকের থেকে সুকোমল একটি হরিণ
খুশির মতন লাফ দিয়ে রাজেন্দ্রানী পূর্ণিমায়
ভিজে যায়, মিশে যায়; অকস্মাৎ রক্তে ঢেউ তুলে
আমার চোখের থেকে কজন মুনিয়া বেশ পাখা
নেড়ে নেড়ে নিমেষে অদৃশ্য হয় গাছের ভেতর।
এবং আমার এই অসহায় কম্পমান করতল থেকে
গোলাপের পাণ্ডুলিপি, শেফালির বাণী দুঃখ হয়ে
ধুলায় মিলায়– দ্যাখো এখন কী নিঃস্ব আমি, হায়!

একদা মেঘের কত ছিল পকেটে আমার
ছিল বনচারী প্রতিধ্বনি, স্বপ্নের সুনীল বীজ।
এখন পকেট শূন্য; শুধু স্মৃতি লেগে আছে কিছু,–
সিগারেট শেষ হলে যেমন কিঞ্চিৎ নিকোটিন
আঙুলে জড়িয়ে থাকে। কী দারুণ নিঃস্বতায় ঘুরি
এদিক ওদিক রাত্রিদিন নিরুপায় এই আমি
ব্যর্থতার সমানবয়সী আর প্রতীক্ষায় থাকি
আবার কখন আসে ফিরে হৃত সম্পদ আমার।

বলার কিছু নেই

কিছুই তো বলব না, আমার বলার কিছু নেই।
তাছাড়া যা বলব তাতে অক্ষর মিলিয়ে এতেবার করতেই
হবে, এই দাবি কী করেইবা করি? শোনো হে বরং
ধরে নাও আমার এ আচরণ নিছক ভড়ং
ছাড়া কিছু নয়। আমি তো নীরবই থাকি
আকসার, জীবনের পায়ে গড়াগড়ি দিই আর অন্ধকারে ঢাকি
মুখ; আপাতত শিকস্তী জমির মতো পড়ে আছি,
নানান সত্তার কী জটিল রোদ্দুরে ছায়ায় বাঁচি।

কী-যে হয়, মাঝে-মধ্যে জিভের ডগাটা কোন ছলে
বেয়াড়া চঞ্চল হয়ে ওঠে বলে মুখের অঞ্চলে
বিস্ফোরণ ঘটে যায়। যদি বলি, এ পান্থশালায়
বেশুমার বুভুক্ষু থালায়
অহর্নিশ মৃত্যু-বাঘ ওৎ পেতে আছে,
দোলনার কাছে

মৃত্যু, যেন অশরীরি দাই-মা, গাইছে ঘুম-পাড়ানিয়া গান,
মৃত্যু ব্যান্ড মাস্টারের মতো বাদ্যহীন আসে, চকিতে বাগান
কংকালের ডালপালা বুকে নিয়ে মৃত্যুরই বাগিচা হয়ে যায়,
তবে কি একথা কেউ মেনে নেবে আজ? যে শাবাজ দূরে ধায়
অনেক উঁচুতে নীলিমায় তার চঞ্চুর ইস্পাতি
হিংস্রতায় ছিন্নভিন্ন বলে, হায়, হব কি আমিও আত্মঘাতী?

এই যে দেখছি ওরা, সারি সারি লোক, গোলাপের কাছে গিয়ে
ইনিয়ে-বিনিয়ে
এক আধসের চাল চায়, গাছের নিকট চায় নতজানু অভিনব
পোশাক-আশাক, সর্বক্ষণ করে স্তব

নিসর্গের ইদানীং আর
অস্থিচর্মসার
হাজার হাজার শিশু চাঁদকে বেলুন ভেবে নিয়ে
মেটায় খেলার সাধ ধুলোয় গড়িয়ে।
এই যে দেখছি কত গ্রামীণ রমণী,
শহুরে ঘরণী
কী মিহি জ্যোৎস্নার শাড়ি পরে আড়ালেই
থাকে একাকিনী লজ্জা-জালে বন্দিনী এবং সেই
খাঁ-খাঁ রূপ এমনকি শয্যাসঙ্গীরও দেখার নেই অধিকার।
কিছুই দেখি না আমি, এ তো শুধু দৃষ্টিরই বিকার!

শত্রুদের কয়েদখানায় ঘানি টেনেছি বলেই, হে স্বদেশ, শোনো,
তোমারই প্রেমের কোনো কোনো
দন্তুর ইজারাদার রক্তপায়ী পাখির মতন
আমাকে ভীষণ ঠোকরায় সুখে যখন তখন।
আমার তো শালপ্রাংশু বাহু নেই, এমনকি হাতই নেই তাই,
পারি না পবিত্র ক্রোধে জ্বলে উঠে মিথ্যার প্রাসাদ ছাই
করে দিতে, পারি না বেবাক মিসমার
করতে তাদের রাঙা তাসের ঘরের মতো মস্ত দরবার।

আমার কাছে

আমার কাছে তোমার সময়
ইচ্ছে মতো রাখতে পারো।

তোমার সময় এই হৃদয়ে হংসমালা হয়ে দোলে
কিংবা মনের প্রাচীন গুহার জোনাকজ্বলায় মিশে থাকে।
কাউকে আমি দেব না সেই
সময়টুকু কেড়ে নিতে।

আড়াল থেকে ডাকলে তুমি
কোন মায়াবী মুদ্রা এঁকে?
এলাম ছুটে তড়িঘড়ি উস্কোখুস্কো কেমন যেন
বলবে সবাই লোকটা বটে নিশি-পাওয়া স্বপ্নাহত।
তোমার সময় স্বপ্ন হয়ে
আমার প্রাণের পান্থজনের
পথের সীমায় উপচে পড়ে
রাত বিরেতে নিরুদ্দেশে।

রুদ্ধ হলে মধ্যরাতে
যানবাহনের প্রবল স্রোত,
ছমছমে সেই নীরবতার মখমলে যার পায়ের শব্দ
কৃচিৎ কখন বেড়ে ওঠে, তুমিই সে যে মনচারিণী।
তোমার সময় তুমি হয়ে
আমার কাছে বসে থাকে।
স্বর্গ পথের রেখার মতো
তার সিঁথিতে ওষ্ঠ রাখি।

আমার কাছে তোমার সময় ইচ্ছে মতো রাখতে পারো,
সেই সময়ে, হৃদয় সাক্ষী, নেই যে স্বত্ব অন্য কারো।

বরং

বাঁকা হাসি হাসলে তো হাসাই যায়,
যাকে ইচ্ছে তাকে
তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে তো করাই যায়,
কিন্তু আমি তেমন কিছু করতে চাই না।
বরং হাসলে আমি ঠোঁট থেকে সহজ
রোদ্দুর ঝরিয়ে হাসব প্রতিবার,
'দূর ছাই' বলে কারুকেই
কখনো দূরে সরিয়ে দেব না।

মরা ঘোড়াকে ঠ্যাঙানো কঠিন কিছু নয়–
ইচ্ছে করলেই তার উদর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
নাড়িভুঁড়ি বের করে টাঙিয়ে দিতে পারি
আমার দরজায়।
কিন্তু আমি তেমন কিছু করতে চাই না।
বরং একটা তরুণ কেশর-দোলানো
বুনো ঘোড়াকে বাগ মানিয়ে
তার পিঠে সওয়ার হবো হমৎকার।

ইচ্ছে করলেই নিজের ঘর
অন্ধকার করে রাখা যায়,
ইচ্ছে করলেই বাগানটিকে
দুমড়ে-মুচড়ে তছনছ করা যায়।
কিন্তু আমি তেমন কিছু করতে চাই না।
বরং ঘরে বাতি জ্বেলে রাখব আর
খুরপি নাচিয়ে বাগানের মাটি
নিড়াব, ফুলের চারাগুলোকে
বেড়ে উঠতে দেব তন্বীর মতো।

তাকে কি বলা যায়?

গহন বর্ষার তুমুল আঁচড়
নিমেষে ফেলবে কি মুছে চরাচর?
কার সে কালো চুল ভিজছে আকাশে?
কারবা হাহাকার সিক্ত বাতাসে?

ভিন্ন সাজ আজ পরেছে শহর।
দুপুরই সাঁঝ হল, মেঘের বহর
মেদুর যাত্রায়। কখনো হঠাৎ
আলো ব্যালেরিনা ছড়ায় দু'হাত।

ক্ষান্তি নেই এই শ্রাবণ ধারার,
যেনবা বিক্ষোভ সর্বহারার।
কোথায় ব্রজবুলি, সুললিত গান?
চতুর্দিকে বয় জলজ স্লোগান।

টেবিল ল্যাম্পের আলোয় গিবন
আবার ঝলসিত। কি গলি, কি বন
সবি তো একাকার। সহসা হৃদয়
কদম ফুল হয়, ঘন স্মৃতিময়।

প্রবল কালো ছিঁড়ে বৃষ্টি-জালের
আসোনি নিরুপমা। জলের তালে
বাজছে শূন্যতা। অথচ সাধিকা
কে যেন ভাঁজে সুর; নব্য রাধিকা?

এ আগুন আমাদের

এ আগুন আমাদের পেরিয়ে যেতেই হবে, কিন্তু
কী করে জানি না।
এখন এমন কেউ নেই এ তল্লাটে যে সহজে
অগ্নিকুণ্ড পেরুনোর মন্ত্র বলে দেবে,
এখন এমন কেউ নেই যার মায়াদণ্ডে লকলকে সব
শিখা দ্রুত তন্বী
ফুলের সুস্নিগ্ধ চারা হয়ে যাবে। বস্তুত এখানে
এখন এমন কেউ নেই
যে এই এলাহি আগুনের
সামনে এসে অকম্পিত স্বরে
করবে সতেজ উচ্চারণ :
'তোমরা পেয়ো না ভয়; তোমাদের হাত-পা ঝলসে দেবে
ধরে না এমন শক্তি এ আগুন, নিভে যাবে একটি ফুৎকারে।'

এ আগুন আমাদের পেরিয়ে যেতেই হবে, কিন্তু,
কী করে জানি না।

এ আগুন ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্বিদিক,
অনেকেই ক্লান্ত
দমকল ডেকে ডেকে, গলা ভাঙা, অথচ কারুর সাড়া নেই।
আমরা তাকিয়ে থাকি নিরুপায়, যেন মোহগ্রস্ত
মৃত্যুকামী পতঙ্গ সবাই,
হঠাৎ আগুনে দেব ঝাঁপ।

এ আগুন আমাদের পেরিয়ে যেতেই হবে, কিন্তু
কী করে জানি না,
এখনও জানি না।

চতুর্দিকে হিস্ হিস্ করছে আগুন;
গেল, সব গেল–
ঘরবাড়ি, গোলাপের ঝাড়, বেবাক দোকানপাট,
সবুজ সতেজ উদ্ভিদের মতো অনুভূতিগুলো
ভস্মীভূত। আমরা কি কোনো অলৌকিক পুরুষের
আশায় থাকব ব'সে সর্বদা নিশ্চেষ্ট, এ মুহূর্তে
চাই, আমরা তো চাই নির্বাপণ। এই যে শুনুন,
আপনারা চটপট সবাই লাগান হাত, দেখা যাক এই
অগ্নিশর্মা মূর্তিটাকে বশ করা যায় কিনা ভালোয় ভালোয়।

জাদুঘর

'আমি যাচ্ছি, আমার এ মুখ তুমি আর কোনো দিন
দেখবে না, আমি চলে যাচ্ছি, আমার সকল বেলা
তোমার দু'চোখ থেকে করতল থেকে
তুলে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার মনোমণ্ডলে আমি আর
কেউ নই' বলে তুমি একঘর আলো
শুষে নিয়ে করেছ প্রস্থান।

হে বিষাদময়ী নিরুপমা, হে প্রতিমা
কী করে তোমাকে বিসর্জন
দেব বিস্মৃতির কালিন্দীতে?
ইচ্ছে করলেই তো আর দুটি হৃদয়ের
সম্পর্কের সাঁকো, যেমন ভাবছ তুমি,
যায় না ভাসিয়ে দেয়া বিদ্বেষের বানে।
তুমি তো কখনো নও ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা
ভৌগোলিক কোনো নাম, নও এ্যালজেব্রার ফর্মুলা
অথবা পদ্যের পঙ্ক্তি নও কোনো, তড়িঘড়ি শুধু
ঘষে তুলে ফেললেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এখনও তো যেদিকে তাকাই, তুমি, শুধু, ব্যাপ্ত তুমি
সবখানে, এই তো দাঁড়াতে এসে নিঃশব্দে এখানে;

মেঝে কী ব্যাকুল নিত বুক পেতে
তোমার পায়ের ছাপ। বসতে চেয়ারে,
দোলাতে পা ঘন ঘন এবং পাখির পালকের
কোমল শব্দের মতো শাড়ির মর্মর উঠত বেজে
শিরায় আমার। এই ঘর তুমিময়
সকল সময়,
একে কোন জাদুবলে রেখেছ বানিয়ে অলৌকিক জাদুঘর?
কেন যে আমার হাতে সহজেই এক মুঠো বালি
রেখে চলে গেছ পেছনে নির্জন ফেলে ধ্বংসস্তূপ,
বুঝতে পারিনি।
তুমি ফিরে আসো আর না-ই আসো আমি এখানেই
থাকব অটল বসে সর্বক্ষণ, এ জায়গা কখনো ছাড়ব না।

উন্মত্ত মুয়াজ্জিনের মতো রটাচ্ছি তোমার নাম
প্রহরে প্রহরে,
সেই ধ্বনি মাথা কোটে স্তব্ধতার পুরুষ্ট দেয়ালে,
তোমার শরীর ভেবে বার-বার শূন্যতাকে করি আলিঙ্গন।

রঙিন টালি ইত্যাদি

একটু আগে কোথায় ছিলে? কোন নিবাসে?
নিছাদ ঘরে আস্তে-সুস্থে
বিঘৎ বিঘৎ জ্যোৎস্না যেমন

ভাসতে থাকে
স্মৃতির মতো একা একা,
তেমনি তুমি কোথাও বুঝি লুকিয়েছিলে।

টালি টালি, রঙিন টালি, সব টালিতে
রৌদ্রছায়া লেপ্টে থাকে,
হয়তো কিছু স্বপ্ন থাকে
ফাঁক-ফোকরে
তুমি কি সেই স্বপ্ন হয়ে
টালির রঙে মিশে ছিলে খুব আড়ালে?

রৌদ্ররাঙা মেঘে ছিলে? কিংবা ছিলে

দেশান্তরী পাখির বুকে?
হয়তো ছিলে আতর-হারা
শিশির ভেতর
কিংবা কোনো টেরাকোটায়
সুদূরতার সঙ্গী হয়ে মগ্ন ছিলে।
এ্যানেমিয়ায় কাতর কোনো নারীর চোখে,
জুয়োয় বন্দি একলা লোকের
উজাড় হা-হা বুক-পকেটে,
শুকনো ঠোঁটে
ঘুমিয়ে ছিলে নির্জনতায় হয়তো তুমি।

ট্যাংকে-বসা নানা রঙের পায়রাগুলো
উষ্ণ-কোমল পাখা থেকে
অনেক দামি বীজের মতো
তোমায় বুঝি
ঝরিয়ে দিল এই বিজনে।
পেলাম তোমায় আমার ত্বকে, শিরায় শিরায়।
একটু আগে ছিল না তো। কেমন করে

এই নিমেষে হলে তুমি?
দৈব দয়ায়? নাকি চতুর
শয়তানেরই
প্ররোচনায় জন্ম নিলে
অন্তরালে মূক কিশোরীর স্তনের মতো?
এই প্রহরে তুমি হলে আমার সাধের
অলৌকিকের ছোঁয়া-লাগা।
কয়েক কাঠা জমি জিরেত।
ভেতর ঘরের
জাদুকরের হাতের নড়ায়
উঠল সেজে থরে থরে রঙিন টালি।

তুমি

যুবসংঘ গড়ে ওঠে, তবু যুবাদের চোখে অদ্ভুত হতাশা।

একজন আততায়ী গুম খুন করে অতিদ্রুত

মুছে নেয় ছোরা, জনশ্রুত
সেতু লুপ্ত দিকে দিকে; কে যখন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হয়ে যান,
ঝুলন্ত খাঁড়ার নিচে কেউ কেউ সুটকেস নিয়ত গোছান।
একজন পাইলট ক্ষিপ্র বোমা ফেলে এসে নিরীহ নগরে
চুমুকে চুমুকে করে শেষ বিয়ারের পাত্র আর ভাঙা স্বরে
গায় গান ট্রা-লা লা-লা; জনৈক তুখোড় নেতা একরাশ
মিথ্যা তাঁর বক্তৃতায় বমিতে ছিটিয়ে হতাশ্বাস
জনতাকে দেন স্তোক। নক্ষত্র-খচিত জেনারেল
ক'জন টেবিলে নক্‌শা আঁকছেন ব্যাপক মৃত্যুর, কী-যে খেল
দেখালেন একজন রাষ্ট্রদূত, কূটনৈতিক বিজয়
হল তাঁর, তারপর পরস্ত্রীর সঙ্গে খুনসুটি অতিশয়।

কাপড়ে বুনছ তুমি, কী আশ্চর্য, স্বপ্ন, কী নিবিড় ভালবাসা।

যেন অর্ফিয়ুস

বিস্ফোরণে ভয়ংকর ফুল হিরোশিমা আর মায়া
সভ্যতার পাথুরে নৈঃশব্দ
আমাদের চতুষ্পার্শ্বে অগণিত হাড়
পচা মাংসে পোকার মিছিল
কাদায় খণ্ডিত কত বেনামি শরীর ইতস্তত
ভিয়েতনামে কি বাংলাদেশে
জীর্ণ জুতো পদহীন এই পটভূমি
তুমি কি দেখতে পাচ্ছ সে আকাশ যেখানে সর্বদা
সূর্যাস্তের মূক কলরোল

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ দুই
বিপরীত দিকে দুটি হাত
পড়ে আছে মধ্যে ভস্মস্তূপ রুক্ষ পথে
প্রান্তরে বিষণ্ন ক্লান্ত উদ্বাস্তুর ভিড় বিশ্বময়

হঠাৎ কোথেকে এক বিশীর্ণ বালক
মৃত্যুর মুখোশ এঁটে মাতে মূকাভিনয়ে এখানে
নৈঃসঙ্গের হুহু ঠোঁট ঘেঁষে কত লোক
শূন্যতায় এলোমেলো করে বিচরণ
তাদের ললাটে ঝোলে দুঃখের ফলক

আমরা দু'জন আছি পাশাপাশি যেমন দু'ফোঁটা
জল থাকে বেদনার্ত দুটি চোখে এ নৈরাশ্যে
আমি রাখি ব্যগ্র ওষ্ঠ থরোথরো অধরে তোমার
সে চুম্বন থেকে জন্ম নেয় অলৌকিক পদ্ধতিতে
অজস্র নক্ষত্র
এবং জীবন ওঠে নেচে বাঁশি হাতে ভস্মের আড়াল থেকে
নতুন গোলাপ নিয়ে যেন অর্ফিয়ুস

আবার মুষলপর্ব

কোথাও নদীর বাঁক, গাছপালা, কোথাওবা দুঃখময় ধু-ধু মাঠ।

হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত ওরা অহর্নিশ; কখনো পথের মোড়ে থামে,
কখনো বিশ্রাম খোঁজে ক্যাম্পে, কখনোবা
সহসা ছিটকে পড়ে দিগ্বিদিক। এ যুগে সর্বত্র
ঘরপোড়া লোক, ইউরোপে এশিয়ায় লক্ষ লক্ষ। বিপর্যয়ে
যূথচারী ওরা সব, অথচ একাকী। বিচ্ছিন্নতা
বয়ে বেড়াতেই হয়, এমনকি বাংলাদেশে আমাদেরও।
বাস্তবিক বিশ শতকের গোধূলিতে ছেঁড়া তাঁবু
ঘাড়ে নিয়ে পৌঁছেও আমরা
কুরুক্ষেত্র, মহাপ্রস্থানের
পাত্রপাত্রী। কিন্তু আজ জলেস্থলে কোথাও দেখি না
দুর্গম পথের যাত্রী সেই একা কুকুরের ছায়া।

হঠাৎ দুপুরে ব্যেপে আসে কালসন্ধ্যা
ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে, কলোনিতে যাদের নিবাস
কিংবা যারা বাঁধে ডেরা ফুটপাতে কি গাছতলায়
তাদের শিরায় ডাইনোসরের বিকট চিৎকার
জেগে ওঠে মাঝে-মধ্যে– শুরু হয় অবলীলাক্রমে
আবার মুষলপর্ব; কে কার অস্ত্রের ক্ষিপ্র ভীষণ ঠোকরে
চকিতে ছিটকে পড়ে, বোঝা মুশকিল। এ ক্ষুধিত অন্ধকারে
শত্রুমিত্র সবাই একাকার।
ছিন্নভিন্ন নর-নারী, রক্তে
ভাসে পথঘাট কী ব্যাপক আর কৃতান্তের মতো
কিরাতের বিষকালো শরে
অবিরত গোঙায় সভ্যতা বেদনার্ত রৌদ্রজলে।

আমার উড়োজাহাজ

কেবল সে-ই তা পারে। আমার বুকের রানওয়ে থেকে দ্রুত
ছুটে দূর নীলিমায় উড়ে যায় মেঘেদের স্তরে,
অন্ধকারে কান্তিমান, রৌদ্রে ঝলসিত
দ্যাখো, কী সুন্দর উড়োজাহাজ আমার।

দ্যাখো, উড়োজাহাজ আমার
বাণিজ্যিক এলাকার মসৃণ পাথুরে অরণ্যের
অনেক ওপর দিয়ে মন্দিরের চূড়ো, মসজিদের
একলা মিনার থেকে বহুদূর শূন্যে উড়ে যায়,
আবার চকিতে আসে ফিরে
আমার নিজস্ব করতলে।

লাল নীল কাগজের টুকরো গেঁথে কেমন মায়াবী
পদ্ধতিতে বানিয়েছি এই উড়োজাহাজ গোপনে।
অনেকে তাকিয়ে দেখে ঈর্ষাতুর চোখে; ওরা আসে
দলে দলে, একজন অপরের পুনরুক্তি অবিকল, আর
বলে একই তপ্ত স্বরে,– 'কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেল
এ জাহাজ', যেন ছাত্রদল সরব মুখস্থ করে পাঠ।

কেউ এই উড়োজাহাজের পাখা ছিঁড়ে ফেলে, কেউবা হঠাৎ
নখ দিয়ে ফুটো করে পেট। 'আমার নিকট থেকে
তোমরা নিয়েছ কেড়ে বহু কিছু, উড়োজাহাজটা
একান্ত আমার থাক' বলে দিলাম উড়িয়ে প্লেন।
আহত সে অনুপম উড়ে যায়, ছায়া পড়ে থাকে,
মাটিতে লুটিয়ে ছায়াটিকে দিই অধীর চুম্বন।

আনাড়ি

যতই হই না কেন মনোযোগী, ভুলচুক ছায়ার মতন
করছে অনুসরণ আমাকে রাত্রিদিন।
এখনও কোকিল বসন্তকে দ্যায় সুরের গৌরব
কী সহজে, পাখি ঠোঁটে খড়-কুটো নতুন বিশ্বাসে
বয়ে আনে, বানায় আপন ঘর শিল্পীর নিষ্ঠায়;
হরহামেশাই

দেখি পথে কর্মিষ্ঠ শ্রমিক তোলে মাটি
কোদালের ঘায়ে,
শ্রমের নিপুণ ছন্দে দোলে তার পেশল শরীর।

কী-যে হয় এ আমার, প্রত্যহ কিছু না কিছু ভুল
করে ফেলি, অথচ দেখছি চতুষ্পার্শ্বে কত লোক
তাদের নিজস্ব কাজ সারে চমৎকার
রূপদক্ষতায়।

আমাকে দেখুন,
সামান্য একটা সিগারেট ধরাতে গিয়েই, হায়,
কয়েকটি ঢ্যাঙা কাঠি খরচা করে ফেলি
এবং ছিটিয়ে দিই ছাই ঘরময়। বরাবর
ঘর গোছানোর শখ আমার, অথচ যতবার
সোৎসাহে গোছাতে যাই, ততবার সব
নয়-ছয় হয়ে যায় বড় বেশি আর
কখনো বিদেশে গেলে সুটকেশ উথাল-পাথাল
করেও সবচে'
জরুরি জিনিসটাই খুঁজে পাই না বস্তুত।

চেনা মনে করে বারংবার রাস্তার লোকের দিকে
ছুটে যাই, হাত ছুঁই। কিন্তু ভুল ভাঙলে অচেনা
সে ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাইতেও ভুল হয়ে যায়।
যখন কাউকে প্রাণ খুলে
দরাজ গলায়
বিষম ডাকতে ইচ্ছে হয়, আমার কণ্ঠনালিতে
রাজ্যের কুয়াশা এসে জমে; প'ড়ে থাকি এক কোনে
স্বরহীন, অসহায়, একা।

একটি নতুন
কবিতা লেখার জন্যে সারারাত জেগে
থাকার উত্তাপ নিয়ে অস্তিত্বের ভিতর মহলে,
ভোরের আলোয়
জ্বালাধরা টকটকে চোখে দেখি, হা কপাল, সাদা
কাগজে কখন সাজিয়েছি ভুলভাল পঙ্‌ক্তিমালা,
যেমন ক্যাপ্টেন দ্যাখে লাইনে দাঁড়ানো
তার সেনাদের কারো মাথায় সবুজ

হেলমেট নেই, কারো পায়ে শুধুমাত্র জীর্ণ মোজা,
ঝকঝকে বুট নেই, কেউবা নিদ্রায় জবুথবু।

দোহাই আপনাদের, আপনারা কেউ
আমাকে কখনো
নেভাতে বলবেন না পাড়ার আগুন।
আমি বালতিটা হাতে নিলেই আগুন আরো বেশি
ফুঁসে ফুঁসে উঠবে এবং হয়ে যাবে আরো জেদী।

যে কেউ ডাক দিক

বন্ধ ঘরে প্রতিদিন প্রতীক্ষার ভার বয়ে চলি; অন্ধকারে
সর্বক্ষণ তার পদধ্বনির দিকেই কান পেতে রাখি আর
নিদ্রার মিতালি করি অস্বীকার, ভয়
যদি সে দরজা থেকেই নিঃশব্দে অভ্যর্থনাহীন
চলে যায়। বার-বার দরজার দিকে ছুটে যাই,
কিন্তু তার দেখা নেই আমার এই নিবাসে কোথাও।

মধ্যরাতে অকস্মাৎ একটি গোলাপ,
আমার নিভৃত ঘরে ভাসমান, যেন ব্যালেরিনা;
বলল, 'কতকাল
তাকাওনি ফিরেও আমার দিকে, তাই
সকল বন্ধন ছিঁড়ে স্বয়ম্বরা হলাম এখন।'
গোলাপি সত্তায় তার উত্তর বুলোই :
হৃদয়ে তোমার ক্রূর কাঁটা রক্ত ঝরায় কেবলি।
তোমাকে ডাকিনি আমি, মিছেমিছি তুমি কেন এলে?
'শুধু আমি নই', বলল সে খণ্ডিতা নারীর মতো,
'নক্ষত্র, চন্দনা পাখি, নদীর কিনার,
এবং জ্যোৎস্নার মোজাইক
সবাই ডাকছে
তোমাকে বাইরে, কতকাল তুমি এই বন্ধ ঘরে
ব'সে আছ, উদাসীন। নিঃসঙ্গতা তোমাকে করাচ্ছে
তুর্কি স্নান।'

আমি আজ অন্য কারো ডাকে সাড়া দিতে
ঘুম গুম খুন করে বসে নেই। দোহাই তোমার,
চলে যাও, আমি শুধু একটি পদধ্বনির জন্যে

প্রতীক্ষায় আছি।
দরজায় টোকা পড়ল কি ফের? যদি গিয়ে তাকে
না দেখি সে ভয়ে দরজাটা আর খোলাই হয় না।

রক্তে কখন

পুষ্পমদির রক্তে কখন লক্ষ পাখি ডেকে ওঠে,
চমকে উঠি বনতরাসে।
এই নাগরিক ফ্ল্যাটে হঠাৎ কেন বনের দীর্ঘ ছায়া
এমন করে দিচ্ছে হানা অবিরত?

মনের ভেতর ঝোপের পাতা সুদূর কোনো
পিতামহের কণ্ঠস্বরে
বলে কথা,
বাকল-পরা দূরবাসিনী, ভাষাহীনা বন্যপশুর
চর্বি-গলা আলোয় হাসে,
ভব্য আমি ট্রাউজারে আর ঝোপকামিজে।

কথায় কেমন হিসেব-টিসেব থাকে গাঁথা;
পথের মোড়ে ক্ষণেক দাঁড়াই,
চেনা-জানা কাউকে দেখে মৃদু হেসে
হাতটি বাড়াই, যেন হঠাৎ
ভাড়া-করা উষ্ণতাকে জিইয়ে রেখে,
সিগারেটের ভস্ম ঝরে যথারীতি।

কিন্তু তবু কখন যেন বেলাবেলি
কী ঘটে যায়,
অচেনা কেউ গৃহহারা

সামনে দাঁড়ায় মুখোমুখি–
রক্ত তখন 'হে প্রবাসী কখন এলে?'–
বলেই ওহো খলখলিয়ে
হেসে ওঠে।

আমাকে সেই পান্থ কেবল বনবাদাড়ে
টেনে বেড়ায়।
খানাখন্দে পড়তে পড়তে সামলে উঠি।
দৈবক্রমে।
হায়রে তবু মনের বিষম অন্ধকারে

দৈব টৈব মারে উঁকি।

এমন ধন্দে কে ছড়াল হাতের আলো?
কোন সে পান্থ সতর্কতায় ঝলমল?
অবাক-মানা চক্ষু মেলে দেখি এসে দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি
রুক্ষ পথে নগ্ন পায়ে
ভালবাসা।

কোনো ঐন্দ্রজালিকের প্রতি

আপনি ঐন্দ্রজালিক, ভুবনের আড়ালে ভুবন দেয় ডাক
মায়াবী সংকেতে, চলে নানা খেলা। স্টেজে স্টেজে সবাইকে তাক
লাগিয়ে দেয়াই কাজ আপনার। হয় কত কী যে
শত শত বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে আর নিজে
আপনি থাকেন অবিচল, বিজ্ঞাপনী হাসি হেসে ক্ষিপ্রতায়
ঘটান বস্তুর রূপান্তর বার-বার। কী প্রথায়

চোখের পলকে ফের দ্বিখণ্ডিত উদ্ভিশন শরীর খেলাচ্ছলে
লাগান নিখুঁত জোড়া, অবিশ্বাস্য বটে। লোকে বলে,
রেখেছেন আস্তিনের আড়ালে লুকিয়ে সব যন্ত্রপাতি, সত্যি
আপনি তো অলৌকিক মেকানিক! যে যাই বলুক, একরত্তি
খুশি নই
আপনার ইন্দ্রজাল দেখে, বরং বিষণ্ন হই
রঙিন টিকিট কিনে প্রতিবার। বস্তুত নিশ্চুপ থাকি উল্লোল মেলায়।

চাতুর্য, বিস্ময় আছে খুব এ খেলায়,
ভালবাসা নেই;
তাই শেষে অসামান্য হয় না কিছুই, সামান্য তো সামান্যেই
আসে ফিরে। এ তুচ্ছতা নিয়ে মেতে কী আনন্দ পান?
কী লাভ সাজিয়ে ক্ষণিকের এই অলীক বিতান?

পতিত জমিনে কেন হেলায় বাদ্যর তালে তালে অবিরত
ফলান না ফসল অথবা দেশে দেশে আছে যত
অস্ত্রাগার, সেগুলো উদ্যান কেন হচ্ছে না এখনও হায়,
এ বিখ্যাত ইন্দ্রজালে? কেন ট্যাঙ্কগুলো আপনার ইশারায়
হয় না পুষ্পক রথ? রহস্য-ব্রোকেড যাচ্ছে ছিঁড়ে বিজ্ঞানের কী ব্যাপক
হাতে ক্রমাগত আর শুধু রূঢ় ছক
জন্ম নেয় দেশ-দেশান্তরে; এলো বড় বেশি স্বচ্ছতার কাল,
পারলে আমাদের রিক্ত মনে দিন ছড়িয়ে প্রকৃত ইন্দ্রজাল।

চতুষ্পার্শ্বে বয়সের ছায়া

চতুষ্পার্শ্বে বয়সের ছায়া দীর্ঘ হতে থাকে ক্রমে।
আমার হৃদয়ে পাতা ঝরে, পাখি
শব্দহীন ফেলে যায় অনেক পালক। আজকাল
ব'সে থাকি প্রায়শই বারান্দায় পুরোনো চেয়ারে,
হাওয়া সাদা-কালো চুলে বুলোয় আদর খেলাচ্ছলে,
কয়েকটা কাক দূর থেকে
তাকায় আমার দিকে। ছেলেমেয়ে স্কুলে,
অসুস্থ ছেলেটা স্তব্ধ দেয়ালের দিকে
মুখ রেখে, গৃহিণী হেঁসেলে, মাঝে-মধ্যে
বেজে ওঠে ব্যস্ততার বোল। আশেপাশে নেই কেউ,
নিঃসঙ্গতা বয়সের নিত্যসঙ্গী ইদানীং, নাকি
যুগচিহ্ন এই?

অথচ এও তো জানি, হঠাৎ অসুস্থ হলে আমি
আমার স্বাস্থ্যের জন্যে কেউ অগোচরে
ব্যাকুল প্রার্থনা করে, আমার আনন্দে উল্লসিত
হয়, শোকে অত্যন্ত কাতর। যারা আমার কবিতা
ভালোবাসে তাদের শুভেচ্ছা ফুল হয়ে ঝরে পথে,
চলতি পথে কেউ নাড়ে হাত, কেউ হাবি দেয় উপহার।

তবু কি বলব আমি একা, এই চেনা বিশ্বে?

নিজের ছায়া

প্রত্যহ
নিজের ছায়া দেখে দেখে আমি ক্লান্ত।
ডানে-বাঁয়ে যেদিকেই তাকাই
তাকে দেখি, অর্থাৎ আমার ছায়াকে।

আমার ছায়ার ভেতর থেকে
এমন কিছু উঠে আসে না,
যা আমার জ্বরতপ্ত ললাটের জ্বালা
জুড়োতে পারে,
আমার অনিদ্রার চরে
বইয়ে দিতে পারে নিদ্রার জোয়ার।

অথচ কখনো-কখনো
আমার ছায়া নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে

মাথা ঝাঁকিয়ে
হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় প্রায় সামরিক কেতায়
আর প্রচণ্ড রাগী সুরে
আমার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলে–
আমি আর তোমার বেগার খাটব না,
এবার বেরিয়ে পড়ব ঠিক আর
যা কিছু আমার বেঠিক মনে হবে,
ভেঙে তছনছ করে দেব সব,
তুমি আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

আমার ছায়ার স্পর্ধায় আমি চমকে উঠি।

প্রত্নতাত্ত্বিক

বাইরে বাইরে আমি খুব ঘোরাফেরা করে থাকি।
পায়ে ধুলোবালি, চুলে খড়কুটো, না-কামানো দাড়ি
দু'চার দিনের, চুলকোনিপ্রবণ এবং অন্ধকার
নুড়িময় উৎসে এক গভীর পিপাসা ইত্যাকার
ভ্রমণের চিহ্ন লেগে আছে রুক্ষ সমস্ত শরীরে।
সংঘে সংঘে রেখে বেলা ঘুরছি বাইরে ক্লান্ত ভিড়ে।
হাওয়া কালকূটে ছাওয়া; এই শ্বাসরোধকারী
পথে বিদেশীর মতো কত আর ঘুরব একাকী?

এখন ভেতরে যাওয়া প্রয়োজন, জ্যোৎস্নার মতন
মশারির অভ্যন্তরে একা স্মৃতির বিস্তর ছাই
ঝাড়া, চুল টানা বুকে মৃদু হাত বুলোনো ইত্যাদি
কাজে অগোচরে কথঞ্চিৎ লিপ্ত হওয়া প্রয়োজন।
প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো আজ নিজে নানান আদি
স্তর খুঁড়ে খুব ঘন ঘন শিহরিত হতে চাই।

নৈশ প্রহরে পরস্পর

কি শুনে হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুম গভীর রাত্তিরে?
কবর খোঁড়ার শব্দ, নাকি প্রেতের আবছা স্বর
আমাকে জাগিয়ে দিল? পর মুহূর্তেই ভাঙে ভুল–

আমার শয্যার পাশে দেখি একা রয়েছে দাঁড়ানো
আমারই সন্তান। তার কণ্ঠস্বর যেন কোনো দূর
বিষণ্ন সৈকত থেকে এলো ভেসে : 'এই এই, শোনো,
কে তুমি, কে তুমি?' তার প্রশ্নের শলাকা হল বিদ্ধ
হৃৎপিণ্ডে আমার; আর্ত আমি, অসহায়, তার দিকে

চেয়ে থাকি, বোবা, চেষ্টাহীন। কতদিন তার কত
ভৌগোলিক কৌতূহল মিটিয়েছি, নিত্য খুঁটিনাটি
প্রশ্নের উত্তর আমি জুগিয়েছি তাকে সহজেই।
অথচ এখন ব্যর্থ, পরাজিত এ নৈশ প্রহরে।

জানি সে অসুস্থ এক অসুখী বালক, হয়তোবা
সুখ-দুঃখ তাকে আর করে না বিহ্বল! নিমেষেই
স্বাভাবিক রৌদ্রছায়া তার চোখে, হায়, অন্য কিছু
হয়ে যায়! আমিও অস্পষ্ট চেনা, কখনো অচেনা

তার কাছে। কিন্তু তবু তার সেই ভীষণ জিজ্ঞাসা
প্রাসঙ্গিক বড় বেশি। তাহলে কে আমি? কার
পরিচয় আজ তুলে ধরব এই বালকের কাছে?
যে প্রবল ভোগী জীবনের গ্রীবায় চুম্বন আঁকে

বার-বার, তার? নাকি যে-যোগী অলক্ষ্যে হাঁটে ধু-ধু
প্রান্তরে একাকী, রুক্ষ, রিক্ত, হাতে রাখে না কিছুই,
তার? কিংবা অস্তিত্বের স্তরে স্তরে নানান যুগের
স্মৃতির ভগ্নাংশ নিয়ে যারা হাসে, কাঁদে, চুল ছেঁড়ে,

দেখা দিয়ে সহসা লুকায়, মুখ ঢাকে মনস্তাপে,–
আমি কি তাদেরই কেউ বাস্তবিক? বিনষ্ট, দণ্ডিত?
দ্বিধার ঠোকরে ছিন্নভিন্ন নিজেকেই প্রশ্ন করি
ঘুরে ফিরে, বলো তবে কোন আমি প্রকৃতই আমি?

সম্মুখে দাঁড়ানো প্রশ্নাকুল যে বালক, তার মধ্যে
আমার ঔরসজাত সন্তান কোথায়? এই ঘরে
সুস্থ, স্বাভাবিক সারাবেলা করত যে খেলা, করেছে
সে প্রস্থান বহুদূরে; একে আমি চিনি না বস্তুত।

এ এক নির্জ্জান তটে রয়েছি দাঁড়িয়ে আমি আর
আমার সন্তান, যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, নিরুত্তর।

বিধ্বস্ত নীলিমা

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৩ [ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭]
প্রকাশক বইঘর, চট্টগ্রাম
প্রচ্ছদ-শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী
উৎসর্গ-পত্র জোহরাকে

ভীষণ অস্থির আমি, সম্প্রতি ক্ষমায় অপারগ।
সদর রাস্তাকে ভয়, ঘোরালো সিঁড়িকে ভয়–কী যে এই রোগ।
আমার জীবন যেন সীমাহীন অরণ্যে রোদন।
বস্তুতঃ স্বভাবদোষে যাত্রাশেষে সরাইখানার উদ্বোধন
কখনো পড়ে না চোখে, শিউরোনো অন্ধকারে ভীতি
ওৎ পেতে থাকে, যেন জ্বলন্ত চোখের পশু, পাই না প্রতীতি
কিছুতেই; চতুপার্শ্বে সবকিছু যাচ্ছে ধ'সে। 'এখন এখানে
পাতি পাতি কী খুঁজছো শামসুর রাহমান?' বলে কেউ বিনষ্ট বাগানে
চলে যায়। প্রাণপণে ডাকি, নিরুত্তর সে উধাও।
জনহীনতায় শুধু নিজেরই ভয়ার্ত স্বর বাজে, 'সাড়া দাও'।
আজীবন যে নীলিমা ভালোবাসো তা-ও অবিরত
সর্বত্র পড়েছে খসে ভয়ানক দ্রুত চাপ চাপ রক্তের মতো।

কবিতার অন্তঃপুরে

যেতে চাই, আকৈশোর মগ্নতায়, অতি সন্তর্পণে
স্বপ্নের নীলাভ সাঁকো বেয়ে
কবিতায় অন্তঃপুরে যেতে চাই। হয়তো সেখানে
রহস্যের ফটক পেরিয়ে
দেখব আছেন সেই অমর বাগানে
নয়জন ভুবন-মোহিনী;
নয়টি নিবিড় নীল চেয়ারে হেলান দিয়ে বুনছেন কিছু
অন্তহীন সোনালি সুতোয়।

ফুলগুলি (হলদে, লাল, সুনীল, বেগুনি)
বাতাসে নর্তকী যেন। কেবলি হোঁচট খাই, সার্চলাইটের
ঝাঁ-ঝাঁ আলো দেখাবে না পথ জানি, তবু যেতে চাই
উজিয়ে সকল বাধা প্রেমিকের মতো।
হয়তো সেখানে
দেখব রাস্তার ধারে চিতাবাঘ সূর্যমুখী ফুলে
মুখ রেখে বাঘিনীর স্মৃতি আনে ডেকে
কিংবা কাকাতুয়া কোনো দাঁড়টাকে তার
বানিয়ে চাঁদের নৌকো আহ্লাদে দুলছে সর্বদাই।
রঙিন ধুলোর পথে মনে হবে বিকেলের আলো
সুন্দরবনের
তরুণ জ্বলন্ত বাঘ হয়ে ফের নেছে নদীতে!

দেখব চকিতে,
কয়েকটি ঘোড়া দ্রুত কাকে যাচ্ছে নিয়ে–
বৃষ্টির সুরের মতো আরক্ত কাঁকরে খুর বাজে,
খুর বাজে শুধু।

সুবচনী হাঁস নিয়ে খেলছে বালক, জানালার
অনেক বাইরে ঝুঁকে ডাকছে মা বেলা গেল বলে।
বারান্দায় একা ব'সে কে এক প্রবীণ ভদ্রলোক
নিমগ্ন দান্তের কাব্যে, সূর্যাস্তের গাঁদা ফুল-রঙ
বিশুষ্ক ফলের মতো মুখে পড়ে; জানু বেয়ে তার
একটি চঞ্চল শিশু উঠছে নামছে বার বার।
ইহুদিটা শহরের বাড়িগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছে উড়ে,
থলি কাঁধে, জীর্ণ টুপি নড়ছে মাথায়। কোনোমতে

কাকের চোখকে দিয়ে ফাঁকি
কেউবা ছিঁড়ছে রুটি, ক'দিনের বাসি, নড়বড়ে
পাঁচিলের ধার ঘেঁষে। কাকগুলি পাখা ঝাপটায়
নগরের সুবিশাল নীলপক্ষ ঘড়ির আয়নায়।

ছাদের চূড়োয় বুঝি একা কেউ বাজায় বেহালা
ভুল সুরে। মধ্যরাতে উলঙ্গ গাধার পিঠে কেউ
গান গায় তারস্বরে। কী যেন পুড়ছে ভয়ানক
শব্দ করে, সভ্যতার বিশ্বস্ত দলিল হয়তোবা।
নিমেষেই সমস্ত শহর
দেখব কী করে হয়ে যায় ফণিমনসার বন
–এই তো মিশ্রিত চিত্র (সব নয়) সেখানে ছড়ানো।

মেঘ-রৌদ্র, এভেনিউ টেলিগ্রাফ তার ইত্যাদির নাম ধরে
ডেকে-ডেকে যাব চলে ঐ কবিতার অন্তঃপুরে ॥

যে আমার সহচর

আমি এক কংকালকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটি, প্রাণ খুলে
কথা বলি পরস্পর। বুরুশ চালাই তার চুলে,
বুলোই সযত্নে মুখে পাউডার, দর্জির দোকানে নিয়ে তাকে
ট্রাউজার, শার্ট, কোট ইত্যাদি বানিয়ে ভদ্রতাকে
সঙ্গীর ধাতস্থ করি; দু'বেলা এগিয়ে দিই নিজে
প্রত্যহ যা খাই তাই। কখনো বৃষ্টিতে বেশি ভিজে
এলে ঘরে মাথাটা মুছিয়ে তপ্ত চায়ের পেয়ালা
রাখি তার টেবিলে সাজিয়ে আর শোনাই বেহালা

মধ্যরাতে বন্ধ ঘরে। মাঝে-মাঝে তাকে হৈ-হৈ রবে
নিয়ে যাই বন্ধুদের গুলজার আড্ডার উৎসবে।
সেখানে সে বাক্যবীর, দর্শনের অলিগলি ঘুরে
শোনায় প্রচুর কথামৃত, সাহিত্যের অন্তঃপুরে
জলকেলি করে তার বেলা যায়, কখনোবা ফের
"শোনো বন্ধুগণ, আত্মাটা নিশ্চয় দামি পাথরের
বাক্স নয়,... সংশয়ের কালো জলে পারবে কি ভেসে
যেতে এই আত্মার পিছল বয়া চেপে নিরুদ্দেশে?
পাবে তীর কোনো দিন?"–ইত্যাকার চকিত ভাষণ

দিয়ে সেও প্রগল্‌ভ আড্ডাকে করে প্রভূত শাসন।

গলির খেলুড়ে ছেলে যে আনন্দে কাগজের নৌকো
ছেড়ে দেয় রাস্তা-উপচানো জলে কিংবা কিছু চৌকো
ডাক টিকেটের লোভে পিয়নের ব্যাগের ভিতর
দৃষ্টি দেয়– তারই খুশি কংকালের দুটি যাযাবর
চোখ ধরে রাখে। তারপর অকস্মাৎ, "মনে আছে
হাতের বইটা ফেলে রেখে বারান্দায় খুব কাছে
টেনে নিয়েছিলে কাকে? মনে পড়ে সে কার ফ্রকের
অন্তরালে উন্মীলিত হিরন্ময় মসৃণ ত্বকের
অন্তরঙ্গতায় তুমি রেখেছিলে মুখ? মনে পড়ে
গোধূলিতে কৌমার্য হরণ সেই কৈশোরের ঘরে?"
–বলে সে কৌতুকী উচ্চারণে, যে আমার সহচর,
রয়েছে যে রৌদ্রজলে পাশাপাশি ছত্রিশ বছর।

আমি এক কংকালকে সঙ্গে নিয়ে চলি দিনরাত
অসংকোচে, আতংকের মুখোমুখি কখনো হঠাৎ
তাকে করি আলিঙ্গন, প্রাণপণে ডাক নামে ডাকি
দাঁড়িয়ে সত্তার দ্বীপে নি-শিকড়, একা, আর ঢাকি
ভীত মুখ তারই হাতে। যে কংকাল বান্ধব আমার
তাকে নিয়ে গেছি নিজের প্রিয়তমার কাছে আর
অকাতরে দয়িতার তপ্ত ঠোঁটে কামোদ চুম্বন
আঁকতে দিয়েছি সঙ্গীটিকে! কী যে নিবিড় বন্ধন
দু'জনের অস্তিত্বের গ্রন্থিল জগতে, বুঝি তাই
ঘৃণায় পোড়াই তাকে, কখনো হৃদয়ে দিই ঠাঁই!

সম্পাদক সমীপেষু

আমরা বাগান চাই আমরা ক'জন অকপট,
শান্তিবাদী ক্লান্ত নাগরিক এমন বাগান চাই
যেখানে ফুলের কাছে সহজে পারব যেতে, ঘাসে
চিৎ হয়ে শুয়ে দিব্যি পা দুটো নাড়ব অকারণ
মাঝে মাঝে। কী কী ফুল থাকবে বাগানে তার সুদীর্ঘ তালিকা
বলো তো পাঠাতে পারি পৌর সমিতির কাছে। ভদ্রমহোদয়,

আমরা বাগান চাই, আমরা ক'জন হতচ্ছাড়া,

যারা মাঝরাস্তা দিয়ে ভাগ্যের ছ্যাকড়া গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে
বড় বেশি ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছি সম্প্রতি, আমরাই
শহরে বাগান চাই লিরিকের প্রসন্নতা-ছাওয়া;
এবং বিশ্বেস করো আছে আজও চাওয়া সাহস।

২

চেতনপুরে ফুলের চারায় ধরল নতুন কলি;
ছেঁড়া জামায়, জুতোর গর্তে করছি স্বপ্ন জড়ো।
স্বপ্ন-আভায় স্বর্গ হলো চেনা ময়লা গলি,
হিংসুটে সব মত্ত পথিক সরো তোমরা সরো।
আমরা কিছু দুর্বিনীত বাগান বাগান বলে
কান করেছি ঝালাপালা মানী-গুণীর বটে।
ফুলবাগানের অলীক মালী শুনছি সে কোন ছলে
মস্ত বাগান সাজিয়ে দেবে, দৈবে কতই ঘটে!

শিল্পকর্মে আস্থা ছিল বলেই ক্ষুধার দাঁতে
দীর্ণ হয়ে ক্লিন্ন প্রাণে পোড়াই আতশবাজি।
ঘুমাক তারা ঘুমাক সুখে নিদ্রা এলে রাতে,
ঝুলিয়ে কাঁধে মরা পাখি আমরা ঘুরতে রাজি।

৩

এমন বাগান চাই যেখানে গেলেই নির্বিবাদে
লতাপাতা জড়ানো ঘোড়ার মূর্তি দেখে অচিরাৎ
ভুলবো দুঃসহ শোক, বস্তুত বাগানে এসে কোনো কোনো দিন—
বুধবার, শুক্রবার, কিংবা রবিবার, হোক না যে কোন দিন,
খুঁজব অদৃশ্য আরোহীকে লোহার ঘোড়ার পিঠে!
দেখব বেঞ্চিতে ব'সে অচেনা কে লোক চুরুটটা
ফুঁকে ফুঁকে ইতস্তত স্মৃতির খোলামকুচি ছড়াচ্ছে প্রচুর।
হয়তো মাথায় ছিট লোকটার, শাগালের ভবঘুরে যেন,
বুঝি নিঃসঙ্গতা কালো সহোদর তার!

আমাদের রমণীর মুখে ফুলের স্তবকগুলি
মেলুক আরক্ত ডানা, আমাদের শিশুদের মুখে
দয়ালু বাতাস দিক চুমু ঘন ঘন, ফুলবাগানের ডাল
মাতাল কবিকে দিক কবিতার পঙ্‌ক্তি উপহার।

এবং সেসব ডালে বিষ পিঁপড়েরা কখনো সদলবলে
বাঁধতে না পারে যেন বাসা; যদি বাঁধে

তাহলে কী করে যাব বাগানের পথে? কী করে ছেলেরা ডাল
বেয়ে বেয়ে কেবলি হারিয়ে যাবে পাতার জঙ্গলে?

ভদ্রমহোদয়! বারো মাস তের পার্বণ-কাতর
লাজুক আত্মাকে বসতিতে যথাযথ
রাখার প্রয়াসে নিত্য উচাটন আমরা কখনো
গুহাকে করিনি ঘর, রাখিনি পানীয় করোটিতে,
আঁকিনি স্বর্গের নকশা বাঘছালে, তুকতাক মন্ত্রের প্রাচীন
কোনো পুঁথি ছিল না সম্মুখে খোলা সর্বক্ষণ। হল্‌দে
পুঁথির তুলোট পাতা আকাঙ্ক্ষার শবটাকে কখনো পারে কি
দিতে চাপা? একদিন লক্ষ্যে পৌঁছে যাব নিরাপদে
আমরা তেমন কেউ নই; দূরে ও নিকটে
প্রকৃতই লক্ষ্য কিছু আছে কিনা সেও তো জানি না।

নানান ফুলের গাছে সুশীতল জল দেব বলে
দু'বেলা অসীম ধৈর্যে ঝারি হাতে সবাই প্রস্তুত,
অথচ বাগানই নেই, কোথাও বাগান নেই আজ।

কোনো অশ্বারোহীকে

মধ্যযুগের পুরু মৃত্তিকা ফুঁড়ে
হঠাৎ এসেছ, শরীরে বীরের ঢং।
পাথুরে জমিতে আলো ফুলকি ওড়ে,
বর্ম তোমার অনেক জবরজং।
ঘোড়ার খুরের শব্দে চমক লাগে,
নগরবাসীর জিজ্ঞাসু চোখ জ্বলে :
"অবেলায় এলো এ কোন অশ্বারোহী?"
প্রাক্তন ঘোঁড়া ভড়কালো কোলাহলে।

কারুকাজময় গবাক্ষে হাত রেখে
দয়িতা তোমার দাঁড়াবে না ব্রীড়াভরে,
দেখাবে না পথ ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে;
এখন সে লোটে নিয়ন-দীপ্ত ঘরে।

জয়ের নেশায় রক্তগোলাপ দেখে
তুমি বিবিক্ষু একেলে বিসংবাদে?
স্বেদাক্ত ঘোড়া দ্বিধায় দুলকি চলে,

অজানা পথের চিহ্ন বুঝতে বাধে।

তুমি কি বোঝো না ডুয়েলের দিন গত?
তবে কেন বৃথা উঁচিয়ে নগ্ন অসি
তেরে আসো আজও একালের পোড়ো মাঠে?
প্রাচীন জরিতে ছড়ায় কালের মসী।

ড্রাগন হননে সুবেশ অশ্বারোহী
এসেছ উড়িয়ে অনেক যুগের ধূলি?
তোমার সুনীল ঘোড়ার খুরের ঘায়ে
পালকের মতো উড়ছে মড়ার খুলি!

ড্রাগনের দিন হয়নিকো অবসিত,
কিন্তু তোমার বর্শা অকেজো আজ।
দ্যাখো ভীষণের নৃত্যনাট্য দ্যাখো,
দ্যাখো জনপথে জন্তুরা জাঁহাবাজ।

তোমার বর্ম অথবা অশ্ব দেখে
উঠব কি মেতে অর্বাচীনের মতো?
ভুলিনি ভীষণ রক্তবমন আজও,
এখনও কাঁদায় মহাসমরের ক্ষত।

লুপ্তি ঘনায় সব দিগন্ত জুড়ে,
পাঁজর-খাঁচায় পিশাচের তাল গুনি।
কার নিঃশ্বাসে ফুলেরা ভস্মীভূত?
নিরুপায় শুধু ধ্বংসের কাল শুনি।

এ যুগের আঁধি রুখবে কি দিয়ে বলো?
লুকাও বরং অতীতের কোনো গড়ে।
বল্লম আর সাধের শিরস্ত্রাণ
শোভা পাক আজ ঘুমন্ত জাদুঘরে ॥

শৈশবের বাতি-অলা আমাকে

সর্বাঙ্গে আঁধার মেখে কী করছ এখানে খোকন?
চিবুক ঠেকিয়ে হাতে, দৃষ্টি মেলে দূরে প্রতিক্ষণ
কী ভাবছ ব'সে?
হিজিবিজি কী আঁকছ? মানসাঙ্ক ক'ষে

হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছ? দেখছ কি কতটুকু খাদ
কতটুকু খাঁটি এই প্রাত্যহিকে, ভাবছ নিছাদ
ঘরে থাকা দায়, নাকি বইপত্রে ক্লান্ত মুখ ঢেকে
জীবনের পাঠশালা থেকে
পালানোর চিন্তাগুলো ভ্রমরের মতো
মনের অলিন্দে শুধু ঘোরে অবিরত?

থাক, থাক–
মিথ্যে আর বাজিও না দুশ্চিন্তার ঢাক।
নীলের ফরাশে দ্যাখো বসেছে তারার মাইফেল আজও, শোনো
কী একটা পাখি ডেকে ওঠে না-না হয়নি এখনও
অত বস্তাপচা এই সব। লজ্জার কিছুই নেই,
দ্যাখো না খুঁটিয়ে সব আর দ্যাখো এই
লণ্ঠনের আলো, সম্মোহনে যার কল্পনার ওড়াতে ফানুস,
পোড়াতে আতশবাজি আনন্দের খুব,
আশ্চর্যের হ্রদে দিতে ডুব।
করেছ কামনা যাকে প্রতিদিন সন্ধেবেলা, আমি সেই আজব মানুষ।

তোমার পাড়ায় আজ বড় অন্ধকার। সম্ভবত
বাতিটা জ্বালাতে ভুলে গেছ, আমি অভ্যাসবশত
কেবলি আলোর কথা বলে ফেলি। মস্ত উজবুক
এ লোকটা– বলে দাও দ্বিধাহীন। ভয় নেই, দেখাব না মুখ
ভুলেও কস্মিনকালে। তোমরা কি অন্ধকার-প্রিয়?
চলি আমি, এই লণ্ঠনের আলো যে চায় তাকেই পৌঁছে দিও ॥

যন্ত্রণা

আমার ছেলেটা জ্বরে ধুঁকছিল, জ্বলছিল তার
চোখ দুটো, টকটকে কৃষ্ণচূড়া। কী ভেবে নিলাম
ছোট হাত মুঠোর ভিতর আর ছুঁয়ে দেখলাম
কপালটা যাচ্ছে পুড়ে, হাঁপাচ্ছে সে এবং মাথার
ব্যথায় কাতর খুব। শুকনো ঠোঁট পাখির ছানার
দুরু দুরু বুক যেন, টের পাই। বাইরে উদ্দাম
হাওয়া, দরজায়, জানালায় দিচ্ছে হানা অবিরাম।
কেবলি শিউরে উঠি ডাক্তারকে ডাকব আবার?

কৃষ্ণচূড়া তাকাল আমার চোখে। "খুব বেশি তোর

কষ্ট হচ্ছে খোকা? মাথাটা বুলিয়ে দিই, ঘুমো তুই",
বললাম। সাড়া শব্দ নেই কোনো, বেড়ালটা হাই
তোলে ব'সে এক কোনে। নিদ্রাহীন ভাবি, হায় ভোর
কি হবে না আর? পারব না ওর যন্ত্রণা কিছুই
নিতে আমি! যন্ত্রণায় আমরা নিঃসঙ্গ সর্বদাই।

তিনটি হাঁস এবং পিতামহ

রাস্তার লোকটা সেই তিনটি নিস্তব্ধ হাঁস রেখে
চলে গেল, প্রায় কিছু না বলেই লম্বাটে পা ফেলে
অন্তর্হিত; যেন বোবা, ক্ষমাপ্রার্থী হয়তোবা। দেখি
স্কুটার-দলিত সাদা-লাল হাঁসগুলো বারান্দার
কংক্রিটে নিঃসাড় চঞ্চু রেখে নির্বিকার প'ড়ে আছে
মূক বেহালার মতো।

তাদের শরীর ছুঁয়ে বুঝি
বহু যুগ বয়ে গেছে প্রবল হাওয়ায়। কে বলবে
ওরা তিনজন মৃদু মুরিত বাগানে, খেত খুঁটে
খুদকুঁড়ো, উল্লসিত গুগলি কিছু পুকুরে ফুলের মতো ভেসে
কোনো দিন? এখন তো তারা শুধু তিনটি স্তব্ধতা
বারান্দায়, আমাদের স্নেহের ওপারে। ছায়াচ্ছন্ন
বারান্দায় দৃষ্টি মেলে জেদী পিতামহ
তাঁর অন্ধকার ঘরে একা
সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনার মতো চুল নেড়ে নেড়ে
-যেন সেই ঝড়ের রাতের রাজা, উন্মত্ত লিয়ার-
চতুর্দিক আর্তনাদে দীর্ণ করে বললেন : "ওরে
ফিরিয়ে আনলি কেন শীতল কংক্রিটে?
এখ্‌খুনি নিয়ে যা তোরা, আমার স্বপ্নের শবগুলি
ফিরিয়ে আনলি কেন? নিয়ে যা, নিয়ে যা!"

সময়

সময় ক্ষুধার্ত বাঘ। পশু, পাখি, উদ্ভিদ, মানুষ
গ্রাম আর জনপদ যা পায় গোগ্রাসে গিলে ফেলে
এবং প্রত্যহ খোঁজে নতুন শিকার। চোখ মেলে

চেয়ে থাকে রাত্রিদিন, হিংস্রতায় প্রখর, বেহুঁশ।
অশেষ ধ্বংসের কালি মুখে তার মেখেছে কলুষ
যুগে যুগে। জঠরে কি দাঁতে অবাস্তব ক্ষুধা জ্বেলে
ছুটে যায় লোকালয়ে, সভ্যতায়, গেলে অবহেলে
সব কিছু; মহানন্দে ওড়ায় সে জয়ের ফানুস।

আমাকেও প্রতিক্ষণ খাচ্ছে আঘাটায়, আমি তার
জ্বলন্ত চোয়ালে বিদ্ধ, যেমন উদ্ধার অসম্ভব
জেনেও পথিক কোনো পাহাড়ের খোঁচে প্রাণপণে
পাথর আঁকড়ে ঝুলে থাকে। আর যে মানবতার
দায়ভাগ বয়ে চলি তারই টানে করে যাই স্তব
অমৃতের, যদিও বিরাম নেই কালের হননে।

জনৈক সহিসের ছেলে বলছে

ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ
ঝুলে আছে আকাশের বিশাল কপাটে, আমি একা
খড়ের গাদায় শুয়ে ভাবি
মুমূর্ষু পিতার কথা, যার শুক্‌নো প্রায়-শব প্রায়-অবাস্তব
বুড়োটে শরীর
কিছুকাল ধরে যেন আঠা দিয়ে সাঁটা
বিছানায়। গতায়ু হবেন যিনি আজ কিংবা কাল,
অথবা বছর ঘুরে, আপাতত ভাবছি তাঁকেই,
তাঁকেই ভাবছি যিনি ঘোড়াকে জরুর মতো ভালোবেসেছেন
আজীবন। মুমূর্ষু পিতার চোখে তরুণ ঘোড়ার
কেশরের মতো মেঘ জমে প্রতিক্ষণ। মাঝে-মাঝে
তাঁকে কেন যেন
দুর্বোধ্য গ্রন্থের মতো মনে হয়, ভাষা যার আকাশ-পাতাল
এক করলেও, মাথা খুঁড়ে মরলেও
এক বর্ণ বুঝি না কখনও।

"জকির শার্টের মতো ছিল দিন একদা আমারও,
রেসের মাঠের সব কারচুপি নখের আয়নায়
সর্বদা বেড়াত ভেসে। প্রতিদিন গলির দোকানে
ইয়ার বন্ধুর সাথে চায়ের অভ্যস্ত পেয়ালায়
দিয়েছি চুমুক সুখে। বিড়ির ধোঁয়ায় নানা রঙ।

পরীরা নেচেছে ঘুরে আর অবেলায়
কোথাও অশেষ স্বপ্ন ভাড়া পাওয়া যাবে ভেবে কত
অলিগলি বেড়িয়েছি চষে আর রাতের বাতাসে
উড়িয়ে রুমাল হেসে শত্রুতা, ব্যর্থতা ইত্যাদিকে
কাফন পরিয়ে
আপাদমস্তক
'বলো তো তোমরা কেউ স্বপ্ন ভাড়া দেবে'–
বলে তীব্র কণ্ঠস্বরে মাথায় তুলেছি পাড়া, ভাগ্যদোষে পাইনি উত্তর।
"রাজা-রাজড়ার দিন নেই আর ছাপার হরফে
কত কিছু লেখা হয়, কানে আসে। ছোট-বড় সব
এক হয়ে যাবে নাকি আগামীর সখের নাটকে।
বর্তমানে এ দেশের স্ত্রী-পুরুষ সাপের পাঁচ পা
হঠাৎ দেখেছে যেন। দিনগুলি হিস্টিরিয়া রোগী"–

কখনও মুমূর্ষু পিতা ঘোড়ার উজ্জ্বল পিঠ ভেবে
সস্নেহে বুলোন হাত অতীতের বিস্তৃত শরীরে।
মাঝে-মাঝে গভীর রাত্তিরে
দেখেন অদ্ভুত স্বপ্ন : কে এক কৃষ্ণাঙ্গ ঘোড়া উড়িয়ে কেশর
পেরিয়ে সুদূর
আগুন রঙের মাঠ তাঁকে নিতে আসে।

অথচ আমার স্বপ্নে রহস্যজনক ঘোড়া নয়,
কতিপয় চিম্‌নি, টালি, ছাদ, যন্ত্রপাতি, ফ্যাক্টরির
ধোঁয়ার আড়ালে ওড়া পায়রার ঝাঁক
এবং একটি মুখ ভেসে ওঠে, আলোময় মেঘের মতোই
একটি শরীর
আমার শরীরে মেশে, আমি স্বপ্নে মিশি,
রূপালি স্রোতের মতো স্বপ্ন কতিপয়
আমার শরীরে মেশে, আমি মিশি, স্বপ্ন মেশে, আমাকে নিয়ত
একটু একটু করে স্বপ্ন গিলে ফেলে।

পুরাণ

হে পিতৃপুরুষবর্গ তোমরা মহৎ ছিলে জানি,
রূপদক্ষ কীর্তির প্রভাবে আজও প্রাতঃস্মরণীয়,
সে কথা বিশ্বাস করি। যে-প্রাসাদ করেছ নির্মাণ

প্রজ্ঞায় অক্লান্ত শ্রমে, জোগায় তো কত ভ্রাম্যমাণ
চোখের আনন্দ নিত্য : অতীতের ডালপালা এসে
চোখে-মুখে লাগে আর ফুটে ওঠে সৃষ্টির বিস্ময়।
আরও গাঢ় অন্ধকারে ভিজিয়ে শরীর পেঁচা, কাক
অথবা বাদুড় আসে শূন্য কক্ষে বিশাল প্রাসাদে
উত্তরাধিকারী খোঁজে, কিন্তু কিছুতেই কোনোখানে
মানবের কণ্ঠস্বর হয় না ধ্বনিত। অলিন্দের
অন্ধকারে ওড়ে শুধু কয়েকটি দারুণ অস্থির
চামচিকে। লেপটে থাকে দুর্বোধ আতঙ্ক স্তব্ধতায়।

দূরত্ব বজায় রেখে দেখে সব খিলান, গম্বুজ
ইত্যাদিতে জমেছে শ্যাওলা আর সিংহ দরজায়
হিংসুক সময় তার বসিয়েছে থাবা। প্রশংসিত
কীর্তিস্তম্ভে ঝরে যাচ্ছে বহু প্রতিবিম্ব পুরাণের :
বিধ্বস্ত ভাঁড়ার ঘরে অতীতের সারসত্য, সব
ভাবনাকে অনায়াসে খুঁটে খায় ইঁদুর, আরশোলা।

হে পিতৃপুরুষবর্গ আমাকে ভেব না দোষী যদি
এ প্রাসাদ বসবাসযোগ্য মনে না হয় আমার,–
কেননা এ-সৌধ আর মরচে-পড়া তালার বাহার
করে না বহন কোনো অর্থ অন্তত আমার কাছে।

তোমাদের কারুকাজে শ্রদ্ধা অবিচল, কিন্তু বলো–
কী করে পিতার শব কাঁধে বয়ে বেড়াই সর্বদা?

আমাকে জড়ায় সত্য, অর্ধসত্য কিংবা প্রবচন,
তবু জানি কিছুতে মজে না মন বাতিল পুরাণে ॥

মিশ্ররাগ

খর রৌদ্রের নিথর প্রহরে
শ্রাবণের ঘন মেঘ দেবে বলেছিলে।
তৃষিত চোখের আর্তি ঝরিয়ে
চেয়ে থাকি দূর অসীম শূন্যে, নীলে।

ঘন সমারোহে পুঞ্জ পুঞ্জ
মেঘের জটলা দূর আকাশের পাড়ে;

যেন একপাল কালো মেঘ তেড়ে
লাফ দিয়ে পড়ে শুভ্র মেঘের ঘাড়ে।

হৃদয়ে মরুর বালি ওড়ে আজ,
দারুণ তৃষ্ণা রুক্ষ সত্তা জুড়ে।
ছায়া খুঁজে ফিরি পাথুরে মাটিতে,
কখন যে মেঘ বাতাসে গিয়েছে উড়ে।

দুপুর-রৌদ্রে তোমার ছায়ায়
নিজের ছায়াকে সহজে মিলাতে চাই।
কোন সে আগুন শুষে নিয়ে গেছে
স্নিগ্ধ ছায়াকে– প'ড়ে আছে শুধু ছাই।

হাজার যুগের প্রেমিকের কত
বাসনা দগ্ধ হৃদয়ে বেঁধেছে বাসা–
সেই গুরুভাব বই দিনরাত,
পথের ক্লান্তি ভোলায় ছায়ার আশা।

গৌরাঙ্গীর দেহের বাগানে
চোখের লুব্ধ ভ্রমরের জয়গান।
শিরায় শিরায় সেতারের ঝালা,
রক্তের প্রতি কণা চায় মহাদান।

জ্বলজ্বলে দুটি স্বর্ণ কুম্ভ
কানায় কানায় যৌবন-জলে ভরা।
জীবনের স্বরে ছলকিয়ে ওঠে,
সীমাহীন পথে সে-জল ক্লান্তিহরা।

স্নান সেরে এলে কুন্তল ধারা
ঝরত একদা গুরু নিতম্ব 'পরে।
কালিয়া আঁধার কনক চাঁপার
শরণ নিত যে– তা-ও আজ মনে পড়ে!

আমার প্রাণের খর বৈশাখে
মেঘে মেঘে আনো বিপুল বৃষ্টিধারা :
হৃদয়ের কূলে সিক্ত হাওয়ায়
কাশফুল হবে খুশিতে আত্মহারা।

কতকাল আর কাটাব বিষাদে

দিনরাত শুধু স্মৃতি সম্বল করে?
মাঝে-মাঝে তাই বিচ্ছেদ ভেবে
বেহুঁশ বেতাল নামি নরকের ঘরে।

দৈব দয়ায় বহুকাল পরে
হয়তো আসবে মিলনের মহাক্ষণ।
কিন্তু তখন কোন বনে, হায়,
হরিণ-ক্ষিপ্র তোমার সে যৌবন?

বৃষ্টির দিনে

তখনও চাঞ্চল্যে ক্ষিপ্র হয়নি শহর, ট্রাফিকের
কলতান বাজেনি প্রবল সুরে। টলটলে স্নিগ্ধশ্যাম ঐ
পার্কের শরীর ঘেঁষে যাচ্ছিলাম হেঁটে দ্রুত পায়ে
বর্ষাতিটা গায়ে চেপে। সহসা সরিয়ে
বৃষ্টির ঝালর একজন হাত রেখে
নিঃশব্দে আমার কাঁধে বললেন গাঢ় উচ্চারণে :

"কোথায় ছুটেছ তুমি হন্তদন্ত হয়ে পরিশ্রমী নাগরিক এমন বর্ষায়?
বরং পার্কের বেঞ্চে সময় কাটাই চলো কথোপকথনে,
চলো পার্কে বৃষ্টির আদর মাখি চোখে-মুখে, সেখানে তুমিও
সুস্নাত গাছের সখ্য পাবে, হাওয়ার অশ্রান্ত ম্যান্ডোলিন শুনে
বেঞ্চটাকে মনে হবে সাধের গন্ডোলা।

"এবং তোমাকে বলি শোনো, বার বার
যূথির সান্নিধ্যে যাওয়া ভালো; মাইল মাইল পথ
বেলা-অবেলায় হেঁটে দেখেছি তো শেষে
সে-পথ কোথায় নিয়ে যায়, কী কল্যাণ হাতে আসে! ট্রাম-লাইনের ধারে
সুকৌশলে হয়তোবা, অপঘাত যেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকে
সিঁধেল চোরের মতো। ট্রাম-লাইনের ক্ষীণ ঘাসের সম্মোহ
ফুরোয়নি বলে আমি শুনলাম ডাক সেই রৌদ্রের নিশির,
এবং নিমেষে ভাসলাম কী রক্তিম সরোবরে।

"মাইল মাইল পথ হেঁটে দেখেছি তো অবশেষে
সে-পথ কোথায় নিয়ে যায়, কী কল্যাণ হাতে আসে!
পরিশ্রমী নাগরিক দাঁড়াও এখানে ক্ষণকাল স্তব্ধতায়,
বর্ষায় নিমগ্ন হও, নিসর্গকে করো তীর্থভূমি"

–এই বলে প্রবীণ জীবনানন্দ পার্কের শরীর ঘেঁষে একা কোথায় গেলেন দূরে।

জনশূন্য ফুটপাতে চির নিঃসঙ্গতা
মুহূর্তে চোয়াল দিল মেলে আমন্ত্রণে; চতুর্দিকে
অনাসক্ত বৃষ্টি পড়ে, বর্ষাতির আড়ালে শরীর
সকল বিফল হল ভেবে রক্তের ফিনকি হয়ে
যেতে চায় মেঘদলে। দেহ ছাড়ি যেন প্রাণ চলি যায়–
অকস্মাৎ বাতাসে এ কার হাহাকার'?

ঝড়ের নদীতে একা টলমল নৌকোর মতোই ভেসে চলি
তিমির দুরন্ত ফুটপাতে। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট,
ঘন-ঘন-ঝন-ঝন বজর নিপাত। আকাশের কাজল ট্যাঙ্কের থেকে
জল ঝরে অবিরল, বৃষ্টি পড়ে সমস্ত শহরে, বৃষ্টি পড়ে
অপরূপ স্বপ্নের চত্বরে। মনে হয় যুগ-যুগ ভিজে ভিজে
সত্তায় জমেছে দামি, অনুপম শ্যাওলার কারুকাজ, মৎস্য-ঘ্রাণ, আর
সহসা নিজেই যেন হয়ে যাই বৃষ্টিভেজা রাত্রির শহর!

অগ্রজ কবির মন্ত্রণায় নিসর্গকে তীর্থভূমি
জ্ঞানে দ্রুত যতটা এগোই তারও বেশি
নিশ্চিত পিছিয়ে পড়ি বিতৃষ্ণায়, আর চিরকেলে
বর্ষার জানুতে মাথা রেখে রেখে বড় ক্লান্ত লাগে।
চোখে-মুখে একরাশ বৃষ্টির আঁচড় নিয়ে ঐ স্নিগ্ধশ্যাম
পার্ক ছেড়ে চলে যাই, বিরক্তিতে ভরপুর, অস্তিত্বের শীর্ষে ক্ষান্তিহীন
বৃষ্টির ঝরঝর বয়ে ইহুদির মতো
সর্বদাই ধাবমান, নৈঃসঙ্গের কাঁটায় জর্জর।

প্রতীতি আসেনি

প্রতীতি আসেনি আজও, শুধু গৃহপালিত স্বপ্নের
তদারকে বেলা যায়। অস্তিত্বকে ভাটপাড়া থেকে
টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এসে, চিকন কথার বিদ্যুল্লতা
থেকে দূরে উল্টোপাল্টা চিত্রকল্পে দিয়েছি পা মেলে।
বশংবদ নক্ষত্রেরা আত্মায় জানায় দাবি, দেখি

সবসুদ্ধ কয়েক শ', তারও বেশি সুকণ্ঠ কোকিল
হত্যা করে, বহু লক্ষ প্রজাপতি ছিঁড়ে, পাপিয়াকে

সোৎসাহে নির্বংশ করে, লোকটা সদর্পে হেঁটে গেল
রোমশ ছত্রিশ ইঞ্চি ঠুকে ঠুকে। সময়ের ছাদ
ধ'সে যেতে চায়, দেখলাম ভূতগ্রস্ত নগ্নতায়।

শতাব্দীর ফসিল জমানো কত কবির পাঁজরে।
মধ্যে মধ্যে হাতড়াই স্বর্গের চৌকাঠ, ব'সে ব'সে
দিনের উদ্বেল স্তন খুঁটি; ভাবি, নিস্তাপ সন্ধ্যার
মেঘমালা, ফুলের নিঃশ্বাস, বৃক্ষ ছায়া, দাঁড়বন্দি
পাখিটার টলটলে চোখগুলো আমাকে কবিতা
দেবে কিছু? দশটি আঙুলে খুঁটি নিজেরই পাঁজর।

প্রতীতি আসেনি আজও, প্রেম আসে মরালের মতো,
ডানা ঝাপটিয়ে বসে চিত্তহারী প্রচ্ছন্ন মাস্তুলে।
ভাটপাড়া থেকে দূরে ভালবাসা তুমি থাকবে কি,
মেলবে কি পাখা এই ভূতগ্রস্ত কলঙ্কী পাঁজরে?

পিতলের বক
(আবুল হোসেনকে)

এতদিন আছি তার কাছাকাছি তাই দুটি চোখে
দেখেছি কৌতুক শ্লেষ, টুক্‌রো হাসি। স্তব্ধতায় ঠায়
টেবিলে দাঁড়িয়ে আছি আঠারো বছর এক পায়
ধ্যানী আলো-অন্ধকারে। প্রতিদিন তার প্রাণলোকে
কত কী-যে ঘটে দেখি, ঘোরালো তর্কের তীক্ষ্ণ নখে
ছেঁড়ে ঢের জটিল তত্ত্বের সূত্র, কাটায় হেলায়
সময় শব্দের প্রেমে, বুদ্ধির দেউড়ি আগলায়
সারাক্ষণ। বাষ্পাকুল হয় না সে আনন্দ কি শোকে।

কিছুতে পাই না ভেবে কৌচে বসে কী-যে বলে অত
বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের সঙ্গে রোজ। না খাদ্য, না ঘুম
কিছুই পারে না তাকে বাধা দিতে; হয়তো নিছক
বাজে কথা, গা ভাসায় তবু সেই স্রোতে অবিরত।
যেদিন মেয়েটা গেল, কাঁদল সে নিশ্চুপ নিঝুম
রাত্তিরে ড্রইংরুমে, দেখি আমি। পিতলের বক।

আত্মজৈবনিক

যুদ্ধবাজ সাইরেনে উচ্চকিত কৈশোর আমার
গলির বিধ্বস্ত ঘরে। গুলির শব্দের প্রতীক্ষায়
কেটেছে ভুতুড়ে রাত্রি অন্ধকারে এবং তামার
মতো দিন খাকির প্রতাপে কাঁপে শান্তির ভিক্ষায়।

যৌবন দুর্ভিক্ষ-বিদ্ধ, দাঙ্গাহাঙ্গামায় ভাঙে দেশ,
এদিকে নেতার কণ্ঠে নির্ভেজাল স্বদেশী আকুতি
ভাষা খোঁজে। আদর্শের ভরাডুবি, মহাযুদ্ধ শেষ,
মঞ্চ তৈরি : কে হবে নায়ক তবে? করি কার স্তুতি?

সগৌরবে ঢাকা-ঢোল বাজাল সে ধ্বংসের উৎসবে
যারা তারা কেউ পেল শিরোপা, কেউবা পতনের
ঝাঁ-ঝাঁ স্মৃতি; বহু মাঠ গেল ভরে নামহীন শবে।
পচা মাংস দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে বেশ্যার স্তনের

উষ্ণতায় মনস্তাপ মাখে যে-লোকটা মগজেই
ঘোরে তার শবাধার, একগাছি দড়ি কিংবা ক্ষুর–
যা-কিছু হননপ্রিয়, যা-কিছু অত্যন্ত সহজেই
জীবনকে করে তোলে অর্থহীন জীর্ণ আঁস্তাকুড়।
চতুর বক্তৃতাবলি, প্রচারণা, সংঘের ধূর্তামি
ছাড়া কল্কে পাওয়া ভার! বুক বেঁধে নির্বোধ সাহসে
বিবর্ণ স্যান্ডেল পায়ে ঘুরেছি ধুলোয় রোজ আমি :
হা-ঘরে বন্ধুর খোঁজে কতদিন বেড়িয়েছি চষে

সারাটা শহর। অন্ধকারে কত আনোয়ারা, বামী
ইতস্তত গেছে ডুবে– দেখেছি স্বচক্ষে আর করে
দিয়েছি বিড়িতে টান একাকিত্বে যখন তখন।
স্মরণের আঠা দিয়ে হতাশ প্রেমের জলছবি
সেঁটেছি সত্তার ফ্রেমে। মধ্যপথে কেড়েছেন মন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন, সম্মিলিত তিরিশের কবি।

কখনো শুনিনি পার্কে ব'সে হরিণের ডাক কিবা
পরীর আশ্চর্য স্তন আনেনি মোহের জ্যোৎস্না চোখে,
জানালার শক্ত শিকে কোনো দিন। নিজেকে প্রতিভা-
বান ভেবে ঘেঁটেছি নন্দনতত্ত্ব, যা বলুক লোকে

স্বপ্নে শুধু হাঁসের ঝাপট দেখি কশাইখানায় :

মনে হয় স্ট্রেচারের ক্যানভাসে প'ড়ে আছি একা,
কানে আসে কানাঘুষো, যেতে যেতে কে যেন জানায় :
এই তো বেজেছে ঘণ্টা, হবে না কখনো আর দেখা।

বতিচেলী নারী নয়, মাতিসের রমণীর মতো
তেমন কাউকে নয়, যে-হোক সে-হোক নারীকেই
পাশে নিয়ে রাস্তায় হাঁটব ভেবে সুখে অবিরত
হঠাৎ নিজেরই পায়ে মেরেছি কুড়াল। মেরে খেই

হারিয়েছি জীবনের। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হয় বলি :
জীবন, থামো হে বাপু, শুনেছি তোমার বাচালতা
অনর্গল বহুদিন; এবার দিয়েছি জলাঞ্জলি
মেরুদণ্ডহীন, ক্লীব আশাকে তোমার। যে-ব্যর্থতা
আমাকে শাসায় নিত্য, আমি তারই অগ্নিকুণ্ডে জ্বলি।
তোমরা আসবে কেউ? খোঁজো যারা ক্ষিপ্র সার্থকতা!

যেহেতু যথেষ্ট নই ভদ্রলোক তাই জবুথবু
সমাজের মোড়লেরা যথারীতি করেছে বিদায়
ওহে অর্ধচন্দ্র দিয়ে। কোনোমতে সামলে নিয়ে তবু
প্রতিবাদ করব কি করব না, পড়েছি দ্বিধায়।

একদিন নিত্যসঙ্গী ছিল যারা তারা ডানে বামে
স'রে পড়ে, আমি শুধু যাইনে কোথাও। চোখে ভ্রম,
আরেক যুদ্ধের ছায়া যৌবনের অপরাহ্ণে নামে
এবং জীবন জানি সারাক্ষণ সিসিফস-শ্রম।

কমা সেমিকোলনের ভিড়ে

বিচিত্র হিংসুক ভিড় শিল্পকে প্রচণ্ড লাথি মেরে,
তীব্র কোলাহল করে বোধগুলি আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে
ফেলে দিল, যেন ছেঁড়া হলুদ কাগজ। ক্রমাগত
সময় তাড়িত তারা, ঘোরে ঘূর্ণিপথে, বাঁশিগুলি
তাদের রোমশ হাতে গুঁড়ো হয়, চতুর্দিকে শুধু
বেজে ওঠে ক্যানাস্তারা। জীবন দু'হাতে ঢাকে কান!

কমা সেমিকোলনের ভিড়ে এ জীবন কখনোবা ঢ্যাঙা এক শূন্যতায়
ভীষণ হাঁপিয়ে ওঠে, পালাই পালাই বলে রোজ

প্রহর হত্যার দায়মুক্ত হতে চায়, মুখ থুবড়ে পড়ে, দেখি
কেমন খুঁড়িয়ে হেঁটে স্মরণীয়ভাবে গলি আর অ্যাভিনিউ
নিঃসঙ্গ পেরিয়ে যায়, বেলাশেষে হয়তোবা ঝুলে থাকে বাসে।
ডানে কিংবা বামে লতাগুল্ম, তৃণদল
কিছুই পড়ে না চোখে, নিরুপায় রক্তচক্ষু মেলে
দূর নীলনবঘনে।

"এ-ও ভালো শুকনো ডালে ঝুলে ঝুলে তুমি
প্রতিদিন রাজহাঁস হওয়ার রুটিন-বাঁধা স্বপ্নে মশগুল,
এ-ও ভালো রঙরেজিনীর কিছু রঙ ধার নিয়ে কদাচিৎ
নিজের আত্মার চিত্র মনোহারী করার নিখুঁত
প্রয়াসে নিমগ্ন থাকা, ছুড়ে ফেলে দেয়া দূরে নিরং বুরুশ–
এ-ও ভালো; ভালো এই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা মরজগতের
শিল্প সব, চেয়ে দেখা যা-কিছু লুকানো
রহস্যের রুপালি আধারে, ভালো কমা সেমিকোলনের ভিড়ে

"নিমজ্জন। অতঃপর নানান ফুলের ডাঁটা নিয়ে শূন্য বুকে
বেপরোয়া নিদ্রা যাওয়া ভালো, হঠাৎ দাঁড়ির পালা
এলেই নিশ্চিত জেনো চুকে যাবে সব পাট। দ্যাখো
সারাক্ষণ কারা যেন সুন্দর পাখির ঝাঁক প্রত্যহ দু'বেলা
পোড়াচ্ছে ফার্নেসে" বলে এ জীবন ভাঙ্গা হাঁটু গেড়ে
বসে গৃহকোণে আর মাথা রাখে স্বপ্নহীন ক্ষুধিত দেয়ালে ॥

কেমন ক'রে শেখাই তাকে

কেমন করে শেখাই তাকে
ছোট্ট অবুঝ শিশুটাকে
জ্বালতে তারার বাতি,
যখন কিনা আমরা নিজে
অন্ধকারে শুধুই ভিজে
কাদা ছোড়ায় মাতি।

কেমন করে শেখাই তাকে
ছোট্ট অবুঝ শিশুটাকে
বলতে সত্য কথা,
যখন কিনা মিথ্যা থেকে

আমরা নিজে শিখছি ঠেকে
চতুর কথকতা!

কেমন করে শেখাই তাকে
ছোট্ট অবুঝ শিশুটাকে
বাসতে শুধুই ভালো,
যখন কিনা রাত্রিদিন
আমরা নানা অর্বাচীন
হচ্ছি ঘৃণায় কালো।

কেমন করে বলি তাকে
ছোট্ট অবুঝ শিশুটাকে
'আস্থা রাখো ওহে!'–
যখন কিনা বিশ্ব জুড়ে
আমরা শুধু মরছি ঘুরে
নাস্তিকতার মোহে।

ঘৃণায় নয়

অতীতের মায়াবী পাহাড় থেকে এ-বর্তমানের
নিবিড় উপত্যকায় এসে দেখি জীবন ফিরিয়ে
আছে মুখ অন্ধকারে। একজন বৃদ্ধ গাঢ় স্বরে
বললেন হাত ছুড়ে : "সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, সত্য আর

সদ্‌গুণ ইত্যাদি রক্ষা করো, রক্ষা করো এ বাগান–
যেখানে পাখির গান শিল্পের প্রতীক খোঁজে প্রতি
লাল নীল ফুলে স্তব্ধ পাথরে মনের অস্তরাগে,
যেখানে হাতের মুঠো ভরে যায় সোনালি পালকে।"

অন্ধকার জীবনের বাগানে নিগ্রোর মতো শুধু
আর্তনাদ করে ওঠে, মহত্ত্ব পিছল নর্দমায়
ভেসে যায়, সৌন্দর্য কবরে পচে, সত্য অবিরাম
উদভ্রান্ত ভিখিরি হয়ে ঘোরে মনীষার মন্বন্তরে।

আমার শয্যায় দেখি অজস্র মৃত্যুর ছায়া আর
হাজার হাজার ঘোড়া খুরের আঘাতে, কেশরের
আন্দোলনে আবার জাগাতে চায় মৃত শতাব্দীকে

আমার শরীরে, চোখে। আমি ছিন্নভিন্ন অন্ধকারে।

একমুঠো তারা দিয়ে যদি কেউ আমার পকেট
ভরে দেয় কিংবা কতিপয় জনপ্রিয় খেলনা দেয়
হাতে তুলে– তবু আমি হাতের শিকড় দেব মেলে
জীবনের সমৃদ্ধ মাটিতে, স্বর হব আশ্চর্যের।

ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকাকে কাগজের মতো
যদি গুঁজে দেয় কেউ হাতে, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে
এক ফুঁয়ে পারব না হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে সব।
কেননা শিখিনি ঘৃণা, বস্তুত ঘৃণায় নয় জানি,

প্রেমেই মানুষ বাঁচে। চিরদিন বিমুগ্ধ নিষ্ঠায়
তাই সাদা চাঁদ কাফ্রি-রাত্রির প্রেমিকা পৃথিবীতে।

কোথাও পারি না যেতে
(টি. এস. এলিয়টকে নিবেদিত)

আমরা ভেবেছিলাম খড়ে-ঠাসা মাথা নিয়ে শুধু
হবে না ঘুরতে আর সাতপুরুষের
বিধ্বস্ত ভিটায় কিংবা জনশূন্য অলিতে গলিতে
প্রলাপের ঝোঁকে
হবে না কুড়াতে বুঝি সময়ের সুতীব্র ধিক্কার।

যাত্রারম্ভে হয়েছিল মনে,
তোমাকে সুদূর কোনো পিতামহ ভেবে
মহানন্দে বাড়াব পা নতুন যুগের চৌমাথায়।
হা কপাল! তোমারই গণ্ডিতে
এখনও রয়েছি বাঁধা, জানি
চুকানো যায় না ঋণ বড় মোড়লকে
কানাকড়ি দিয়ে।
অস্তিত্বের চতুর্দিকে কখন দেয়াল
হয়ে গেছে গাঁথা,
এখন সেখানে মাথা ঠুকে
কী ভীষণ অর্থহীন অলীক ভাষায়
পরস্পর কথা বলি, ঘেন্নায় দেখি না মুখ কারো।
যখন-তখন ভয় পাই, চমকাই

নিজের বিকৃত ছায়া দেখে
আর মনে হয়
সব কিছু মেরামত সাপেক্ষ এখনও,
তাই 'মিস্তিরিকে ডাকো' বলে
ভীষণ চেঁচিয়ে উঠি
সামনের সিঁড়ির পাশে
ধ্বংসের রাজধানীতে!
আমাদের চতুর্দিকে রাস্তা খোলা, তবু
কোথাও পারি না যেতে। কে এক চতুর
বাজিকর শস্তা কিছু আলো খেলায়
সর্বদা মাতিয়ে রাখে, স্ফূর্তি মজ্জাগত।

বন্ধুর কামিজ কোর্তা অকাতরে নিজের বলেই
হামেশা চালিয়ে দিচ্ছি, আমি খাঁটি নবীন যুবক।
শস্তা নভেলের খালে চালাই নিরুদ্ধ কামনার
বেসামাল নৌকোটিকে। আমার ভোটাধিকার নেই
জীবনের নির্বাচন কেন্দ্রে আমি ব্যালট পেপার
হারিয়ে ফেলেছি যেন, পাতিপাতি করে খুঁজি তবু
পাই না হদিস তার। পক্ষান্তরে জীবনকে বলি ঃ
কী খেল দেখালে ভায়া, বেধড়ক বসিয়েছ পথে
এবং নিয়েছ কেড়ে ছলে বলে সব পুঁজিপাটা।

প্রত্যহ বন্ধুরা বলে : "কেন শুধু আগুনের ঝড়ে
বল তো কিসের মোহে রাত্রিদিন পাখা পোড়াচ্ছ হে?
চেয়ে দ্যাখো কয়েকটি যুবা,-বাক্‌সর্বস্বের দল-
হাঁটু মুড়ে বেপরোয়া দুরাশার মহান চত্বরে
রাত্রিকে করছে পান ক্রমাগত চাঁদের গেলাশে।
তুমি শুধু ভয় পাও, যেন আর্ত হরিণের চোখে
জটিল লতার ছায়া, অথবা বাঘের থাবা কাঁপে।"

উপদ্রুত কেরানির বিশুদ্ধ মুখের মতো যাচ্ছেতাই এক
অন্ধকারে আমরা স্বপ্নের
গলা টিপে নানাবিধ হত্যাকাণ্ডে মাতি,
কখনো আবার
জীর্ণ হোটেলের
টেবিলে চিবুক রেখে বলি, আমাদের মনীষাকে

বয়স্ক করেছে তুমি, চৈতন্যের প্রখর আলোয়
সর্বদা দিয়েছ ভরে আমাদের সংকীর্ণ আকাশ।

জনাকীর্ণ পথে হাঁটি, আওড়াই ধ্যানমগ্নতায় :
হতশ্রী জীবনে
কিছুটা পালিশ দাও প্রভু, জানতাম
একদা ফ্রিবস ছিল সুকান্ত পুরুষ, দীর্ঘকায়।

স্বর্গে গেলাম দর্শক হিসেবে
(দান্তের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক)

মোল্লা-পুরুত এখনও রটায়
স্বর্গলোকের বিজ্ঞাপন।
নানা মুনি তার নকশা আঁকেন,
ব্যাখ্যা করেন বিজ্ঞজন ॥

দৈব দয়ায় একদিন ঠিক
পৌঁছে গেলাম স্বর্গলোকে।
স্বর্গ তো নয়, আমার শহর
দেখতে পেলাম চর্মচোখে ॥

সেখানেও লোক রাস্তা খুঁড়ছে,
মন্ত্রী হচ্ছে, কিনছে নাম।
চৈত্রদুপুর পুড়ছে সেখানে,
গলছে রাতের মধ্য যাম ॥

ইলেকট্রিকের হঠাৎ-আলোয়
ঘরের জানলা খুলছে কেউ।
ব্যস্ত মানুষ, মন্থর গাড়ি,
বড় রাস্তায় ভিড়ের ঢেউ ॥

এয়ারপোর্টে প্লেন নেমে আসে,
ট্রেন চলে যায় শেষ রাত্রে।
সেখানেও দেখি তর্কের থীম
ফকনার কামু কিবা সার্ত্রে ॥

বক্তা ছড়ান ধরতাই বুলি,
রাজায়-রাজায় বাধে লড়াই।

টগবগ করে ফুটছে নিত্য
জটিল মতামতের কড়াই ॥

দোকানে সাজানো বিদেশী কবির
আনকোরা বই দিচ্ছে উঁকি।
ঘটি-বাটি-ভিটে বাঁধা রেখে কেউ
ফটকা বাজারে নিচ্ছে ঝুঁকি ॥

ডাক্তার এলে ভিজিট চুকিয়ে
গৃহী মোছে তার চোখের জল।
বাতাসে কাঁপছে মৃদু খড়খড়ি,
রোগীর শিয়রে শুকনো ফল ॥

তরুণী টেবিলে খাবার সাজায়,
খবর পড়েন বুড়ো হাকিম।
মুড়মুড়ে দুটি টোস্টের ফাঁকে
নিবিড় হলুদ সোনালি ডিম ॥

কফির গন্ধে উন্মন মন,
কাঞ্জিভেরাম কৌচে লোটে।
প্রেমিকের চোখ বালবের মতো
দীপ্ত ভাষায় ঝলসে ওঠে ॥

রাতের আঁধারে ফুটপাতে আসে
ভিখিরিণী তার নি-ছাদ ঘরে;
ঘাগড়া দুলিয়ে কুষ্ঠরোগীর
ঠোঁট চেপে ধরে কামের জ্বরে!

অক্ষর গুনে পঙ্‌ক্তি মেলায়
রাগী যুবকের দলের চাঁই,
ক্ষিপ্রকলায় চিত্র আঁকছে
রঙ ছুড়ে দিয়ে যাচ্ছেতাই!

রবিঠাকুরের গান ভেসে আসে,
হেঁটে যায় লোক সুরের টানে।
পিকাসোর ছবি ড্রইংরুমের
দেয়ালকে দেয় অন্য মানে ॥

বামনের দেশে

মেঘম্লান চন্দ্রালোক ক'জন বামন শুদ্ধাচারী
যাজকের জোব্বা গায়ে মহত্তম যুগের স্মরণে
জুটেছে রাস্তার মোড়ে। "দ্যাখো এই পৃথিবীকে দ্যাখো,
আমাদের কীর্তিমান অগ্রজেরা জোগালেন যাকে
স্মরণীয় দিনের মহিমা, যাকে নাটকের শেষ
দৃশ্যের বিক্ষুব্ধ নায়কের মতো শোকে ত্যাগ করে
কালান্তরে করলেন নিঃশব্দে প্রস্থান, তাকে নোংরা
করেছে অজস্র জন্তু, পবিত্রতা বিগত সুদূর
শতাব্দীর মতো অনাত্মীয়। মোট কথা, ইতিমধ্যে
সযত্নে লালিত সেই পৃথিবীর কতটুকু আর
অবশিষ্ট ধ্যাননেত্রে? হাসি পায়, যখন সম্প্রতি
দেখি কনিষ্ঠেরা শুধু অবিশ্বাস্য ছলে সরাসরি
মৃত্যুকে উপেক্ষা করে জীবনকে পরায় মুকুট।
অথচ জানে না তারা তাদেরও নিস্তার নেই সেই
ধ্বংসের প্রহার থেকে, হবে শবাগার জীবনের
সমস্ত বৈভব। সে বিপুল অর্থহীন অপচয়ে
তারাও নিশ্চিত লিপ্ত আজীবন। তারাই ইন্ধন"

বলে সেই বামনেরা ভ্রান্তির ডুগডুগি।
দূর হ হতাশা,
যা তুই নচ্ছার! জীবনের ত্রিসীমায়
দেখাবিনে মুখ আর, যা তুই ফিরে যা।
মৃত্যুর গোলামি করগে যা, আমরা তো সর্বক্ষণ
জীবনের স্তবে আন্দোলিত,
মজ্জাগত উৎসবের উজ্জ্বল চিৎকার।

সময়ের স্বগতকথনে বার বার
কান পাতি, প্রাজ্ঞ পদাবলি, প্রতীকের উচ্চারণ, রূপাভাস,
গাঁথি মগজের কত শাণিত ফলকে।
সাধারণ হলেও অন্তত
অতিশয় লঘুমতি যুবা নই, অলৌকিক মন্ত্রের মায়ায়
কবরের ধূলিকে বানাই
নক্ষত্রের ফেনা, যত পারি দূরে রাখি
অনুশোচনার মলময়
কীটের স্বৈরিতা। অমরত্ব কাকে বলে জানি না তা,

সে-জ্ঞানে উৎসাহ কম, বাছা-বাছা ভাষ্যকার তার
দিয়েছেন যে-ব্যাখ্যা তাতেও
কখনো ওঠেনি মন। পিতৃপুরুষেরা
ধারণার যে ক'বিঘে জমিতে লাঙল চষে কিছু
শাক-সবজি, সাধের আনাজ
তুলেছেন ঘরে, সেগুলো রোচেনি মুখে।

আমরা নতুন শব্দ ছুড়ে দিই সময়ের মুখে,
সেই শব্দে মুগ্ধ হয়ে কোনো স্থির সহজ সিদ্ধান্তে
না এসেই আমরা অনেকবার সাগ্রহে হয়েছি পার কত
স্বল্পজীবী নীলিমার সাঁকো!

বলা যায় না করে অধিক বাক্যব্যয়
বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের সঙ্গে ক্রমাগত
বিখ্যাত বসন্ত শুধু করছে বিশ্বাসঘাতকতা।
ভুলেছে স্বধর্ম তার, আমাদের আকাঙ্ক্ষার ডালে
দেয় না ফুলের গুচ্ছ, পক্ষান্তরে চৈতন্যের আনাচে কানাচে
সর্বদা দিতেছে ছুড়ে তিরস্কার। নষ্ট বাগানের
ভ্রষ্ট কিছু পাখি
কবরখানার গান গেয়ে-গেয়ে নিজেরাই ছায়া হয়ে যায়।

এ শহরে চতুর্দিকে ভিড়, চতুর্দিকে
বামনেরা জটলা পাকায়
এবং চাঁদরের নখ উপড়ে আনবে ভেবে তারা
গুটিয়ে জোব্বার হাতা এলাহী রগড় করে শেষে
থুতু ছুড়ে দেয়
আকাশের মুখে।

মহামান্য বামনেরা সময়ের বিবাহ-বাসরে
অতিথির ভূমিকায় ক্লান্ত হয়ে কন্যাপক্ষ সাজে :
অনেক মোড়লি করে– গাঁয়ে নাক মানুষ
তাতে কীবা এসে যায়–
সভায় আনতে গিয়ে কনে
আলমারি থেকে টেনে আনে সম্পন্ন ফরাসে এক
প্রাচীন কংকাল।

তারপর বনেদি কেতায় হেসে ওঠে,
যেন তীব্র ফুর্তির প্রগলভ পিচকারি

ছুড়ে দিলো দুঃস্বপ্নের সংখ্যাহীন বিন্দু,
অন্দরে-বাহিরে
লণ্ডভণ্ড সব,
পণ্ড হলো বিবাহ-বাসর।

বাদ দাও শৃগালের বিখ্যাত ধূর্তামি,
মুখোশের বিচিত্র কল্পনা বাদ দাও।
তুমি কি মিথ্যার জালে পারবে ধরতে
অতর্কিতে উল্লিখিত সত্যের ঈগল
কোনো দিন? পারবে কি সময়ের ত্বক
ছিঁড়ে ফুঁড়ে জন্ম দিতে সোনালি আপেল–
মাংস যার জানবে না অবক্ষয়, শুধু

চৈতন্যের নিঃসংশয় প্রভাবে সে-ফল
চেনা পরিবেশে পাবে শিল্পের মহিমা!

পথে ছুটি দিশাহারা, ফতোয়াবাবুদের
ভিড় দেখি ছত্রভঙ্গ। বিভ্রান্তি চৌদিকে
প্রত্যহ ছড়িয়ে পড়ে প্রবাদের মতো।
পিকাসোর গুয়ের্নিকা ম্যুরাল মনে পড়ে–
ক্রুদ্ধ সেই ঘোড়াটার আর্তনাদ যেন
আমাদের কাল। আমরা ভয়ার্ত চোখে
ধূর্ত মর্ত্যজীবীদের করুণা কুড়াই
অহর্নিশ। অগোচরে স্বপ্নের ঘোড়াকে
ঝেঁটিয়ে বেড়াই, ভাবি তাকে তাড়ালেই
থাকা যাবে নিশ্চিন্তির সম্পন্ন কোটরে।
অথচ অবাক লাগে যখন স্বপ্নের গলিঘুঁজি
পেরিয়ে ব্রোঞ্জের তপ্ত চত্বরে দাঁড়াই,
বাঁচবার চেষ্টা করি তীব্র বক্তব্যের
অন্তরঙ্গতায়,
সামনে তাকিয়ে দেখি পরিবর্তনের
টগবগ ঘোড়া
থমকে দাঁড়ায় নৈঃশব্দের ক্ষণস্থায়ী প্রাঙ্গণের
এক কোণে এবং মাথায় তার স্বপ্নের কিরীটি
সম্মোহনে একান্ত নির্ভর।
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ে সুতীক্ষ্ণ বাতাসে
এবং তখন

ক্ষুধার্ত চোয়ালে তার বাস্তবের খড়কুটো নড়ে।

যেদিকে তাকাই
নিশ্চয়তা কিছু নেই। দুর্যোগের দিনে
মাদুলি তাবিজ তুকতাক নিয়ে মেতে আছে যারা,
সর্বক্ষণ যারা
পশুদের দাসত্বে বিলীন,
যাদের বিক্রীত চোখে নির্বাসিত মানুষের যন্ত্রণাও নেই
যাদের আত্মায় শুধু পশুদের বিষ্ঠা স্তূপীকৃত–
ভদ্রমহোদয়গণ, তাদের নিষ্ঠায়
তিলমাত্র করি না সন্দেহ,
অথচ নিশ্চিত তারা লোকালয় ছেড়ে
কবরখানায় খোঁজে স্বেচ্ছা নির্বাসন
বস্তুত নিজেরই অগোচরে।

চতুর্দিকে যে বিচিত্র চিত্রশালা দেখি রাত্রিদিন
তাতে সবি ব্যঙ্গচিত্র। চোখ জুড়ে আছে কিমাকার
জীবনমথিত দৃশ্য : বিশিষ্ট প্রতিভাবানদের
আত্মার সদগতি ক'রে সম্মিলিত শৃগাল ভালুক
ফিরে আসে ময়লা গুহায়। নির্বোধেরা সারাক্ষণ
গড়ছে এমন সিঁড়ি যা-দেখে শিউরে ওঠে দূরে
ভূশণ্ডির কাক। দুঃস্বপ্নের জোড়াতালি দিয়ে-দিয়ে
লিখেছে প্রাচীরপত্র সর্বনাশ বড় জাঁক করে।
পৃথিবীর সব কিছু ধোপানির গালগল্প ভেবে
পথে ব'সে হতবুদ্ধি হয়ে যাই বামনের দেশে ॥

অপচয়ের স্মৃতি

"দেখে নিও আমি মহাপুরুষের ভূমিকায় ঠিক
উৎরে যাবো একদিন। হবো তথাগত কিংবা যিশু,
দগ্ধীভূত আত্মায় ফেলবে ছায়া কোনো বোধিদ্রুম।
ফন্দিবাজ জনরবে কান দিয়ে, জিঘাংসায় মেতে
চেনা দেশে করব না প্রতারিত শান্তির পাখিকে
চতুর মিলিত ফাঁদে। পথে হাঁটে জীবিত মানুষ,
ভালবাসে পৃথিবীর তাপ, রাত্রিবেলা পুত্র ভয়ে
চেঁচিয়ে উঠলে ঘুমে জোরে বুকে চেপে ধরে তাকে–

ঘৃণার ত্রিশূলে তাকে কী করে বিঁধব অকাতরে?

“হে পিতৃপুরুষবর্গ তোমাদের মিলিত শোণিত
বিষণ্ন বংশের রক্তে জাগায় প্রতীকী শিহরণ
মতবাদ-পীড়িত যুগের গোধূলিতে। সংবর্ধনা
পায় তারা নষ্ট বাগানের স্তব্ধতায়, বিষাদের
ইন্ধন জোগায় নিত্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সময়ের
কাৎরানি মূঢ়তা আর মিথ্যাচার, যা-কিছু নিঃশ্বাসে
অগোচরে সহজে মিশিয়ে দেয় বিন্দু বিন্দু বিষ।

“যে-স্মৃতি ভ্রাতৃহননে প্ররোচিত করে বার বার
প্রেতায়িত মন্ত্রণায়, যে-স্মৃতির কর্কশ চিৎকারে
কেঁপে ওঠে গৃহস্থালি ভয়-পাওয়া পায়রার মতো,
বন্ধ হয় জানালা-কপাট, তাড়া খেয়ে দিন ঢোকে
রাত্রির গুহায়, অমঙ্গল খিল খুলে আঁধিঝড়ে
সদম্ভে বেরিয়ে পড়ে চৌরাস্তায়– আমি সুনিশ্চিত

দায়ভাগী তার। চিরন্তনী অপচয় আমাদের
সব স্বপ্ন নষ্ট করে, চোখ জুড়ে থাকে কিমাকার
জন্তুর কংকাল কোনো। ধ্বংসস্তূপ ফুলে ঢেকে আমি
বিষাদের গাথা লিখি শ্রীযুক্ত বিষণ্ন পরিমল।
“খাবার টেবিলে ব'সে মেজাজ খারাপ করে আমি
সান্ত্বনাদায়িনী মাকে বলি শিশু নই, কাঁহাতক
খোকা সেজে থাকা যায় অবিচল স্নেহের নকশায়!
আমার অনেক কাজ। পৃথিবীটা দৃশ্যকাব্য হলে
ছিল না ঝামেলা মোটে, মহিমার শিরস্ত্রাণ প'রে
বস্তুপুঞ্জে দিতাম মিশিয়ে ঢের রহস্যময়তা।”

“বাচাল প্রিন্টিং প্রেস সোৎসাহে দিচ্ছে জন্ম আজ
যে-উচ্ছিষ্ট সভ্যতাকে আমি তার ম্লান, স্বার্থহীন
ক্রীড়নক হব শুধু? আমার মগজে সারাক্ষণ
প্রকাণ্ড, উজ্জ্বল এক রাজহাঁস পাখা ঝাপটায়,
কেবলি হোঁচট খায় দেখি স্বপ্নলোকের চৌকাঠে।
ধাতুর চত্বরে ব'সে অজস্র পেরেক ঠোকে কারা
শক্ত কাঠে সর্বক্ষণ, স্বপ্নে দেখি, নৈরাজ্যে অস্থির
প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সব মহান হরফ মুছে যায়,
চতুর্দিকে মুণ্ডহীন মানুষের অখণ্ড স্বরাজ!”

ফুটপাথে হন্তারক হাওয়ার শাসানি পরিমল
বোঝেনি বস্তুত তাই যখন পৈশাচী অন্ধকারে
ভায়ের উৎকট গন্ধ নেকড়ের মতো হিংস্রতায়
শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দৃষ্টি-অন্ধ-করা রক্ত দেখে
থমকে চায়, চোখ জুড়ে থাকে স্থির এক অবিশ্বাস,
(রাজহাঁস মুখ থুবড়ে পড়ে নর্দমায়) পৃথিবীতে
সম্প্রতি কোথাও নেই শ্রীযুক্ত বিষণ্ন পরিমল!

শুধু একটি ভাবনা

দেখি প্রত্যহ দুঃখের তটে
ভাসে স্বপ্নের রুপালি নৌবহর।
বিপদের এই ভীষণ আঁধিতে
আজকে আমার একটি ভাবনা শুধু :
কালের মলিন কুয়াশার ফাঁদে
কী করে বাঁচাই স্বপ্নের মায়াতরী?

পথের প্রান্তে দেখি দিনরাত
একটি বৃক্ষ—পিতৃপুরুষ যেন।
মাথা নেড়ে নেড়ে বলেন সদাই–
“বাঁচো, সুখী হও, তোমাদের ভালো হোক”।
বিপদের এই ভীষণ আঁধিতে
আজকে আমার একটি ভাবনা শুধু :
দিগন্ত-জোড়া প্রলয়ের ঝড়ে
কী করে বাঁচাই প্রবীণ বৃক্ষটিকে?

আজকাল লোকে যায় না বাগানে,
তবু তো ধুলায় গোলাপ বাগান বাঁচে।
সেখানে পাখির কণ্ঠে ধ্বনিত
হৃদয়-মথিত কত মানবিক গান।
বিপদের এই ভীষণ আঁধিতে
আজকে আমার একটি ভাবনা শুধু :
ফাগুনের স্মৃতি ঝলকিত ফুল
কী করে বাঁচাই বারুদের ঘ্রাণ থেকে?

আমার মায়ের প্রশান্ত চোখ

জেগে রয় রোজ সংসারে নানা কাজে।
প্রসারিত তাঁর হাতের মায়ায়
অন্ধকারেও জ্বলে ওঠে দীপাবলি।
বিপদের এই ভীষণ আঁধিতে
আজকে আমার একটি ভাবনা শুধু :
দিগন্ত-জোড়া প্রলয়ের ঝড়ে
কী করে বাঁচাই পুণ্য সে দীপাবলি?

পুতুলের মতো আমার মেয়েটা
সারাদিনমান পুতুল খেলায় মাতে।
ডাকলে কেবলি দৌড়ে পালায়,
লাল জুতুয়াটা কোথায় যে পড়ে থাকে।
বিপদের এই ভীষণ আঁধিতে
আজকে আমার একটি ভাবনা শুধু :
হিংসুক সেই দৈত্যের থেকে
কী করে বাঁচাই খুকির পুতুলগুলি?

বন্ধুদের প্রতি

সময়ের প্রশংসা করব বলে আমরা ক'জন
খুঁজি কিছু বাছা-বাছা চিত্রকলা, উপমা প্রতীক
মগজকে হুকুম খাটিয়ে। কল্পনার জামেয়ারে
সত্তা ঢেকে দেখি ক'টি আপোগণ্ড পোকা ইতিমধ্যে
রূপক করেছে নষ্ট। দর্শনের মেরাপ-বাঁধানো
প্রাঙ্গণ কয়েক বিঘা জুড়ে আছে, একটি জিজ্ঞাসা
ভেঙে-চুরে হাজার জিজ্ঞাসা আড়চোখে চেয়ে থাকে
দ্বিধান্বিত নীলিমার দিকে। আমরা চেঁচিয়ে মরি
সমস্বরে– ইতিহাস লেখে কত কাকের ছা বকের ছা–
পাই না স্তুতির ভাষা। কয়েক পুরুষ অপেক্ষায়
স্থিত হলে হয়তো উজ্জ্বল লোকভাষা জন্ম নেবে,
কবিত্বের শৃঙ্গারে বাড়বে জানি কালে জৌলুস।

আমরা কয়েকজন আমোদ প্রমোদে ক্লান্ত হয়ে
আত্মপরিচয় ঢেকে ব্যক্তিগত বিকারী ধোঁয়ায়
দুশ্চিন্তার উপদ্রবে ছিঁড়ে ফেলি শিল্পের জটিল

অন্তর্বাস, পণ্ড করি, জনাব, তারার শুদ্ধ খেলা।

কী ভ্রান্তিবিলাসে দেখি ধাতুর প্রাসাদে কয়েকটি
অন্ধ ঘোড়া রাত্রিদিন ঘোরে এক অর্থহীনতায় :
তাদের আরোহী নেই, মালিকানা জানা নেই কারো
ত্রিধাতু নির্মিত সেই প্রাসাদের। অন্ধ ও বধির
ঘোড়াগুলি নক্ষত্র বমন করে, লেজের দাপটে
তাড়িয়ে বেড়ায় খোজা ক্রীতদাস, নগ্ন ক্রীতদাসী
সর্বক্ষণ একই বৃত্তে। অবিবেকী সুরে স্তূপীকৃত
শব হল ছিন্নভিন্ন, চতুর্দিকে নক্ষত্র, বিষ্ঠায়
মতিচ্ছন্ন একাকার। আশেপাশে যা-কিছু চোখের
চাওয়ায় এখনও স্পষ্ট, জীব-জগতের সেই সব
আনন্দ সঙ্কট ত্রাস প্রতিক্রিয়া খোঁজে মননের
তীব্র সত্যে, স্বচ্ছতায়। কিন্তু আজও ক'পা বাড়ালেই
পণ্ড হয় চৈতন্যের নব্য নাট্যে, মনন গোঙায়!

আমাদের পিতৃপুরুষের চেনা রূপলোক আজ
ব্যঙ্গচিত্র বর্ণাভাসে চৈতন্যের বিনিদ্র নিষ্ঠায়,
জীবন যাত্রার নাটে। যখন বাতিকগ্রস্ত আলো
গাধার চিৎকার হয়ে ফেটে পড়ে ধাতুর চত্বরে,
আমরা কয়েকজন একচ্ছত্র ভীষণ পিতলে
নীলিমা মিশিয়ে কিছু, মানবিক গলিঘুঁজি ঘেঁটে
ভুলে যেতে চাই এই শতকের জলাতঙ্ক, দূর
সমাজের সুখসঙ্গ, ভুল রূপকের খেসারত!

সমস্ত আকাশে চাঁদ পিটিয়ে রুপালি কানাস্তারা
আঁস্তাকুড়ে ভাবুককে বেকুব বানায়। অবসাদে
হাই তোলে ইতিহাস। হরিণ এবং খচ্চরের
সংগমে নিতেছে জন্ম অদ্ভুত বেখাপ্পা জন্তু সব।

পৃথিবীকে বদলাতে পারি না আমরা, পারব না
ওষুধবিষুধ দিয়ে কিংবা ঝাড়ফুঁকে পৃথিবীর
শুশ্রূষা করতে। শুধু কিছু উপমা প্রতীক আর
চিত্রকল্পে শিল্পের শুদ্ধতা দেব ভাষার গতিকে।

নিরুদ্দেশ দেয়াল

মুহূর্তে মুহূর্তে ভীতি, বদ্ধ কালা চার দেয়ালের
আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মগজের কোষে। এমনকি
মস্তিষ্কে দেয়াল গেঁথে হো-হো হেসে ওঠে বহু লোক,
কোপন স্বভাবী লোক। "কী দরকার দেয়াল-পেরুনো
দৃষ্টির দিব্যতা দিয়ে" বলে তারা অভ্যাসের বশে
সত্তার চৌদিকে তোলে পাথুরে দেয়াল ঝোড়ো হাতে।

যতই নিরেট হোক, দেয়ালটা থাকুক আমাকে
ঘিরে পাহারায়,
দৃষ্টি তবু যায় দূরে, দরজা-জানালা
থাকে প'ড়ে। পা দুটো কী করে ব্যস্ততায় খোঁজে পথ
গর্তের ভিতর, যাকে বলি ঘর। ডুসেলডর্ফের
পোড়-খাওয়া পথপ্রান্তে যেতে চাই, অস্ট্রিয়ান বাড়ির বাগানে
যে তরুণী ফুল তোলে, নোয়ায় কম্পিত ডাল, যার
স্তনভারে সূর্যগন্ধী ফলের সোনালি– অন্য মনে
গভীর গোলাপটিকে হাওয়ায় দুলিয়ে জীবনের
মানে বলে বাক্যের অতীত– তারই কাছে সারাবেলা
কেবলি পৌঁছুতে চাই।

কায়রোর কফির দোকানে
এক কোণে ব'সে ব'সে দৃশ্য গাঁথি, মিনারের মতো প্রবীণ যে ভদ্রলোক
খাচ্ছেন সুগন্ধ কফি, ইচ্ছে হয় বলি তাঁকে, "কেমন আছেন?"
ন্যুইয়র্কে যে বালক বল নিয়ে লাফাতে লাফাতে
ঘোরানো সিঁড়িতে ওঠে, ছায়া দেখে ভয় পায়, তাকে বুকে নিয়ে
হরবোলা সেজে জেনে নিতে চাই কী যে তার নাম। ক্যাথিড্রাল
বড় রাস্তাটার ডান দিকে রেখে ইচ্ছে হয় গ্রান্ড ক্যানালের
গন্ডোলায় দুলি কিছুক্ষণ, দু'দণ্ড বিশ্রাম নিই
প্যারিসের বুলেভারে কিংবা বুদোয়ারে। হাঙ্গেরির
সাদা বাড়িটার
সুদৃশ্য কার্নিশ ঘেঁষে ভোরের আলোয় মাখা যে পায়রাগুলো
উড়ে যায়, শূন্যতাকে চেয়ে বার বার,
মাদ্রিদের লিরিক জ্যোৎস্নায় আধ-পাগলা যে লোকটা
গত শতকের ঢের কুহক সঞ্চারী শোকগাথা করছে রচনা আর

গিটার ধ্বনিতে যার এলদেরাদোর ছবি চৈতন্যে জাগায়,

ছন্নছাড়া তাকে, সেই পায়রাগুলোকে
চোখ ভরে দেখবার, সবখানে পৌঁছুবার, রেড স্কোয়ারের
মিশ্র ভিড়ে, পিকিং-এর প্রাণের মেলায়, সবখানে
পৌঁছবার খোলা রাস্তা চাই।

টপকে প্রাক্তনী চোরাবালি হঠকারী যে-মদ্যপ
অমিত্রাক্ষরের মায়ামন্ত্রে সেই উনিশ শতকে
সমুদ্রে ভাসাল পোত, আমি তার উত্তরাধিকারী—
শিরায় শব্দের ঝোড়ো গান, চৈতন্যের নীলিমায়
সারসের পক্ষধ্বনি শুনি, কী আবেগে অকস্মাৎ
দেয়াল চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ!

নিজের কবিতার প্রতি

কবিতা আমার ধমনীকে তোর
জোগাই নিত্য রক্তকণা।
হায় রে তবুও তোর জন্যেই
পদে পদে জোটে প্রবঞ্চনা।

হেঁটেছিস পথ গুরুজনদের
শত গঞ্জনা মাথায় করে।
কাটা ঘুড়ি তুই, বাতাসের লেজ
শাসাচ্ছে তোকে অবুঝ ওরে।

হায় রে দুস্থ কবিতা আমার
তুলে নিলি কোন জোয়াল কাঁধে!
কিসের তাড়ায় এখনও যে তোর
চক্ষুলজ্জা খোয়াতে বাধে!

ছেঁড়া কাঁথাটাকে সম্বল করে
কতকাল আর ঘুরবি বল?
নির্বোধ নারী, বাতুল পুরুষ
তোর কাছে চায় সুখের ছল।

অনাবশ্যক মুক্তো ছড়ালি,
ফোটালি অলীক কথার খই।
যোগ্য মূল্য দেবে যে তেমন

উলুবনে বল ক্রেতারা কই?

পয়ারে কিংবা মাত্রাবৃত্তে
আঁধারকে দিলি আলোর ধার।
বিশ্বজোড়া সে সন্তাপ ছেঁকে
এনেছিস বটে সত্যসার।

প্রতিপক্ষের বাছা বাছা চাঁই
নিন্দা রটায় কাব্যলোকে :
রোগজর্জর এক দশকেই
দারুণ শনিতে পেয়েছে তোকে

খ্যাতির দ্রাক্ষা নাগালে পাসনি
বলেই দিবি কি গলায় দড়ি?
তোর দর্পণে চিরন্তনের
প্রতিবিম্বকে ঈষৎ ধরি।

বন্ধুর জন্যে

কৌচের কোমলে ডুবে গৃহিণীর গানের বাগানে
হরেক ফুলের শোভা দ্যাখো চোখ বুজে সবখানে,
প্রহর বদলায় রং গানে গানে; বন্ধু তুমি প্রেমে
জল হয়ে যাও গ'লে। হঠাৎ বহতা সুর থেমে

গেলে তুমি "হৃদয় বুড়িয়ে যায় গ্রন্থিল পেশির
সবলতা ক্রমশ শিথিল হলে? শুধু বিদ্বেষীর
মতো ক্রোধে সহসা ফেলব খুলে নিজেরই পাঁজর
বাসনা-রক্তিম ঘোর বার্ধক্যের কালান্তক জ্বর
হাড়ে নিয়ে?"–এইসব প্রশ্ন নেড়েচেড়ে যথারীতি

ক্লান্ত হও, মাঝে-মাঝে শব্দের গন্ধের কিছু স্মৃতি
জিভের ডগায় তুলে হুইস্কির মতো করো পান।
তারপর সবান্ধব রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান
কবিতায় আধুনিক মানুষের আত্মার সন্ধানে
জটিল অরণ্যে করো মৃগয়া প্রচুর! ভিন্ন ধ্যানে

তোমার ছেলেটা দেখি চকখড়ি চকখড়ি চক

ছুড়া কেটে ঘরের মেঝেতে ব'সে নড়বড়ে বক
আঁকে আঁকাবাঁকা টানে (মানে না আঁকার ব্যাকরণ)
হঠাৎ বকের মুখে গেঁথে দেয় তারা অকারণ।

খাঁচার পাখিটা রাগী, নিজেরই নরম ডানা দুটি
করেছে রক্তাক্ত শিকে, কী সুন্দর দুর্বিনীত ঝুঁটি

ক্রমাগত যাচ্ছে ক্ষয়ে ক্ষত হয়ে– তবুও অবুঝ
কেবলি ক'দিন থেকে যেতে চায় বনের সবুজ
পাতায়, রোদ্দুরে, মেঘে।
তুমিও ফিরিয়ে নাও চোখ,
সে কোন অদৃশ্য মোহনায় দ্রবীভূত দুই শোক
অভিন্ন ধারায় বয়। যেহেতু তুমিও জানো বিষ
দিয়ে বিষ ক্ষয় হয়, জীবন তো অন্ধকারে শিস
দিয়ে চলা, ইত্যাদি পাঁচালি,– বুঝি তাই অকাতরে
দুঃখের ফসিলগুলি প্রত্যহ সাজাও থরে থরে।

পেরিয়ে অনেক রাস্তা নাম ধরে ডাক দিই, সাড়া
দাও তুমি, কতবার আমার অস্থির কড়া নাড়া
শুনে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামো, প্রীত, নিয়ে যাও ঘরে,
আমিও প্রসন্ন হেসে পোষমানা ঘরের আদরে।

প্লাস্টিকের ফুল, মূর্তি, কফি সেট– হয় না বিশ্বাস–
থাকবে না চিরদিন। ভয় হয়, সমস্ত নিঃশ্বাস
শুষে নেয় যেন কেউ। বড় ভয় হয়, যদি আর
প্রাণপণে ডেকেও কোথাও সাড়া না পাই তোমার!

বাড়ি

নিজের বাড়িতে আমি ভয়ে ভয়ে হাঁটি, পাছে কারো
নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে। যদি কারো তিরিক্ষি মেজাজ
জ্বলে ওঠে ফস্ করে যথাবিধি, সেই ভয়ে আরও
জড়োসড়ো হয়ে থাকি সারাক্ষণ। আমার যে-কাজ
নিঃশব্দে করাই ভালো। বাড়িতে বয়স্ক যারা, অতি
পুণ্যলোভী, রেডিওতে শোনে তারা ধর্মের কাহিনী।
যুবকেরা আড্ডাবাজ, মেয়েরা আহ্লাদী প্রজাপতি,
মক্ষিরানী। সংসারে কেবলি বাড়ে শিশুর বাহিনী।

মেথরপাড়ায় বাজে ঢাক-ঢোল, লাউডস্পিকারে
কান ঝালাপালা আর আজকাল ঠোঙ্গায় সংস্কৃতি
ইতস্তত বিতরিত, কম্‌তি নেই কালের বিকারে।
বুকে শুধু অজস্র শব্দের ঝিলিমিলি। যে-সুকৃতি
জমেনি কিছুই তার কথা ভেবে মাথা করি হেঁট,
ঘুমায় পুরোনো বাড়ি, জ্বলে দূরে তারার সেনেট।

দাগ

"না, আমি কস্মিনকালে তোমার এ নৈঃসঙ্গ ঘোচাতে
পারব না" বলে তুমি সেই ছোট ঘরটি গোছাতে
মন দিলে। এটা-সেটা নেড়েচেড়ে তুলে নিলে দুল
বালিশের নিচে থেকে, পরলে আবার। এলোচুল
সহজে বিন্যস্ত হলো; পরিচিত গন্ধমাখা ঘরে
বিধ্বস্ত স্নায়ুর রাজ্য, বন্দি আমি ভয়ের নিগড়ে!

বুঝি তাই অকস্মাৎ বুকে টেনে নিলাম তোমাকে
সংক্রামক হতাশায়, বললাম : "হত্যা করো তাকে,–
আমার এ নৈঃসঙ্গকে; তোমার স্বপ্নের পাটাতনে
তুলে নাও হাত ধরে। বাকল-বঞ্চিত গাছ বনে
যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তেম্‌নি তুমি থাকো আজ পাশে,
আলিঙ্গনই জানি রক্ষাকবচ এমন সর্বনাশে।"

নৈঃসঙ্গ-হত্যায় মেতে খুলে নিলে দুল, নিরুত্তাপ
বালিশে নামল কালো উচ্ছল প্রপাত। কার ছাপ
খুঁজি তবু সবখানে? উন্মীলীত তোমার দু'চোখ
আমার চোখের নিচে, যেন দুটি সভ্যতার শোক
ভ্রষ্টলগ্নে শুধু কাঁপে পাশাপাশি। দু'চোখের তটে
সে মুহূর্তে দেখি মহাপ্লাবনের দাগ জেগে ওঠে!

সেই কণ্ঠস্বর

"নারে খোকা আজ তুই যাসনে বাইরে, দ্যাখ চেয়ে
বাইরে ভীষণ ঝড়। অন্ধকার রাত্তিতে যেসব
ভয়াল দৈত্যের কথা বলি তোকে লালকমলের
সেই গল্পে তারা আজ দলে দলে শক্ত মাটি ফুঁড়ে

এখানে এসেছে তেড়ে– ঘরবাড়ি, টেলিগ্রাফ তার
যা পাবে সম্মুখে তারা তছনছ করবে নিশ্চয়।

“বাইরে এখন বড় অন্ধকার, ডাইনীর চুল
ওড়ে চতুর্দিকে আর হাজার হাজার হিংস্র মোষ
ফেনায়িত মুখে ছোটে দিগ্বিদিক, খুরের আঘাতে
আকাশ ভাঙল বুঝি– দাঁড়া, দরজাটা ভেজিয়ে দি,
আয় ওরে বুকে আয়, বাইরে ভীষণ অন্ধকার;
না তুই যাসনে আজ যাসনে বাইরে, কথা রাখ”–
এ বলে মায়ের বুক নিত টেনে তার সে খোকাকে
কবেকার ঝোড়ো দিনে, আমি ভয়ে লুকাতাম মুখ।

অথচ এখন আমি ভয়ানক দুর্যোগে একাকী
বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। ঝোড়ো হাওয়া তাঁবুর বনাত
কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে আজ হিংসার ফুৎকারে।
ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে বলে দৈত্য-দানো চক্রান্তের টানে
আসে তেড়ে পৌরপথে। সম্মিলিত নেকড়ে হায়েনা
রক্তমাখা কাপড়ের গন্ধ শুঁকে শুঁকে চক্রাকারে
ঘোরে, আমি নিরুপায়। ইতিমধ্যে আমার শরীর
ছিন্নভিন্ন গণ্ডারের বৈরিতায়। সময় উজিয়ে
আসে নাকো কানে আর উৎকণ্ঠিত সেই কণ্ঠস্বর :
“নারে খোকা আজ তুই যাসনে বাইরে, কথা রাখ”
–মায়ের চকিত কণ্ঠ লুপ্ত এ-কালের কলরোলে।

চতুর্দশপদী

মনে পড়ে কোনো দিন আমাদের আবদ্ধ জলায়
ছিলে তুমি রাজহংসী। শ্যাওলার পিছল সবুজে
কখনো হয়নি ম্লান সাদা পাখা, আলো খুঁজে খুঁজে
গণ্ডি ছেড়ে চলে গেছ বহু দূরে। তোমার চলায়
এ-কাল মেলেছে দল। প্রতারণা কি ছলাকলায়
আনোনি বিভ্রম কোনো মুগ্ধ চোখ; স্বপ্নের গম্বুজে
বাঁধোনি সুখের বাসা মসৃণ আরামে চোখ বুজে
এবং হওনি বিদ্ধ শিকারির তীরের ফলায়।

জলার কাদায় আজও আমাদের চঞ্চু, পাখা ডোবে,–

মজে থাকি অধঃপাতে। মধ্যে-মধ্যে হাই তুলি, ভাবি
এখন কোথায় তুমি? বুঝি না দারুণ সর্বনাশ
পেতেছে জটিল ফাঁদ আমাদের অস্তিত্বের লোভে।
উড়ো কথা কানে আসে : মেটাতে এ জীবনের দাবি
ইতিমধ্যে এমনকি তুমিও হয়েছ পাতিহাঁস।

কাননবালার জন্যে

একদা তোমার নাম হাটে মাঠে ঘাটে, সবখানে
গুঞ্জরিত হত জানি। বড় মিঠে তোমার সংলাপ
মুখস্থ করত যারা রাত্রিদিন, তাদের উত্তাপ
জোগাতে মোহিনী রূপে– এ দশকে আজ তা কে জানে!
বিজয়িনী তুমি, তাই সেলুনে কি পানের দোকানে
রবীন্দ্রনাথের পাশে ঝুলত তোমার ফটোগ্রাফ,
দেখতাম; সে আশ্চর্য বাবুবিলাসের যুগে– সাফ
মনে পড়ে– ছিলে বহু যুবকের বিনিদ্র শিথানে।

কাল তার এ্যালবামে কিছুতে রাখে না সব ফটো,
দেয় ঠেলে আঁস্তাকুড়ে; সময় বেজায় জাঁহাবাজ।
বুঝি তুমি তাই লোকলোচনের আড়ালে, মলম
পারে না রুখতে আর জরার আঁচড়। বড়-ছোট
পানের দোকানে ঝোলে অন্যান্য বালার ছবি আজ,
নেপথ্যে জীবনী লেখে পুরোদমে ভৌতিক কলম।

খেলনা

আমার মেয়েকে দেখি বাড়িটার আনাচে কানাচে
বেড়ায় আপন মনে, ফ্রক-পরা। লেখাঘরে তার
রকমারি খেলনা নিয়ে সকাল-বিকাল মেতে আছে।
দেখি রোজ ঘটা করে পুতুলের বিয়ে দেয় আর
ছোটায় কাঠের ঘোড়া তেপান্তরে, সমুদ্রে ভাসায়
সপ্তডিঙা। মায়ের গঞ্জনা কিংবা পিতার নিষেধ
মানে না কিছুই, শুধু পুতুল-ভাঁড়ের তামাশায়
হাসে, নাচে ছড়ার ঘরোয়া ছন্দে, নেই কোনো খেদ।

আমারও খেলার শখ আশৈশব, খেলনার রূপক
স্বকালে করেছে ভিড়, তাই দৃশ্যান্তরে খেলনাগুলি
কতিপয় শস্তা বুলি আর নষ্ট ধারণার ছক
মনে হয়। সংসার-জলার কাদা ঘেঁটে ছেঁকে তুলি
রঙচটা ভাঙা মূর্তি– মন আর বসে না খেলায়,
খেলনা ফেলে বসে থাকি নিরুপায় আজ অবেলায়।

স্টেজে

আর কী রয়েছে বাকি? সবি তৈরি, গোটা মঞ্চটাই
সুসজ্জিত নানা ছাঁদে। ইতিমধ্যে মাইক লাগানো
হয়ে গেছে আর সামনে শ্রোতাদের চেয়ার সাজানো
সারি সারি, বস্তুত কোথাও নেই তিলমাত্র ঠাঁই।
মঞ্চে বক্তা দু'চার কদম হেঁটে দিচ্ছেন মহড়া
নির্ধারিত বক্তৃতার, বাছা-বাছা বাক্যের শায়ক
অস্থির স্মৃতির তূণে, কিন্তু তবু সভার নায়ক,
পাদপ্রদীপের আলো, মনে হয় সবই মনগড়া!

প্রস্তুত প্রধান বক্তা, সাড়ম্বরে সভা উদ্বোধন
করা গেল, যথারীতি, কিন্তু এ কী শ্রোতারা কোথায়?
তারা তো আসেনি কেউ, স্বস্তি কই এমন সভাতে
যেখানে বক্তার হাঁকডাক সবই অরণ্যের রোদন!
আমরা সবাই সেই বক্তার মতোই শূন্যতায়
কেবলি চলেছি হেঁকে প্রাণপণে মালাহীন হাতে।

একজন বেকারের উক্তি

যদি হতে পারতাম কোনো হিন্দি ফিল্মের নায়ক
পুণ্যবলে, তবে আমি ডুগডুগি বাজিয়ে ঠিক কৃতী
পুরুষ হতাম জানি। প্রেমের দেবতা যথারীতি
মেঘের আড়াল থেকে দিত ছুড়ে পুষ্পিত শায়ক :
হস্তিমূর্খ ধনীর দুলালী সে-ও নির্ঘাত শৌখিন
প্রেমে খেত হাবুডুবু। মধ্যপথে বাড়াভাতে ছাই
পড়লেও, শেষ দৃশ্যে বিসমিল্লা খানের সানাই

বাজবে মধুর সুরে, হেসে খেলে কেটে যাবে দিন।

অতএব চাকরি বিনে কস্মিনকালেও ফুটপাত
হতো না চষতে আর পরিশ্রমী কুকুরের মতো
একটি হাড়ের খোঁজে ক্রমাগত গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে
হতাম না ক্লান্ত শুধু। আপাতত এই শীর্ণ হাত
করি সমর্পণ দুস্থ জ্যোতিষীর কাছে, ভাগ্যহত-
রুপালি পর্দার লীলা অবিরত থাকে চোখ জুড়ে।

একটি টিনের বাঁশি

যখন ছিলাম সাত বছরের খেয়ালি বালক,
মধ্যদিনে বিছানাকে রত্নদ্বীপ ভেবে সযতনে
খুঁজতাম গুপ্তধন। শিকারের খোঁজে ঘুরে বনে
দিতাম মাথায় গুঁজে সাতরঙা পাখির পালক
রেড ইন্ডিয়ানদের মতো আর উটের চালক
সেজেছি তো সাহারায়। সেসব দুপুরের ক্ষণে ক্ষণে
চিরচেনা বাঁশি-অলা বাজাত টিনের বাঁশি, মনে
জ্বালাত আতশবাজি, গলিময় সুরের আলোক।

আজ এই জীবনের মধ্যদিনে ভাবি যদি সেই
বাঁশি-অলা ফিরে আসে, এ-গলির মোড়ে ঘুরে ঘুরে
বাজায় টিনের বাঁশি, তা হলে আনাড়ি তার সুরে
পাব কি আনন্দ আর? ডেকে এনে নিজের পাশেই
আবার বসাব তাকে? অসম্ভব, সে পৃথিবী পুড়ে
হয়ে গেছে ছাই আর সে-বালক অনেক আগেই!

কোথাও কেউ নেই

আকাশে চঞ্চল মেঘের কারুকাজ,
বর্ষা সেতারের বাজাল ঝালা আজ।
একটি সুর শুধু শুনছি ঘুরে ফিরে-
সে সুর বাজে যেন আঁধার চিরে চিরে।
বাইরে কিছু আর যায় না জানি দেখা,
কোথাও কেউ নেই, ত্রিলোকে আমি একা।

বজ্রে কেঁপে উঠি, বিরহ মেলে দল;
হৃদয়ে ঝরে জল কেবলি অবিরল।
কৌতূহলে হাত বাড়াই ডানে বামে,
আঁধারে শূন্যতা, হতাশা বুকে নামে।
বাইরে কিছু আর যায় না জানি দেখা,
কোথাও কেউ নেই, ত্রিলোকে আমি একা।

আমার পৌরুষ অবুঝ পাখি হয়ে
আঁধারে মুখ রেখে কাঁদে না লোকালয়ে।
তবুও মেঘেদের অকূল হুতাশনে
স্মৃতির লোকালয়ে পড়ছে কাকে মনে?
বাইরে কিছু আর যায় না জানি দেখা,
কোথাও কেউ নেই, ত্রিলোকে আমি একা।

আকাশ ঢেকে গেছে নীলাম্বরে আজ,
ভাবছ কোন ছলে করবে তুমি সাজ?
আপন অঙ্গ তো চেনাই হল দায়।
কী মেঘে বিদ্যুৎ লুকিয়ে ভীরু পায়?
কেমন করে বলো নামবে তুমি পথে!
পারতে যদি সেই নীলাম্বরী হতে!

আমার অঙ্গনে সিক্ত এলোচুলে
আঁচলে মুছে মুখ দাঁড়ালে নাকি ভুলে?
আমার অঙ্গন আঁধারে হল বন,
নিয়েছি বুক পেতে জলের দংশন!
বাইরে কিছু আর যায় না জানি দেখা,
কোথাও কেউ নেই, ত্রিলোকে আমি একা ॥

প্রভুকে

প্রভু, শোনো, এই অধমকে যদি ধরাধামে পাঠালেই,
তবে কেন হায় করলে না তুমি তোতাপাখি আমাকেই?
দাঁড়ে ব'সে-ব'সে বিজ্ঞের মতো নাড়তাম লেজখানি,
তীক্ষ্ণ আদুরে ঠোঁট দিয়ে বেশ খুঁটতাম দানাপানি।
মিলত সুযোগ বন্ধ খাঁচায় বাঁধা বুলি কুড়োবার,
বইতে হতো না নিজস্ব কথা বলবার গুরুভার।

সেই হাত

যে-হাত যুগল স্তনে খোঁজে চাঁদ-সাদা
স্বপ্নের মদির পথ, খোঁজে ক্ষেত্র প্রীতি কর্ষণের,–
ভাবতে অবাক লাগে, সেই একই হাত
সহজেই কাগজে নির্দেশ লেখে বোমা বর্ষণের!

আমার ছেলেকে

খবদ্দার খোকা তুই কোনো দিন শিল্পের মৃগকে
দিবিনে ঘেঁষতে ত্রিসীমায়। বরং ডিঙিয়ে বেড়া
ভাষ্য, টীকা, দর্শনের মহানন্দে নিশ্চিন্দির ডেরা
বাঁধিস মনের মতো। জীবনকে সঁপে দিয়ে ছকে
বাজাবি ঢোলক নিত্য; চাকরির চরম নাটকে
সাজলে নিখুঁত হুঁকোবরদার, সমাজের সেরা
মুরুব্বির তল্পি বয়ে সামলালে নথিপত্র ঘেরা
অস্তিত্বকে, পৌঁছে যাবি উন্নতির প্রশস্ত সড়কে।

পক্ষান্তরে শিল্পের আঁতুড়ঘরে আছে কালকূট
হতাশার। রাত্রিদিন বিষাক্ত হাওয়ায় শ্বাস টেনে
কী পাবি অবুঝ তুই? অন্তহীন যন্ত্রণা, বিষাদ
অথবা পতন শুধু। সাফল্যের বিখ্যাত মুকুট
ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তার চেয়ে স্থূলচর্ম বেনে,
বীমার দালাল হওয়া ভালো, ভালো ফুর্তির আস্বাদ।

তিনটি ঘোড়া

তিনটি সাদা ঘোড়া বাতাসে দেয় লাফ,
বন্য কেশরের জ্বলছে বিদ্যুৎ।
চোখের কোণে কাঁপে তীব্র নরলোক,
তিনটি শাধা ঘোড়া বাতাসে দেয় লাফ।

আকাশে মেঘদল সঙ্গ চায় বুঝি,
মাটির নির্ভর উঠছে দুলে শুধু।
বাতাসে ঝলমল মুক্ত তলোয়ার,
তিনটি তলোয়ার আঁধারে ঝলসায়।

স্বপ্নহীনতায় স্বকাল হলো ধু-ধু,

স্বস্তি নেই খাটো মাঠের মুক্তিতে।
খুরের ঘায়ে ওড়ে অভ্র চৌদিকে,
তিনটি সাদা ঘোড়া স্বপ্ন তিনজন।

শূন্যে মেঘদল যাচ্ছে ডেকে দূরে,
মেঘের নীলিমায় দেয় না ধরা তারা;
লক্ষ্য গোলাপের পাপড়ি ওঠে ভেসে,
অন্ধকারে যেন মুখের রেখাগুলো।

তিনটি ঘোড়া বুঝি সাহস হৃদয়ের,
ত্রিকাল কেশরের শিখায় জাগ্রত।
শূন্য পিঠে ভাসে মুকুট উজ্জ্বল,
তিনটি সাদা ঘোড়া বাতাসে দেয় লাফ।

একজন পাইলট

আকাশকে ধন্যবাদ। এ শূন্যতা, এই নীল আমাকে বাঁচায়,
রইলাম চিরঋণী। এনামেল-মসৃণ উধাও মেঘদল
ছুঁয়ে যায় এরোপ্লেন; ক্রমাগত উঠছি উপরে,
যাচ্ছি চলে দূরে ফেলে বিন্দু
বিন্দু মাঠ
গাছপালা,
সরু নদী,
দপ্‌দপে
লোকালয়, সব কিছু দূরে ফেলে। আমার সত্তায়
বাজে নীলিমার স্তব; আকাশের অকূল সাহারা
চষে চষে কী বেল কী জুঁই
প্রত্যহ ফোটাতে চাই বুঝি না কিছুই। নীলিমায়
প্রপেলর গুঞ্জনে মৃত্যুকে ভুলে থাকি প্রহরে প্রহরে।
না, আমি কখনও আর নিচে নামব না,
নামব না, নামব না।
মনে পড়ে কৈশোরের সতেজ সকালে কতদিন
আকাশে দিয়েছি ছেড়ে ঘুড়ি আকাঙ্ক্ষার। মেঘমালা
কখনও হয়েছে ফুল, কখনও বা এঞ্জেলের পুণ্য ডানা হয়ে
দৃশ্যলোভী বালকের হৃদয় করেছে জয় ক্ষণে ক্ষণে, ফের
মুহূর্তে বদলিয়ে রঙ হয়ে গেছে মিকেলেঞ্জেলোর
আদমের মুখ, দীপ্ত, প্রসারিত হাত, দৃষ্টি খোলা।
বুঝি তাই আজীবন আকাশ-মাতাল আমি, তাই

পরিণামে হল যা হবার–
নীলিমাকে করেছি সুহৃদ।

রাত্রিদিন

উপরে উঠছি বলে চক্ষুশূল হব কি সবার?
না, আমি কখনও আর নিচে নামব না,
নামব না, নামব না।
নিচে নর্দমার গন্ধ। অজস্র পিচ্ছিল কেঁচো বিষাক্ত জঞ্জাল।
ভালবেসে কেবলি বর্ধিত করে অস্তিত্বের ঢিবি, চতুর্দিকে
অস্তিচর্মসার মানুষের ভিড় আর পথে পথে অধঃপাত
দাঁত বের করে হাসে। নগরে জঙ্গলে ভেদচিহ্ন লুপ্তপ্রায়,
সবাই ঘাঁটছে নোংরা আবর্জনা উৎসবের উত্তেজনা নিয়ে।

প্রেম তো সুদীর্ঘ

পত্রের-মার্জিন-ঘেঁষা পুনশ্চের মতো সংকুচিত, ক্ষণজন্মা
শিল্পীরা জলের দরে বিকোয় বাজারে, প্রগতির চাকা দেখি
অবিরত পাঁকে আট্‌কে যায়; স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, উদারতা,
করুণা নামক কিছু বিখ্যাত বিষয় আগাগোড়া শোকাবহ
বিশাল কাফনে মুড়ে লোকগুলো মহানন্দে বগল বাজায়,
ঘৃণাকে আনন্দ ভেবে শান্তিকে তর্জমা করে হিংসা কাঁটায়!
বরং আমার এরোপ্লেন শূন্যতায় হয়ে যাক
খানখান, তবু আমি নিচে নামব না।
ক্ষুধার চিৎকার থেকে, নর্দমার তীব্র গন্ধ থেকে
দারিদ্র্যের দাঁত নখ থেকে, আতঙ্কের থেকে দূরে,
সমস্ত কাঙালপনা, ক্ষুদ্রতার থেকে
আর কিনু গোয়ালার গলি থেকে দূরে
নীলিমার নহবত শুনে-শুনে যাব ঊর্ধ্বে যাব,
আরও ঊর্ধ্বে আরও।
না, আমি কখনো আর নিচে নামবে না,
নামব না,
নামব না ...

ভেলায়

জনহীন শিল্পশালায় ভজেছি শূন্যতাকে।
ললাটে অভিশাপের নিদারুণ জড়ুল বয়ে
চলেছি নিরুদ্দেশে অজানা জলের ডাকে।
প্লাবনের দামাল হাওয়া বয়ে যায় সত্তা জুড়ে।

স্মৃতিতে উদ্ভিদেরই মায়াবী পুরাণ ছায়া,
সাগরে যাচ্ছি ভেসে বুড়োটে ভেলায় চেপে।
কবে যে পালের ফালি নিমেষে উধাও হল,
জানি না হঠাৎ কবে ছিঁড়েছে দাঁড়ের দড়ি।

অজানা সমুদ্দুরে কুহকী নারীর গানে
হারালো দিক্‌নিশানা; শোণিতের রুদ্র ঝড়ে
মায়াবী পাহাড় ছুঁয়ে নিমেষে মজল যারা,
তাদেরই হাড় ক'খানা জমেছে পাথর ঘেঁষে।

কে ঘোড়া মেঘের সাঁকো পেরিয়ে স্বপ্নে আসে?
বুঝি তার খুরের ঘায়ে নীলিমা হচ্ছে গুঁড়ো।
কে জাগায় তন্দ্রা তটে? বেঘোরে বৈঠা দেখি
অবেলায় শিথিল মুঠোয় সহসা উঠলো ন'ড়ে।

নিয়ত লবণকণা ক্ষতকে কামড়ে ধরে।
কখনো ঢেউকে ভেবে রমণীর বক্ষচূড়া
মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ি নিরালা অতল জলে!
কখনো জলজ প্রাণী চকিতে মুখটি তোলে।

সবুজের আশায় জংলে একাকী পায়রাটাকে
ছেড়েছি মুঠোয় থেকে ধু-ধু সেই নীলাম্বরে।
নিয়ে তার তীক্ষ্ণ ঠোঁটে সুদূরের চিকন পাতা
ফেরেনি ভেলায় আজও, ফেরেনি পায়রা সাদা।

কিমিয়ার গোপন মায়া এখনও রক্তে নামে।
পুরাণের ভগ্ন ছায়ায় বেদনায় পুতুল গ'ড়ে
চলেছি নড়বড়ে এক বুড়োটে ভেলায় চেপে–
অবেলায় যাচ্ছি ভেসে, কেবলি যাচ্ছি ভেসে।

সংবাদপত্রে কোনো একটি ছবি দেখে

তুমিও ঘুমিয়ে ছিলে ছোট খাটে, পাছে ঘুম-দ্বীপে
ঝড় ওঠে, পাছে বানচাল হয় চাঁদের মতোই
স্বপ্নের মোহন নৌকা, হাঙরের দাঁত ছিঁড়ে ফেলে
শান্তির রুপালি মাছ কিংবা অপদেবতার ক্রূর
দৃষ্টি পড়ে কচি মুখে, ঘুমের মোমের ডানা পুড়ে
হয় ছাই, পাছে ভয় পাও তাই মায়ের প্রার্থনা
একা ঘরে সারাক্ষণ ছিল জেগে তোমার শয্যার

চতুষ্পার্শ্বে; উদ্ভিদের মতো তুমি ঘুমে ভাসমান।

কে এক ভীষণ দৈত্য তোমার ঘুমের দ্বীপটিকে
অকস্মাৎ দিল নেড়ে প্রাণপণে, অভ্রের প্রাসাদ
হল গুঁড়ো, বিচূর্ণিত প্রবালের সিঁড়ি। সান্তিয়াগো
উঠল নড়ে দরদালানের ভিতে কে বলবে আজ
কী ঘুণ লুকিয়ে ছিল? এবং তোমাকে কী আক্রোশে
স্বপ্ন দেখে দুঃস্বপ্নের গোলকধাঁধায় দিল ছুড়ে!
সান্তিয়াগো, যেন সে তাসের ঘর, এক ফুঁয়ে হলো
আঁস্তাকুড়; শহরের কণ্ঠ হলো তীব্র হাহাকার।

তোমার বিভ্রান্ত চোখ কী যেন খুঁজছে প্রতিক্ষণ,
কাকে খোঁজো ধ্বংসস্তূপে? মাকে? নাকি বিমর্ষ পিতাকে–
যিনি রোজ শূন্য ঘরে বাজাতেন রাত্তিরে বেহালা,
বিকেলে তোমার ছোট হাত ধরে নিজেরই বাগানে
বেড়াতেন অন্যমনে, শুনতেন পাতার মর্মর।

মাঝে মাঝে "দ্যাখো চেয়ে কী সুন্দর পাখি, ওরা ডালে
শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে," ব'লে যিনি সূর্যাস্তের দিকে
দু'চোখ দিতেন মেলে– বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে খোঁজো তাঁকে?

সেখানে যেও না আর। কেউ নেই, কিছু নেই, কালো
একটা বেড়াল শুধু ব'সে আছে হলুদ জঞ্জালে।
ছেঁড়া কাগজের টুকরো উড়ে এসে তোমার পায়ের
কাছে থামে। না, সেখানে নেই কোনো রঙিন পুতুল–
যা আছে দেখলে বড় ভয় পাবে, যেও না সেখানে।
কে এক বর্বর তার সর্বনাশা খেলার নেশায়
ভেঙেছে তোমার শান্ত খেলাঘর। হে দুঃস্বপ্নচারিণী
আমার হৃদয় হল তোমাদের বিধ্বস্ত শহর!

কখনো আমার মাকে

কখনো আমার মাকে কোনো গান গাইতে শুনিনি।
সেই কবে শিশু রাতে ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে
আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতেন কিনা আজ মনেই পড়ে না।

যখন শরীরে তার বসন্তের সম্ভার আসেনি,
যখন ছিলেন তিনি ঝড়ে আম-কুড়িয়ে বেড়ানো
বয়সের কাছাকাছি হয়তো তখনো কোনো গান

লতিয়ে ওঠেনি মিড়ে মিড়ে দুপুরে সন্ধ্যায়,
পাছে গুরুজনদের কানে যায়। এবং স্বামীর

সংসারে এসেও মা আমার সারাক্ষণ
ছিলেন নিশ্চুপ বড়, বড় বেশি নেপথ্যচারিণী। যতদূর
জানা আছে, টপ্‌পা কি খেয়াল তাঁকে করেনি দখল
কোনো দিন। মাছ কোটা কিংবা হলুদ বাটার ফাঁকে
অথবা বিকেলবেলা নিকিয়ে উঠোন
ধুয়ে মুছে বাসন-কোসন
সেলাইয়ের কলে ঝুঁকে, আলনায় ঝুলিয়ে কাপড়,
ছেঁড়া শার্টে রিফু কর্মে মেতে
আমাকে খেলার মাঠে পাঠিয়ে আদরে
অবসরে চুল বাঁধবার ছলে কোনো গান গেয়েছেন কিনা
এতকাল কাছাকাছি আছি তবু জানতে পারিনি।

যেন তিনি সব গান দুঃখ-জাগানিয়া কোনো কাছের সিন্দুকে
রেখেছেন বন্ধ করে আজীবন, এখন তাদের
গ্রন্থিল শরীর থেকে কালেভদ্রে সুর নয়, শুধু
ন্যাপথলিনের তীব্র ঘ্রাণ ভেসে আসে!

বাংলা কবিতার প্রতি

'এসো সখি' বলে বহু যুবরাজ তোমাকে সর্বদা
তেপান্তরে, নদীতীরে, কাশবনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
ছায়াচ্ছন্ন শাল তাল তমালের ভিড়ে টেনে এনে
মধ্যদিনে শুনিয়েছে রাখালের বেণু। বড় বেশি
জলজ কণিকা ফুসফুসে জমেছিল বলে তুমি
ভুগেছ সর্দিতে খুব, এত ছিঁচকাঁদুনে হয়েছ
আদরিণী কাব্যলক্ষ্মী আমাদের, এত আলুথালু!

তোমাকে বালিকা ভেবে অনেক চটুল মান্যবর
অক্লান্ত বাজিয়েছেন ঝুমঝুমি আর লজেঞ্চুস
সেধেছেন, কেউ কেউ রঙিন রিবনে বাঁধা কিছু
মনোহরি বাক্স– তুমি হাসিমুখে করেছ গ্রহণ।
(মাঝে-মাঝে ক'জন ঐন্দ্রজালিক নীলিমার থেকে
ছিনিয়ে হাঁসের মালা দিয়েছে তোমার কোলে ছুড়ে)
দেখেছি তো কতিপয় বিদূষক সাতপুরুষের
কাহন কাহন সোনারুপো দিয়ে নাকছাবি আর

কেয়ূর, পায়ের মল দিয়েছে গড়িয়ে, তুমি গর্বে
গরবিনী, বেড়িয়েছ পাড়া সেই কিঙ্কিণী বাজিয়ে।

না, আমি নিন্দুক নই। তুমি তো জানোই কী আনন্দে
তোমার সান্নিধ্য চাই, একনিষ্ঠ প্রেমিকের মতো
বসে থাকি তোমারই বাগানে। বেল জুঁই কি টগর
ইত্যাদি বটেই, এমনকি মরাপাতা নিই তুলে
ব্যগ্র হাতে। যখন উধাও সব পুষ্প স্বপ্নেরা
তখনও তোমার তীব্র আধিপত্য চৈতন্যে আমার।

না, আমি নিন্দুক নই। আপাতত অসহ্য তোমার
চটকসর্বস্ব মুখ— এতকাল একই অঙ্গরাগ
দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। যখন ঝুলন্ত বারান্দায়
দাঁড়াও, বাড়াও মুখ আর হৃদয় দুয়ার খুলে
উঁকি মারো জনপথে, কিংবা নিশীথ টেবিলে রেখে
অলংকার, বিবর্ণ দস্তানা তুমি শস্তা হোটেলের
কামরায় ভাসমান প্রমোদ হিল্লোলে, অনেকটা
বুক-পেট দেখিয়ে দুপুরে এভিনিউ ঘুরে ঘুরে

যখন উত্তাল ঢেউ তুলে হাঁটো নিতম্ব দুলিয়ে,
লজ্জা কি পাও না তুমি? আমি মুখ নিচু করে থাকি।
একই প্রসাধিত মুখ, একই ছলাকলা দেখে দেখে
আলোড়িত অন্ত্রতন্ত্র— বিবমিষা, শুধু বিবমিষা!

বারোয়ারী যে মালা পরেছ সে তো পচে পচে আজ
এক স্তূপ দুর্দশার মতো আর অভিনবত্বমাতাল
কিছু যুবা তোমাকে নামাল পথে, বনেদী জরির
শাড়ি সাতফালা করে ছিঁড়ে গুঁড়ো এলাচের মতো
নক্ষত্রখচিত সার্বভৌম অন্তর্বাস কুটি কুটি
করল সখেদে। তুমি ধুলোয় উবুড় হয়ে রইলে
লাস্যময়ী! স্বেচ্ছাসেবকের দল প্রবল উদ্যমে
তোমার মরালকণ্ঠে দিল পুরে কত দুর্ভিক্ষের
বিশীর্ণ পাঁচালি। পচা মাখনের মতো দুর্বিষহ

গন্ধ-প্রসবিনী শরীরে তোমার ভনভনে মাছি
এক ঝাঁক। বলো, বিদ্যাধরী, বলো ন্যক্কার নেই কি
কিছুতেই? ঘেন্না, বড় ঘেন্না, বড় বেশি ঘেন্না লাগে—
কালের মন্দিরা বাজে ডানে বাঁয়ে দুই হাতে, শোনো,
এসো ভিন্ন সাজে বিদ্যাধরী ওগো ঘেন্না-জাগানিয়া!

রৌদ্র করোটিতে

প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৭০ [জুলাই ১৯৬৩]
প্রকাশক পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘ
প্রচ্ছদ-শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী
উৎসর্গ-পত্র আব্বা ও আম্মাকে

দুঃখ

আমাদের বারান্দায় ঘরের চৌকাঠে
কড়িকাঠে চেয়ারে টেবিলে আর খাটে
দুঃখ তার লেখে নাম। ছাদের কার্নিশ, খড়খড়ি
ফ্রেমের বার্নিশ আর মেঝের ধুলোয়
দুঃখ তার আঁকে চকখড়ি
এবং বুলোয়
তুলি বাঁশি-বাজা আমাদের এই নাটে।

আমাদের একরত্তি উঠোনের কোণে
উড়ে-আসা চৈত্রের পাতায়
পাণ্ডুলিপি বই ছেঁড়া মলিন খাতায়
গ্রীষ্মের দুপুরে ঢক্‌ঢক্‌
জল-খাওয়া কুঁজোয় গেলাশে, শীত-ঠকঠক
রাত্রির নরম লেপে দুঃখ তার বোনে
নাম
অবিরাম।

পিরিচ চামচ আর চায়ের বাটিতে
রোদ্দুরের উল্কি-আঁকা উঠোনের আপন মাটিতে
দুঃখ তার লেখে নাম।

চৌকি, পিঁড়ি শতরঞ্জি চাদর মশারি
পাঞ্জাবি তোয়ালে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি
প্রখর কম্বল আর কাঁথায় বালিশে
ঝাপসা তেলের শিশি টুথব্রাশ বাতের মালিশে
দুঃখ তার লেখে নাম।
খুকির পুতুলরানী এবং খোকার পোষমানা
পাখিটার ডানা

মুখ-বুজে-থাকা
সহধর্মিণীর সাদা শাড়ির আঁচলে দুঃখ তার
ওড়ায় পতাকা।
পায়ে-পায়ে-ঘোরা পুষি-বেড়ালের মসৃণ শরীরে
ছাগলের খুঁটি আর স্বপ্নের জোনাকিদের ভিড়ে
বৃষ্টি-ভেজা নিবন্ত উনুনে আর পুরানো বাড়ির

রাত্রিমাখা গন্ধে আর উপোসী হাঁড়ির
শূন্যতায় দুঃখ তার লেখে নাম।

হৃদয়ে-লতিয়ে-ওঠা একটি নিভৃততম গানে
সুখের নিদ্রায় কিবা জাগরণে, স্বপ্নের বাগানে,
অধরের অধীর চুম্বনে সান্নিধ্যের মধ্যদিনে
আমার নৈঃশব্দ আর মুখর আলাপে
স্বাস্থ্যের কৌলিন্যে ক্রূর যন্ত্রণার অসুস্থ প্রলাপে,
বিশ্বস্ত মাধুর্যে আর রুক্ষতার সুতীক্ষ্ণ সঙ্গিনে
দুর্বিনীত ইচ্ছার ডানায়
আসক্তির কানায় কানায়
বৈরাগ্যের গৈরিক কৌপীনে
দুঃখ তার লেখে নাম।

রৌদ্রঝলকিত ভাঙা স্তিমিত আয়নায়
নববর্ষে খুকির বায়নায়
আমার রোদ্দুর আর আমার ছায়ায়
দুঃখ তার লেখে নাম।

অবেলায় পাতে-দেয়া ঠাণ্ডা ভাতে
বাল্যশিক্ষা ব্যাকরণ এবং আদর্শ ধারাপাতে
ফুলদানি, বিকৃত শ্লেটের শান্ত মেঘলা ললাটে
আর আদিরসাত্মক বইয়ের মলাটে
চুলের বুরুশে চিরুনির নম্র দাঁতে
দুঃখ তার লেখে নাম।

কপালের টিপে,
শয্যার প্রবাল দ্বীপে,
জুতোর গুহায় আর দুধের বাটির সরোবরে
বাসনার মণিকণ্ঠ পাখিডাকা চরে
দুঃখ তার লেখে নাম।
বুকের পাঁজর ফুসফুস আমার পাকস্থলিতে
প্লীহায় যকৃতে আর অন্ত্রের গলিতে
দুঃখ তার লেখে নাম।

আমার হৃৎপিণ্ডে শুনি দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রাক্ দ্রাক্
দুঃখ শুধু বাজায় নিপুণ তার ঢাক।

ঐ ভীমরতিভরা পিতামহ ঘড়ির কাঁটায়
বার্ধক্য-ঠেকানো ছড়ি, পানের বাটায়
গোটানো আস্তিনে দুমড়ানো পাৎলুনে
কাগজের নৌকা আর রঙিন বেলুনে
দুঃখ তার লেখে নাম।

কখনো না-দেখা নীল দূর আকাশের
মিহি বাতাসের
সুন্দর পাখির মতো আমার আশায়
হৃদয়ের নিভৃত ভাষায়
দুঃখ তার লেখে নাম।

খুপরির গান

ধুলো গিলে ভিড় ছেনে উকুনের উৎপাত উজিয়ে
ক্লান্তি ঠেলে রাত্তিরে ঘুমোতে যাই মাথাব্যথা নিয়ে।
না-জ্বেলে ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি স্বপ্নচারী বিছানায়
গড়াই, লড়াই করি ভাবনার শত্রুদের সাথে–
হাত নাড়ি লাথি ছুড়ি পৃথিবীর গোলগাল মুখ
লক্ষ্য করে। বিবেকের পিঁপড়ে যদি সত্যি হেঁটে যায়

পিচ্ছিল দেয়ালে, মন থেকে মুছে নেব ছোটখাটো
পাপবোধ অল্পবিস্তরেণ....পোষমানা মূল্যায়নে
পাব সুখ দেখব কি নেড়েচেড়ে এক টুকরো হলদে
নিষ্প্রাণ কাগজে মোড়া আত্মা, সত্যি একরত্তি সেই
আধ্যাত্মিক পিণ্ড...আর পরাবিদ্যা ভাসাব জ্যোৎস্নায়?
দিনে কৃষ্ণচূড়া রাতে রজনীগন্ধার স্পর্শ যারা
পেতে চায় অন্তরঙ্গ সাহচর্যে, যদি বলে তারা :
'গুনে-গুনে রেজগি দিয়ে প্রতিদিন অভ্যাসবশত
ছুঁয়েছি লাভের বুড়ি, লোকসান বলে কাকে জানি না ইয়ার'
–কী দেবে জবাব তবে অসংখ্য তারার ব্যালেরিনা,
বাগানের স্তম্ভিত সবুজ মূঢ় ফুলের স্তবক?

ভ্যানগগ রক্তে তার কালো কাক ফসলের ক্ষেত
সূর্যমুখী এক জোড়া জীর্ণ বুটজুড়ো কেবলি মথিত করে
রোদে সূচ্যগ্রে বিদ্ধ হল শাশ্বতীর আকাঙ্ক্ষায়,

সহযাত্রী বন্ধু তার হলুদ যেসাস খোঁজে আরেক প্রান্তরে
নতজানু, ঊর্ধ্ববাহু, কণ্ঠে কালো বৃষ্টির আরক।

এ-পাড়ায় ১৭টি উজবুক ৫ জন বোবা
৭টি মাতাল আর ৩ জন কালা বেঁচেবর্তে
আছে আজও দুর্দশার নাকের তলায়। মাঝে-মাঝে
দুর্লভ আঙুর চেয়ে কেউ-কেউ তারা বলে থাকে
'টক সব টক– তার চেয়ে তাড়ির ঝাঁঝালো ঢোঁক
ঢের ভালো, ভালো সেই গলির মোড়ে জ্বলজ্বলে
পানের দোকান আর বাইজির নাচের ঘুঙুর।'

বমির নোংরায় ভাসে মেঝে, রুটির বাদামি টুকরো
চড়ুই পালাল নিয়ে। তাকাব না কখনো বাইরে....
ঘরে জানলা নেই...হলুদ যেসাস বিদ্ধ কড়িকাঠে....
রৌদ্রঝলসিত কাক ওড়ে মত্ত রক্তে কাঠফাটা
আত্মার প্রান্তরে। সারারাত
অনিদ্রা দুঃস্বপ্ন আর
ছারপোকা, ছিদ্রান্বেষী ইঁদুরের উৎপাত উজিয়ে
ময়লা চাদর ছেড়ে উঠি ফের মাথাব্যথা নিয়ে।

আমার মাকে

মাকে দেখি প্রতিদিন ধ্যানী প্রদক্ষিণে
ছায়াবৃতা আপন সংসারে। তাকে চিনে
নিতে পারি সহজেই যখন নিভৃত অনুভবে বারবার
একটি ভাস্বর নদী, ফলের বাগান, মাঠ আর
শস্যক্ষেত, দূরের পাহাড়
গলে গিয়ে একই স্রোতে বয়ে যায়, সীমা
মুছে যায় চরাচরে : স্বদেশের স্বতন্ত্র মহিমা
অনন্য উপমা তাঁর। কে যেন চকিতে চেনা স্বরে
বলে শুনি, পাল্কি চড়ে, বেনারসি পরে
যেদিন এলেন তিনি আমাদের ঘরে
চেরাগের মতো কল্যাণের হাত ধরে–
তারই স্মৃতি আছে লেগে অদৃশ্য চাঁপার উন্মীলনে,
সোনার কলসে আর সাঁঝ-নামা দিঘির গহনে।

মার চোখে শৈশবের ক্রৌঞ্চ দ্বীপ ভাসে?
চোখে বেনেবউ পাখি, চোখে চন্দ্রমল্লিকার দাবি
শঙ্কিত আভাসে আঁকা– ভাবি
রান্না আর কান্না গাঁথা রুক্ষ এই মরুর আকাশে
এখনও কি স্বপ্ন বোনে উর্ণনাভ চাঁদ
নাকি স্বপ্নের জরির পাড়ে সবি জাদুকরি ফাঁদ।
চেয়েছে বুকের সূক্ষ্ম সোনালি সুতোয় চিরদিন
সমস্ত জীবন হোক নকশিকাঁথা : সে ইচ্ছার ঋণ
শুধে দিতে বুঝি হতে হয়
গাছের মতোই এই রৌদ্রজলে মৃন্ময়, তন্ময়।

মাকে দেখি। আজও দেখি কী এক মায়ায়
পাখি তার হাত থেকে স্নেহের খাবার খেয়ে যায়
দু'বেলা আবেগ ভরে। দেখি তসবি গুনে
সন্ধ্যার মিনারে
সত্তার কিনারে
ঐ দূরায়নী আজানের ধ্বনি শুনে
আর সুবে-সাদেকের তীব্র শুভ্রতায় নির্মেঘ আনন্দে শোকে
আজীবন সমর্পিতা কোরানের শ্লোকে।

আমার দুর্ভাগ্য সেই বিশ্বাসের অনড় জমিনে
দেখি না প্রোথিত কোনো অলীক পর্বত– যাকে চিনে
দ্বন্দ্বহীন জীবনের কাছে আত্মবিসর্জনে পাব স্বর্গসুখ।
মাঝে-মাঝে সংশয়ের গলিতে বিমুখ
প্রশ্ন তুলে ধরে ফণা :
আমি কি সঠিক জানি ভদ্রমহিলাকে
–আমি যার একান্ত বিস্তার অনন্তের শুভ্রলোকে–
চিনি তাকে?
ব্যথা হয়ে বাজে মাঝে-মাঝে তারও চোখ
আমার অস্তিত্ব-পটে : 'কে এই অচেনা ভদ্রলোক?'

মায়ের চোখে

আমার খোকন গাঢ় দুপুরে ঘুমাত, ঘুমাবার
করত ভান আমার বালিশে, বুকে আর
'গল্প বলো....কড়ির পাহাড়, শঙ্খমালা', বলত গ্রীষ্মের দুপুরে

কাঁচা আম কত জলছবি হাতে, জাহাজের বাঁশি বাজাত নকল সুরে।
ওঁর চশমা চোখে টুপি পরে দেখা দিত মস্ত সং
আমার হেঁশেলে, লাল টুকটুকে কচি মুখে বুজরুকি ঢং :
মাটিতে লুটাত হেসে আর যারা দেখত পাঁচজন,
বলত, কী-যে কাণ্ড করে একরত্তি তোমার খোকন।

এখন সে স্থূলোদর, প্রশস্ত কপাল, পাতলা চুল
ঢাকে না মাথার টাক, স্লেট হাতে যায় না ইস্কুল।
আজ দেখি স্বাস্থ্যান্বেষী সে-ও ছড়ি হাতে
পার্কে কিংবা নদীতীরে (যদি কমে বাড়তি মেদ, বাড়ে
খিদেটুকু) ঘরে ফেলে সিঁড়ি হাতড়িয়ে অন্ধকারে।
বেড়েছে রক্তের চাপ, দাগ মেপে ঠিকঠাক ঘুমহীন রাতে
কেবলি ওষুধ খায়, ডেন্টিস্টের কাছে যায় যখন-তখন
আমার খোকন।

চেনা অচেনার সঙ্গতি

The stars rang like silver coins in my hand.
RIMBAUD

সবাই দেখল তাকে বিস্ময়ের উন্মুখ চৌকাঠে,
দাঁড়িয়ে দেখল তার শীর্ণ হাতে একমুঠো তারা,
খেলছে সে– যেন কতগুলো ঝকঝকে টাকা
নেড়েচেড়ে দেখছে তন্ময় হয়ে মুগ্ধতার ঘুলঘুলি দিয়ে।
নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তারা দশজন
দেখল সে শুয়ে-শুয়ে বৃষ্টির ঝাঁঝালো মদে ডুবে
খুঁজছে সোমত্ত নৌকো তার ভেজা ঠোঁটে কিনারে
চুমো খাবে বলে। তারা শুধু পরস্পর

পিটপিটে চোখ টিপে দেখল কানের জানালায়
নির্ভার অস্তিত্ব এক বসেছে নিঃশব্দে। পৃথিবীর
সমস্ত স্তব্ধতা যেন শরীরে রেখেছে ঘিরে সেই আগন্তুক।
সবাই বলল তাকে, পাখিটাকে– শুয়োরের তাজা
টকটকে মাংসের পিণ্ডের মতো সন্ধ্যার সাক্ষাতে–
সবাই বলল তাকে সমবেত কণ্ঠের ক্রেঙ্কারে :
‘গাও পাখি গান গাও, এ প্রহর গানের প্রহর।’

নিষ্কম্প স্তব্ধতা দেখে তারা ফের দ্বিগুণ বিক্রমে
করল গানের ফরমাশ। নৈঃশব্দের দরবারে
তবুও হল না উন্মীলিত ফুলের পাপড়ির মতো কোমল গান্ধার।
চুরুট রঙের কোট ছুড়ে ফেলে, ফটোগ্রাফারের
কালো কাপড়ের মতো পর্দা টেনে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে
এক পশলা তারা সে-লোকটা (সবাই দেখল যাকে)
তাকাল পাখির ছোট দুটি সোনালি চোখের দিকে।
হাতের মুঠোয় তারা চকিতে উঠল বেজে রুপালি মুদ্রার
ঝনঝনে শব্দের মতো, পাখির চোখের দুটি তারা
ঝরাল আলোর দ্যুতি লোকটার কম্পিত মুঠোয়।

ছুঁচোর কেত্তন

যদি মুখ খুলি কী বলব? বলার কিছুই নেই?
বলব কি দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া রমনার শান্ত গাল
দিয়েছে রাঙিয়ে, বলব কি আর দশজন মরে মরুকগে,
আমার সকালে চাই রোজ দুটি আধাসেদ্ধ ডিম,
রুটি-মাখনের সঙ্গে— জ্যাম না-ই হোক, ক্ষতি নেই
অথবা মল্লিকের ছোট মেয়েটার (কী-যে তার নাম
ক'দিন হয়েছে হাম), যে-লেখক এবার পেলেন
আদমজী পুরস্কার তিনি প্রত্যহ মাজেন দাঁত
কলিনস্ দিয়ে, কী করে বিকোয় সবজি
বাজারে ইত্যাদি টুকিটাকি বলব কি
ছাদহীন ঘরে দিন কে চায় কাটাতে আজীবন,
সোনার খাঁচায় রইল না দিনগুলি।

আদিতে কিছুই নেই, অন্তে নেই কিছু;
মধ্যে শুধু এই থাকা না-থাকার জ্যোৎস্না চমকিত
ঊর্ণাজাল।

গ্রীষ্মের দুপুরে

রাস্তার বিবর্ণ কোণে ঘোড়ার খুরের শব্দ সত্য,
সত্য এই জানালার কাচে কালো বৃষ্টির আঁচড়,
পাতার কঙ্কাল আর ব্রিজের ওপর ঝকঝক
রাত্রির চলন্ত ট্রেন, দাড়ি না-কামানো

মুখের মতন দিন সত্য– সত্য সবি।

কিন্তু তবু কী সম্পর্ক পূর্ণিমা চাঁদের সঙ্গে এই
খেঁকি কুকুরের? অথবা রজনীগন্ধা আর দূর
চিমনির ধোঁয়া অবিশ্বাস্য কী গ্রন্থিতে আছে বাঁধা?
সম্বন্ধের কোন প্রসারিত পরিধিতে
মগ্ন পরস্পর হাতের চকিত মুদ্রা জনাকীর্ণ
এভেন্যুর ফোয়ারার বিচূর্ণিত জল!

একটি প্রখর পাখি ঠুক্‌রে ফেলে দেয় অবরিত
পোকা-খাওয়া মূল্যবোধ। আমরা যে-যার মতো পথ চলি,
দেখি বুড়ো লোকটা পার্কের বেঞ্চে ব'সে হাঁপিয়ে, ফুঁপিয়ে
অভিশাপ ছুড়ে দেয়, গাল পাড়ে ভিখিরিকে আর
উল্কি-পরা সরু গলি চমকায় নগ্ন ইশারায়,
বেকার যুবক দৃষ্টি দ্যায় সিনেমার প্ল্যাকার্ডের
রঙচঙে ঠোঁটে, মুখে বুকে আর মদির উরুতে।

পৃথিবীটা চলছে, চলবে যতদিন সূর্য তার
ছিটোবে সোনালি থুতু, কিন্তু যদি
ততই নিশ্চিত এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তবে
কেন সে নব্বুই বছরের বুড়ো কনকনে হাওয়ায় ভাসিয়ে ধবধবে
সাদা চুল এক হাঁটু তুষারের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোনায় কতো
শান্তি ললিত বাণী একই কেন্দ্রে ঘুরপাক-খাওয়া
অগণিত মানুষের হাটে!

যদি মুখ আদপেই খুলি বলব কি এপ্রিলের
উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘেমে ঘেমে রোজ হচ্ছি নাজেহাল,
ব্লাউজ পিস্‌টা চমৎকার... তোমাকে মানাবে ভালো
পরো যদি খয়েরি শাড়ির সঙ্গে অথবা হানিফ
করেছে সেঞ্চুরি ফের, দালাই লামার আত্মজীবনীতে কত
ঘটনার সমাহার; বলব কি চলো যাই কফি খাই
হাল ফ্যাশনের কিছু বই পড়া চাই
নইলে লাফাবে তুমি এঁদো ডোবা, কুয়োর ভেতরে।

বলব কি টাইয়ের নিখুঁত নট শিখলোনা বাঁধতে বেচারা
আজ অব্দি, বলব কি তিনটি সরলরেখা মিলেই ত্রিভুজ...
ঘরে বসে ছুঁচোর কেত্তনে আজ মেটাব কি সাধ,
বলব কি...

পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ

পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ চেয়েছে চাঁদের কাছে বুঝি
একটি অদ্ভুত স্বপ্ন তাই রাত্রি তাকে
দিল উপহার

বিষাদের বিস্রস্ত তনিমা
যেন সে দুর্মর কাপালিক
চন্দ্রমার করোটিতে আকণ্ঠ করবে পান সুতীব্র মদিরা

পৃথিবীতে সম্পন্ন গাছের পাতা ঝরে
হরিণের কানের মতন পাতা ঝরে ধ্বনি ঝরে
উজ্জ্বল মাছের
রুপালি আঁশের মতো ধ্বনি ঝরে ঝরে ধ্বনি
ঝরে পৃথিবীতে
সে ধ্বনির আকাঙ্ক্ষায় জ্ব'লে ততদিন সে-ও
থাকবে পথের প্রান্তে প্রতীক্ষার ঘাটে
যতদিন সহজে ভাসানো চলে সোনার কলস

রৌদ্রের দস্যুতা জেনে বৃষ্টির আঁচড়ে
মুহ্যমান দুঃখের দর্পণে দেখে মুখ
বাসি রুটি
চিবোয় অভ্যাসবশে জ্যোৎস্নাজ্বলা দাঁতে
আর স্মৃতিগুলি একপাল কুকুরের মতো
খিঁচিয়ে ধারালো দাঁত মনের পিছনে করে তাড়া
ভাবে

একতাল শূন্যতায় ভাবে
বেহেস্তের ছবি যায় কশাই চামার
ছুতোর কামার আর
মুটে মজুরের ঘরে আর দরবেশের গুহায়
বাদশার হারেমে সুন্দরী বাঁদী যদি
বিলাসের কামনার খাদ্য হয় সোহাগ জোগায়
বিলোল অধরে
গড়ায় ক'ফোঁটা পানি ক্ষুধিত পাষাণে
অথবা নুলোর বউ কাঁদে ভাদ্রের দুপুরে
তবে যে লোকটা হেঁটে যায়
বিকেলের মোলায়েম রোদে

তার কীবা এসে যায়

অন্যের দুঃখের নদী বয়ে যেতে দেখে
আমরা সবাই কম বেশি
স্বস্তির হাওয়ায় ভাসি নিজের ফাঁড়ার কথা ভেবে
একচ্ছত্র ক্ষুধার সাম্রাজ্যে ঘুরে ঘুরে
ধুলো ঘেঁটে ছাই ছেনে হৈ হৈ ছেলেদের
দৌরাত্ম্যে অস্থির
ফিরে আসে পার্কে এই নিরানন্দ বাদামের খোসা
ভবঘুরে কাগজের অভ্যস্ত জগতে
যেখানে অনামি
বাউণ্ডুলে ময়লা ভিখিরি আর লম্পট জোচ্চোর
গণ্ডমূর্খ আর ভণ্ড ফকির অথবা
অর্ধনগ্ন ভস্মমাখা উন্মাদিনী বেহেড মাতাল
এসে জোটে সন্ধ্যার আড়ালে
যখন কোথাও
রজনীগন্ধার ডালে কাগজের মতো চাঁদ বোনে
স্বপ্নের রুপালি পাড়

অর্ধদগ্ধ বিড়িটাকে শুকনো ঠোঁটে চেপে
তাকায় রাস্তার ধারে চাঁদহীন মাঠে
অদ্ভুত বিকৃত মুখে যেন
পৃথিবীর কোনো সত্যে সৌন্দর্যে কল্যাণে
আস্থা নেই তার যেন একটি কর্কশ পাখি
আত্মাকে ঠুকরে বলে তোমার বাগান নেই বলে
রক্তিম গোলাপ আসবে না
বিকলাঙ্গ স্বপ্নের অলিন্দে কোনো দিন
জানে তার নেই ঠাঁই সুন্দরের কোলে
নুলোর বউটা তবে তাকে
থাক থাক
এসব কথার বুজরুকি
কখনো সাজে কি তার চালচুলো নেই যার এই
দুনিয়ার ঘরে

রোঁয়াওঠা কুকুরের সাহচর্যে গ্রীষ্মের গোধূলি
হয়তো লাগবে ভালো রাত্রি এলে চাঁদ

হয়তো অদ্ভুত স্বপ্ন দেবে তার সত্তার মাটিতে
বিষাদের ঘরে
কেউ জাগাবে না তাকে
পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জটাকে

তিনটি বালক

রুটির দোকান ঘেঁষে তিনটি বালক সন্তর্পণে
দাঁড়ালো শীতের ভোরে, জড়োসড়ো। তিন জোড়া চোখ
বাদামি রুটির দীপ্তি নিল মেখে গোপন ঈর্ষায়।
রুটিকে মায়ের স্তন ভেবে তারা, তিনটি বালক
তৃষিত, আত্মাকে সঁপে সংযত লোভের দোলনায়,
অধিক ঘনিষ্ঠ হ'ল তন্দুরের তাপের আশায়।

কিন্তু তারা কর্মঠ থাবার তাড়া খেয়ে, তাড়াতাড়ি
ফিরে গেল হিমেল বাতাসে খুঁজে নিতে অন্য কোনো
বুভুক্ষার পরিমেল। যে বুড়ো লোকটা আধপোড়া সিগারেট
তন্ময় নিষ্ঠায় রাস্তা থেকে তুলে নেয়, তার কাছে
তিনটি বালক যেন নরক পালক, সহযাত্রী
দুঃখের অম্বর-ডিসেম্বরে ফুটপাতে
কুঁকড়ে থেকে এক কোণে হাড়ে হাড়ে টের পায় যারা
হিমেল হাওয়ার ধার : শরীরের মাংস যেন খ'সে প'ড়ে যাবে
ইতস্তত পচা কমলালেবুর মতো নামমাত্র স্পর্শে, আর

ফুটোভরা কাঁথার তলায় শুয়ে তারাময় খোলা
আকাশের নিচে কোনো দিন
হয়তো অলক্ষ্যে হয় স্বর্গের শিকার।

মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখে : ম্লান কুয়াশায়
এক ঝাঁক ঘুঘু নামে পূর্বপুরুষের
সম্পন্ন ভিটায়।

যখন রবীন্দ্রনাথ

যখন রবীন্দ্রনাথ কালো ঘোড়াটাকে সিন্ধুপারে
দেখলেন, সম্মুখ শান্তির পারাবারে

অবগাহনের তৃষ্ণা নিয়ে চোখে দৃশ্য-মোছা-ঝড়ে
দিলেন প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে চরাচরে,
মৃত্যুর অতীত সৃষ্টিলীলা, শান্তিলেপা কত ছবি
শব্দের ছন্দের জাদু, মায়াবনবিহারিণী হরিণী এবং
ছায়া সুনিবিড় গ্রাম, মাছের কানকা ভরা গলি, ঋতুরং–
যেদিন গেলেন তিনি, ভুললেন সবি।

হামেদ জালাল, সেই প্রৌঢ়, জ্যোৎস্না রাতে
যিনি গ্রান্ড ক্যানালের গন্ডোলায় ভেসে
আপেলের মতো ছাড়িয়ে সত্যের খোসা, স্মিত হেসে
বুদ্ধের মূর্তির নিচে, যিনি বাদামি চুলের বান্ধবীর সাথে
কাঁকড়ার ঝোল কিংবা অয়েস্টার চোখে,
মাতাডোর আর ষাঁড়ের লড়াই দেখে
মিটিয়ে চোখের তৃষ্ণা ঘাসের ঘাগরার নাচে, শেষে
একদিন সাফল্যের তরী বেয়ে সুদূরে আবেশে
স্বদেশের ঘাটে ভিড়লেন,
যিনি শালিকের দিকে চেয়ে 'আগে এখানে নামিনি?'
তিনিও ধুলোয় মিশে ভুললেন কাঞ্চন-কামিনী,
ত্বকের নিবিড় লেনদেন।

সুফিয়া খাতুন যার ঘন কেশদামে
ছিল দীপ্ত যৌবনের স্বর্ণভস্ম, যাকে নীল খামে
স্বামী ছাড়া আরো ক'জন উদ্‌ভ্রান্ত যুবা নানা ছলে
পাঠিয়েছে পত্র–লোকে বলে,
তিনিও কবরে শুয়ে ভোলেন নিপুণ কামকলা।
কর্মঘর্ম গাঁথা ব্যস্ত রাস্তায় গলিতে যারা গলাবাজি
করে, দাঁতে দাঁত ঘষে,
সহানুভূতির মতো সবুজ সবজির প্রয়োজনে দর কষে,
রুটির মতোই জীবনকে ধ্রুব জানে
জমায় বিভ্রান্ত ভিড় শুঁড়ির দোকানে,
সোনার ষাঁড়ের লেজ ধরার আশায় দিনরাত
ঘোরে দিগ্বিদিক, বিকেলের মিহি রোদে
নেতার বক্তৃতা শুনে দেয় করতালি, অকস্মাৎ
মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে বেনামি দুর্জ্ঞেয় কোনো বোধে
তারা যাবে, ভুলবে বাজার দর আর
সোমবার কিবা রবিবার।

কাদের জন্যে

লিখতে কহ যে দিনরাত্তির
কাদের জন্যে লিখব?
কাদের জন্যে দুঃখের পাঠ
করুণ ভাষ্যে শিখব?

ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার আর
মোক্তার আর রাজনীতিবিদ
আদার ব্যাপারী আর ব্যাংকার
পেডেস্তো আর মিহি কলাবিদ
খুঁটবে আমার কাব্য।
তাদের জন্যে লিখব এবং
তাদের জন্যে ভাবব?

শকুন-উকিল ঘোর ঠিকাদার
আর নিধিরাম সর্দার আর
হুজুরের জি-হাঁ হুঁকোবরদার
বৈদ্য এবং বৈশ্য
ঘাঁটব আমার প্রাণ-নিংড়ানো
সাধের অনেক শস্য।

তাদের জন্যে সকাল সন্ধে
গাধার খাটুনি খাটব?
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি-লাগা
সরু দড়িটায় হাঁটব?

একজন লোক

লোকটার নেই কোন নামডাক।
তবু তার কথা অষ্টপ্রহর
ভেবে লোকজন অবাক বেবাক!

লোকটার নেই কোনোখানে ঠাঁই।
জীবন লগ্ন পথের ধুলায়,
হাতে ঘোরে তার অলীক লাটাই।

লোকটা কারুর সাতে-পাঁচে নেই।

গাঁয়ের মোড়ল, মিলের মালিক–
তবু ঘুম নেই কারুর চোখেই;
লোকটার কাঁধে অচিন শালিক।

বলে দশজনে এবং আমিও
রোদ্দুর খায় লোকটা চিবিয়ে,
জ্যোৎস্নাও তার সাধের পানীয়।
হাজার প্রদীপ জ্বালায় আবার
মনের খেয়ালে দেয় তা নিবিয়ে।

মেঘের কামিজ শরীরে চাপিয়ে
হাঁটে, এসে বসে ভদ্রপাড়ায়।
পাথুরে গুহায় পড়ে না হাঁপিয়ে
সে-ও সাড়া দেয় কড়ার নাড়ায়।

তবু দশজনে জানায় নালিশ :
লোকটা ঘুমায় সারাদিনমান,
কাছে টেনে নিয়ে চাঁদের বালিশ।

আত্মপ্রতিকৃতি

আমি তো বিদেশী নই, নই ছদ্মবেশী বাসভূমে–
তবে কেন পরিচয় অন্ধকার ঘরে রাজা, কেন
দেশের দশের কাছে সারাটা জীবন ডুগডুগি
বাজিয়ে শোনাব কথা, নাচাব বানর ফুটপাতে?
কেন তবে হরবোলা সেজে সারাক্ষণ হাটে মাঠে
বাহবা কুড়াব কিংবা স্টেজে খালি কালো রুমালের
গেরো খুলে দেখাব জীবন্ত খরগোশ দর্শকের
সকৌতুক ভিড়ে? কেন মুখে রঙ মেখে হব সঙ?

না, তারা জানে না কেউ আমার একান্ত পরিচয় :
আমি কে? কী করি সারাক্ষণ সমাজের চৌহদ্দিতে?
কেন যাই চিত্রপ্রদর্শনী, বারে, বইয়ের দোকানে,
তর্কের তুফান তুলি বুদ্ধিজীবী বন্ধুর ডেরায়?
না, তারা জানে না কেউ।

অথচ নিঃসঙ্গ বারান্দার

সন্ধ্যা, এভেন্যুর মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা, সার্কাসের
আহত ক্লাউন আর প্রাচীনের অতন্দ্র বিড়াল,
কলোনির জীবনমথিত ঐকতান, অপ্সরীর
তারাবেঁধা কাঁচুলি, গলির অন্ধ বেহালাবাদক
ব্রাকের সুস্থির মাছ, সেঁজার আপেল জানে কত।
সহজে আমাকে, জানে কবরের দুর্বিনীত ফুল।

একটি মৃত্যুবার্ষিকী

হয়নি খুঁজতে বেশি, সেই অতদিনের অভ্যাস,
কী করে সহজে ভুলি? এখনও গলির মোড়ে একা
গাছ সাক্ষী অনেক দিনে লঘু-গুরু ঘটনার
আর এই কামারশালার আগুনের ফুলকি ওড়ে
রাত্রিদিন হাপরের টানে। কে জানত স্মৃতি এত
অন্তরঙ্গ চিরদিন? জানতাম তুমি নেই তবু

আঠারো সাতে কড়া নেড়ে দাঁড়ালাম
দরজার পাশে। মনে হলো হয়তো আসবে তুমি,
মৃদু হেসে তাকাবে আমার চোখে, মসৃণ কপালে,
ছোঁয়াবে আলতো হাত, বলবে 'কী ভাগ্যি আরে
আপনি? আসুন। কী আশ্চর্য। ভেতরে আসুন।' দেখি

অন্ধকারে বন্ধ দরোজায় দুটি চোখ আজও দেখি
উঠল জ্ব'লে। কতদিনকার সেই চেনা মৃদু স্বর
আমার সত্তাকে ছুঁয়ে বাতাসে ছড়াল
স্মৃতির আতর।

শূন্য ঘরে সোফাটার নিষ্প্রাণ হাতল
কী করে জাগল এইক্ষণে? একটি হাতের নড়া
দেখলাম যেন, চা খেলাম যথারীতি
পুরানো সোনালি কাপে, ধরালাম সিগারেট, তবু
সবটাই ঘটল যেন অলৌকিক
যুক্তি-অনুসারে।

মেঝের কার্পেটে দেখি পশমের চটি
চুপচাপ, তোমার পায়ের ছাপ খুঁজি

সবখানে, কৌচে শুনি আলস্যের মধুর রাগিণী
নিঃশব্দ সুরের ধ্যানে শিল্পিত তন্দ্রায়।

জানালায় সিল্ক নড়ে, ভাবি কত সহজেই তারা
তোমাকে কীটের উপজীব্য করেছিল,
সারাক্ষণ তোমার সান্নিধ্যে পেত যারা
অনন্তের স্বাদ।

বারান্দায় এলাম কী ভেবে অন্যমনে, পারব না
বলতে আজ। জানতাম তুমি নেই, তবু

শিকি জ্যোৎস্নার আলো

নখ দিয়ে কুটি কুটি পারি না ছিঁড়তে আকাশের
ছড়ানো ত্রিপল কিংবা সাধ্য নেই পাহাড়ের চূড়া
নিমেষে গুঁড়িয়ে দিই, পোড়াই কোরিয়া হাসিমুখে,
ফোটাই সাধের ফুল ইচ্ছেমতো গোলাপ বাগানে
আর এক চুমুকে সমুদ্রের সব জল শুষে নিই
নিপুণ খেলার ছলে, পরাক্রান্ত সিমুমের ঝুঁটি
মুঠোর ভেতর ধরি, ঝরাই শ্রাবণ সাহারায়,
আম গাছে কালো জাম ফলাই চতুর কোনো শ্রমে,
সার্কাসের বিনীত পশুর মতো উঠবে বসবে
চন্দ্র-সূর্য তর্জনীর ইশারায় : সাধ্যাতীত সবি।

অকুণ্ঠ কবুল করি শিখিনি এমন মন্ত্র যার বলে
আমার বাঁশির সুরে শহরের সমস্ত ইঁদুর,
রাঙা টুকটুকে সব ছেলেমেয়ে হবে অনুগামী,
কৃতকর্মে অনুতপ্ত পৌরসভা চাইবে মার্জনা।
যে রুটিতে বুভুক্ষার শুক্‌নো ছায়া পড়ে প্রতিদিন,
হতে পারি অংশীদার তার সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ কোণে;
যে অঞ্জলি পেতে চায় তৃষ্ণার পানীয়, কয়েকটি
বিন্দু তারও শুষে নিতে পারি শিকি জ্যোৎস্নার আলোয়
আত্মার উষর জিভে...

অথবা যেমন খুশি পারি
আঁকতে স্বর্গের নকশা। বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোল জানি

জীবনে বাজানো চলে, যেমন গভীর তানপুরা
গুণীর সহজ স্পর্শে মিড়ে মিড়ে অর্থময়, পারি
ঈশ্বরকে চমকে দিতে হৃদয়ের ধ্রুপদী আলাপে।

একটি দৃশ্যের আড়ালে

এখনও আকাশ আছে, এই খোলা জানালার বাইরে
রাস্তায় অটুট ট্রাফিকের ঐকতান। বাতাসের
টোকায় খড়খড়ি জেগে ওঠে স্বপ্ন থেকে, বারান্দায়
যুগল পায়রা প্রেমে নিমজ্জিত, গলির বুড়োটা
তারাভরা আকাশের মতো শতচ্ছিন্ন তালিমারা
কোট গায়ে বিড়ি টানে, বোষ্টমির গানে
মাথা নাড়ে, দূরের শূন্যতা শব্দময়
প্লেনের গুঞ্জনে।

কিন্তু তার শোক নেই, পরিতাপ নেই,
তৃষিত বাসনা নেই, সেই পৃথিবীর রৌদ্রছায়া
স্থির চোখে। আমি শুধু লাশ নিয়ে বসে আছি পাশে
হলুদ চাঁদের নিচে– আর যারা ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর
ঘুমভরা ঢুলুঢুলু চোখে গেছে দোকানে চা খেতে।

নিস্পন্দ শরীর এক পাশে আছে প'ড়ে, জমে-যাওয়া
দশটি আঙুল প্রসারিত দেখছি আমার দিকে–
যেন আঁকড়ে ধরবে তারা এখনি আমার স্তব্ধতাকে।

নির্বাপিত সত্তার আড়ালে
চকিতে উঠল জ্ব'লে গ্রীষ্মের সেঁকা দপদপে কোনো
তরুণ ফলের মতো তোমার মুখের
প্রখর যৌবন।

সূর্যাবর্ত

বাঁচার আনন্দে আমি চেতনার তটে
প্রত্যহ ফোটাই ফুল, জ্বালি দীপাবলি
ধ্যানী অন্ধকারে। আর মৃত্যুকে অমোঘ
জেনেও স্বপ্নের পথে, জেনেও আমার

পৃথিবীতে খুঁজি
জীবনের দান গানে গানে, প্রাণলোকে
খুঁজে ফিরি অপসৃত সুন্দরের স্মৃতি।

অভ্যাসের বিবর্ণ দৃষ্টিতে নয়, সৃষ্টির আবেশে
সপ্রেম তাকাই চতুর্দিকে
এই চরাচরে : উন্মীলিত
বৈশাখী রৌদ্রের উজ্জীবনে,
উধাও মাঠের প্রান্তে ধ্যানী ঐ গাছের ছায়ায়
আর বনে বনে মর্মরিত খোলা উর্মিল হাওয়ায়
নীলিমায় দিই মেলে মানসমরাল।
ব্যাপ্ত এই চরাচরে পতঙ্গ অথবা
নিবিড় গোলাপ– সবি মনে হয় অরূপ রতন।

এখনও সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসে
যথারীতি, ঝরনার মতন ঝরে সম্পন্ন গৃহীর
নিকানো উঠোনে আর কবরের পুরানো ফাটলে।
প্রদীপ্ত সূর্যের রং লাগে যুবতীর
সলজ্জ রক্তিম গালে, আর
আলো ঝরে নিদ্রাহীন রোগীর শয্যায়।

পিচ্ছিল শবের ভোজে মত্ত কৃমি অথবা আজানে
উচ্চকিত সবচেয়ে উঁচু কোনো উজ্জ্বল মিনার–
সবাই অলক্ষ্যে পায় সূর্যের প্রসাদ
সমপরিমাণে;

এবং উদার সূর্য উপমা তোমার।
প্রকৃতির টোলে আমি কখনো নিইনি পাঠ, তবু
ঋতুতে ঋতুতে
আমার সত্তার স্বরগ্রাম
কেবলি ধ্বনিত হয়, অবিরাম প্রহরে প্রহরে
এখনও যে ক্লান্ত হলে নিসর্গের কাছে
আশ্চর্যের গ্লাস হাতে যাই,
অবসন্ন চেতনার গোধূলিতে শুনি
সান্ত্বনার ভাষা এখনও রবীন্দ্রনাথ,
সে তোমারি দান।

আমাকে দিয়েছ ভাষা, তার ধ্বনি, প্রতীকী হিল্লোল

অস্তিত্বের তটে আনে কত
ঐশ্বর্যের তরী– পাল-তোলা তরঙ্গের স্মৃতিস্রোত
দীপ্ত জলযান।

আমাকে দিয়েছ ভাষা, সে-ভাষা আমার
হৃদয়ের একান্ত স্পন্দনে
প্রাণের নিভৃত উচ্চারণে
শিখা হয়ে জেগে রয় জীবনের মুক্ত দীপাধারে।
এবং নিশ্চিত জানি তোমার বাণীর
দীপ থেকে অন্য এক ভাষার প্রদীপ
জ্বালাব অযুত প্রাণে, জ্বলবে তখন
কত না হীরক সম্ভাবনা সময়ের
বিমূর্ত সন্ধ্যায়।

তুমি নও সীমিত শুধুই কোনো পঁচিশে বৈশাখে।
তোমার নামের ঢেউ একটি দিনের
সংকীর্ণ পরিধি ছিঁড়ে পড়েছে ছড়িয়ে
রূপনারানের কূলে, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘে
অনন্তের শুভ্রতায়। তুমি নও সীমিত শুধুই
পঁচিশে বৈশাখে।

যেমন রৌদ্রের তাপ জ্যোৎস্নার মদির মায়ালোকে
হাওয়ার নির্ঝরে
অথবা শ্রাবণে
অক্লান্ত বর্ষণে বেঁচে থাকি মাঝে-মাঝে
নিজেরই অজ্ঞাতে,
তেমনি তোমার
কবিতায়, গানে প্রতিধ্বনি হয়ে জাগে
আমাদের সত্তার আকাশ।

জীবন যখন ক্রমে কেবলি শুকিয়ে যায়, ডোবে
পাঁকের আবর্তে আর বর্বরের বাচাল আক্রোশে
অবলুপ্ত জ্ঞানীর সুভাষ,
জেনেছি তখন
অলৌকিক পদ্মের মতন
তোমার স্মরণ
উন্মোচিত হয়,

হয় উদ্ভাসিত
অসংখ্য প্রাণের তীর্থে এবং তোমার
গানে গানে মৃত্যুর তুহিন শীতে ফোটে
ফোটে অবিরত
জীবনের পরাক্রান্ত ফুল ॥

একটি জীবনচরিত

যিনি ওই পোড়াবাড়িটায়
থাকতেন নিরিবিলি কোনো কোনো দিন
রোদে পিঠ দিয়ে আর শ্রাবণের ধারাজলে ঠায়
সারাদিনমান সঙ্গীহীন
কাটাতেন গোলকচাঁপার নিচে, চোখ-ছলছল
তিনি ভাবতেন তার চুল
ঘাসের সবুজ শিখা, হাত অবিকল
মৃন্ময় গাছের ডাল, চোখ ফাল্গুনের কোনো ফুল,
ঠোঁটের কিনারে কালো শ্রাবণের মসৃণ লবণ
(ভাবতেন তিনি) আছে লেগে সারাক্ষণ।

কখনো কোটর থেকে কাঠবিড়ালিটা নেমে এলে
পাতাঝরা তন্ময় বিকেলে,
দিতেন মাথাটা তার আদরে বুলিয়ে
এবং ভুলিয়ে
রাখতেন ওকে ঘাসে বাদামের কৌতুকী খেলায়
গরুর খুরের রাঙা ধূলিওড়া নিমগ্ন বেলায়।

চুপচাপ সে অস্তিত্ব রোজনামচায় চিরন্তন
সুখে রাখতেন টুকে অভ্রের গুঁড়োর মতো মৌমাছি-গুঞ্জন,
বসন্তের বর্ণালি বর্ষার ভরা রাত্রির ক্রন্দন
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের সূক্ষ্ম রসায়ন
কুয়াশায় পতঙ্গের জীবন বয়ন।
পাখির নীরব মৃত্যু, প্রতিটি ফুলের জন্মমুহূর্ত এবং
ফড়িঙের চঞ্চলতা, আকাশের সবগুলো রং
সবই তো পড়েছে ধরা চেতন-উষার মতো প্রাণে,
জার্নালের পাতায় যেখানে প্রাত্যহিক ঐকতানে
লিপিবদ্ধ আরো কিছু– গভীর গ্রন্থের নয়– জীবনের ভাষা :

"হে সবুজ গাছ, হে আমার প্রিয় বন্ধু, মেঘেভাসা
পাখির মতোই চাই আজও তোমার ছায়ায় চাই কিছুক্ষণ
পূর্ণতায় নানান লতাগুল্মের প্রাণের রণন।"

যেদিন গেলেন তিনি কে যেন বলল নিচু স্বরে,
"আমাদের রৌদ্রছায়াময় এ প্রান্তরে কখন গেছেন ঝ'র
একটি বয়েসী বৃক্ষ।" অন্য কোন বোকা প্রতিবেশী
আওড়ালো শোকের চলতি শ্লোক ক'টি বড় বেশি।

রোদের ছুরির ঘায়ে, বৃষ্টির ধারালো নখে, হলুদ পাতায়
ওই পোড়াবাড়িটার স্মৃতি
হ'ল বাতাসের সহচরী শূন্যতায়,

নির্বিকার রইলেন শুধু, শুধু শ্রীমতী প্রকৃতি।

ডায়েরির একটি পাতা

সকালের রোদে এই সাতিই আশ্বিনে
আরো একটি দিন এলো জানাতে সাদর
সম্ভাষণ। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে চাদরে পা ঘষি,
অন্যমনে আঙুল চালিয়ে দিই চুলে,
কোথাও উজ্জ্বল মোটরের হর্ন বেজে ওঠে (শুনি)
চেনা শব্দ হরেক রকম। টিক টিক ঘরি বাজে, ঠিক ঠিক
টিকটিকি সাড়া দেয় সহযোগী তন্ময় নিষ্ঠায়।
বাথরুমে গড়ায় কলের পানি, বারান্দায় দেখি
হাওয়ায় টবের ফুলে সে কী গলাগলি।

আলোলাগা ভালোলাগা বেলা
খেলা করে সত্তার প্রাঙ্গণে
–বেঁচে আছি।

আলনায় ঝোলানো আমার
ইজের কামিজ সাদা দেয়ালের ফুল,
টেবিলে পুরানো ছবি, শুকনো ফল, দাড়ি কামাবার
সরঞ্জাম, অসমাপ্ত কবিতার পাণ্ডুলিপি, বই
সবকিছু ঝলমলিয়ে ওঠে
আশ্বিনের রোদ্দুরে এবং

মনে হয় থাকব এখানে চিরদিন।

যখন পাশের ঘর থেকে ভেসে আসে
রুটি মাখনের ঘ্রাণ, সোনালি চায়ের
সুগন্ধ, চুড়ির শব্দ, দরজার আড়ালে তোমার
কণ্ঠস্বর ছোঁয় প্রাণ, ভাবি কী সুন্দর
এই বেঁচে থাকা ...

আত্মহত্যার আগে

শয্যাত্যাগ, প্রাতরাশ, বাস, ছ'ঘণ্টার কাজ, আড্ডা,
খাদ্য, প্রেম, ঘুম, জাগরণ; সোমবার এবং মঙ্গলবার
বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আর রবিবার একই
বৃত্তে আবর্তিত আর আকাশ তো মস্ত একটা গর্ত–
সেখানে ঢুকব নেংটি ইঁদুরের মতো। থরথর
হৃদয়ে প্রতীক্ষা করি, স্বপ্ন দেখি আগামীকালের
সারাক্ষণ, অনেক আগামীকাল্য উজিয়ে দেখেছি
তবু থাকে আরেক আগামীকাল। সহসা আয়নায়
নিজের ছায়াকে দেখি একদিন– উত্তীর্ণ তিরিশ।

পূর্ণিমা চাঁদের দিকে পিঠ দিয়ে, অস্তিত্বকে মুড়ে
খবরের কাগজে ছড়াই দৃষ্টি যত্রতত্র, নড়ি,
মাঝে-মাঝে ন'ড়ে বসি, সত্তার স্থাপত্যে অবিরল
অলক্ষ্যে গড়িয়ে পড়ে মাছের ঝোলের মত জ্যোৎস্না
আর আমি বিজ্ঞাপন পড়ি, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ি :

এবার কলপ দিন, আপনি তো জানেন অকাল-
পক্ব চুলে কলপ লাগালে অনায়াসে ফিরে আসে
ফেরারি যৌবন... আর এই ফলপ্রদ টনিকটা
খাবেন প্রত্যহ তিনবার ঠিকঠাক দাগ মেপে
অর্থাৎ চায়ের চামচের দু'চামচ এবং খাবার আগে
কিংবা পরে, তাহলে বাড়বে ক্ষিদে আর স্নায়ুগুলি
নিশ্চিত সবল হবে, যদি খান সুস্বাদু টনিক।

ধরা যাক যা-কিছু লিখেছি সবি পড়ে লোকে, প'ড়ে
প্রচুর তারিফ করে, ব্যাংকের খাতাও স্ফীতকায়;
উন্নতির সবগুলি গোল ধাপ পেয়েছে আমার

সুকৃতী পায়ের ছাপ, ইচ্ছাপূরণের যত গান

হৃদয়ের সাতটি মহলে পেলো খুঁজে সফলতা;
জীবনের প্রতিটি সুন্দর স্বপ্ন পাপড়ি মেলে
চেয়েছ আমার দিকে : পত্নীর গার্হস্থ্য প্রণয়ের
পরিণাম পুত্র-কন্যা সহজে এসেছে যথারীতি
এবং নিজের বাড়ি, সাজানো বাগান, ধরা যাক,
গাজরের ক্ষেত, মুরগি ইত্যাদির স্বচ্ছন্দ বিন্যাসে
মানবজীবন ধন্য। শৈশবের সাধের কল্পনা
নকশা অনুসারে, ধরা যাক, একে একে ঘটল সবি।
অনেক সমুদ্র ঘুরে কত বন্দরের গন্ধ মেখে
একদিন সার্থবাহ বার্ধক্যের অবসন্ন ঘটে
ফিরে আসে পণ্যবাহী সার্থক জাহাজ, পালতোলা,
গলাফোলা নাবিকের গানে গুঞ্জরিত। মূর্খ যত
চেঁচিয়ে মরুক তারা, পূর্ণতার স্তবে রাত্রিদিন
জপেছি ভীষণ মন্ত্র ক্ষয়ে ক্ষয়ে ... কিন্তু তারপর?

আড় হয়ে বিকেলের রোদ পড়ে চায়ের আসরে;
কয়েকটি সুবেশ তরুণ-তরুণীর সংগত সংলাপে
গোলাপ বাগান জ্বলে রক্তিম কুঁড়ির জাগরণে
মুহূর্তের অতন্দ্র মালঞ্চে। টেবিলের ফুলদানি
জ্যোৎস্নার বিস্ময়ে ফোটে মহিলার অন্ধকার ঘরে।
নিয়ন আলোর মতো কারুর হাসির শত কণা
জাগায় স্মৃতির শব, হাড়হিম দেহে লাগে তাপ।
আমি নই ইডিপাস, তাহলে কী করে উচ্চরোলে
সভাসদ মাঝে করি উচ্চারণ : 'অবশেষে বলি
ভালো সবকিছু ভালো?'

অসংগতি, না আমার মধ্যে নেই, রয়েছে সেখানে
রেস্তোরাঁয়, অন্ধকারে দেয়ালে আমার চতুর্দিকে,
বলতে পারো বরং নিজেই আমি নিমজ্জিত, ওহে,
এ-অসংগতির মধ্যে। লিপস্টিক ঘষে মুছে-ফেলা
ঠোঁটের মতন আত্মা নিয়ে কী আশ্বাসে বাঁচায় যায়
যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডে, বিরক্তির মাছির জ্বালায়?

যেহেতু উপায় নেই ফেরবার, আমার সম্মুখে
দুটি পথ অবারিত, আমন্ত্রণে প্রকট চটুল—

গলায় বিশ্বস্ত ক্ষুর কিংবা অলৌকিক বিশ্বাসের
রাজ্যে শুধু অন্ধের স্বভাবে বিচরণ, সায় দেয়া
কবন্ধের শাস্ত্রের শাসনে, পরচুলা খ'সে পড়া
ক্রমাগত অনর্থক যুক্তিহীন মাথা নেড়ে-নেড়ে।

ঈশ্বর কি শিউরে ওঠেন মলভাণ্ডে? উনুনের
কড়াইয়ের তীব্র জ্বালে কুঁকড়ে যান কাগজের মতো?
যদি বলি প্রবঞ্চনা ঈশ্বরের অন্য নাম তবে
সত্য থেকে সঠিক ক'গজ দূরে আমার সংশয়ী
পদক্ষেপ? তা হলে বিশ্বস্ত ক্ষুর গলায় ছোঁয়ালে
অথবা ক'ফোঁটা বিষ কণ্ঠ বেয়ে নেমে গেলে এই
জঠরের পাকে পাকে, পার্থক্যের কী জটিল সূত্র
উন্মোচিত হবে পরিণামে?

আজীবন আমি

আমার হৃদয়ে ছিল লোকোত্তর সফল বাগান
তর্কাতীত ঐশ্বর্যে ভাস্বর।
কোনো দিন অসময়ের সিংহবর্ণ মরুভূমি তাকে
পারেনি ডোবাতে তরঙ্গিত বালির কবরে,
অথবা উটের দীর্ঘ কোনো
স্টেপ পায়ের নিচে হয়নি দলিত
বাগানের কোমল পরাগ।

বরং সেখানে বহু চৈত্রসন্ধ্যা তার
সুরভিত প্রশান্ত চিকুর
দিয়েছে এলিয়ে বারবার, আর কত
চকিত রাত্রির নীলিমায়
আকাশের বাঁকা সিঁড়ি বেয়ে
এসেছে তো রক্তকরবীর ডালে শব্দহীন চাঁদ :
সে-চাঁদ দু'জনে মিলে দেখেছি অনেক
সপ্রেম প্রহরে; কতবার সে চাঁদের স্মৃতি-ছবি
এঁকেছি নিভৃত মনে শিল্পীর প্রজ্ঞায়।

তুমিও দেখেছ
রাত্রির মুকুরে ভাসে অগণন তারার বিস্ময়;

হৃদয়ের হ্রদে নীল তারা
জলের শয্যায় শুয়ে দেখে কত স্বপ্ন অলৌকিক।
আমরা দু'জন সেই স্বপ্নের মেদুর
অংশ হয়ে নিয়েছি প্রাণের উন্মীলনে
জীবনের দান– আর এ বাগান আজও
মুঞ্জরিত, আজও।

এখানে বাগানে
আমার প্রভাত হয়, রাত্রি নামে, উৎসারিত কথা

হৃদয়ের সোনালি রুপালি
মাছ হয়ে ভাসে আর বসন্তের আরক্ত প্রস্তাবে
প্রজ্বলিত, উন্মোচিত তুমি।
বাগানে পূরবী ঝরে গোধূলির নামে,
কখনো আবার ঐ বর্ষার সঙ্গীত
সমস্ত সত্তায় আনে অপরূপ শ্যামল আবেগ।

জ্যোৎস্নার লাবণ্যে আর রৌদ্রের স্বতন্ত্র মহিমায়
তুমি তন্বী গাছের বিন্যাসে আছ এই
বাগানে আমার গানে গানে
জীবনের দানে উল্লসিত।
এবং তোমার প্রাণ প্রতিটি ফুলের
উন্মোচনে শিহরিত আর
উত্তপ্ত তামার মতো বাস্তবের পরিধি পেরিয়ে
অভীপ্সা তোমার প্রসারিত, মনে হয়,
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোনো জীবনের দিকে :
যে-জীবন পৃথিবীর প্রথম দিনের
মতোই বিস্মিত চোখ রাখে
আগন্তুক ভবিষ্যের চোখে
অথবা প্রেমের মতো উজ্জ্বল সাহসে
ভাঙা-চোরা পথে,
আবর্তে আবর্তে খোঁজে চির-অচেনাকে,
এমনকি হাত রাখে নিশ্চিন্তে অকল্যাণের হাতে।

যখন জীবনে সেই বাগানের সঞ্চারী সুরভি
ধ্রুপদী গানের মতো, সন্ধ্যার ধূপের মতো অর্পিত আবেগে
করে স্তব ঈপ্সিতের, সেই ক্ষণে তোমাকেই খুঁজি

বাগানের মধুর উপমা :
তোমার অস্তিত্বে সুরভিত
আজীবন আমি ॥

রূপান্তর

চঞ্চলা নর্তকী নও, অথচ যখন হাঁটো কিংবা ছুটে যাও,
বর্ষার বৃষ্টির পরে রামধনু উঠলে আকাশে,
বারান্দায়, চলায় সহজে লাগে ছন্দের বিদ্যুৎ।
যখন আয়নার সামনে লিপস্টিক মাখো ঠোঁটে, হাই-হিল জুতো
পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামো, হাতে বই, বুকের উপর
কালো বেণী, চিবুকে ঘামের ফোঁটা, কী-যে ভালো লাগে।

যখন বাগানে যাও, ফুল তোলো, ঝকঝকে দাঁতে
হঠাৎ কামড়ে ধরো সবুজ পেয়ারা, ময়নাকে
ছাতু দাও খেতে আর ভাঁড়ারের অন্ধকার কোণে
আঁতকে ওঠো আরশোলা দেখে, পানি চেয়ে
ভেঙে ফ্যালো গ্লাস, নখ খাও এবং চাবির রিং
ঘোরাও আঙুলে
অথবা সুরের তাল কেটে গেলে তন্ময় বিকেলে
খিলখিল ওঠো হেসে, ক্যারম খেলতে গিয়ে সারা
খেলাটাই করো মাটি
কী করে বোঝাই কতো ভালো লাগে তোমাকে তখন!

অবশ্য কখনো
কবিতা পড় না তুমি (ক্লাসের বরাদ্দ পদ্য ছাড়া)
তাতে কী? তবুও এ সুন্দর শরীরী সৌরভে মেতে
পৃথিবীতে আছ তাই মেটাই চোখের তৃষ্ণা
সারাক্ষণ।

হয়ত পারতে হতে সোনালি-নিবিড় বালুকণা
আমার মুঠোয় ঝলোমলো, ভাবি তুমি অর্গানের
ধ্বনির মতোই শ্রাবণের কালো ফোঁটা পাতাবাহারের বুকে,
বাগানের টসটসে ফলের সুরভি, মাংসে-বেঁধা
গোলাপের কাঁটা হয়তো পারতে হতে ...

মাথায় ভাবনা নিয়ে

মাথায় ভাবনা নিয়ে খুপরিতে আছি শুয়ে এই
নিজের আঁধারে লগ্ন, দেখি
ময়লা দেয়ালে আঁকা দুঃখের নিভৃত ফুল আর
মনকে প্রবোধ দিই : রাত্রিদিন দুর্দশার ঢাক
বাজিয়ে কী লাভ?

প্রাণধারণের কত অমাবস্যা, কত না পূর্ণিমা,
বৈশাখের দীপ্ত দিন, শ্রাবণের সন্ধ্যা সুনিবিড়–
জীবনের এই রূপান্তর, আবর্তিত ইতিহাস,
ব্যক্তি-সমাজের চেতনায়
সোনার রোদ্দুর দিয়ে বোনে
প্রত্যহ স্বপ্নের পাড় বিমুগ্ধ খেলায়।

আত্মদান স্মৃতি আর সম্প্রীতির নিবিড় পূর্ণিমা
মানুষে মানুষে পড়ে আশ্চর্য সংলাপ :
জীবনের মতো ব্যাপ্ত একটি সিম্ফনি
ঝরায় ঝরনার পানি,
ফোটায় বাগানের ফুল স্বপ্নে জাগরণে।

দ্যাখো এই আমার ঘরের আসবাব : ইতস্তত
দারুণ হতাশা লেপ্টে রয় কড়িকাঠে
কামিজে ইজেরে আর মনস্তাপ ঝোলে
আলনায় এবং মাংসের ঝোলে নাচে বিভীষিকা!

তবু জানি এই ঘরে জ্যোতির্ময় হতে পারে আজও,
আবার আমার আত্মা নতুন জন্মের প্রতিভায়
হতে পারে নিবিড় বাগান
তোমার দৃষ্টির তারাময় প্রস্রবণে।

যখন নিরুদ্ধ হতাশায় জীবনকে মনে হয়
একমুঠো বালি আর আকাশের চাঁদ
প্রতিভাত হয়
ভিক্ষুকের ভাঙা পাত্র বলে,
তোমার স্বপ্নের দীপ জ্ব'লে ওঠে নরকে আমার–
বুভুক্ষায় ঝরে
চকিতে স্বর্গের কান্তিবিগলিত দ্রাক্ষার মদিরা।

যদি ইচ্ছে হয়

যদি ইচ্ছে হয় যেতে পারি আদিম অরণ্যে
যেখানে অন্ধকারে মূল্যবান রত্নের মতো জ্বলে
পাশব চোখ, ভালুকের কশ বেয়ে
গড়িয়ে পড়ে টাটকা মধুর ধারা।

কিন্তু আমি যাইনে সেখানে, থাকি শহরে, আমার শহরে।
ঊর্ধ্বশ্বাস ট্রাফিকের ব্যস্ততায় বিজ্ঞাপনের মতো
ঝলমলিয়ে ওঠা হাসি
শিরায় আনে আশ্চর্য শিহরণ :
মনে হয় যেন ঢক করে গিলে ফেলেছি
এক ঢোঁক ঝাঁঝালো মদ। আর প্রহরে প্রহরে
অজস্র ধাতব শব্দ বাজে আমার রক্তে,
যেন ভ্রমরের গুঞ্জন।

আমার ছোট খুপরিতে ভোর আসে
ব্যালেরিনার মতো নিপুণ বিন্যাসে, আমি
মৃত কবিদের প্রাণবন্ত অক্ষরে ডুবে থাকি–
বেলা গড়িয়ে অবেলায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

রাতে খড়খড়িটা খুলে দেখি
বুড়ো রাজমিস্ত্রির চোখের মতো ছানি-পড়া আকাশে
জ্যামিতিক চাঁদ শোনে তারার কথকতা, সেই মুহূর্তে
রহমত ব্যাপারীর রক্ষিতা হয়তো তার ক্লান্ত যৌবনটাকে
কুঁচকে যাওয়া পোশাকের মতো
এলিয়ে দিয়েছে রাত্রির আলনায়।

কখনো দেখি, রাত্রির ফুটপাতের ধারে এসে জমে
সারি সারি উজ্জ্বল মসৃণ মোটর,
যেমন গাঢ়-সবুজ ডালে ভিড় করে
পাখির ঝাঁক সহজ অভ্যাসে ॥

অস্তিত্বের তন্ময় দেয়ালে

মনের খেয়ালে গেঁথে অগণন তারা
অস্তিত্বের তন্ময় দেয়ালে

স্মৃতিকে করেছি আমি সীমাহীন সুনীল আকাশ।
সেখানে কয়টি হাঁস শৈবালের আর
বন্ধ্যা তুষারের গণ্ডি ছেড়ে পেতে চায়
রৌদ্রের জোয়ার আজও, আজও
নিরুদ্বেগ সাহসী ডানায়।

মনে পড়ে আমিও একদা পড়েছি ঝাঁপিয়ে অন্তহীন
নীলিমায়, কতদিন মেঘের প্রাসাদে
কাটিয়েছি মায়াবী প্রহর
আমি আশ্চর্যের যুবরাজ।

সেদিন আননে ছিল আঁকা
ত্রিলোকের রূপাভাস, আর
স্বপ্নের কাননে তুলে বাসনার ফুল
যথারীতি পেয়েছি মদির সঙ্গ কত
এবং বেসেছি ভালো– আস্থা রেখে সেই
দ্রাক্ষাবনে, অনন্তের প্রীত গুঞ্জরণে–
স্বপ্নের সুন্দরীদের কাটিয়েছি কত যুগ সেই
নীলিমা-খচিত মায়ালোকে।

তাড়াতাড়ি হঠাৎ রাত্রির শেষ বাসে
উঠে পড়ে ভাবি এই
নেশার খোঁয়ারি কেটে গেলে
নামব কোথায় তবে, এখানে কোথায়?
থাক থাক, ক্ষতি নেই কিছু,
ভাবব পরে।

এখন দু'চোখ ভরে শুধু
দেখা যাক–কী দেখব? নিশ্চল, নিরেট
অন্ধকারে হাতড়িয়ে পথ কাকে ছোঁব শেষে? কাকে?
ডিঙিয়ে মর্ত্যের বেড়া পাব কি স্বর্গের
অবতরণিকা?
সাফল্যের গাছ যত পাখি পুচ্ছ তুলে নাচে, আজ
তাদের স্বপ্নের ঘোরে বুঝি
আমার চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে
এ-রাত্রির শেষ বাসে! ও কিছুই নয়
আসলে হৃদয় মাঝে-মাঝে

হয়ে পড়ে নেহাত অবুঝ : নাবালক
নেশার খোঁয়ারি কেটে গেলে পৃথিবীকে
নির্বোধের হাসির মতোই মনে হয়।
শূন্য প্রহরের দীর্ঘশ্বাস বৃথা প্যানিক ছড়ায়
এবং নড়ায় স্তব্ধ আদর্শের ভিত।

জানি এই ভিড় ঠেলে, ঢিলে-ঢালা সস্তা স্যুট প'রে
রাস্তার দাম্ভিক শত বিজ্ঞাপন প'ড়ে, পুঁইশাক
ডাঁটার চচ্চড়ি,
নিরীহ মাছের ঝোলে ডুবিয়ে জীবন
থাকব, বাঁচব আমি দিনের চিৎকারে
রাত্রির করুণ স্তব্ধতায়।

মাঝে-মাঝে কারো
অস্তিত্বের সুরভির জন্য হয়তোবা
ধমনী চঞ্চল হবে স্পন্দিত নদীর মতো ফের,
সত্তার মিনারে চাঁদ জ্বলবে তখন।
আজ শুধু
স্মৃতিকে করেছি আমি বিশাল আকাশ ॥

লালনের গান

যখন তোমার বাহুর বাসরে
মগ্ন ছিলাম চন্দ্রিত তন্দ্রায়,
আলো-আঁধারির চকিত সীমায়,
লালনের গান দূর হতে এলো ভেসে।
সে গানের ধ্বনি স্তব্ধ সায়রে
ফোটায় নিবিড় অজস্র শতদল।
ধুলোয় উধাও সে গানের কলি
গ্রামছাড়া পথে মনের মানুষ খোঁজে।

শৈশব-গাঁথা জামতলা আর
কনক দুপুরে শ্রাবণ দিঘির ডুব,
ঘোরলাগা ভোর, অভিজ্ঞ সাঁঝ–
সবি আছে বুঝি স্মৃতির অভ্রে ডুবে।

কে আসে ঘাসের স্তব্ধ সবুজে

নীরবে নগ্ন শুভ্র চরণ ফেলে?
সে-যে সেই গান স্পন্দনে যার
আঁধারেও চির মনের মুকুল জ্বলে।

অবচেতনার গহন ধারায়
তারাময় মনে জাগে স্বপ্নের পলি।
একটি চাঁপার বিন্দুতে মেশে
সব দ্বন্দ্বের ঘূর্ণিত অবসান।

সে গানের সুর জীবনে ঝরায়
জুঁই-চামেলির অরূপ সুরভি আজও
অন্তরাগের ধ্যানী বাসনায়
জ্বলে ওঠে ক্ষীণ দীপ্ত চন্দ্রকলা।

কাল মন্থনে চেতনায় জাগে
অতীতের দ্বীপ, স্মৃতির প্রবালে লাল।
বর্তমানের মুক্ত আধারে
ভবিষ্যতের দীপাবলি ওঠে ভেসে।

সে-গানের ধ্বনি ফিরে ফিরে আসে
মর্ত্যজীবীর রঙিন ধুলোর পথে–
তারই মাধুর্যে ঋতুতে ঋতুতে
রৌদ্রছায়ায় শান্ত বাগানে বাঁচি।

সে-গান আমার বৈশাখী দিনে
যাত্রী-প্রাণের তৃষ্ণার সরোবর।
তারই টানে চলি বাকাচোরা পথে–
লালনের গান স্মৃতির দোসর সে-যে ॥

উদয়াস্ত দেখি ছায়া

কোথায় ভাসাব ভেলা? দুরন্ত জলের ধ্বনি শুনে
কত বেলা গেল,
তবুও আপন
মাটির বিরাগ মূর্ত, ঠাঁই নেই ভাই
প্রাণের পাড়ায় তাই জানি না কখন কে হারায়।
ভয়ে চোখে চোখ রাখি, হাঁটুর বিবরে ঢাকি মুখ,

বাঁচার ভাবনা
ক্লান্ত হয়ে ফেরে মনে। যাবো না যেখানে
কোনোদিন স্বপ্ন তার তেড়ে আসে কুকুরের মতো,
মাচার সংসারে রাতে (নিজেকে শুনিয়ে বলি) যতটুকু পারো
দেখে নাও মুখ,
কে জানে কখন হবে ভোর, কেউ হয়তো তোমার
ঝিমানো দুপুরে খুলবে না দোর।

কলাইয়ের শূন্য মাঠে কাঁপে সাদা ঢেউ,
কে যাবি ঘরের পানে সূর্য-নেভা টানে
গোধূলির গরু-ডাকাপথ
খরস্রোতা নদী, ফাঁকা সাঁঝে
কে দেখাবে আলো?
বাজে শুধু
ধু-ধু জলধ্বনি
ওরে
নেই ফিরে যাওয়ার উঠোন।
উদয়াস্ত দেখি ছায়া বন্ধ্যা জলে, কাকে পেতে চায়
এ হাওয়ার ক্ষুধা।
হারিয়ে জলের সাহারায়
প্রত্যন্তের পথ
প্রাণের তৃষ্ণায় কেঁদে তারা সমকালীন দু'জন
তবু উঠল গাছ বেয়ে : মানুষ শঙ্খিনী।
প্রতিযোগিতার শ্রমে যার দুটি আর্ত ক্লান্ত চোখ।
দেখে নিল অন্তিম আকাশ,
তার নীল হাহাকার যাবে কতদূর?

ভাসমান পশু আর নির্বাক মানুষ
ক্যামেরার স্বদেশী খোরাক,
অনেক অনেক দূরে শস্যের শিবির ...
নির্বোধ আশায় আর মজে না যে মন,
কত বেলা গেল...
কী করে ফিরব ঘরে,
কোন ঘাটে ভিড়ে
আবার চাঁদের অভিবাদন গ্রহণ?

বৈঠায় মারিনি পাখি, শোনো

ভুলে কোনো অমোঘ প্রহরে,

তবু কেন
তবু কেন এই
জলের মরণ?

ক্ষয়

পুবের আকাশে প্রতিদিন একই
সূর্য সকালে আবির মাখে।
কীর্তিনাশার প্রমত্তা রূপ
আজও খেলে যায় চরের বাঁকে।

আমি শুধু আমি বদলে যাচ্ছি,
মানে মোট কথা হচ্ছি বুড়ো।
গতকল্যের কিছু নেই বাকি,
বিগত যুগের স্বপ্ন গুঁড়ো।

দেয়ালের এই পিকাসো মাতিস
চির অক্ষয় থাকবে বটে;
অথচ আমার দেহের চিত্রে
কত কী-যে শুধু নিত্য ঘটে।

চোখ ফেরালেই বছর ফুরায়,
কমে ক্রমাগত দেহের তাপ।
চোখের তলায় ত্বকে অঙ্কিত
কাকের পায়ের শীর্ণ ছাপ।

মেষতন্ত্র

মেষরে মেষ তুই আছিস বেশ,
মনে চিন্তার নেইকো লেশ।

ডানে বললে ঘুরিস ডানে,
বামে বললে বামে।
হাবে ভাবে পৌঁছে যাবি
সোজা মোক্ষধামে।

চলায় ঢিমে তালের রেশ,
মেষরে মেষ তুই আছিস বেশ।

যাদের কথায় জগৎ আলো
বোবা আজকে তারা,
মুখে তুবড়ি ছোটে যাদের
আকাট মূর্খ যারা।

দিনদুপুরে ডাকাত পড়ে
পাড়ায় রাহাজানি,
দশের দশায় ধেড়ে কুমির
ফেলছে চোখের পানি।
পৃথিবীটা ঘুরছে ঘুরুক
মানুষ উড়ুক চাঁদে,
ফাটায় বোমা সাগর তলায়
পড়ছে পড়ুক ফাঁদে।

তোর তাতে কি? খড়বিচুলি
পেলেই পোয়াবারো।
জাবর কেটে দিন চলে যায়,
পশম বাড়ুক আরও।

জগৎ জোড়া দেখিস ঐ
সবুজ চিকন ঘাসের দেশ।
মেষরে মেষ তুই আছিস বেশ!

হাতির শুঁড়

আদ্যিকালের বেবাক কিছুই অলৌকিক।
পক্ষীরাজের পক্ষছায়ায় দিগ্বিদিক
নীল আকাশে উড়ত কত রাজকুমার।
আদ্যিকালের আজব কথার নেই শুমার!

ফলত সদা সোনার ডালে হীরের ফল,
জাগত জ্বেলে ঘিরের প্রদীপ লালকমল,
অসির খেলায় দৈত্যদানো করত বধ।
মরুভূমি, দূরের পাহাড়, মায়ার হ্রদ

উড়ন্ত সেই গালিচাটায় হচ্ছে পার।
সাত সফরে এই জীবনের সত্যসার
সিন্দাবাদের নখমুকুরে বিম্বিত।
সোনার কাঠি রুপোর কাঠি চিহ্নিত
ঘুমের খাটে শঙ্খমালা ঘুমন্ত;
কৌটো খোলা ভোমরা মরে জীবন্ত।

ঐরাবতের খেয়ালখুশির ধন্দায়
ভোরের ফকির মুকুট পরে সন্ধ্যায়।
প্রাক্তন সেই ভেল্কিবাজির মন্তরে
যাচ্ছে চেনা অনেক সাধু-সন্তরে।

সেই চালে ভাই মিত্র কিবা শত্তুর
চলছে সবই– মস্ত সহায় হাতির শুঁড়!

ইচ্ছে তাঁর ইচ্ছে

সূর্য আকাশে রৌদ্র ছড়ায়,
দুপুরের রোদ বিকেলে গড়ায়,
অনাবৃষ্টিতে শস্যের ক্ষেত জ্ব'লেপুড়ে যায়
খালবিল সব নিমেষে শুকায়,
–ইচ্ছে তাঁর ইচ্ছে।

বানে ভাসে কত গরু ভেড়া মোষ
ঘরবাড়ি, হাঁস, খান আর বোস,
ছাগল-বেড়াল, কুকুর-শেয়াল, খেলার পুতুল
কার সে দীর্ঘ মেঘরং চুল।
–ইচ্ছে তাঁর ইচ্ছে।

মারিতে মড়কে দেশ ছারখার,
নব সংসারে ওঠে হাহাকার,
মেঘচেরা রোদে বাতাসে নড়ছে গাছের ডালটা,
জোয়ারে ফুলছে শুকনো খালটা
–ইচ্ছে তাঁর ইচ্ছে।

জীর্ণ দেয়ালে শুধু থেকে থেকে
বেয়াড়া একটা কাক ওঠে ডেকে,

চৌধুরীদের বউটা শরীরে জড়ায় আগুন
ষোড়শীর মনে জ্বলছে ফাল্গুন
–ইচ্ছে তাঁর ইচ্ছে।

রাত্রি ফুরোলে জ্ব'লে ওঠে দিন
বাঘের থাবায় মরছে হরিণ;
কালবোশেখীর তাণ্ডবে কাঁপে পড়ো-পড়ো চাল
শূন্য ভাঁড়ারে বাড়ন্ত চাল
–ইচ্ছে তাঁর ইচ্ছে।

বাতিল কেরানি চেয়ে নিয়ে ক্ষমা
মৃত্যুতে খোঁজে ত্রাণে উপমা।
ধ্বংসের মুখে গ্রাম আর কত নগর পোড়ালি,
মুষড়ে পড়ল জুতোর গোড়ালি।
–ইচ্ছে তাঁর ইচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এদেশে হায়েনা, নেকড়ের পাল,
গোখরো, শকুন, জিন কি বেতাল
জটলা পাকায় রাস্তার ধারে।
জ্যান্ত মানুষ ঘুমায় ভাগাড়ে।

অথচ তোমার চুল খুলে দাও তুমি।
এদেশে কতো যে ফাঁকির অছিলা,
কালোবাজারের অপরূপ লীলা।
আত্মহত্যা গুম খুন আর
ফটকা বাজার– সব একাকার।

এখনও খোঁপায় ফুল গুঁড়ে দাও তুমি।

মড়ক-মারির কান্নার রোল
সারা দেশটার পাল্টায় ভোল।
হা-ভাতে ছোঁড়ারা হুজুরের দোরে
সোনালি আমের মরশুমে ঘোরে।
এখনও তোমার বাহু মেলে দাও তুমি।

এদেশে আ'মরি যখন-তখন

বারো ভূতে খায় বেশ্যার ধন।
পান নাকো হুঁকো জ্ঞানীগুণীজন,
প্রভুরা রাখেন ঠগেদের মন।
এখনও গানের সুরে ভেসে যাও তুমি।

এদেশে নেতারা হাওদায় চ'ড়ে
শিকার গাঁথেন বাক্যের শরে,
আসলের চেয়ে মেকিটাই দামি।
বিচিত্র দেশ, কৃতজ্ঞ আমি

এখনও যে মেয়ে হাসি জ্বেলে দাও তুমি।

নরমুণ্ডের নৃত্যে

স্ফটিক পাত্রে রুপালি পানীয়
কাঁপছে তরল জ্যোৎস্নার মতো,
অঞ্জলি ভরা ফুলের পরাগ
অঙ্গার হলো চোখ ফেরাতেই।
পিপাসায় জ্বলি এবং আমিও
চরম ক্ষতির বোঝা টেনে চলি।

জ্ঞানের গরিমা উঁচু মিনারের
চূড়ো না ছুঁতেই হারিয়েছে খেই;
সকালসন্ধে দর্শন খুঁড়ে
এনেছি চকিত চতুর মুষিক।

তুমি যা-ই বলো চরাচরে আজও
অলীক ঘটনা ঘটছে সদ্য।
জ্ঞানীগুণীদের নাকের তলায়
অহরহ কত খেল চমকায়
কে তার ভাষ্য দেবে নির্ভুল?
ত্রিলোকে তেমন মল্লিনাথের,
ঈশ্বর জানে, দেখা মেলা ভার।

কালো মহাদেশ অনিশ্চিতের
নাগরদোলায় ঘুরছে সদাই

এবং অযুত তারার মুলুকে
মহাশূন্যের সেনা দেয় হানা।

ভালুকের কড়া দাপটে ঈগল
ক্ষুব্ধ চিত্তে ঝাপটায় ডানা;
সমানে-সমানে কোলাকুলি তাই
বিমূঢ় সিংহ খাচ্ছে বিষম।

শীর্ষ মেলাটি বুদ্বুদ যেন
এক লহমার ফুৎকারে ফাটে;
থাকবে বজায় ঠাণ্ডা লড়াই।

সিংহমশাই ছয় মোড়লের
হাটে যেতে চান, কিন্তু সহসা
পথ আগলায় শত্রুপক্ষ।
দিনকাল বড় বেয়াড়া এখন—
এমনকি তার শুকনো হাড়ের,
হায়রে কপাল, আশ্বাস নেই।

গাত্র বাঁচিয়ে পুণ্যবানেরা
পথ চলে বটে দৈনন্দিন,
কিন্তু তাঁদের শান্ত সকাল,
অলস দুপুর অমাবস্যার
কুটিল আঁধারে হচ্ছে বিলীন।

হাবেভাবে তাঁরা এত সমাহিত,
ঈশ্বর যেন বন-ভোজনের
ঠাণ্ডা আমেজে মগ্ন এখন।

নরমুণ্ডের ভয়াল নৃত্যে
চলছে যখন স্বপ্ন হনন,
দুঃস্বপ্নের ঊর্ণাজালেই
দার্শনিকের প্রবীণ কণ্ঠে
মানবতা আনে অযুত যুগের
সূর্যোদয়ের প্রেমঘন ভাষা ॥

পুরাকালে

পুরাকালে কে এক বণিক তার সবচেয়ে দামি
মুক্তোটিকে বাগানের মাটির গভীরে
রেখেছিল লুকিয়ে যেখানে
সূর্যের তিমির-দীর্ণ আলো
পৌঁছেনি কখনো,
হৈমন্তী গাছের পাতা ঝরেনি যেখানে।

তোমাকে পাওয়ার ইচ্ছা সেই
মুক্তোর মতোই জ্বলে আমার ভেতর রাত্রিদিন
আর আমি ভাবি এই সৌন্দর্যকে লালন করার
আশ্চর্য সাহস
কে দিল আমাকে?

অনুস্মৃতি

এমন একলা এই পথ, কোনোখানে সাড়া নেই
জনমানবের। বুঝি বাতাসের স্বরে
গলে গিয়ে মিশে যাবে আমাদের সত্তার সুরভি,
এমন নিঃসঙ্গ এই পথ!

'এখানে আসে না কেউ' তুমি বলেছিলে, 'খরগোশ,
প্রজাপতি, জোনাকি অথবা ঝিঁঝি হরেক রকম
নানারঙা পাখ্‌পাখালি, কাঠবিড়ালী ছাড়া
এখানে আসে না কেউ। রৌদ্র ওঠে, মেঘ ফেলে ছায়া,
গাছাপালা আর্দ্র হয় বৃষ্টির আদরে। আর দ্যাখো
সোনালি-হলুদ ফুল গুচ্ছ গুচ্ছ অর্পিত স্তবকে :
বিন্দু বিন্দু আনন্দের সমবায় শুধু।

তোমার পায়ের নিচে শুক্‌নো পাতাগুলো
উঠল বেজে, তুমি ছোট গাছটার ডাল ধরে দেখি,
দাঁড়ালে, রইলে মাথা নিচু করে ক্ষণকাল, আমি
বললাম, 'সবকিছু বদ্‌লে গেছে তুমি আছ বলে।'

আর তুমি :
'ঘুরে-বেড়ানোর মতো বেশ জায়গা। নেই

উঁকি-দেয়া চোখ, উদ্যত তর্জনী আশে-পাশে,
এবং দূরের আকাশকে
মনে হয় এখানে আকাশ অবিকল।'

এরোপ্লেন উড়ে গেল মাথার উপর : এক ঝাঁক
শব্দের মৌমাছি উঁচু উঁচু গাছ স্পর্শ করে
আমাদের স্তব্ধতাকে করেছে গুঞ্জিত।

তোমার আমার মধ্যে যে-শিল্পিত দূরত্ব অটুট
চিরদিন, তারই রূপ রইল এখানে ধরা এই
জনহীন পথপ্রান্তে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের স্তবকে।

কোনো দিন মফস্বলে একরত্তি অখ্যাত স্টেশনে
থামলে রাত্রির ট্রেন, শেষ রাতে মরা জ্যোৎস্না ঠেলে
চা খেয়ে মাটির খুড়ি ছুড়ে ফেলে দেব প্লাটফর্মে,
(হুইসিলে পাড়াগাঁর ছবি দূরে হবে সচকিত)
হঠাৎ ধরাব সিগারেট, ভাবব কতদিনকার
সেই নদী, বন, সাঁকো, আর
তোমার পায়ের নিচে কত শুকনো পাতার মর্মর ॥

শীতরাত্রির সংলাপ

যে-রাত্রি পাস্টেরনাক দেখেছেন সাদা প্রান্তরের
বরফের স্তূপে, নেকড়ের ক্ষুধিত চিৎকারে ছেঁড়া
শূন্যতায়, সে-রাত্রি দেখিনি আমি এবং এখানে
আমাদের ফটকে জমে না।
অজস্র তুষার আর বরফ চিবানো আধ-পাগলা
মেয়ে বাগানের ভাঙা বেড়াটার ধারে
অথচ চৌকাঠে
মুচকি হেসে দাঁড়ায় না এসে সিল্কের রুমাল-বাঁধা
চুলে খোলা পায়।
একদার কুয়াশায় লীন কোনো পৌষের হিমেল
রাত আজও অস্তিত্বের গির্জের চূড়োয়
ঝরায় শিশির কণা : মনে পড়ে সেই ছোট ঘরে
প্রথম প্রহরে তুমি পড়ছিলে ডাক্তার জিভাগো
একা, গায়ে পাৎলা কোট, নামহীন দূরত্বে আসীনা—

তখন তোমাকে সহজেই ভাবা যেত বিদেশিনী,
বলেও ছিলাম তাই। আর সেইক্ষণে অকস্মাৎ
নরম কাগজ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো পাস্টেরনাকের
সাদা রাত্রি, যেন
পড়ল ছড়িয়ে সবখানে, উদ্ভাসিত
আমাদের সত্তার জটিল গাছপালা।

বলেছিলে : 'শীতের প্রখর রাত্রি দিয়েছে নামিয়ে
আমাদের অন্ধখার হা-খোলা কবরে।
হয়তো চাঁদের প্রেত খানা-খন্দে উঁকি
দেবে ক্ষণকাল, ক্ষণকাল গোপনে রাত্রির কানে
দুল হয়ে থাকবে ঝুলে ক'টি চামচিকে
তৃতীয় প্রহরে। রাত্রিভর হিম হাওয়া বয়ে যায়
রক্তের ফেনিল হ্রদে আর বারবার কেঁপে ওঠে
অস্তিত্বের প্রচ্ছন্ন কংকাল।'

আমি তার উত্তরে বলেছি : এই দাঁতে-দাঁত লাগা
নীল জীবনকে তাপ দেবে বসন্তের
উদার জ্বালানি। দ্যাখো চেয়ে সৌন্দর্যের গাঢ় স্তবে
মুখর রহস্যময় নিঃসঙ্গ মানুষ।

ইতিহাস, তোমাকে

করাতের অসংখ্য দাঁতের মতো মুহূর্তগুলো
আমাকে কামড়ে ধরেছিল, আর সেই মরণ-কামড়ে
আমি ঝাঁঝরা শরীরটাকে দু'একবার নেড়েচেড়ে
পৃথিবীর বন্ধ দরজা নখ দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে
নিঃসাড় হয়ে যেতে পারতাম।
কিন্তু আমার দুঃখ-চর্চিত ললাটে
অন্য সম্মানের আভাস ছিল বলেই
বেঁচে রইলাম। তৃষ্ণার দুপুরে কোনো আহত সাপের মতো
এক সীমাহীন ক্রোধে, মূর্খ যন্ত্রণায় নিজেকে টেনেহেঁচড়ে
বেঁচে রইলাম সর্বনাশের পাশ কাটিয়ে
সমস্ত দুর্দশার মুখের ওপর আমার প্রবল থাবা মেলে দিয়ে।

জীবনকে খণ্ড খণ্ড চিত্রে দেখেছি– কখনো সুন্দর

কখনো কুৎসিত। যুবককে দেখেছি
দুপুর সন্ধ্যা আর রাত্রিকে রেণুর মতো
উড়িয়ে দিতে হাওয়ায় আর বৃদ্ধকে দেখেছি তার
খাটো মোমবাতিটাকে হিংসুক বাতাসের
বিরোধিতা থেকে রক্ষা করার জন্য কী ব্যস্তবাগীশ।

কখনো অশেষ হঠকারিতায় জীবনকে একটা
আংটির মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চেয়েছি,– কখনো
সময়ের জরায়ু ছিঁড়ে নিতে চেয়েছি
কয়েকটি টসটসে নিটোল কালো আঙুর,
যাদের আমি ঠোঁটে নিয়ে থেঁতলে দিতে, পিষে ফেলতে
ভালবাসি, ভালবাসি যাদের মাংসল কণাগুলো ছুড়ে ফেলে দিতে
ইতিহাসের হলুদ জঞ্জালে।

পেঁজা তুলোর মতো তুষারে অশ্বেতরের
পায়ের ছাপ, সোনালি গমের মাঠ
আগুনের লকলকে জিভ কিংবা ধোঁয়াটে
সন্ধ্যার প্রান্তরে খণ্ডিত সৈনিক :
একেই বলবে কি ইতিহাসের বিশ্বস্ত বিবৃতি?

একটি আলোকিত দেহকে বিনাশ করবে বলে যারা
ক্রুশকাষ্ঠে পেরেক ঠুকেছিল, তাদের
উৎসবে, ব্যভিচার কিংবা যারা বালিতে, অন্ধকার
গুহার দেয়ালে মাছের চিত্র এঁকে
ক্রুশবিদ্ধ অস্তিত্বের মহাপ্রয়াণে চোখ মুছেছিল,
তাদের ঘরকন্না, প্রেমের ব্যাপ্ত বলয়, তা-ও কি
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয় প্রতারক ইতিহাসের?

ইতিহাস সরোদের মতো বেড়ে উঠলে
আমি সুখী, দামামার মতো গর্জে উঠলে
দুঃখ আমাকে বিবর্ণ করে। জীবন যখন বর্বরের মুঠোয়
কপোতের নরম বুকের মতো কেঁপে ওঠে,
গহন পাতালের প্রাগৈতিহাসিক শীতল জল
নিভিয়ে দিতে চায় হৃদয়ের আগুন,
আমার সমস্ত সম্ভ্রম আর উল্লাস
অর্পণ করি আগামীর অঞ্জলিতে
–কেননা ভবিষ্যৎ এক
জলদমন্দ্র সুর ইতিহাসের ধ্রুপদী আলাপে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

লোকে বলে বাংলাদেশে কবিতার আকাল এখন,
বিশেষত তোমার মৃত্যুর পরে কাব্যের প্রতিমা
ললিতলাবণ্যচ্ছটা হারিয়ে ফেলেছে– পরিবর্তে রুক্ষতার
কাঠিন্য লেগেছে শুধু, আর চারদিকে পোড়োজমি,
করোটিতে জ্যোৎস্না দেখে ক্ষুধার্ত ইঁদুর কী আশ্বাসে
চম্‌কে ওঠে কিছুতে বোঝে না ফণিমনসার ফুল।

সুধীন্দ্র জীবনানন্দ নেই, বুদ্ধদেব অনুবাদে
খোঁজেন নিভৃতি আর অতীতের মৃত পদধ্বনি
সমর-সুভাষ আজ। অন্যপক্ষে আর ক'টি নাম
ঝড়জল বাঁচিয়ে আসীন নিরাপদ সিংহাসনে,
এবং সম্প্রতি যারা ধরে হাল বহতা নদীতে
তাদের সাধের নৌকো অবেলায় হয় বানচাল
হঠাৎ চড়ায় ঠেকে। অথবা কুসুমপ্রিয় যারা
তারা পচা ফুলে ব'সে করে বসন্তের স্তব।

যেমন নতুন চারা পেতে চায় রোদবৃষ্টি তেমনি
আমাদেরও অমর্ত্যের ছিল প্রয়োজন আজীবন।
তোমার প্রশান্ত রূপ ঝরেছিল তাই সূর্যমুখী
চেতনার সৌরলোকে রাজনীতি প্রেমের সংলাপে।
যেন তুমি রাজসিক একাকিত্বে– মধ্যদিনে যবে
গান বন্ধ করে পাখি– কখনো ফেলোনি দীর্ঘশ্বাস,
যেন গ্রীষ্মে বোলপুরে হওনি কাতর কিংবা শুকনো
গলায় চাওনি জল– অথবা শমীর তিরোধানে
তোমার প্রোজ্জ্বল বুক হয়নিকো দীর্ণ কিংবা যেন
মোহন ছন্দের মায়ামৃগ করেনি ছলনা কোনো–
এমন মূর্তিতে ছিলে অধিষ্ঠিত সংখ্যাহীন প্রাণে।
গোলাপের তীক্ষ্ণ কাঁটা রিলকের সত্তার নীলিমাকে
ছিঁড়েছিল, তবু তাও ছিল স্নানাহার, চিরুণির
স্পর্শ ছিল চুলে, ছিল মহিলাকে নিবেদিতপ্রাণ।

আমার দিনকে তুমি দিয়েছ কাব্যের বর্ণচ্ছটা
রাত্রিকে রেখেছ ভরে গানের স্ফুলিঙ্গে, সপ্তরথী
কুৎসিতের ব্যূহ ভেদ করবার মন্ত্র আজীবন
পেয়েছি তোমার কাছে। ঘৃণার করাতে জর্জরিত

করেছি উন্মত্ত বর্বরের অট্টহাসি কী আশ্বাসে।

প্রতীকের মুক্ত পথে হেঁটে চলে গেছি আনন্দের
মাঠে আর ছড়িয়ে পড়েছি বিশ্বে তোমারই সাহসে।
অকপট নাস্তিকের সুরক্ষিত হৃদয় চকিতে
নিয়েছ ভাসিয়ে কত অমলিন গীতসুধারসে।
ব্যাঙডাকা ডোবা নয়, বিশাল সমুদ্র হতে চাই
এখনও তোমারই মতো উড়তে চেয়ে কাদায় লুটিয়ে
পড়ি বারবার, ভাবি অন্তত পাঁকের কোকিলের
ভূমিকায় সফলতা এলে কিছু সার্থক জনম।

স্বগত ভাষণ

আমার মাথার ক্ষত দ্যাখে লোকে ফুলের মতন
উন্মীলিত প্রতিদিন, আমি বিশ শতকের যিশু।
আমার চৌদিকে দেখি ক্রুশকাঠ নিয়ে যাচ্ছে বয়ে
মুখ বুজে কয়েকটি শীর্ণ শব, তারাই আবার
জ্বলজ্বলে রাত্রির দোকানে এসে কয় খিলি পান
কিনে দলছাড়া হয় অথবা প্রচণ্ড ক্ষোভে মেতে
নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে তোলে তারার কবর
দেখতে চায় না চাঁদ ভেসে যাক অবারিত নীলে।

আমার মাথাটা যেন বহ্নিমান একটি শহর
যেখানে মানুষ, যান, বিজ্ঞাপন, রেডিওর গান,
ভিখিরির চ্যাঁচামেচি, বেশ্যার বেহায়া অনুরাগ,
কানাঘুষো, নামহীন মৃত শিশু আবর্তিত শুধু।

আমাকে শাসায় ভাগ্য সারাক্ষণ, বাগে পেয়ে যদি
টিট করে দেয় ঈর্ষাতুর দেবদূত দুঃস্বপ্নের
মুখোশ দেখিয়ে তবে কী মজা লুটবে অন্ধকারে
আমার দুর্দশা দেখে নোনাধরা চারটি দেয়াল!

ক্লান্ত হয়ে স্বপ্ন দেখি : পেরিয়ে হলুদ মরুভূমি
একটি বিকট সিংহ আত্মাটাকে নেড়ে-চেড়ে শেষে
ছুড়ে ফেলে দিয়ে জীর্ণ জঞ্জালে নিঃশব্দে চলে গেছে।
হয়তো রোচেনি মুখে, কিংবা যেটা যোগ্য কুকুরের

কী করে বসাবে ভাগ তাতে অরণ্যের অধীশ্বর?
নিজের ছায়াকে দেখি হেঁটে যায় দূরে, আমি তার
অনুগামী। কয়েকটি প্রবঞ্চক স্বর গান হয়ে
মিশে যায় কঙ্কালের মতন বৃক্ষের অন্তরালে

তিনটি ডাইনী বুড়ি দূরের আকাশ থেকে সাদা
চাঁদটাকে উপড়ে এনে, গুঁড়ো করে পাচনের সাথে
মিশিয়ে বিকৃত শব্দে টেনে নিয়ে তৃষিত জঠরে
বলে তারা : কেন বৃথা করো তুমি নিজেরই মৃগয়া?

মাথার ক্ষতের ঘ্রাণে জেগে দেখি ঘরের দেয়ালে
অলীক ফুলের নকশা, চতুর্দিকে যৌবনের রঙ
নিয়েছে জড়তা শুষে। শরীর চিৎকারে দীর্ণ হয় :
আমি কি এখনও যুবা আলোকিত আয়ুর ভূগোলে?

খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি

বড় রাস্তা, ঘুপচি গলি, ঘিঞ্জি বস্তি, ভদ্রপাড়া আর
ফলের বাজার ঘুরে খেলনার দোকানের সামনে
দাঁড়ালাম। কাচের আড়ালে দেখি কাঠের পুতুল,
রেলগাড়ি, ছক-কাটা বাড়ি, আরবি ঘোড়া এক জোড়া,
উড়ন্ত পাখির মতো এরোপ্লেন, টিনের সেপাই।
ভালুক বাজায় ব্যান্ড, বাঁকা-শিং হরিণের পাশে
বাঘের অঙ্গার জ্বলে, বিকট হা করে আছে সিংহ :
সারি সারি রয়েছে সাজানো ওহো হরেক রকম
বাজনা বাঁশি বাদশা বেগম আর উজির নাজির।

আমার পিরান নেই, পাগড়ি নেই লালমুখো সেই
উজিরের ম'তো, নাগরা নেই পায়। এখন দুপুরে
লেপ্টে আছে পৃথিবীর গায়। কয়েকটি যুবককে
ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওরা– লোকে বলে রাত্রিদিন তারা
নেহাই হাতুড়ি দিয়ে ইচ্ছেমতো চেয়েছে গড়তে
কত কিছু, দেশকে নতুন করে গড়ে পিটে নিতে
চেয়েছে হুজ্জত সব জ্বলন্ত জোয়ান। বুঝি তাই
টিট করে দেবে ওরা যৌবনের গোঁয়ার ইচ্ছাকে।

"গান বন্ধ কর্ তোরা, নর্তকী নাচের মুদ্রা ভোল"–
"এমন হুকুমনামা জারী হলে সংস্কৃতি সদনে
আমরা গোল্লায় যাব এবং দাঁতাল বর্বরতা

সদর্পে তুলবে মাথা প্রাগৈতিহাসিক কূপ থেকে”
হেঁটে যেতে যেতে বলব কয়েকটি সুবেশ যুবক।
ইচ্ছে হয় মুখ ঘষি খেলনার দোকানের কাচে
বড় ইচ্ছে হয় ঘষি দুটি চোখ। যে-বিড়িটা কানে
গুঁজে ভোরে বেরিয়ে পড়েছি পথে তাই টানি সুখে
এখানে দাঁড়িয়ে ঠায় দুপুরের ঠাঠা রোদে। যদি
ছুঁয়ে দেখি স্বচ্ছ কাচ সূর্যসেঁকা আত্মায় আরাম
পাবো কিছু মনে হয়; দেখি মেঘেরা পালায় দৌড়ে
যেমন ছেলের দল ছুটে যায় পাঠশালা ছুটি
হয়ে গেলে। এ দুপুরে নিজের ছায়াকে দেখে কাচে
ঘুরে-ফিরে কেন শুধু গাঁয়ের নদীকে মনে পড়ে?

গাঁয়ের নদীর তীরে একজন বাউল আমাকে
একদিন ‘এদেশে আলোর কথা ভুলে থাকে লোক;
বড়ো বেশি অন্ধকার ঘাঁটে আর নখের আঁচড়ে
গোলাপ-কলিজা ছেঁড়ে পরস্পর’– বলেছিল হেসে।

নৌকোর গলুইয়ে বসে বুঝিনি সেদিন তার কথা,
আমি শুধু মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলাম তাকিয়ে
তার দুটি উদাস চোখের দিকে; শুনতে পেলাম
নদীর শব্দের সাথে মিশে গেছে বাউলের স্বর।

ডেপুটি হাকিম নই, নই কোনো ভবঘুরে কবি;
পেটের গোলাম আমি, বুঝেছ হে, অলীক হুকুমে
চৈত্ররাতে ফুটপাতে শুই। ঠ্যাং দুটি একতারা
হয়ে বাজে তারাপুঞ্জে, মর্মরিত স্বপ্নের মহলে
বাউলের কথামৃত স্বপ্নে হয় আমের বউল।

‘দ্যাখো দ্যাখো হাড্ডিসার লোকটার মুখের কী ছিরি,
কেতমন বিচ্ছিরি লাগে, দ্যাখো কত নোংরা’ বলে দুটি
তরুণী কলের পুতুলের মতো হেঁটে গেল চলে।
উঁচু বুক দেখে ভাবি পেশোয়ারি উজ্জ্বল দোকানে
দূর থেকে দেখছি তাজ্জব হয়ে টসটসে ফল।
নিজেকে কুচ্ছিত ভেবে লজ্জা পেলে সদর রাস্তায়
আমাদের চলে? উপরে আকাশ জ্বলে নির্বিকার।
যে ভদ্দরলোক এ মুহূর্তে এক খিলি পান কিনে
পুরল শৌখিন মুখে সে অশ্লীল গল্পের নায়ক
হতে পারে সহজেই। হতে পারে বেশ্যার দালাল।
বেইমান দুনিয়ায় খুনসুটি, ভালবাসাবাসি

বুঝি না কিছুই– নাকি বিলকুল বুড় হাবড়া আমি
হয়ে গেছি এতদিনে। কী যে ভাবি এত হাবিজাবি!

আমার জীবন নয় সুখের পানসি ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ভেসে যাবে অথবা নেইকো' কোনো তালুক মুলুক
দু'হাতে ওড়াব ব'সে। পুণ্যলোভী দাতার দয়ায়
জীবনে সম্বল শুধু কয়েকটি তামার পয়সা।

গতকাল ফ্রকপরা যে-মেয়েটি একটি দু'আনি
হাসিমুখে দিয়েছিল এই হতচ্ছাড়া ভিখিরিকে,
কাচের আড়ালে রাখা ফুটফুটে পুতুলের মুখে
হঠাৎ পেলাম খুঁজে রাঙা তার মুখের আদল
–আমার মাবুদ তাকে খোশহাল বেগম করুন।

যে লোকটা সারাদিন পাখি বেচে গড়েছে সংসার,
হলুদ পাখির মতো যার বউ, সে কেন গলায়
পরে ফাঁস? সে লাশ পচার আগে মৃত এক পাখি
বউটিকে নিশীথে কাঁদাতে এসে দ্যাখে, হা কপাল,
আনন্দে উচ্ছল নারী হয়েছে উৎসব দ্বিধাহীন,
আয়নায় কাজল পরা দুটি চোখ ক্ষুধায় উজ্জ্বল।
'দূর হ এখান থেকে হা-ভাতে ভিখিরি কোথাকার
আঁস্তাকুড়ে বেছেন আস্তানা, নোংরা খুঁটে খা-গে'–
দোকানি খেঁকিয়ে ওঠে। খেলনা ফেলনা নয় জানি,
এখন এখান থেকে, আল্লা, যাব কোন জাহান্নামে!
খেলনা ফেলনা নয়। ফলের বাজার, পুতুলের
স্থির চোখ ... পীরের মাজার, হৈচৈ মানুষের ভিড়,

গাঁয়ের নদীর তীর গুঞ্জরিত বাউলের স্বরে...
গেরস্তপাড়ায় বেশ্যাবৃত্তি, ভালুক বাজায় ব্যান্ড,
খেলনা ফেলনা নয়... বাজনা বাজে, ফলের বাজার,
ফ্রকপরা ফুটফুটে মেয়েটির একটি দু'আনি
হাতের চেটোয় নাচে, কাচের আড়ালে দুই যোদ্ধা,
সেপাই রাঙায় চোখ, ভদ্দরপাড়ায় বাজনা বাজে,
"আঁস্তাকুড়ে বেছে নে আস্তানা', খেলনা ফেলনা নয় ...

মূল্যের উপমা

(তাকে, আমাকে যে কবি ব'লে উপহাস করত)

লিখি না গোয়েন্দা গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী
কিংবা চিত্রতারকার বিচিত্র জীবনপঞ্জি লিখে

হয়নি প্রচুর অর্থাগম। অথচ যা-করি তা-ও
যায় না কখনো বলা অসংকোচে ভদ্রমণ্ডলীকে।
আমার উঠোনে সুখ নয় জানি মরালগামিনী
সকালের তাজা রোদে অপরাহ্নে অথবা উধাও
রাত্রির উপুড় করা অন্ধকারে। যখন প্রেমিক
প্রেমিকার উন্মোচিত স্তনে মুখ রেখে ভোলে শোক,
ঠোঁটের উত্তপ্ত তটে থরথর জীবনের দিক
ঝড়ে-পড়া সারেঙের মতো খোঁজে, গণিকার চোখ
যখন কাজলে দীপ্ত ক্লান্তির আড়ালে নগরের
অষ্টতম নাগরের আলিঙ্গনে, জেগে থেকে জ্বলি

স্বর্গবাসী স্বপ্নের চিন্তায় দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ টেবিলের
নিষ্কম্প আলোর দিকে দৃষ্টি মেলে। নিজেকে কেবলি
ছেড়ে দিই শুভ্রতম জীবনের বিস্তীর্ণ অতলে।
নিখাদ বিশ্বাস নিয়ে নির্বীজ মাটির রুক্ষতাকে
সাজাই সরেস ফুলে, আমার ঝর্ণার স্নিগ্ধ জলে
মরুভূমি আর্দ্র হয়, শুকনো মৃত কাঠ হয় বীণা
এবং কর্দমে জেগে ওঠে এমন প্রতিমা যাকে
ত্রিলোকে দ্যাখেনি কেউ। প্রত্যহ নগদ মূল্য বিনা

দেয়াল পাথর গাছ নদী বালি বাতাস আঁধার
বিড়ালের চোখ আর পাখির ডানার কাছে শুধু
কথা খুঁজি নিজেকে জীবনপণ যুদ্ধে করে ক্ষয়।
অথচ করে না কেউ ক্ষমা, তাই আমি জ্বলি ধু-ধু–
বিজ্ঞাপন, করতালি, বরমাল্য, জয়-পরাজয় :
যা-ই হোক, জানি তবু একরত্তি মূল্য নেই তার।

পিতার প্রতিকৃতি

'কখনো নদীর স্রোতে মৃত গাধা
ভেসে যেতে দেখেছি সন্ধ্যায়,
দেখেছি একদা যারা হৈচৈ করে যুদ্ধে
গেছে তাদের ক'জন
মহৎ স্বপ্নের শব কাঁধে নিয়ে হেঁটে-হেঁটে
ক্লান্ত হয়ে ফের
স্বগৃহে এসেছে ফিরে। গোবিন্দলালের পিস্তলের
ধোঁয়ায় রোহিনী আর একটি যুগের অস্তরাগ
মিশে যেতে দেখেছি আমরা'– বলে

পিতা থামলেন কিছুক্ষণ।

তিনি ভোরে খাচ্ছিলেন রুটি আর স্মৃতির তিতির
পুরানো চেয়ারে ব'সে। রোদ্দুরের অরেঞ্জ স্কোয়াশে
ভিজিয়ে প্রবীণ কণ্ঠ বল্লেন জনক :
"আমি তো বেঁচেছি ঢের খেয়ে-দেয়ে
ভালো থেকে অশেষ কৃপায়
তাঁর, কত বছরের রৌদ্রজলে ক্ষ'য়ে গেছে
অস্তিত্বের ধার
আর কে না জানে প্রকৃত দীর্ঘায়ু যিনি
অনেক বিচ্ছেদ মৃত্যু তার মনে প্রেতের ছায়ার
মতো ঝুলে থাকে আজীবন। শৈশবের
অশেষ সন্ধান তাকে টেনে আনে জনশূন্যতার
নেউল-ধূসর তীর্থে, যেখানে কুয়োর জলে
সত্যের নিটোল মুখ দেখার আশায়
যেতে হয়– যেখানে দরোজা বন্ধ, বারান্দায়
পাখির কংকাল,
গোলাপের ছাই প'ড়ে আছে
একটি বাতিল জুতো বিকেলের রোদের আদরে

হেসে উঠে বলের মতন নেচে নেচে নিরিবিলি
ফুলের জগতে চলে যায়
এবং একটি ঘোড়া চমকিত বালকের আকাঙ্ক্ষার ঘ্রাণে
মত্ত হয়ে ছুটে যায় দলছাড়া মেঘের তল্লাশে,
সহসা খিঁচিয়ে মুখ ছিঁড়ে নেয় অস্তগামী
সূর্যটির মাংস একতাল।
'বেঁচে আছি বহুদিন তবু পৃথিবীকে
এখনও রহস্যময় মনে হয় ... আর শোনো
ভাবতে পারি না
কোনো দিন থাকব না এখানে, চেয়ারে ব'সে
ঝিমাব না
ভোরের রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে কোনো দিন।

'তখন থাকবে তুমি আমার সন্তান
–দীর্ঘজীবী হও তুমি,
তোমার কর্মঠ আঙুলের উষ্ণ রক্তে ঘন ঘন
আমার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলি
এক ঝাঁক হাঁসের মতোই জানি
নিপুণ সাঁতার কেটে তোমাকে জোগাবে স্বপ্ন অনিদ্রার রাতে–'

–বলে তিনি মুগ্ধ চোখে ফেরালেন মুখ
অতীতের দিকে,
তখন রাসেল রিলকে বুদ্ধ পিকাসোর
নাম জানেন না ভেবে
পারিনি করুণা করতে বয়েসী পিতাকে ॥

শনাক্ত পত্র

সূর্যোদয় কখনো দেখেনি বলে তিনটি যুবক
প্রত্যহ একত্র হয়ে ধর্ণা দেয় সূর্যাস্তের কাছে।
'সূর্যের চুল্লিতে আমি বহুদিন সেঁকেছি আত্মাকে
উল্টিয়ে পাল্টিয়ে, ওহে, তবু দেখি এখানে-সেখানে
থেকে যায় স্যাঁতসেঁতে কিছু ভাব। অর্থাৎ এখনও
জীবন খোলেনি তার সবগুলি দ্বার সরাসরি,
বস্তুত হাতের পাঁচ অলক্ষ্যে দিয়েছে রেখে, তাই
পৃথিবীর রকে আজও হামাগুড়ি দিই, কেউ-কেউ

'হাঁটি-হাঁটি পা-পা এইমতো কতো নাবালক ছাঁদে
ক্রমাগত চলেছি হোঁচট খেয়ে প্রতিটি প্রহর।
তালগোল কেবলি পাকিয়ে যায় এই পরজীবী
অস্তিত্বের বিমূর্ত চৌকাঠে। পথে দৌড়ে এসে দেখি
আমার আসার আগে যাত্রীর বান্ডিল নিয়ে ওই
ছেড়ে যায় বাস'– এই বলে সটান মাঠের মরা
ঘাসে শুয়ে দুই-মুখ-ফিরে-আসা সিগারেটে দিল
সুখটান প্রথম যুবক। চেয়ে দ্যাখে প্রায় নেভা
আকাশে সূর্যের স্টোভ সূর্যাস্তের রঙ দেখে তার
মনে পড়ে হঠাৎ মোটরে দেখা মহিলার ঠোঁট।

'ইয়ার বলেছ তোফা। সেই কবে নড়বড়ে টোলে
জল পড়ে পাতা নড়ে মুখস্থ করেছিলুম জন
ত্রিশেক বালক মিলে ঐকতানে প্রশান্ত সকালে,
দুপুরের অন্ধ-করা রোদে আজ কে কোথায়, ওহে,
পড়েছে যে ছিটকে দূরে। ধড়িবাজ যে লোকটা
দেখাল ঘুঘুর ফাঁদ, একদিন সে-ই জানব না
ছিল চেনা সুবোধ বালক, শ্লেটে যার চকখড়ি
বুলাত আদর্শ জীবনের শর্তাবলি প্রথামতো।

'ভুলেছি সবার নাম। তাদের মুখের রেখাটুকু

মুছে গেছে স্মৃতির অস্থির ক্যানভাস থেকে আজ।
সূর্যাস্তের রোগা আলো'– অবজ্ঞার ঢিল ছুড়ে দূরে
দ্বিতীয় কথক ভাবে– 'রাশেদা ভাবীর ম্লান ঠোঁট।'

'নামে কী-বা আসে যায়, বলেছেন, কবি-নাট্যকার;
সত্যি, কী-বা আসে যায় নামে', বলে তৃতীয় যুবক
ঝাড়ল হাতের ছাই, 'ধরো এই তোমার নামের
যে-অর্থ দাঁড়ায় তার কতটুকু তুমি? কিন্তু যদি
বলি কেউ আমার নামের খামে মনের খেয়ালে
বসায় তোমার নাম, অথবা আমরা তিনজন
যদি ফের তুলে নিই যে-কোনো তিনটি নাম যার
যেটা ইচ্ছে, তাতে কিছু হবে কি বিশেষ হের-ফের?

'নেমকহারাম নই, দেখেছি তো আরজি পেশ করে
এই জীবনের কাছে রাত্রিদিন, নেপোয় মেরেছে দইটুকু–
আমরা ক'জন শুধু শুকনো মুখে শূন্য হাতে শেষে
প্রত্যহ এসেছি ফিরে রকবাজ সন্তদের ভিড়ে',
তৃতীয় যুবক ভাবে : 'মধ্যাহ্নের চিৎকারের পরে
এখনও রয়েছে লেগে আকাশের প্যালেটে যে-রঙ,
তাকি নয় উত্তপ্ত সন্ধ্যায় বন্ধ্যা গণিকার ঠোঁট?'

'আমার জীবনে সুখ নেই', প্রথম যুবক বলে।
'আমার জীবনে সুখ নেই', বাতাসে দ্বিতীয় স্বর
নকশা আঁকে হিজিবিজি। চিন্তার কপাটে পড়ে খিল।
'আমার জীবনে সুখ নেই', বলে তৃতীয় কথক।
সূর্যোদয় কখনো দেখেনি বলে তারা তিনজন
সূর্যাস্তের কাছে চেয়েছে শিখতে কিছু জীবনের
রসায়ন। প্রথম যুবক দ্যাখে দ্বিতীয়ের চোখে

নেই তার নিজের চোখের মণি, তৃতীয়ের চোখ
সেখানে কাঁপছে মৃদু। দ্বিতীয় কথক দ্যাখে তার
নিজের থ্যাবড়া নাক নিয়েছে প্রথমজন কেড়ে।
হোক না কার্বন কপি পরস্পর, কী-বা আসে যায়
রকবাজ সন্তদের ভিড়ে, ওহে, কী-বা আসে যায়...
প্রাণপণ হেঁকে বলো শূন্যতায় কী-বা আসে যায়।

দুপুরে মাউথ অর্গান

উন্মত্ত বালক তার মাউথ অর্গানে দুপুরকে

চমকে দিয়ে সন্দেহপ্রবণ কিছু মানুষ ব্যতীত
দালান পুলিশ গাড়ি চকিত কুকুর অ্যাসফল্ট
রেস্তোরাঁকে বানাল দর্শক। ট্রাফিক সিগন্যালের
সবুজ বাতিটা ফের নতুন আশার মতো ঝল-
মল জ্বলে, কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মোটর পাশাপাশি
হঠাৎ হরিণ হতে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে বুঝি
রোদচেরা সমুরের গমকে।

এভেন্যুর ফুটপাতে
উন্মত্ত বালক নেই, মাউথ অর্গান নাচে শুধু
দূরে-কাছে বাতাসের ঝঙ্কৃত সঙ্গতে। দুপুরের
রৌদ্রের বর্ষায় লোকগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায় :
প্রত্যেকটি মানুষকে মনে হল স্বপ্নে-ভেসে-ওঠা
দ্বীপের মতন, লুপ্ত স্মৃতির সন্ধানে চমকিত;
সুরের হীরকদ্যুতি ঝলসিত্ত বুকের শ্লেষ্মায়
মগজের কোষে। ফুটপাতে শুয়ে-শুয়ে সিংহ মুখো
কুষ্ঠরোগী আকাশে দু'চোখ রাখে, স্বপ্ন দ্যাখে, দ্যাখে
রঙিন পাখির কত নরম শরীর ভেসে যায়,
বাতাসে ছড়ায় রঙ। কখনো ভাবে না তারা কবে
ট্রেনের চাকার তলে কে রাখল দুঃস্বপ্ন-মথিত
মাথা তার, জানে শুধু অফুরন্ত ওড়ার আকাশ
বালকের অর্গানের সুরে ঝরে ত্রিতল দালানে,
রঙমাখা ক্লান্ত ঠোঁটে, নিঃশেষিত ফলের ঝুড়িতে
পথে বিট পুলিশের পোশাকের নিষ্প্রাণ শাদায়
মোটরের মসৃণ শরীর আর ব্যাংকের দেয়ালে
ফুটপাতে পরিত্যক্ত বাদামের উচ্ছিষ্ট খোসায়
পকেটমারের ক্ষিপ্র নিপুণ আঙুলে, তিনজন
গুণ্ডার টেড়িতে শুকনো-মুখ ফেরিঅলার গলায়।

কুষ্ঠরোগী দ্যাখে তারও ক্ষতের পিছল রসে ঝরে
মত্ত বালকের অর্গানের সুর : ভাবে এই সুর
পারে না গড়তে তার গলিত শরীরে ভাঁজে ভাঁজে
আবার নতুন মাংস শিল্পের অলীক রসায়নে?
হতে কি পারে না তার বিনষ্ট শরীর ওই দূর
আকাশের পাখিদের মতো ফের সহজ সুন্দর?

শুধু প্রশ্নে বিদ্ধ আমি

শুধু প্রশ্নে আমি, উড্ডীন যে-প্লেন কোনো দিন
পারে না নামতে নিচে এরোড্রমে, ঘোরে দিগ্বিদিক,
গুঁড়ো হয় বিস্ফোরণে, অথবা নিখোঁজ তারই মতো
উত্তর দেয় না ধরা মননের মায়াবী গণ্ডিতে।
বরং ঘোরায় নিত্য কত ছলে, পড়ি খানা-খন্দে,
আবর্তে তলিয়ে যাই, মাথা ঠুকি পাথুরে গুহায়।

গাছ কি শিউরে ওঠে ঠাণ্ডা ভয়ে যখন শরীর
থেকে তার পাতাগুলি ঝরে যায় অথবা আনন্দে
উল্লসিত পাখির চোখে সোনালি শস্যের মাঠ কোনো
কখনো ওঠে কি জ্ব'লে স্বপ্নের মোহন আমন্ত্রণে?
মাছ কি বিতৃষ্ণ হয়ে মগ্ন হয় আত্মনিপীড়নে
কোনো ক্ষণে জলের বাগানে চায় পাখির কোরাস?
নিজেকে নিঃসঙ্গ ভেবে পথের কুকুর ফুটপাতে
রাত্রির নেশায় মত্ত খোঁজে কোন একান্ত সুহৃদ?

সন্দেহ ক্রমশ কেন হতাশায় হয়ে যায় লীন
বুদ্ধির জটিল চৌমাথায়? অনিদ্রার আক্রমণে
বেসিনে আরশোলা দেখে আঁতকে কেন উঠি মধ্যরাতে
মুখ ধুতে গিয়ে, কেন ভাবি কাফ্‌কার নায়কের
পরিণাম, বিপন্ন অস্তিত্ব যার বুকে হেঁটে হেঁটে
শুনতে চেয়েছে জ্যোৎস্না-চমকিত বেহালার সুর,
চেয়েছে খুঁজতে সম্পর্কের অবলুপ্ত তন্তুজাল।

শুধু প্রশ্নে বিদ্ধ আমি আজীবন, উত্তরের প্লেন
নামে না ঘাঁটিতে কোনো, থামে না তর্কের কোলাহল।

রৌদ্র করোটিতে

জীবনকে তুখোড় যদি সারাক্ষণ
মাতলামো করি আর শরীর গাঁজার গন্ধে ভরে
ছুট করে চলে যাই সাঙাতের ফুর্তিবাজ রকে,
পাপকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলি হ্রদের আলোর
মতো যদি উৎপীড়িত অন্ধকারে, ঘেয়ো ভিখিরির
ছেঁড়া ন্যাকড়ার ভাঁজে নক্ষত্রের ছায়া দেখি যদি
অথবা স্বপ্নের ঠাণ্ডা হরিণকে কাঁধে নিয়ে, ওহে,
কোথাও অলক্ষ্যে স'রে পড়ি, কনে-দেখা আলো সাক্ষী

রেখে বড়বাবু পৃথিবীকে একটা সালাম ঠুকে
হো-হো হেসে উঠি অতর্কিতে বদরাগী উর্দি দেখে,

তবে কি বেল্লিক ভেবে সরাসরি দেবে নির্বাসন
চিরতরে অথবা লেখাবে দাসখৎ শোকাবহ
আত্মার সাক্ষাতে? যাই করো, চিরদিন আমি তবু
থাকব অনড় সাক্ষী তোমাদের কাপুরুষতার।

জানি যারা দেখতে চায় নিষ্কলুষ জ্যোৎস্নার সারস
ঘুমেভরা ডানা দুটি গুটিয়ে রয়েছে ব'সে ভাঙা
দেয়ালের মস্ত বড় হাঁয়ের ভেতর, দেখতে চায়
বয়স্কের তোবড়ানো গালের মতন অতীতের
ধসে কয়েকটি ক্লান্ত নর্তকী ঘুঙুর নিয়ে করে
নাড়াচাড়া, যারা দেখতে চায় ঝাড়লণ্ঠনের নিচে
মোহিনী সৌন্দর্য আবর্তিত কুৎসিতের আলিঙ্গনে
রাত্রির স্খলিত গালিচায়, ফেলেনি নোঙর তারা
কোনো দিন বণিকের জ্বলজ্বলে সম্পন্ন বন্দরে।
নির্বাসন দাও যদি জনহীন অসহ্য সৈকতে,
নিহত আত্মার শোকে করব না কখনো বিলাপ।
বরং নির্মেঘ স্থানে হাত-পা ছড়িয়ে অবিচল
দুর্দশার প্রহার গ্রহণযোগ্য করে দেখব সে
ডানপিটে সূর্যটাও সহসা উধাও অন্ধকার
বনে; নিশাচর বেদে চাঁদের প্রসন্ন মুখে পাখা
ঝাপটায় ঢাউস বাদুড়, ছিঁড়ে ফেলে শুভ্রতাকে।

কখনো দেখব স্বপ্ন– কয়েকটি জলদস্যু যেন
অবলীলাক্রমে কাটা মুণ্ডুর চামড়া নিচ্ছে তুলে
অব্যর্থ ছোরার হিংস্রতায়, গড়ায় মদের পিপে
রক্তিম বালিতে আর বর্বর উল্লাসে চতুর্দিকে
কম্পিত পাতার মতো শব্দের ধমকে। কখনোবা
হঠাৎ দেখব জেগে শুয়ে আছি হাত-পা ছড়ানো
বিকেলের সাথে নামহীন কবরের হল্‌দে ঘাসে,
দেখব অঢেল রৌদ্রে ঝল্‌সে উঠে ঝরায় চুম্বন
ওষ্ঠহীন করোটিতে, জানব না সে করোটি কার,
সম্রাট অথবা ভাঁড় যার হোক আমি শুধু একা
দেখব রৌদ্রের খেলা একটি নির্মোহ করোটির
তমসায় : দেখব কে ছুঁয়ে যায় কালের বুড়িকে।

নিজ বাসভূমে

প্রথম প্রকাশ	ফাল্গুন ১৩৭৬ [ফেব্রুয়ারি ১৯৭০]
প্রকাশিকা	মাহতাবুন নেসা, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী	মুর্তজা বশীর
উৎসর্গ-পত্র	আবহমান বাংলার শহীদদের উদ্দেশ্যে

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছ আমার সত্তায়।
মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে
শিউলীশৈশবে 'পাখী সব করে রব' বলে মদনমোহন
তর্কালঙ্কার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক। তুমি আর আমি,
অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর মমতায় লীন,
ঘুরেছি কাননে তাঁর নেচে নেচে, যেখানে কুসুম-কলি সবই
ফোটে, জোটে অলি ঋতুর সংকেতে।

আজন্ম আমার সাথী তুমি,
আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গ'ড়ে পলে পলে,
তাই তো ত্রিলোক আজ সুনন্দ জাহাজ হয়ে ভেড়ে
আমারই বন্দরে।

গলিত কাচের মতো জলে ফাৎনা দেখে দেখে রঙিন মাছের।
আশায় চিকন ছিপ ধ'রে গেছে বেলা। মনে পড়ে, কাঁচি দিয়ে
নকশা কাটা কাগজ এবং বোতলের ছিপি ফেলে
সেই কবে আমি 'হাসিখুশি'র খেয়া বেয়ে
পৌঁছে গেছি রত্নদ্বীপে কম্পাস বিহনে।

তুমি আসো, আমার ঘুমের বাগানেও
সে কোন বিশাল
গাছের কোটর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আসো,
আসো কাঠবিড়ালির রূপে,
ফুল্ল মেঘমালা থেকে চকিতে ঝাঁপিয়ে পড় ঐরাবত সেজে,
সুদূর পাঠশালার একান্নটি সতত সবুজ
মুখের মতোই দুলে দুলে ওঠো তুমি

বারবার কিংবা টুকটুকে লঙ্কা-ঠোঁট টিয়ে হয়ে
কেমন দুলিয়ে দাও স্বপ্নময়তায় চৈতন্যের দাঁড়।

আমার এ অক্ষিগোলকের মধ্যে তুমি আঁখিতারা।
যুদ্ধের আগুনে,
মারীর তাণ্ডবে,
প্রবল বর্ষায়
কি অনাবৃষ্টিতে,

বারবনিতার
নূপুর নিক্বণে,
বনিতার শান্ত
বাহুর বন্ধনে
ঘৃণায় ধিক্কারে,
নৈরাজের এলো-
ধাবাড়ি চিৎকারে,
সৃষ্টির ফাল্গুনে

হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
উনিশশো' বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছ সগৌরবে মহীয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি,
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউরের পৌষমাস!
তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

এখানে এসেছি কেন? এখানে কী কাজ আমাদের?
এখানে তো বোনাস ভাউচারের খেলা নেই কিংবা নেই মায়া
কোনো গোল টেবিলের, শাসনতন্ত্রের ভেল্‌কিবাজি,
সিনেমার রঙিন টিকিট
নেই, নেই সার্কাসের নিরীহ অসুস্থ বাঘ, কসরৎ দেখানো
তরুণীর শরীরের ঝলকানি নেই কিংবা ফানুস ওড়ানো
তা-ও নেই, তবু কেন এখানে জমাই ভিড় আমরা সবাই?

আমি দূর পলাশতলির
হাড্ডিসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক,
মধ্যযুগী বিবর্ণ পটের মতো ধু-ধু,
আমি মেঘনার মাঝি, ঝড়বাদলের
নিত্য-সহচর,

আমি চটকলের শ্রমিক,
আমি মৃত রমাকান্ত কামারের নয়ন পুত্তলি,
আমি মাটিলেপা উঠোনের
উদাস কুমোর, প্রায় ক্ষ্যাপা, গ্রাম উজাড়ের সাক্ষী,
আমি তাঁতি সঙ্গীহীন, কখনো পড়িনি ফার্সি, বুনেছি কাপড় মোটা-মিহি
মিশিয়ে মৈত্রীর ধ্যান তাঁতে,
আমি
রাজস্ব দফতরের করুণ কেরানি, মাছি-মারা তাড়া-খাওয়া,
আমি ছাত্র, উজ্জ্বল তরুণ,
আমি নব্য কালের লেখক,
আমার হৃদয়ে চর্যাপদের হরিণী
নিত্য করে আসা-যাওয়া, আমার মননে
রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে
এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে
আর চৈতন্যের নীলে কতো স্বপ্ন-হাঁস ভাসে নাক্ষত্রিক স্পন্দনে সর্বদা।

আমরা সবাই
এখানে এসেছি কেন? এখানে কী কাজ আমাদের?
কোন সে জোয়ার
করেছে নিক্ষেপ আমাদের এখন এখানে এই
ফাল্গুনের রোদে? বুঝি জীবনেরই ডাকে
বাহিরকে আমরা করেছি ঘর, ঘরকে বাহির।

জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,
জীবন মানেই
ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,
জীবন মানেই
মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া পাল খাটানো হাওয়ায়,
জীবন মানেই
পৌষের শীতার্ত রাতে আগুনে পোহানো নিরিবিলি।
জীবন মানেই
মুখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিস দিয়ে,
জীবন মানেই
টেপির মায়ের জন্যে হাট থেকে ডুরে শাড়ি কেনা,
জীবন মানেই

বইয়ের পাতায় মগ্ন হওয়া, সহপাঠিনীর চুলে
অন্তরঙ্গ আলো তরঙ্গের খেলা দেখা,
জীবন মানেই
তালে তালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে চলা, নিশান ওড়ানো,
অন্যায়ের প্রতিবাদে শূন্যে মুঠি তোলা,
জীবন মানেই
মায়ের প্রসন্ন কোলে মাথা রেখে শৈশবের নানা কথা ভাবা,
জীবন মানেই
খুকির নতুন ফ্রকে নকশা তোলা, চারু লেস বোনা,
জীবন মানেই
ভায়ের মুখের হাসি, বোনের নিপুণ চুল আঁচড়ানো,
প্রিয়ার খোঁপায় ফুল গোঁজা;
জীবন মানেই
হাসপাতালের বেডে শুয়ে একা আরোগ্য ভাবনা,
জীবন মানেই
গলির মোড়ের কলে মুখ দিয়ে চুমুকে চুমুকে জলপান,
জীবন মানেই
রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়ানো,
স্ফুলিঙ্গের মতো সব ইস্তাহার বিলি করা আনাচে-কানাচে
জীবন মানেই ... ...

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরেথরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়– ফুল নয়, ওরা
শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।

এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রঙ,
যে রঙ লাগে না ভালো চোখে, যে-রঙ সন্ত্রাস আনে
প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল-সন্ধ্যায়–
এখন সে-রঙে ছেয়ে গেছে পথঘাট, সারা দেশ
ঘাতকের অশুভ আস্তানা।
আমি আর আমার মতোই বহু লোক
রাত্রিদিন ভূলুণ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ
কেউবা ভীষণ জেদী, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।

বুঝি তাই উনিশশো ঊনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনও বীরের রক্তে দুখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।

পুলিশ রিপোর্ট

এত উজ্জ্বলতা আমি কখনো দেখিনি।
সবখানে জ্বলজ্বলে ঝোপ; এত উজ্জ্বলতা, চোখ-অন্ধ-করা,
চৈতন্য-ধাঁধানো
উজ্জ্বলতা দেখেননি মুসাও কখনো।
হাতে নিয়ে পাকা লাঠি দেখলাম ওরা, সংখ্যাহীন
জ্বলজ্বলে ঝোপঝাড় এগোয় কেবলি। চতুর্দিকে তরঙ্গিত মাথা,
উত্তাল, উদ্দাম।

সড়কের দুকুল-ছাপানো
লোক, শুধু-লোক।
লোক,
আমাদের চোখের পাতায়
লোক।
লোক,
পাঁজরের প্রতিটি সিঁড়িতে
লোক।
লোক,
ধুকপুকে বুকের স্কোয়ারে

লোক।

হঠাৎ সে কোন তরুণের বুকের গভীর থেকে
কী যেন ফিনকি দিয়ে ছোটে, পড়ে আমার দু'হাতে।
রক্ত এত লাল আর এমন গরম
কখনো জানিনি আগে, ব্যারাকে পৌঁছেই ঘন ঘন
ধুই হাত ঘষে ঘষে,
অথচ মোছে না দাগ কিছুতেই সে তাজা রক্তের।
হোস পাইপের অজস্রতা পারে না মুছতে দাগ,
এ-দাগ ফেলবে মুছে এত পানি ধরে না সমুদ্রে কোনো দিন।

ঘড়িতে গভীর রাত, ব্যারাক নিশ্চুপ। বারান্দায়
করি পায়চারি আর হঠাৎ কখনো কানে ভেসে আসে
সমুদ্রের বিপুল গর্জন;
সুন্দরবনের সব বাঘ যেন আমার ওপর
পড়বে ঝাঁপিয়ে ক্ষমাহীন।

ঘুমোতে পারি না আমি কিছুতেই, ঘুমকে করেছি গুম খুন।
কেমন উৎকট গন্ধ লেগে রয় সকল সময়
আমার দু'হাতে আর সমস্ত শহরে।
সারাটা শহর যদি কেউ দিত ঢেকে
অজস্র সুগন্ধি ফুলে, তবে দুটি হাত গোপনে লুকিয়ে
রাখতাম সুরভিত ফুলের কবরে সর্বদাই।

ফিরে যাচ্ছি

ফিরে যাচ্ছি, ফিরে যাচ্ছি, আমি যেন সুপ্রাচীন গ্রিক,
নীল ত্রিপলের মতো আকাশের নিচে অ্যাম্ফিথিয়েটার
থেকে ফিরে যাচ্ছি পালা দেখে,
ফিরে যাচ্ছি আলো থেকে অন্ধকারে।
কে যেন ডাকছে শুনি; এ আমার মতিভ্রম, কেউ ডাকছে না,
কেউ ডাকবে না।

এখনও তো চোখে
ভাসে অর্ধপশু অর্ধমানবের ক্ষিপ্র পেশি আর কানে আসে
প্রবীণ পুরোহিতের নিবিড় প্রার্থনা।
নগরের পুরুষের কোলাহল আর পুরনারীর বিলাপে

ছায়াচ্ছন্ন পথ-ঘাট, প্রতি চত্বর। নতজানু
যে যেন প্রগাঢ় স্বরে বলে, "হে রাজন,
আমাদের নগরের পরিত্রাণ চাই।"

ওরা তো সদলবলে আসে, জড়ো হয় হাটে-মাঠে,
বস্তি-বন্দরের
আলো-আঁধারিতে,
কখনো জলার ধারে কিংবা গাছতলায় কখনো।
ওরা আসে বেয়াড়া দামাল,
দ্যাখো শ্রেণীস্বার্থের সাধের গণ্ডি ছুঁয়ে
চকিতে কোথায় যেন সোনার হরিণ ছুটে যায়,
চতুর্দিকে মৃত্যুর সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে
দেখেও কেবলি ওরা– যে যাই বলুক–
সোনার হরিণ চায়। আপাতত নৈরাজ্যের সাথে
মিতালী পাতাতে গররাজি।
ওরা তো সদলবলে আসে, ওরা আসে,
পায় ইতিহাসের কর্দমে, কী বিশ্বাসে
পথ চলে অবিরাম, দিগন্তে নিবদ্ধ দৃষ্টি, অথচ জানে না
পদে পদে প্রমাদেরই ফাঁদ।
কখনো বা লাঠি ঘোরে, কখনো নিশান ওড়ে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বাজারে ফুলুরি নিয়ে দরাদির, জিলিপির রসে
বড় সিক্ত, আহ্লাদিত ছেলে বুড়ো যুবকের কষ।
পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ইত্যাদি চলছে
পুরোদমে ইতস্তত প্রতিহারী হেঁকে যায় সুউচ্চ প্রাচীরে
পরিখায় পরিখায় জনশূন্যতায়।
দুটো চোখ উপড়ে নিলেও, হে রাজন,
প্রাক্তন পাপের বোঝা কমবে না একতিলও। কাঁদো
দারুণ রক্তাক্ত চোখে কাঁদো
প্রাকারে দাঁড়িয়ে একা। হবে না প্রতিধ্বনিত তোমার দরবার
সুললিত স্তবে।
পঞ্চমাঙ্ক শেষ, ফিরে যাচ্ছি ...
চৌদিকে শবের ছড়াছড়ি, ফিরে যাচ্ছি ...
ভাঁড়ের কেবলি ভয়, কখন মাড়িয়ে দেয় নায়কের শব,
ফিরে যাচ্ছি–
বিকৃত শবের গন্ধ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি বিবরে আবার

অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে পালা দেখে ফিরে যাচ্ছি আর
জানেন তো বস্তুত পালাটা বিয়োগান্ত ফিরে যাচ্ছি।

মা সন্ধ্যায় বাতি জ্বালেননি বলে,
পিতা দরজার কাছে এসে
উদার অভিজ্ঞ হাত বাড়াননি বলে,
ভাই তার নিপুণ সেতার বাজায়নি বলে
বোন ঘর সাজায়নি বলে
ফিরে যাচ্ছি, ফিরে যাচ্ছি, কেউ ডাকছে না।
কেউ ডাকবে না?

হরতাল
(শহীদ কাদরীকে)

প্রতিটি দরজা কাউন্টার কনুইবিহীন আজ। পা মাড়ানো,
লাইনে দাঁড়ানো নেই, ঠেলাঠেলিহীন;
মুদ্রার রুপালি পরী নগ্ন নৃত্যপরা শিকের আড়ালে
অথবা নোটের তোড়া গাংচিলের চাঞ্চল্যে অধীর
ছোঁয় না দেরাজ। পথঘাটে
তাল তাল মাংসের উষ্ণতা
সমাধিস্থ কর্পূরের বেবাক।
মায়ের স্তনের নিচে ঘুমন্ত শিশুর মতো এ শহর অথবা রঁদার
ভাবুকের মতো;
দশটি বাঙ্ময় পঙ্‌ক্তি রচনার পর একাদশ পঙ্‌ক্তি নির্মাণের আগে
কবির মানসে জমে যে-স্তব্ধতা, অন্ধ, ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্র
থাবা থেকে গা বাঁচিয়ে বুকে
আয়াতের নক্ষত্র জ্বালিয়ে
পাথরে কণ্টকাবৃত পথ বেয়ে ঊর্ণাজাল-ছাওয়া
লুকানো গুহার দিকে যাত্রাকালে মোহাম্মদ যে-স্তব্ধতা আস্তিনের ভাঁজে
একদা নিয়েছিলেন ভরে
সে স্তব্ধতা বুঝি
নেমেছে এখানে।

রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়, স্তব্ধতা সঙ্গিন হয়ে বুকে
গেঁথে যায়; একটি কি দুটি

লোক ইতস্তত
প্রফুল্ল বাতাসে ওড়া কাগজের মতো ভাসমান।

সবখানে গ্যাসোলিন পাইপ বিশুষ্ক, মানে ভীষণ অলস,
হঠাৎ চমক লাগে মধ্যপথে নিজেরই নিঃশ্বাস শুনে আর
কোথাও অদূরে
ফুল পাপড়ি মেলে পরিস্ফুট শব্দ শুনি;
এঞ্জিনের গহন আড়াল থেকে বহুদিন পর
বহুদিন পর
অজস্র পাখির ডাক ছাড়া পেল যেন।
সুকণ্ঠ নিবিড় পাখি আজও
এ শহরে আছে কখনো জানিনি আগে।
ট্যুরিস্ট দু'চোখ
বেড়ায় সবুজে :
সমাহিত মাঠে
ছেলেদের ছায়ারা খেলছে এক গভীর ছায়ায়।
কলকারখানায়
তেজী ঘোড়াগুলো
পাথুরে ভীষণ;
ন্যাশনাল ব্যাংকের জানালা থেকে সরু
পাইপের মতো গলা বাড়িয়ে সারস এ স্তব্ধতাকে খায়।

শহর ঢাকার পথ ফাঁকা পেয়ে কত কী-যে বানালাম হেঁটে যেতে-যেতে
বানালাম ইচ্ছেমতো : আঙুলের ডগায় হঠাৎ
একটি সোনালি মাছ উঠল লাফিয়ে,
বড় হতে হতে
গেল উড়ে দূরে
কোমল উদ্যানে
ভিন্ন অবয়ব
খুঁজে নিতে অজস্র ফুলের বুদোয়ারে।

হেঁটে যেতে যেতে
বিজ্ঞাপন এই সাইনবোর্ডগুলো মুছে ফেলে
সেখানে আমার প্রিয় কবিতাবলির
উজ্জ্বল লাইন বসালাম;
প্রতিটি পথের মোড়ে পিকাসো মাতিস আর ক্যান্ডিনিস্কি দিলাম ঝুলিয়ে।

চৌরাস্তার চওড়া কপাল,
এভেন্যুর গলি, ঘোলাটে গলির কটি,
হরবোলা বাজারের গলা
পাষাণপুরীর রাজকন্যাটির মতো
নিরুপম সৌন্দর্যে নিথর।

স্তূপীকৃত জঞ্জালে নিষ্ক্রিয় রোদ বিড়ালছানা মৃদু
থাবা দিয়ে কাড়ে
রোদের আদর।
জীবিকা বেবাক ভুলে কাঁচা প্রহরেই
ঘুমায় গাছতলায়, ঠেলাগাড়ির ছায়ায় কিংবা
উদাস আড়তে,
ট্রলির ওপরে
নিস্তরঙ্গ বাসের গহ্বরে,
নৈঃশব্দের মসৃণ জাজিমে।
বস্তুত এখন
কেমন সবুজ হয়ে ডুবে আছে ক্রিয়াপদগুলি
গভীর জলের নিচে কাছিমের মতো শৈবালের সাজঘরে।

চকিতে বদলে গেছে আজ,
আপাদমস্তক
ভীষণ বদলে গেছে শহর আমার!

আমরা প্রার্থী তারই

তোমার আমার কাঙ্ক্ষিত ভোর
আসার আগেই স্বপ্ন-বিভোর
তোমাকে হানল ওরা।

একদা তুমিও চৈত্র দুপুরে
টলটলে সেই পুরোনো পুকুরে
ফেলেছ চিকন ছিপ।

আম্রছায়ায় কালো দিঘিটায়
এক হাটু জলে দাঁড়িয়েছ ঠায়
শাপলা তুলবে বলে।

সর্ষে ক্ষেতের হলদে হাওয়ায়
কী জানি সে কোন গভীর চাওয়ায়
হাত দুটি দিতে মিলে।

ঝোপের কিনারে কখনো হঠাৎ
গুলতিটা পেলে বাড়িয়েছ হাত
প্রজাপতিটার দিকে।

সেই কবে তুমি শিরীষের মূলে
আহত পাখিকে নিয়েছিলে তুলে
উদার ব্যগ্র বুকে।

যে-সাড়া তরুণ ঘাসের ডগায়
জ্যোৎস্না-ডোবানো স্বপ্ন জোগায়
তা-ও পেয়েছিলে তুমি।
বলেছিলে, তুমি, যে-কথা কখনো
বাজে না হৃদয়ে গান হয়ে কোনো
সে-কথা ব্যর্থ, ম্লান।

বলেছিলে আরও, যে-জীবন কারো
প্রাণকে করে না আলোয় প্রগাঢ়,
সে-জীবন নিষ্ফল।

বুঝি তাই প্রেমে বড় উৎসুক
তুলে ধরেছিলে স্বদেশের মুখ
নিবিড় অঞ্জলিতে!

খোলা রাস্তায় মিছিলে মিছিলে
চকিতে প্রহরে ছড়িয়ে কী দিলে?
চৌদিক থরথর।

তোমার আমার কাঙ্ক্ষিত ভোর
আসার আগেই স্বপ্ন-বিভোর
তোমাকে হানল ওরা।

এই আলো আরো পবিত্র হবে
তোমার রক্ত-রাঙা বৈভবে,—
বলল ব্যাকুল পাখি।

যে-আলো তোমার চোখে নেচেছিল,
যে-আলো তোমার বুকে বেঁচেছিল
আমরা প্রার্থী তারই।

আসাদের শার্ট

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।

বোন তার ভায়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায়;
বর্ষিয়সী জননী সে-শার্ট
উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন স্নেহের বিন্যাসে।

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চূড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে-কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

ঐকান্তিক শ্রেণীহীনা

এ রৌদ্রে কেমন করে দাঁড়াও অটল? দেখলাম, অতীতের
মুখের ওপর ঝাঁপ বন্ধ করে কেমন সহজে
এলে তুমি সাম্প্রতিক সদর রাস্তায়।
বেণী-নামা পিঠে জমে ঘামের শিশির,

আঁচলে প্রবল হাওয়া, উচ্ছ্বসিত হ্রদের মতন
তোমার রুপালি স্বরে করে ঝলমল নানা মনীষীর পাতা।
সামান্যে শিল্পিত বেশ, চলায় বলায় সর্বক্ষণ
রুচির মোহন ছোঁওয়া। কখনো চকিতে মঞ্চে ওঠো জ্বলজ্বলে
পদক্ষেপে, শিরদাঁড়া ঋজু থরো থরো
ফ্ল্যাগ বয়ে নিয়ে যাও পল্টনের মাঠে, কখনো-বা
এভেন্যুর মোড়ে। কলেজের
সংস্কৃত প্রাঙ্গণ, বস্তি, পথঘাট অলংকৃত তোমারই ছায়ায়।

সামাজিক বিকারের কুকুরগুলোকে কোন রাঙা
মাংস দিয়ে রাখো শান্ত করে?
কী করে প্রখর দীপ জ্বালছ মশালে,
এ বিস্ময় ঠোকরায় এখনও আমাকে।

দেখছি তোমাকে আমি বহুদিন থেকে, দেখছি এখনও তুমি
বিকেলের বারান্দায় ব'সে
প্রবীণা মায়ের চুলে চালাও চিরুনি স্মৃতি জাগৃতির লগ্নে
পুরানো গায়ের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে, কখনো-বা
ভায়ের শার্টের গর্ত ভরে তোলো শৈল্পিক নিষ্ঠায়,
কখনো পিতার সঙ্গে তর্কে মাতো এ-যুগের মতিগতি নিয়ে,
কখনো তুমুল ভাসো গণউত্থানের গমগমে তরঙ্গমালায়।

ব্যক্তিগত প্রেম আছে তোমারও গহনে
যে-প্রেম তোমাকে নিয়ে যায় তীব্র আকর্ষণে বহু জীবনের
কল্লোলিত মোহনায়। বুঝি তাই ঊর্মিল আবেগে
ছুটে যাও ভাসমান গ্রামে কি শহরে। ভদ্রয়ানা
আড়ালে রেখেই হও এককাট্টা শোকের শরিক।
কখনো রিলিফ ক্যাম্পে ভাবো চুপচাপ, উন্নয়ন
সুনীল কাগজে আসে আলাদা আদলে। কখনো-বা
নিজের গভীরে দাও ডুব, ভাবো ব'সে তারই কথা,
যে আনে প্রাণের টানে স্বপ্নের উদ্দাম
ভাগীরথী কারখানায় এবং খামারে।

শুধুই আবেগ নয় বুদ্ধির শাণিত রৌদ্র করে ঝলমল
অস্তিত্বে তোমার আর প্রচুর গ্রন্থের পাকা রঙ
লাগে মনে, মননে সমৃদ্ধ তুমি ঐকান্তিক শ্রেণীহীনা;
সর্বোপরি বাস্তবের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে

পেয়েছ বাঁচার সূত্র কর্ম আর ধ্যানে।

প্রথার কৃপণ মাপে সুন্দরী যে-জন
তুমি সে কখনো নও, অথচ তোমারও
নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, যে-সৌন্দর্য ঝড়ের ঝাপটায়
সুতন্বী গাছের সাহসের,
যে-সৌন্দর্য মানবিক বোধের, প্রেমের, জীবনের।

বিকল্প ঘার

'কেটে পড়ো, কেটে পড়ো মঞ্চ থেকে', সেই জমজমাট প্রহরে,
ঝলমলে হলঘরে তীক্ষ্ণ সমস্বরে
শ্রোতারা জানান দাবী। ভাবি, তবে কী করি এখন উলুবনে?
এখুনি পড়ব কেটে সিটি আর বেড়ালের ডাক শুনে? না কি শান্ত মনে
যাব বলে অকম্পিত কণ্ঠস্বরে যা আছে বলার একে একে।
শব্দেরা কাগজ থেকে রঙিন পাখির মতো যায় উড়ে শ্রোতারা থাকেন বেঁকে।

দিয়েছি বিকল্প ঘর, যেখানে বিপুল স্তব্ধতার
স্তন্য পান করে শব্দে বেড়ে ওঠে লীলায়িত স্বাস্থ্যে,
যেখানে দেখাতে পারি কাঁটা-ঝোপ, লতা-পাতা ফুলের বাহার
এবং দেখাতে পারি ল্যাম্পপোস্টে খুব আস্তে আস্তে
খাচ্ছে দোল দেবদূত, অ্যাসেম্বলী হলের মসৃণ ছাদ থেকে
মনোরম বুররাখ যাচ্ছে উড়ে দুলিয়ে যুগল
পাখার এরেড্রোম ছুঁয়ে, খুরে নক্ষত্রের রেণু মেখে

সে ঘরের চতুষ্কোণ দৃশ্যতই সুদূর মুঘল
কক্ষ হয়ে যায়, হয়ে যায় এমনকি পাতালের
জল-ধোয়া অমল প্রাসাদ কিংবা ক্যান্ডিনিস্কি দৃশ্য–
বিমূর্ত গীতল বর্ণে লুকোনো ঘরের ছাদ আর চাতালের
শূন্যতা অথবা প্রাণী, গাছপালা। বস্তুত সীমাহীন সে-ঘরের বিশ্ব।

'কেটে পড়ো, কেটে পড়ো মঞ্চ থেকে। যা বলছ তার ল্যাজা-মুড়ো
বুঝি না কিছুই'– একজন বললেন হেঁকে নাড়িয়ে শিঙের দুটো চূড়ো,
সঙ্গিনের মতো হাত সিলিং-এর দিকে ভীষণ উঁচিয়ে।
'ওসব শোনা ধৈর্য আমাদের নেই। কেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
মিছে হয়রান করো আমাদের? ফুর্তির ফানুস চাই, চপচপে

কথা আর গান চাই। তোমার ওসব ছাইপাশ জ'পে জ'পে
ক্ষেতে বাড়বে না শস্য', বলে তাঁরা চকিতে দিলেন ছুড়ে কিছু
নষ্ট ডিম, তুলতুলে টমাটো এবং আমি মাথা করে নিচু
মঞ্চে কোণঠাসা হয়ে ভাবি সে আগন্তুকের কথা, দৃষ্টি যার
প্রত্যূষের মতো আর শ্রুতি প্রতীক পরম সূক্ষ্মতার।

অথচ আজও সে অবয়বহীন, মধু-যামিনীতে
অথবা অমাবস্যায় আসে না শব্দের স্বাদ নিতে।
তবু তাকে লক্ষ্য করে শ্বেত কাগজের শব্দমালা দুলে ওঠে
এবং সবেগে ধায়, যেমন বরফজমা তরঙ্গিনী ছোটে
অকস্মাৎ সূর্যের উদার বুকে লীন হতে। আসে যদি, আগন্তুকটিকে
বসিয়ে বিকল্প ঘরে আমি যাব হরিদ্রাভ বয়সের দিকে।

গ্রন্থে আছেন শহীদুল্লাহ্

গ্রন্থাবলি প'ড়ে আছে, লেখার টেবিলে চশমা, কালো টুপিটায়
জমছে মসৃণ ধুলো এবং জায়নামাজ, পুণ্য স্মৃতিময়,
নিবিড় গোটানো একপাশে। প্রাতরাশ ঠাণ্ডা হচ্ছে বলে কেউ
ডাকবে না ঘন ঘন। প্রত্যহ বাড়বে বেলা, মধ্যরাতে একে একে বাতি
নিভবে প্রতিটি ঘরে। কদিমী চেয়ার ছেড়ে গ্রন্থাগার থেকে
বেরিয়ে আপনি আর সিঁড়ি বেয়ে যাবেন না একা
দোতলায়, মগজের নন্দিত নিকুঞ্জ
আধ্যাত্মিক পাখির অমর্ত্য গানে গুঞ্জরিত হবে না কখনো।

দুশ্চরিত্র সময়ের কাছে আপনাকে নতজানু হতে কেউ
দ্যাখেনি কখনো, আপনার আচকানে পেয়েছে সক্ষম পাখা
নিষ্কলুষ নীলিমায়। হে বিদ্যা, হে প্রজ্ঞা, মনীষার মন্বন্তরে
ছিলেন বিপুল অন্নসত্র, যে যেমন খুশি নিয়েছে অঞ্জলি
পেতে বারবার।
এখন আছেন গ্রন্থে, বাংলার স্মৃতিতে, জ্বলজ্বলে দরোজায়।
সেই কবেকার অপরূপ শৈশবকে কোন জাদুবলে চির-
প্রতিবেশী করে রেখেছিলেন মায়াবী কুঠুরিতে,
ভেবেছি বিস্ময়ে কতদিন। অন্বেষণে
আলোকিত শতঝুরি একটি বৃক্ষের কাছে চেয়েছেন পৌঁছুতে সর্বদা।

সোনালি মাছের মতো উঠত লাফিয়ে

আপনার প্রবীণ চোখের নিচে নিত্য অভিধানের শব্দেরা
বারবার, সস্নেহে দিতেন ঠাঁই একান্ত মানস-
সরোবরে। পাণিনীয় সূত্রের মায়ায় হেঁটেছেন গহন জটিল পথে
দীর্ঘকাল প্রশ্নাতুর। বাংলা ব্যাকরণ রাজনর্তকীর মতো
মদির কটাক্ষ মেলে আপনাকে ডেকে নিয়ে গেছে
অন্তঃপুরে, সহবাসে বিনোদের ধ্বনি অতঃপর
সামাজিকতায় বেজে ওঠে ঘরে ঘরে।
অন্ধকারে যাব না কখনো, অন্ধকার
আমাকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করে, করতেন উচ্চারণ মনে মনে
হয়তোবা; আপনাকে আলোর প্রেমিক
জেনেছি সর্বদা। অন্ধকারে যাবেন না, যাবেন না কোনো দিন
আমরাও বলেছি ব্যাকুল
অথচ পেছনে সীমাহীন অন্ধকার ফেলে, শুধু
কতিপয় গ্রন্থ হয়ে উদাস গেলেন চলে অন্য অন্ধকারে।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি

একদা কবিতা তার বুক নগ্ন করেছিল আপনার চোখের সম্মুখে,
আপনি সে নগ্নতায় দেখেছেন নিজেরই মনের সূর্যোদয়।
একদা কবিতা তার স্তনের গোলাপ কুঁড়ি চেয়েছিল দিতে,
আপনি সে গোলাপের উজ্জ্বলতা ছেড়ে
কালবোশেখীর ঝড়ে চকিতে গেলেন ছুটে বাগ্মিতা নামের
দজ্জাল মেয়ের কাছে, যার ক্ষিপ্ত তুমুল নর্তনে স্বপ্নগুলি
পড়ল ছড়িয়ে ভাঙা ঘুঙুরের মতো।

কতদিন হারমোনিয়ামের রিডে নিপুণ আঙুল
তন্ময় নাচেনি আর কতদিন কামিনীর ঠোঁটে
আঁকেননি প্রগাঢ় চুম্বন।
এখন আপনি সেই যাত্রী আত্মভোলা, হঠাৎ যে নেমে পড়ে
ভুল ইস্টিশানে অবেলায়।
তবু আপনার মতো কারুকেই চাই, চাই আজও নজরুল ইসলাম।

সুপ্রভার তরঙ্গিত সুরের মতোই
হাওয়া ছুঁয়ে যায়
অস্তিত্বের তট,
এবং পবিত্র গাঙ্গুলীর দুটি অক্ষিগোলকের প্রসন্ন রশ্মির মতো

দিবালোক আসে,
প্রমীলার হাসির মতোই জ্যোৎস্না ঝরে আপনার
বুকের নির্জন মরু এবং পায়ের অন্তরীপে।
তবুও বুকের মধ্যে কথা
নৈঃশব্দের গভীর মোড়ক-ছেঁড়ে কথা
হয় না এখন উচ্ছ্বসিত।
আপনার মগজের কোষে কোষে মৃত প্রতিধ্বনি কবিতায়?

কোন পুলিনের খুব স্মৃতির বকুল গাছকে
অনেক পেছনে ফেলে ছায়াচ্ছন্ন বারান্দায় শুধায় ফেরারি বুলবুল :
কেমন আছেন নজরুল ইসলাম?
কাবেরী নদীর জল, পদ্মার উত্তাল ঢেউ প্রশ্ন করে আজ :
কেমন আছেন নজরুল ইসলাম?
বাদুড় বাগান লেন এবং মন্মথ দত্ত রোড
বেলগাছিয়ার
প্রতিটি সকাল আর প্রতিটি সন্ধ্যায় করে প্রশ্ন :
কেমন আছেন নজরুল ইসলাম?
সারা বাংলাদেশের ব্যাকুল কণ্ঠে সেই একই প্রশ্ন :
কেমন আছেন নজরুল ইসলাম?

কবিয়াল রমেশ শীল

কিন্নর কণ্ঠের খ্যাতি ছিল না তোমার, কোনো দিন
জলকিন্নরীর ধ্যানে, ঈশ্বরের বিফল সন্ধানে
কাটেনি তোমার বেলা। কুলীন ড্রইংরুমে কিংবা ফিটফাট রেস্তোরাঁয়
হওনি কখনো তর্কপরায়ণ সাহিত্যের শৌখিন আড্ডায়।
ছিল না তোমার মন জমকালো শিল্পের মহলে, আলোকিত
প্রভাতবেলায় তুমি যে-শিল্পের পেয়েছিলে দেখা
ভীষণ তামাটে তার গ্রীবা রৌদ্রের সুতীব্র আঁচে।

স্বদেশকে প্রিয়ার একান্ত নাম ধরে ডেকে ডেকে
অগ্নিবলয়ের মধ্যে গড়েছিলে প্রেমের প্রতিমা
নিজে পুড়ে পুড়ে।
তোমার প্রেমার্ত স্বর পঞ্চান্ন হাজার
একশো ছাব্বিশ বর্গমাইলে আনাচে-কানাচে
পৌঁছে গেছে। বাউলের গেরুয়া বস্ত্রের মতো মাটি, মাছ আর আকাশের কাছে

নদীর বাঁকের কাছে, মজুরের ক্ষিপ্র, পেশি অত্যাচারী শাসক-দপুরে
কৃষকের হাল-ধরা মুঠোর কাছেই তুমি শিখেছিলে ভাষা।

বস্তুত এখানে বড় বেশি আমরা সবাই যাত্রা ভালবাসি,
এমনকি নিজেরাই 'অধিকারী পার্ট দাও' বলে
সমস্বরে ভীষণ চেঁচাই,
সহাস্য বাড়াই মুখ রঙচঙে মুখোশ পরার লোভে আর নিজেদের
কাপ্তান কাপ্তান লাগে কিনা দেখে নিই আড়চোখে
বিকৃত আয়নায়, ঘাড়ে মুখে আলতো বুলিয়ে নিয়ে পাউডার
পরস্পর খুব করি খুনসুটি। ইদানীং আমরা সবাই
অন্ধ, মূক আর বধিরের পার্ট ভালবাসি। অথচ তোমার
ভূমিকা সর্বদা ছিল ভিন্নতর। অন্ধকারে থেকে, মনে পড়ে,
দেখতাম রুদ্ধবাক প্রধান যাত্রার তুমি রাজপুত্র, নিঃশঙ্ক, সুকান্ত,
সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিতা সত্যকে
অক্লেশে জাগাতে চাও, অভিশপ্ত রাজ্যের উদ্ধারে
কোষমুক্ত করো তরবারি। তুমি পাষাণপুরীর
প্রতিটি মূর্তির স্তব্ধতায় চেয়েছিলে ছিটোতে রুপালি জল।

চোখ বুজলেই দেখি, হু-হু মাঠে, কুটিরে, খোলার ঘরে, দুঃখ-ছাওয়া শেডে,
সুস্থির দাঁড়িয়ে আছ সুদিনের কর্মিষ্ঠ নকিব।

ইচ্ছা

যদি বাঁচি চার দশকের বেশি
লিখব।
যদি বাঁচি দুই দশকের কম
লিখব।
যদি বেঁচে যাই একটি দশক
লিখব।
যদি বেঁচে যাই দু'চার বছর
লিখব।
যদি বেঁচে যাই একমাস কাল
লিখব।
যদি বেঁচে যাই একদিন আরও
লিখব।

কী যুগে আমরা করি বাস

কী যুগে আমরা করি বাস। প্রাণ খুলে কথা বলা
মহাপাপ; যদি চেয়ার টেবিল কিংবা দরজার কানে গলা
খাটো করে বলি কোনো কথা, তবে তারাও হঠাৎ
যেন ব'নে যাবে বড় ঝানু গুপ্তচর। এমনকি গাছপালা,
টিলা, নদীনালা
কারুকে বিশ্বাস নেই বাস্তবিক। আমাদের এমনই বরাত।

কী যুগে করি আমরা বাস। এখন প্রতিটি ঘরে
মিথ্যা দিব্যি পা তুলে রয়েছে ব'সে; প্রহরে প্রহরে
পালটাচ্ছে জামা জুতো। সারাক্ষণ খাটছে হুকুম
তারই ক্ষিপ্র ব্যস্ততায় পাড়ার মোড়ল, মজলুম।
মহানুভবতা, প্রীতি ঔদার্য বিবেক সবই নিয়েছে বিদায়
ছেলে-বুড়ো ঘুমোনো পাড়ার থেকে করুণ দ্বিধায়।

কী যুগে আমরা করি বাস। কোনো বসন্তের রাতে
যখন ঘনিষ্ঠ যাই পার্কে দুই, অসংখ্য হা-ভাতে
ভিড় করে আসে চারপাশে। আমাদের চুমোর ওপর
পড়ে দুর্ভিক্ষের ছায়া। মহামারী দিগ্বিদিক মাথায় টোপর
প'রে ঘোরে সর্বক্ষণ। আমাদের সন্তানের দোলনা দুলছে মৃদু ছন্দে
অসংখ্য লাশের ঘুম-তাড়ানিয়া উৎকট দুর্গন্ধে।

কোন দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হ'য়ে আছে?

কোন দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হয়ে আছে
এখনও আমার মনে? দেখেছি তো গাছে
সোনালি-বুকের পাখি, পুকুরের জলে
সাদা হাঁস। দেখেছি পার্কের ঝলমলে
রোদ্দুরে শিশুর ছুটোছুটি কিংবা কোনো।
যুগলের ব'সে থাকা আঁধারে কখনো।

দেশে কি বিদেশে ঢের প্রাকৃতিক শোভা
বুলিয়েছে প্রীত আভা মনে, কখনো-বা
চিত্রকরদের সৃষ্টির সান্নিধ্যে খুব
হয়েছি সমৃদ্ধ আর নিঃসঙ্গতায় ডুব

দিয়ে করি প্রশ্ন : এখনও আমার কাছে
কোন দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হয়ে আছে?

যেদিন গেলেন পিতা, দেখলাম মাকে–
জননী আমার নির্দ্বিধায় শান্ত তাঁকে
নিলেন প্রবল টেনে বুকে, রাখলেন
মুখে মুখ; যেন প্রিয় বলে ডাকবেন
বাসরের স্বরে। এখনও আমার কাছে
সেই দৃশ্য সবচেয়ে গাঢ় হয়ে আছে।

তার আগে

কখনো আকাশ কখনো-বা দূরবর্তী গাছপালা,
কখনো গলির মোড়, কোনো আত্মীয়ের মৃত মুখ
ল্যাম্পোস্টের ঝাপসা আলো কুয়াশায়, মর্চে-পড়া তালা
কিংবা মেথরনীর নিতম্ব কখনো যৎসামান্য ভুলচুক
অথবা সংঙ্গিনাকীর্ণ রাত মানসে ঝরায় কত
কবিতার ফোঁটা। তার আগে ট্রেন চলে যায় দ্রুত ছিন্নভিন্ন করে
আমার শরীরে, চোখে ওঠে লাল পিঁপড়ে অবিরত
ঝাঁক ঝাঁক, হৃৎপিণ্ড বিক্ষত হয় পাখির ঠোকরে।

যিনি নম্বর ভালবাসতেন

"নম্বরে জীবন ছাওয়া। সেই কবে ইশকুলের রোল নম্বরের
স্মৃতি নিয়ে বেরিয়েছি পথে,
তারপর থেকে ঝাঁক ঝাঁক
নম্বরের দাবি-দাওয়া মেটাতেই জীবনের প্লেন
ফুরিয়ে ফেলেছে পেট্রোলিয়াম বেবাক। কয়েকটি
পলিসি নম্বর আর বাড়ির নম্বর আর গাড়ির নম্বর,
ব্যাংকের খাতার প্রিয় নম্বর ইত্যাদি
কেবলি করেছি জড়ো, অথচ নম্বর
নিকট এসেছে যত মানুষ ততই দূরে গেছে চলে। তবে
আমি নিজেই কি শুধু কতিপয় নম্বরের সমাহার কোনো?
শিখেছি অনেক ঠেকে বহু ঘোল খেয়ে

নম্বরের নেই শ্রুতি, নেই আলাপের কোনো সাধ।”
–বলে তিনি ব্রিফকেস নেড়ে-চেড়ে বসলেন গার্হস্থ্য মোটরে।

গাড়ি তাঁর হুট করে চলে গেল, বাড়ির সুরম্য দরজায়
অভ্যস্ত রীতিতে নেমে দেখেন কাগজ কতিপয়
হাওয়ায় উড়ছে আর ক'জন বালক
পাখির ঝাঁকের মতো একরাশ কাগজের পেছনে-পেছনে
ছুটেছে হুল্লোড় করে। মনে হ'ল তাঁর,
কাগজের ঝাঁক যেন একতাড়া নোট ফুরফুরে
আর তিনি নিজে হৈ-হৈ ছেলেদের সঙ্গে ছুটছেন
উড়ো কাগজের ঠিক পেছনে-পেছনে শৈশবের দিকে ব্যগ্র মুখ রেখে।

“দাড়ি কামানোর পর গালে কিংবা কোমল চিবুকে
যেসব খুচরো কাটা দাগ লেগে থাকে,
তাদের কেমন যেন অন্তরঙ্গ লাগে, বড় ব্যক্তিগত”– বলে তিনি
জরুরি ফাইল কিছু রাখলেন গোপন দেরাজে।
চিরচেনা বাগানের দেশী কি বিদেশী ফুল দেখে,
সতেজ ফুলেরা যেন– ভাবলেন তিনি– চকচকে টাকাকড়ি।

হঠাৎ রক্তের চাপ বাড়ে, বুকে ট্যাক্সির ঝাঁকুনি
আপিসের বন্ধ ঘর, ব্রিফকেস, চেক বই, হৈ-হৈ বালকেরা
বাড়ির ঘোরানো সিঁড়ি, লিফট-এর স্তিমিত আলো, গোপন দেরাজে,
ব্রিফকেস, চেক বই, প্রসন্ন নোটের তাড়া, জরুরি ফাইল,
লিফট্-এর স্তিমিত আলো, হৈ-হৈ বালকেরা, ব্রিফকেস,
পলিসি নম্বর,
গৃহিণীর পলায়নপত্র যৌবনের অস্তরাগ, চেক বই, আপিসের,
বন্ধ ঘর, টাইপিস্ট মেয়েটির লো-কাট ব্লাউজ, বালকেরা,
ব্রিফকেস, অস্তরাগ, লিফট্-এর স্তিমিত আলো, লো-কাট ব্লাউজ,
পলিসি নম্বর,
ব্রিফকেস, চেক বই, প্রসন্ন নোটের তাড়া, চেক বই, চেক বই, চেক...
বাগানের স্তব্ধতায় পতনের শব্দ আর নিঃশব্দ ভীষণ
বুকের একান্ত ঘড়ি, শূন্য হাত, ঘাসে আধপোড়া সিগারেট,
অদূরে নিশ্চুপ ঝারি।
ওপরে অনেক তারা, একান্ত সেকেলে আশরফি।

একটি বালকের জন্যে প্রার্থনা

ভীষণ বুড়িয়ে গেছি ইদানীং আমরা সবাই,
বেশ জবুথবু লাগে নিজেদের বেলা-অবেলায়।

আমরা সবাই বুড়ো। কেউ পঙ্গু বাতে, শয্যা কারো
মালিশের গন্ধে ভরা। পক্ষাঘাতগ্রস্ত কেউ আর
আদিম গুহার মতো দন্তহীন মুখ খুলে কেউ
বিড়বিড় বকে সারাক্ষণ–বকুনির আগাগোড়া
বাপের আরবি ঘোড়া দাদার ইরানি তাঞ্জামের
ঝিলিমিলি জুড়ে রয়। বারান্দার দাঁড়বন্দি তোতা
সেই বকবকানির ধৈর্যশীল শ্রোতা। তার কী-বা
দায়, ঝুঁটি নাড়ে, ছোলা খুঁটে খায়, বহুবার শোনা
কাহিনীর করে কথকতা। বুকে টুকটুকে ঠোঁট
গুঁজে রাখা, ঘুম পেলে। নিজেদের মতো হতে চেয়ে

ক্রমান্বয়ে শুধু অন্য কারুর মতোই হয়ে যাই
নিজেরই পার্টের বদলে ভুল পার্ট আওড়াতে
আওড়াতে ক্লান্ত হই। যতই ভুগি না কেন বাতে,
রক্তচাপে, রক্তে রক্তে শর্করার প্রকোপ যতই

যাক বেড়ে, জীবনকে প্রতিদিন মনে হয় তবু
হাড়হিম শীতে সুশোভন পশমের কম্ফর্টার
গলায় জড়ানো, তাই সকালে বিকালে প্রকৃতির
খোলামেলা দরবারে আয়ুর মেয়াদ বাড়ানোর
ব্যাকুল তদ্বির নিয়ে যাই। ভদ্রয়ানা মজ্জাগত
এবং প্রজ্ঞার ভারে দু'হাঁটুতে ঠেকে সাদা মাথা,
অথচ চৌদিকে কী-যে ঘটে দিনরাত কিছুতেই
ঢোকে না মাথায়। অভ্যাসের দাস বলে প্রতিদিন
সংবাদপত্রের ভাঁজ খুলি আর চোখের অত্যন্ত
কাছে নিয়ে হেড লাইনের মায়ায় বেবাক ভুলি!

লাঠি যেন প্রাণাধিক পুত্র, তাই কম্পমান হাত
কেবলি তাকেই খোঁজে। পাড়ায় হাঙ্গামা বাধলেও
তেমন পাই না টের, আজকাল শ্রুতির প্রাখর্য
বলতে কিছুই নেই। বরং কালাই বলা চলে,
বদ্ধ কালা! হামেশাই খুব পুরু কাচের চশমা
পরি, তবু লোকজন, ঘড়বাড়ি, পাড়া কি বেপাড়া,

অলিগলি, গাছপালা স্পষ্ট আর দেখি না কিছুই।

আমরা সবাই বুড়ো, দৃষ্টির স্বচ্ছতা নেই কারো।
আমরা সবাই আজ একটি বালক চাই যার
খোলা চোখে রাজপথে নিমেষেই পড়বে ধরা ঠিক
সেই রাজসিক মিহি কাপড়ের বিখ্যাত ছলনা।

ঋণী

পুরোনো ঢাকার নেড়ি গলি ছেড়ে আজিমপুরের
তেতলার ফ্ল্যাটে যাই বস্তুত আড্ডার লোভে, খানিক হাঁপাই।
ক্লান্তির কফিন ঢাকা শরীর এলিয়ে কৌচে নিঃশব্দে দূরের
আকাশে বুলাই চোখ এবং বৈশাখী গরমেও স্বস্তি পাই
বন্ধুর সুহাস মুখে; উপরন্তু ভাগ্যবলে ফাহ্‌মিদা এখানে অতিথি
আজ রাতে। আমাদের প্রহর সমৃদ্ধ হবে, রাবীন্দ্রিক সুরে
নানান বিন্যাসে অবিরাম দুলবে সত্তার মৌন ঝাউবীথি,
জাগবে আনন্দলোক তেতলার ফ্ল্যাটে সরকারি আজিমপুরে।

ফাহ্‌মিদা সুর ভীজে– এ-ও এক বৃষ্টি অপরূপ,
অস্তিত্ব ডুবিয়ে নামে। গীতবিতানের কিছু নিভৃত নিশ্চুপ
পাতা ওড়ে অলৌকিক কলরবে, গাংচিলের মতো ওড়ে, ঘোরে সারা ঘরে
প্রাণের ঊর্মিল জল ছুঁয়ে যায় কতো ছলভরে।
ফাহ্‌মিদা কণ্ঠে সুর তুললেই ঘরে রৌদ্র ওঠে, মেঘে মেঘে
বাজে বাঁশি, ভাসে ভেলা, শ্রাবণের ধারা ঝরে, গাছ হয়; হাট-
ফেরা লোক মিলায় সোনার মেঘে এবং চোখের দ্বারে ধ্যানের আবেগে
নদীর সুদূর পাড়ে যায় দেখা ঘাট।
কখন যে রাত্রি বাড়ে আলো-আঁধারিতে তেতলায়,
কিছুই পাই না টের সুরে ভেসে, ফ্ল্যাটে ফাহ্‌মিদার গলায়
আমার সোনার বাংলা ঝলমল করে ওঠে। ঋণী তারই কাছে
আজীবন, কণ্ঠে যার বারবার রবীন্দ্রনাথের গান বাঁচে।

কোনো কোনো কবিতার শিরোনাম

ডিমের খোলের অন্তস্থলে যেতে ভারি ইচ্ছে হয়।
সেখানে প্রস্থান করি যদি,

কেউ জানবে না,
কখনো আমার কোনো ক্রিয়ার খবর পৌঁছুবে না
কারুর কাছেই।
সেখানে একান্তে বসবাস করবার প্রিয় সাধ
কেবলি লতিয়ে ওঠে হলহল করে
বিভিন্ন প্রহরে।
ফিরিয়ে উদ্বেগ-বিদ্ধ মুখ অত্যাচারী শব্দ থেকে
কুমারী নীরবতার বুক দেখে নেব নাচিকেত চৈতন্যে চকিতে।

ভাঙব না নৈঃশব্দের ধ্যান। করব এমন কাজ, যখন যেমন খুশি,
যা' লংঘন করে না কখনো
শব্দহীনতার সীমা– যেমন জামার
আস্তিন গোটানো কিংবা চেয়ে থাকা অপলক, অথবা জুতোর
ফিতেটাকে ফুল সযত্নে বানিয়ে তোলা,
স্মৃতির নিকুঞ্জে
কোনো মনোহর শশকের প্রত্যাশায় ব'সে থাকা।

মধ্যে-মধ্যে নীরব থাকতে ভালো লাগে; নীরবতা
ফুল্ল উরু মেলে দিলে, মুখ রাখি তার নাভিমূলে।
তখন শব্দের ডাকাডাকি অত্যন্ত বিরক্তিকর,
এমনকি কবিতা লেখাও
ক্লান্ত বারবনিতার সঙ্গে সঙ্গমের মতো ঠেকে,
বুঝি তাই কোনো কোনো কবিতার শিরোনাম লেখার সময়
বড় লজ্জাবোধ হয়।

কোনো রমণীর জন্যে সারারাত ঘুমোতে পারি না,
সৌরভের মদে চুর দূরে বোহেমিয়ান বাগান,
শহরে সার্কাস পার্টি এলো বহুদিন পর আর
স্পঞ্জের স্যান্ডেল পায়ে সন্ন্যাসী সটান হেঁটে যান
দুপুরুক্ষ বেলায় চেলার খোঁজে কোন আখড়ায়,
কোথাও লাইনসম্যান প্রাণপণে দোলাচ্ছে কেবলি
রাঙা বাতি তার,
অথবা আমার বুকে ঝারির মুখের মতো বহু ফুটো আছে–
কী এমন কথামালা এসব যাদের তন্তুগুলো
চাপিয়ে কাব্যের তাঁতে বুনে যেতে হবে রাত্রিদিন?

'এই যে যাচ্ছেন হেঁটে শরীর খদ্দরে ঢেকে, চোখে পুরু চশমা,
মাথায় পাখির বাসা, ইনি কবি; মানে,
করেন শব্দের ধনে প্রচুর পোদ্দারি' ... শুনলেই পায়ে পায়ে
জোর লাগে ঠোকাঠুকি, কামড়ায় বিছে ...
যেন খুব সাধ্বী দিবালোকে এভেন্যুর চৌমাথায়
প্রকাশ্যে ইজের খুলে দ্রুত
প্রস্রাব করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে গেছি
পুলিশের হাতে।

শব্দ, রাজেন্দ্রানী শব্দ কেবলি পিছলে যায়, যেমন হাতের
মুঠো থেকে স্তন,
তবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে
নিতম্ব বুলিয়ে তার নিয়ে আসি ঘরে।
পায়চারি করে আর সিগারেট পুড়িয়ে এন্তার,
গরম কফির পেয়ালায় ব্যাকুল চুমুক দিয়ে ঘন ঘন
একটি কবিতা শেষ করে সুখে কোনো কোনো দিন
শিরোনাম লিখতে গিয়েই আচমকা ভারি লজ্জাবোধ হয়।

জেদি ঘোড়াটা

জেদি ঘোড়াটা তেজী ঘোড়াটা হাঁপায় ছোড়ে
বারংবার কালো খুরের হল্কা শুধু।
স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে ওঠে প্রাণের তোড়ে,
দু'চোখে তার স্বপ্ন কিছু কাঁপছে ধু-ধু।
জেদি ঘোড়াটা তেজী ঘোড়াটা ছুটছে এই
ছুটছে ঐ শহর-গ্রামে, পরগনায়;
ছুটছে শুধু, দীপ্ত পিঠে সওয়ার নেই।
দেখছে চেয়ে কৌতূহলী দশজনায়।

জেদি ঘোড়াটা তেজী ঘোড়াটা ডাইনে বাঁয়ে
ভীষণ ছুটে ক্লান্ত হলে জুড়োয় পাড়া।
হঠাৎ কারা পরায় বেড়ি ঘোড়ার পায়ে;
স্তব্ধ ঘোড়া, শকুনিদের চঞ্চু খাড়া।

বিবেচনা

সেদিনও কি এমনি অক্লান্ত ঝরঝর বৃষ্টি হবে এ শহরে?
ঘিনঘিনে কাদা
জমবে গলির মোড়ে সেদিনও কি এমনি,
যেদিন থাকব প'ড়ে খাটে নিশ্চেতন,
নির্বিকার, মৃত?

আলনায় খুব
সহজে থাকবে ঝুলে সাদা জামা। বোতামের ঘরগুলো যেন
করোটির চোখ, মানে কালোর গহ্বর। জুতো জোড়া
রইবে প'ড়ে এক কোণে, যমজ কবর। কবিতার
খাতা নগ্ন নারীর মতোই চিৎ হয়ে
উদর দেখিয়ে
টেবিলে থাকবে শুয়ে আর দেয়ালের টিকটিকি
প্রকাশ্যেই করবে সঙ্গম।

হয়তো কাঁদবে কেউ, আশা করা যেতে পারে; আত্মীয়-স্বজন
কেউ কেউ শোকে ধোবে সত্তা। ঘরে পুড়বে আগরবাতি আর
কোরানের পুণ্য সব আয়াতে আয়াতে
হবে গুঞ্জরিত চতুষ্কোণ। বাজারে ছুটবে কেউ
চাটাই, বাঁশের খোঁজে; কেউবা ফুঁকবে সিগারেট
ঘন ঘন, কেউ মৃদু বলবে অদূরে, প্রতিবেশী একজন :
'লোকটা নাস্তিক ছিল, শরিয়তে মোটেই ছিল না
মন, মসজিদে তার সাথে কখনো হয়নি দেখা,
এবং নিষিদ্ধ দ্রব্যে ছিল তার উৎসাহ প্রচুর।
কিন্তু তবু কেন জানি বাস্তবিক কখনো ভুলেও
পারিনি করতে ঘেন্না তাকে।
মারেনি লাঠির বাড়ি মাথায় কারুর
কোনো দিন, উপরন্তু ছিল সদালাপী।'

যেদিন মরব আমি, সেদিন কি বার হবে, বলা মুশকিল।
শুক্রবার? বুধবার? শনিবার? নাকি রবিবার?
যেবারই হোক,
সেদিন বর্ষায় যেন না ভেজে শহর, যেন ঘিনঘিনে কাদা
না জমে গলির মোড়ে। সেদিন ভাসলে পথঘাট,
পুণ্যবান শবানুগামীরা বড় বিরক্ত হবেন।

রৌদ্রে নিয়ে যাও

দ্বিধাকে সরিয়ে দূরে ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে
এখন তোমরা তাকে রৌদ্রে নিয়ে যাও। বড় বেশি
অন্ধকারে ছিল এতদিন, দিনগুলি ছিল তার
পেঁচার কোটরাগত। বড় বেশি অন্ধকারে ওরা
রেখেছিল তাকে; অন্তর্জীবনের হল্‌দে পাতাগুলো
অন্ধকারে ডোবা আর তৃষিত শরীর তার পাকা
আনারের মতো ফেটে পড়তে চেয়েছে প্রতিদিন

রোদ্দুরের আকাঙ্ক্ষায়। হবে সে সূর্যের সেবাদাসী,
আজীবন সাধ ছিল তারও অথচ নিঃসঙ্গ ঘরে
প্রখর চৈত্রের ভরা দুপুরেও বিরূপ আঁধার
হঠাৎ বাদুড় সেজে উদ্ভিন্ন শরীরটাকে খুব
আলুথালু করছে উন্মত্ততায়, তীব্র পাখসাটে।

রৌদ্রকে সে প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো নগ্নতায়
করেছে কামনা আর দুধে-সাদা স্বপ্নের অচেনা
গলিপথে দেখেছে অনেক কাঁটাবন, মরুভূমি,
গহ্বর পেরিয়ে আনা ক্ষুধার্ত বেখাপ্পা কয়েকটি
ক্রুদ্ধ পশু রাত্রিটাকে খুবলে খেতে পরম উৎসাহী–
যেন তারা তাড়াতাড়ি গলিপথে ভোর হোক চায়।

মরীচিকা-প্রতারিত আত্মা তার হরিণের মতো
চেয়েছে রাখতে মুখ রোদ্দুরের হ্রদে কতদিন।
কখনোবা রাত বারোটায় কিংবা একটায় (তাই
অনুমান করা চলে) শরীরে বাড়ির ছায়া নেমে
এলে মৃদু মোমবাতি-আলোকিত চার দেয়ালের
চুন-সুরকি ভেদ করে কতিপয় সন্ত আর মিহি
সোনালি চুলের দেবদূত আসতেন তার কাছে,
আঁধার শাসিত কণ্ঠে দিতেন পরিয়ে মালা ঠিক
আলোর মুক্তোয় গড়া। নিতেন মাথার ঘ্রাণ আর
রাখতেন অলৌকিক হাত তার লাজুক মাথায়।
তখন চৈতন্যে দিব্যি উঠত জ্ব'লে আশা ক্ষিপ্রতায়
ভুল সকালের মতো। বড় বেশি অন্ধকারে ছিল
বলে স্বপ্নভঙ্গে খেত থতমত, যেমন সে কাজে
হঠাৎ জলের ঘড়া ভেঙে, ফেলে হত অপ্রস্তুত।

শোনো, মৃত্যু বন্দনায় যুগ যুগ কাটিয়ে দিলেও
ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর, তার সত্তার শীতল
অন্ধকার কখনো হবে না দূর। ভীষণ আঁধারে
এতদিন রেখেছিল তাকে ওরা; দয়ালু ব্যক্তিরা
অন্তত এখন তাকে অকৃপণ রৌদ্রে নিয়ে যাও।

পার্ক থেকে যাওয়া যায়

পার্ক থেকে যাওয়া যায়। গেলে ফুল মার্ক পাওয়া যাবে
তার কাছে। যদি মোমগন্ধী ইকারুস হয়ে যাই ফুল-চন্দন দেবে সে
গোধূলিতে। কিন্তু ইকারুস বড় পতনপ্রবণ। আকাশের
সুনীল বন্ধন তাকে পারে না রাখতে ধরে। পার্কময় আমি
কিংবা আমাকেই পার্ক বলা যেতে পারে। রৌদ্রে জ্বলি, করি পান
আকণ্ঠ আরক শ্রাবণের,
কখনো-বা মগজকে নগ্ন তুলে ধরি কাঁচা দুধেল জ্যোৎস্নায়।

পার্কের বাইরে দেখি আইসক্রিমের শূন্য বাক্স নিয়ে কেউ
প্রত্যহ দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কেউ বেশ ঘটা করে
দোকান সাজায় নিত্য, বেচে না কিছুই কোনো দিন।
কে এক রাজকুমার আসবেন বলে
আসবেন বলে
আসবেন বলে প্রতিদিনি ওরা অভ্যাসবশত
যে যার দোকান নিয়ে অটল অপেক্ষমাণ, পণ্যহীন। এই পার্ক থেকে

যখন যেখানে খুশি যাওয়া যায় উজ্জ্বল সবুজ মেখে ট্রাউজারে, কানে
দখিন হাওয়ার গুলতানি পুরে, পাখিদের গান
শার্টের আস্তিনে গুঁজে এবং পকেটবন্দি রজনীগন্ধার শুভ্র ঘ্রাণ অকাতরে
বিলিয়ে সড়কে যাওয়া যায়, প্রভাতবেলার শান্ত প্রফুল্ল বন্দর ছেড়ে
দুপুরের মাঝ-দরিয়ায় ভেসে সূর্যের সোনালি সঙ্গ ছেড়ে
গোধূলির তটে যাওয়া যায়।

অতীতের শুকনো খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বহুদূরে যাওয়া যায়, আপাতত
আমার গন্তব্য গলি। রাবীন্দ্রিক নয় মোটে, রবীন্দ্রনাথের
গলিঘুঁজি কাঁঠালের ভূতি, মরা বেড়ালের ছানা আর মাছের কানকা
সত্ত্বেও কেমন সুশ্রী। পার্কের পাথুরে বেঞ্চ ছেড়ে
আমি যে গলিতে যাব নাম তার অলীক অক্ষর দিয়ে শুধু।

কোনো কোনো দিন হাসে সে-ও, প্রায় প্রতিদিন সে-গলির গাল
বেয়ে পড়ে লোনা জল। থাকে একজন, চোখে যার যুগপৎ
শতকের ধূমায়িত বিভীষিকা যৌবনের নিটোল কুহক। মাঝে মাঝে
ফুলের তেলের মতো তার স্মৃতি আনে বিবমিষা।
তবু মনে হয়,
সত্বর সেখানে গেলে আমার অসুখ যাবে সেরে
নিবিড় স্বপ্নিল পথ্যে, একান্ত গহন কোনো নার্সময়তায়।
দেখব গলির মোড়ে প্রস্তুত ফিটন, মেঘলোক-ফেরা ঘোড়া
খুরে খুরে অস্থিরতা ঝরাচ্ছে কেবল।
দুলিয়ে পাদানি খুব উড়িয়ে স্মৃতির মতো স্বচ্ছ নীলাম্বরী
ফুরফুরে হাওয়া খাতে যাবে ভালোবাসা,
আমার মোহিনী ভালোবাসা।

রৌদ্রের মিছিল এলে রোঁয়া-ওঠা তোয়ালের মতো
আকাশের মোড়ে মোড়ে নক্ষত্র-বিপনি
বন্ধ করে ঝাঁপ।
আমরা এ ওর গায়ে ছায়া ফেলে পথ চলি; আমাদের হাতে
হলুদ ফেস্টুন কত অথচ বেজায় খাঁ খাঁ লালসালু। এ তল্লাটে কোনো
স্লোগানের স্পষ্টতাই নেই। অতঃপর বিস্ফোরণ, ছত্রভঙ্গ কিছু মুখ,
পরিচিত
দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি : দু'দল দু'দিকে যায় অভিমানে গরগরে ক্রোধে।

তাহলে কোথায় যাব? একা-একা সার্কাস দেখাতে পারব না
চৌরাস্তায়। অতএব পার্কে ফেরা ভালো, ভালো সেই
পণ্যহীন ফিটফাট কতিপয় দোকানির কাছে গিয়ে সরাসরি বলা—
আমি তো রাজকুমার নই, আমার গালিচা নেই শূন্যচারী, তবু
তোমাদের কাছে ফিরে আসি খেলাচ্ছলে তোমাদের দোকানের শোভা
দেয় উস্কে কল্পনাকে। ভাবি, আজই পার্কের ভেতর
নিজস্ব সুহাস চারা করব রোপণ, জল দেব, নাম দেব স্বাধীনতা।

হৃদয়ের গল্প

প্রেমিক শয্যায় তার কাতর মৃত্যুর প্রতীক্ষায়,
প্রাণের প্রতিটি তন্তু উন্মুখর রৌদ্রের ভিক্ষায়
সর্বক্ষণ; বীজাণুর দামাল গেরিলাগুলি নিবিড় দঙ্গলে
রয়েছে গা ঢাকা দিয়ে শিরা উপশিরার জঙ্গলে।

কখনো ওড়ায় পুল অতর্কিতে, কখনো টাওয়ার গুঁড়ো হয়
এক লহমায়। ভয়, সারা ঘরে ভয়।

ভাবে সে শয্যায় মিশে, ওষুধের ঘ্রাণে ডুবে ভাবে
কেবল সেসব পল অনুপল, যাদের অভাবে
জীবনের চিলে-কুঠুরিতে অধিক জমত আরও ঊর্ণাজাল,
ধুলোর পোকামাকড়ের শব। উন্মাতাল
অতীতের কথা ভাবে : পার্কের বেঞ্চিতে
কখনো বসত গিয়ে নিবিড় দু'জন কখনোবা খুব শীতে
রাস্তায় হাঁটত ওরা। রেস্তোরাঁর দরজার আলো
প্রেমিকের চোখে ভাসে, যদিও ঘিরেছে তাকে মরণের কালো।

এখন প্রেমিকা তার রেস্তোরাঁয় তিনটি যুবার সাথে রাষ্ট্র
করে হৃদয়ের গল্প : রাঙা ঠোঁটে মিহি নড়ে কোকাকোলা রাষ্ট্র।

প্রৌঢ় অধ্যাপকের মতে

বাছুরের মতো সব নাবালক কবিরা এখন
ঢুঁমরে বেড়ায় যত্রতত্র আর কচি তীক্ষ্ণ খুরে
লন্ডভন্ড করে দেখি কাব্যের প্রশান্ত তপোবন।
গুঁড়িয়ে পদ্যের স্তূপ ক'বিঘা নিষ্ফল জমি জুড়ে
বানায় বিচিত্র ঢিপি। উপরন্তু বেয়াড়া পাঠক
তাদেরই লেজুড় হয়ে দিব্যি ঘোরে, যাক রসাতলে
কাব্যলোক; পুরোদমে যাচ্ছে তাই চলুক নাটক
ভীষণ পতন থেকে কবিতাকে উদ্ধারের ছলে।

এই সব বাছুরের দল জানি গোটাবে পাততাড়ি
দু'দিন ইয়ার্কি মেরে। আপাতত করে মণ্ডুপাত
রীতির নীতির আর সমস্বরে চেঁচিয়ে হঠাৎ
কাঁপায় কাচের ঘর, ভেঙে পড়ে থাম সারি, সারি।
হা কপাল, কালক্রমে বাছুরেরা হবে ধেড়ে ষাঁড়,
কল্কে দেবে বহুজন, হয়তো খেতাব পাবে "স্যার"।

তিনজন বুড়ো

চায়ের দোকানে ব'সে ঘেঁষাঘেঁষি তিনজন বুড়ো

অতীতের পাহাড়ের ঢালু বেয়ে তুষারের চূড়ো
ছুঁল আর ভাসাল শরীর হ্রদে, প্রজাপতি-ছাওয়া
মাঠে ছুটোছুটো করে ক্লান্ত হল। যেন নাওয়া-খাওয়া
নেই কারো এভাবে রয়েছে ব'সে ওরা তিনজন
ছারপোকা কবলিত বিবর্ণ বেঞ্চিতে। ভন ভন
ওড়ে মাছি নাকের ডগায়, বুঝি ওরা এককাট্টা
গাইছে কাওয়ালি। নাড়ে, ওরা মাথা নাড়ে আর ঠাট্টা
মস্করা কথার ফাঁকে ফাঁকে চলে। কেউ তার উড়ো

কথাকে চিঞ্চিৎ নকশি করে তোলার আশায় গুঁড়ো
গুঁড়ো রঙ বর্ণনায় দিল তোফা ছড়িয়ে ছিটিয়ে।
বলল সে, শোনা ভাই খুঁটিনাটি ফ্যাসাদ মিটিয়ে
বদলেছি বউ আমি জুতোর পাটির চেয়ে ঘন
ঘন।' ধোয়া ছেড়ে অন্যজন বলে, 'আমি গত গণ-
অভ্যুত্থানে অহরহ দেখেছি তাসের রাজা কত
গেছেন চকিতে ভেসে ম্লান বিশীর্ণ কুটোর মতো
বানের প্রবল তোড়ে, ঘটনার গলগ্রহ।' বাকি
যে থাকে সে বলে না কিছুই, যেন সে দ্বিতীয় পাখি
উপনিষদের, দেখে শুধু দেখে গভীরে একাকী।

অজস্র মাইক্রোফোন

অজস্র মাইক্রোফোন রটায় শান্তির বাণী, অথচ সর্বত্র
তীব্র কুচকাওয়াজ চলছে অবিরাম। শান্তি-ছত্র
মেলে দিয়ে হিরন্ময় হয়ে ওঠে সম্মেলন, শীর্ষ সম্মেলন
সুভাষণে। দিকে দিকে অবিরল প্রেসক্রিপশনের মতন
বিলি হয় শান্তি-সমর্থক পুস্তিকা ইত্যাদি আর
প্রেস ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার
ঘূর্ণিল ফিল্মের রিল দ্রুত ভরে ওঠে শান্তিবাদী নেতাদের
নিম নেতাদের মুখের বিচিত্র ভঙ্গিমায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
ভবিষ্যৎ ভেবেই রাসেল আর্তস্বরে করেন সতর্কবাণী,
হয়তো দেখেন তিনি চরাচরে ডিনোসরাসের ভিড়, সব রাজধানী
বিশীর্ণ কংকাল হয়ে ভাসে তাঁর চোখে। এমনকি লম্বা চুল
সাবান-বিদ্বেষী হিপ্পিরাও কখনো ব্যাকুল
ঘোরে পথে পথে বোমা-তাড়ানিয়া বিক্ষোভ মিছিলে।

অস্ত্রাগারে সটান দাঁড়িয়ে সামরিক নায়কেরা ধীরে প্রশান্ত গলায়
ছড়াচ্ছেন আশ্বাসের বাণী ওড়াচ্ছেন শান্তির ফানুস
যখন তখন মরু সমুদ্র পর্বত আকাশের নীলে।
এদিকে মানুষ সব সন্ত্রস্ত মানুষ
ক্রমাগত ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছে গাদা গাদা রাইফেলের তলায়।

ছবি

বনের হরিণ নয়, বক নয়, নয়কো ডাহুক,
ছেলেটা আনল এঁকে খাপছাড়া মানুষের মুখ।
দিব্যি টেরিকাটা চুল, চোখ কান নেই তো কিছুই;
ঠোঁট আছে, খিল-আঁটা। ইচ্ছে করে ছবিটাকে ছুঁই,
আচম্বিতে আঁৎকে উঠি তার সঙ্গে নিজের মুখের
মিল দেখে; ছবিটায় খোঁজ পাই আরও অনেকের।

ছেলেটা পাগল নাকি?

ছেলেটা কখন ফেরে কত রাতে কেউ তা জানে না।
রুক্ষ চুল, মাটিমাখা জুতো পায়ে চেনা
গলিটা পেরিয়ে আসে, ঢোকে ঘরে একা, নড়বড়ে
চৌকি দেয় কোল আর পাশের টেবিলে থাকে প'ড়ে
কড়কড়ে ভাত, ভাজা মাছ (মা জানেন ছেলে তার
খুব শখ করে খায়) এবং পালং শাক, ডাল, পুদিনার
চাটনি কিঞ্চিৎ। অথচ সে পোরে না কিছুই মুখে, হ্যারিকেন
শিয়রের কাছে টেনে বই পড়ে, আর ভাবে কী-কী অহিফেন
জনসাধারণ আজ করছে সেবন বিভ্রান্তির চৌমাথায়।
দ্যাখে সে কালের গতি মার্কস আর লেনিনের প্রসিদ্ধ পাতায়।

সকাল হলেই ফের ব্যাকুল বেরিয়ে পড়ে, মা থাকেন চেয়ে–
দেখেন ছেলের মাথা ঠেকে ঘরের চৌকাঠে, তাঁর চোখ ছেয়ে
চকিতে স্বপ্নের হাঁস আসে নেমে, পাখসাটে কত
ছবি ঝরে সেকালের, ঝরে জ্যোৎস্না স্ফুলিঙ্গের মতো।
ভাবেন এমনি একরোখা, কিছুটা বাতিকগ্রস্ত ছিলেন তিনিও, মানে
যার পরিচয় এই দেহ-দ্বীপ, দুঃখের উপসাগর জানে।

‘ছেলেটা পাগল নাকি?’–প্রতিবেশী বুড়ো বললেন খনখনে
কণ্ঠে তাঁর। ‘পাগল নিশ্চয়, নইলে ঘরের নির্জনে
কেন দেয়নি সে ধরা’, ভাবেন লাঠিতে ভর দিয়ে বুড়ো, ‘নইলে কেউ বুঝি

মিটিং-মিছিলে যায় যখন-তখন? সব পুঁজি
খেয়ায়, ঘরের খেয়ে তাড়ায় বনের মোষ? জীবনের সকালবেলায়
গোলাপের মতো প্রাণ জনপথে হারায় হেলায়?’

সন্ধ্যা

কোনো কোনো সন্ধ্যা যুবতীর জলার্ত চোখের মতো
ছলছল করে আর তখন নিজেকে
দেখি শুয়ে আছি
শবাধারে। ফুলের সম্ভার নেই, কৃষ্ণ গ্রন্থ এক প’ড়ে আছে পাশাপাশি।
মনে হয়, পুরোনো কাগজ, ভাঙা পাত্র,
বিলেতি দুধের শূন্য টিন
ইত্যাকার বাতিল বস্তুর মধ্যে ব’সে আছি একা
শহরতলির হু হু ছায়ান্ধ প্রান্তরে।
তখন কালচে আকাশের পক্ষী-মালাকে ধূসর
বিদায়ী রুমাল বলে মনে হয় শুধু।

কবিতা

কখন যে ছেড়ে যাবে হঠাৎ আমাকে, কখন যে ...
সেই ভয়ে রক্ত জমে যায় দইয়ের মতন।
যখন নিঃসঙ্গ
ব’সে থাকি ঘরে, বই পড়ি, শার্টের বোতামগুলো ছুঁই কিংবা
এলাহি ডবল ডেকারের পেটে ঢুলি,
এমনকি ঘুমের মধ্যেও
সেই ভয় ভীষণ ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর।

যখন আমার চোখে চোখ রাখো, বাগানের তাজা
ফুলগুলো বাড়ায় আমার দিকে মুখ, ঝরনা নেচে
ওঠে হাতে, পাখি আসে খুব কাছে, তোমার চুম্বনে
জন্ম নেয় কত পদাবলি।

হয়তো খেলছি ব্রিজ, হয়তো গিয়েছি ইস্টিশানে,
হয়তো, পুরছি মুখে খাদ্য,
হয়েছি শামিল কোনো শবানু গমনে,
অকস্মাৎ সেই ভয় ঝানু জাদুকরের মতন
কালো পর্দা দিয়ে
ঢেকে ফেলে আমাকে সম্পূর্ণ :
কখন যে ছেড়ে যাবে হঠাৎ আমাকে, কখন যে...

প্রত্যাবর্তন

পুনরায় রৌদ্রহীন রৌদ্রে আমি, পথহীন পথে।

এই রৌদ্র, এই পথ কতকাল আমাকে অত্যন্ত
করেছে ব্যাকুল। বাইরের ক্ষীণতম শব্দ কিংবা
একটি দৃশ্যের জন্যে পিপাসার্ত কাটিয়েছি অনেক বছর।
অনেক বছর আমি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কাটিয়েছি
হিরন্ময় ভেন্টিলেটারের
স্বপ্ন দেখে দেখে। কতকাল কৃষ্ণচূড়া, তৃষিত বুকের মধ্যে
দেয়নি ছড়িয়ে অগ্নি-গুঁড়া।

আমার মাথায় সাদা চুল ওড়ে হাওয়ায়, পুরানো
চটের থলের মতো শিথিল শরীর,
দাঁত নড়বড়ে,
দৃষ্টি নিবু নিবু আর জীবনের প্রতিটি মোর্চায়
যেন সান্ধ্য আইন হয়েছে জারি। রাস্তার কিনারে
বিশীর্ণ চাঁদের মতো নুয়ে-পড়া দর্জিটা এখনও
কী ব্যগ্র পরায় সুচে সুতো।

আমার যে-ঘর নেই
সে-ঘর আমাকে ডাকে বুক হাট করে,
আমার যে-শয্যা নেই
সে-শয্যা আমাকে ডাকে বিশ্রামের স্বরে,
আমার যে-প্রিয়া নেই
ডাকে সে বুকের পদ্ম উন্মোচন করে,
আমার যে পুত্র-কন্যা নেই
ডাকে তারা কচি চারাদের মতো বাহু মেলে দিয়ে।
পুনরায় রৌদ্রহীন রৌদ্রে আমি, পথহীন পথে।

ডাকছি

ডাকছি ডাকছি শুধু ডেকে ডেকে বড় ক্লান্ত আমি;
দেয় না উত্তর কেউ। সারাক্ষণ করি পায়চারি,
চৌদিকে তাকাই, ডাকি প্রাণপণে, এ-বাড়ি সে-বাড়ি
করি ঘন ঘন তবু পাই না কারুর দেখা। নামি
পথে একা, চৌরাস্তায় ভীষণ চেঁচাই। ফের থামি
আচম্বিতে, যেন কেউ বাস ছেড়ে সাত তাড়াতাড়ি
আসছে আমারই দিকে। আমি তাকে কী এলোপাতাড়ি
বলতে গিয়েই বোবা। পথে শূন্যতার মাতলামি।

যেন মৃত্যু অকস্মাৎ এ শহরে সব ক'টি ঘরে
দিয়েছে বাড়িয়ে হাত, শহরের প্রত্যেকটি ঘড়ি
হয়েছে বিকল আর শোক পালনের মতো কেউ
এখন কোথাও নেই। ভয়ানক নৈঃশব্দের ঝড়ে
শহর-মরুর বুকে একটি কাঁকড়া শুধু তড়ি-
ঘড়ি যাচ্ছে ঠেলে ঠেলে ক্রমাগত শূন্যতার ঢেউ।

রাজকাহিনী

ধন্য রাজা ধন্য,
দেশজোড়া তার সৈন্য।
পথে-ঘাটে ভেড়ার পাল!
চাষীর গরু, মাঝির হাল,
ঘটি-বাটি, গামছা, হাঁড়ি,
সাত-মহলা আছে বাড়ি,
আছে হাতি, আছে ঘোড়া।
কেবল পোড়া মুখে পোরার
দু'মুঠো নেই অন্ন,
ধন্য রাজা ধন্য!

ঢ্যাম কুড় কুড় বাজনা বাজে,
পথে-ঘাটে সান্ত্রী সাজে।
শোনো সবাই হুকুমনামা,
ধরতে হবে রাজার ধামা।
বাঁ দিকে ভাই চলতে মানা,

সাজতে হবে বোবা-কানা।
মস্ত রাজা হেলে দুলে
যখন তখন চড়ান শূলে

মুখটি খোলার জন্য।
ধন্য রাজা ধন্য।

এ লাশ আমরা রাখব কোথায়?

এ লাশ আমরা রাখব কোথায়?
তেমন যোগ্য সমাধি কই?
মৃত্তিকা বলো পর্বত বলো
অথবা সুনীল সাগর-জল–
সব কিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই।
তাই তো রাখি না এ লাশ আজ
মাটিতে পাহাড়ে কিংবা সাগরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই।।

বর্ণ নিয়ে

পুরোটাই দৈবাৎ ঘটনা, বলা যায়। স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ
যেন ক্যারমের ঘুঁটি, বার বার উঠছে লাফিয়ে
আঙুলের ক্ষিপ্র ডগায় আমার; প্রথমেই স্বর-
বর্ণের নকিব মানে আদ্যাক্ষর এলো, তার সঙ্গে
এলো তেড়ে শৈশবের সেই অজগর, যে পুস্তক
ছেড়ে ছুড়ে আচম্বিতে আমার খাতায়
উঠত লাফিয়ে আর খাতা ছেড়ে চলত বঙ্কিম কখনো-বা
হেলে দুলে মগজের তেপান্তর মাঠে। স্বরবর্ণের নিঃসঙ্গ আদ্যাক্ষর
ফুলবাবুটির মতো নিয়ে এলো হাতে
চমৎকার লাঠি মানে একটি আকার। তারপর
ব্যঞ্জনবর্ণের আদ্যাক্ষর এলো ভীষণ বেতালা কা-কা শব্দ
করে এলো, আকারকে ইয়ার বক্সির মতো নিয়ে এলো টেনে।
অনন্তর ক্যারমের সেই মধ্যমণি ঘুঁটিটির
সমস্ত লালিম নিয়ে অন্তঃস্থ বর্ণের

তৃতীয় সদস্য এলো– আমার খাতার পাতা জুড়ে
কেবলি ক্ষুধার্ত চোখ, কেবলি ভিক্ষার পাত্র আর
শুধু ভিড়, তিল তিল ক্ষয়ে-যাওয়া প্রায়
উবে-যাওয়া অস্তিত্বের ছায়ান্ধ মিছিল।

হাত

যায় না সে ভিড়ের ভেতর। সারাক্ষণ নির্জনতা
করে আহরণ।
কখনো সে-হাত টেলিফোনে চকরঙ নম্বরের
উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হয়, কখনো দেয়ালে ঝুলে থাকে
বিবর্ণ ছবির গায়। কখনো-বা মগজের রঙিন পুকুরে
বিলাসী সাঁতার কাটে, কেমন তন্ময় ছোঁয় গুল্মলতা।
ঘরের চালায় প'ড়ে থাকে আলস্যে কখনো
যেন বোহেমীয়ান সে একজন, ক্ষিপ্ত,
ধারে না কারুর ধার। অবহেলে রাখে ধরে রৌদ্র ছায়া আর
বৃষ্টির ধবল দাঁত কামড়ালে নাচে, বেজে ওঠে
দমকা হাওয়ায়।
সে হাত পায়রা হয়ে কোলে আসে কিংবা দোলে খুব
শূন্য দোলনায়, কবেকার আবছায়া জলছবি কতিপয়
কুড়িয়ে আনে সে রেডিওর কাছে এসে শব্দহীন
নিবিড় ঘুমিয়ে থাকে বেড়ালের মতো।
সে হাত চকিতে
বেদের ঝাঁপির মধ্যে শঙ্খিনীর সঙ্গে
অন্তরঙ্গতায়
মোহন সুনীল হয়, জেলেদের আমিষ পাড়ায়
রৌদ্রে মেলে দেয়া জালে বাঁধা পড়ে স্বেচ্ছায় কখনো।

রুপালি মাছির মতো নক্ষত্র নিকুঞ্জ,
শহরের দূরতম এলাকার নিভৃত বল্মীক,
নানাবিধ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির দোরগোড়া থেকে
ফিরে এসে এখানেই সে-হাত লুটায় কাটা ঘুড়ির মতন।

বাঁশি তাকে ডাকে,
ডাকে সাত রঙ,
শোনে সে আহ্বান পাথরের।

ভোরে কাঁচা কবরের ওপর ঘুমিয়ে কখন কী স্বপ্ন দ্যাখে,
সে-হাতের মৃত্যুভয় নেই।

ব্যাকুলতা

আমার সিঁড়ি আগলে থাকে
ব্যাকুলতা।
পেছনে থেকে চুল টানে সে
হঠাৎ বাঁধে আলিঙ্গনে,
আমার সিঁড়ি আগলে থাকে
ব্যাকুলতা।

হাওয়ায় ঘোরায় চাবির গোছা,
যেন আমার ঘরণী সে;
দুপুরবেলা কখন খাটে
দেয় এলিয়ে শরীরটাকে,
ব্যাকুলতা।

বাসের ভিড়ে দোকান-পাটে
পার্কে ধূসর বেঞ্চিটাতে
আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে
ব্যাকুলতা।

যখন লিখি কিংবা খুলি
সদ্য কেনা বইয়ের পাতা
তখন পিঠে নিঃশ্বাস ফ্যালে
ব্যাকুলতা।

রোদ-খেলানো ফসফরাসে
কিংবা বুড়িগঙ্গা তীরে
আচম্বিতে আমার বুকে
দ্যায় তুলে সে ছদ্মবেশী
দুঃখ সুখের শিল্পকলা
ব্যাকুলতা।

একপাল জেব্রা

এই ঘরের শব্দ আর নৈঃশব্দকে সাক্ষী রেখে,
সাক্ষী রেখে আস্তাবলের গন্ধ, দক্ষিণের তাকে রাখা
শূন্য কফির কৌটো, বারান্দায় শুকোতে দেয়া হাওয়ায়
দবলে ওঠা সাদা শার্ট, যে শার্টের কলার একবার
কোনো বেজায় সাংস্কৃতিক মহিলার লিপস্টিক ভূষণে
সজ্জিত হয়েছিল, উজাড় মানি-ব্যাগ
আর দর্পণের সুহৃদকে সাক্ষী রেখে লিখি কবিতা।

নিপুণ গার্ডের মতো হুইসিল বাজাতে বাজাতে সবুজ ফ্ল্যাগ
ওড়াতে ওড়াতে একটি কবিতার শাঁ শাঁ ট্রেনকে
অন্তিম স্টেশনে পৌঁছে দিতে না দিতেই
কিছু পঙ্‌ক্তি পেয়ে বসে আমাকে আবার। দুর্দান্ত
এক পাল জেব্রার মতো ওরা আমার বুকে ধুলো উড়িয়ে বারংবার
ছুটে যায়, ফিরে আসে।

ক্ষমা করুন রবীন্দ্রনাথ, আপনার মহান মায়াবী শৈলাবাস থেকে,
ভুল বুঝবেন না নজরুল, আপনার হারমোনিয়ামের আওয়াজে
মধুর মজলিশ আর হাসির হুল্লোড় থেকে,
কিছু মনে করবেন না জীবনানন্দ, আপনার সুররিয়ালিস্ট হরিণেরা
যেখানে দৌড়ে যায়, সেখান থেকে,
মাফ করবেন বিষ্ণু দে, আপনার স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ থেকে
অনেক দূরে যেতে চায় সেই দামাল জেব্রাগুলো।
আমি একলা প্রান্তরের মতো প'ড়ে থাকি। জেব্রাগুলো তুমুল
উদ্দামতায় মেতে ওঠে, তাদের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে
আমাদের হৃদয়ের অন্তর্লীন তৃণরাজি শিখার উজ্জ্বলতা পায় কখনো,
ফিরে আসে না আর। আমি একলা প্রান্তরে ডাকতে ডাকতে
ক্লান্ত হয়ে পড়ি, ওরা ফিরে আসে না তবু। প'ড়ে থাকি
অসহায়, ব্যর্থ। তখন দুক্ষোভে নিজেরই হাত
কামড়ে ধরতে ইচ্ছে হয়, আমার প্রিয়তম স্বপ্নগুলোর
চোখে কালো কাপড় বেঁধে গুলি চালাই ওদের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে।

নিপুণ গার্ডের মতো হুইসিল বাজাতে বাজাতে, সবুজ ফ্ল্যাগ
ওড়াতে ওড়াতে একটি কবিতার শাঁ শাঁ ট্রেনকে
অন্তিম স্টেশনে পৌঁছে দিতে না দিতেই আবার এক পাল জেব্রা
তুমুল ছুটোছুটি করে বাতাস চিরে রৌদ্র ফুঁড়ে আমার বুকের আফ্রিকায়।

বিড়ম্বনা

ভেবেছি তোমাকে পার্কে নিয়ে যাব, অথচ সেখানে
উঠতি গুণ্ডার টাঙ্কি, শিস।
ভেবেছি তোমাকে নিয়ে দু'দণ্ড বসব রেস্তোরাঁয়,
সেখানেও হ্যাংলা আর ফড়েদের ভিড়ে টেকা দায়।
ভেবেছি তোমাকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরব চমৎকার,
অথচ প্রতিটি পথে ক্ষুধার্তের ভীষণ চীৎকার।
ভেবেছি তোমাকে নিয়ে বৈকালিক নৌকো বিহারের
আনন্দ কুড়াব ঢের,
কিন্তু বন্যাস্ফীত জলে ভাসে মৃত মানুষ, মহিষ।

পক্ষপাত

ঘাসের নিচের সেই বিষাক্ত সাপকে ভালোবাসি,
কেননা সে কপট বন্ধুর চেয়ে ক্রূর নয় বেশি।
ভালোবাসি রক্তচোষা অন্ধ বাদুড়কে,
কেননা সে সমালোচকের চেয়ে ঢের বেশি অনুকম্পাময়।
রাগী বৃশ্চিকের দংশন আমার প্রিয়,
কেননা সে দংশনের জ্বালা অবিশ্বাসিনী প্রিয়ার
লাল চুম্বনের চেয়ে অধিক মধুর।
আমি কালো অরণ্যের সুকান্ত বাঘকে ভালোবাসি,
কেননা সে একনায়কের
মতো কোনো সুপরিকল্পিত
সর্বগ্রাসী শত্রুতা জানে না।

টিকিট

একটি টিকিট আমি বহুকাল লুকিয়ে রেখেছি
সযত্নে বুকের কাছে। আশেপাশে সর্বক্ষণ যারা
ঘুরছে তাদের বড় লোভ এই টিকিটের প্রতি।
এক একটি দিন যায়, সে-টিকিট অলক্ষ্যে সবার
কেবলি সোনালি হয়। হোন্ডায় সওয়ার আঁটো যুবা,
বেসামাল ট্রাক ড্রাইভার, বাস কন্ডাক্টার আর

সাদা হাসপাতালের দারোয়ান এবং এয়ার
হোস্টেস সবাই চায় সে-টিকিট আমার নিকট।

সেদিনও জ্বরের ঘোরে দেখলাম, একজন কালো
শিশিটার অন্তরালে সুদুরের কুয়াশা জড়ানো।
শরীরে দাঁড়াল এসে, বাড়াল খড়ির মতো হাত
সাত তাড়াতাড়ি তপ্ত আমার বুকের দিকে সেই
টিকিটের লোভে, আমি প্রবল বাধায় তাকে দূরে
সরালাম। আরো কিছুকাল রাখতেই হবে ধরে
এ টিকিট রাখতেই হবে বুকের একান্ত রৌদ্রে,
জ্যোৎস্নায় বানানো পকেটের হু হু জনহীনতায়।

প্রকারভেদ

সুকণ্ঠ কোকিল তুমি বসন্তের মাতাল নকিব,
মধ্যরাতে বিপর্যস্ত করে ফেল এখনও আমাকে,
নিদ্রার গহন থেকে নিয়ে যাও পাতার টেরেসে।
হাঁস তুমি ব্রজেন দাশের মতো কাটছ সাঁতার
পাড়ার পুকুরে যথারীতি। নিঃসঙ্গ কুকুর তুমি
শহরের নানা দৃশ্য রাখছ দু'চোখে; টিকটিকি
যখন তখন তুমি ডেকে ওঠো, দেয়ালের মাঠে
দিব্যি ফুলবাবু সেজে হাওয়া খাও প্রত্যহ দু'বেলা।

কোকিল, কুকুর, হাঁস, টিকটিকি ইত্যাদি ইত্যাদি
আটক করে না জেলে তোমাদের কেউ কিংবা
গোয়েন্দা নেয় না পিছু, তোমাদের অলিতে গলিতে
কারফ্যু হয় না জারি অতর্কিতে। তোমাদের কেউ
করে না শোষণ কোনো দিন; কেননা তোমরা নও
ঈর্ষণীয় সেই জাতি বস্তুত মানব যার নাম।

সোনার তরী

'এই রোকো' বলে কোনো জাঁদরেল ট্রাফিক পুলিশ
পারে না করতে রোধ কখনো তোমার পথ কিংবা
চেকপোস্টে তোমাকে হয় না জমা দিতে পাসপোর্ট

ভিসা; বজ্রে বাজিয়ে মোহন বাঁশি আসো মহারাজ
মায়াবী সসারে অপরূপ অগোচরে। কোনো দিন
ঝকঝকে বাসস্টপে, মাথা-ঝলসিত ফুটপাতে
অথবা পার্কের বেঞ্চে ব'সে জুতোর কাদার দিকে
অনিমেষ তাকিয়ে থাকার ক্ষণে, টেলিফোনে কথা
বলতে বলতে মৃদু এমনকি মফস্বলগামী
ট্রেনের বগিতে ঢুলে, কবিতার কাঙাল আমরা,
অকস্মাৎ পেয়ে যাই তোমার সাক্ষাৎ। প্রতিদিন
তোমার জন্যেই কত দখিন দুয়ার থাকে খোলা।

এ শহরে স্বপ্নের দোকান নেই কোনো, আছে শুধু
দরাদরি, বচসাও অন্তহীন। হলুদ দাঁতের
কিছু লোক, বেসামাল, এমনকি অন্ধ ভিক্ষুকের
দোতারাও নেয় কেড়ে দারুণ আক্রোশে; চৌরাস্তায়
দাপায় লাফায় আর কালো পিরহানে ঢেকে ফেলে
সবগুলো উজ্জ্বল মিনার। উপরন্তু বল্মীকের
উপদ্রবে ক্রমাগত হচ্ছে নোংরা প্রতিটি সোপান।
এরই মধ্যে তুমি আসো কাব্যের মহান সান্তা ক্লস।

নিষ্প্রদীপ ঘরে থাকি রাত্রিদিন। দরজা-জানালা
বন্ধ সব। বড় শ্বাসকষ্ট হয়; হঠাৎ কখনো
ইচ্ছে করে 'এ্যাম্বুলেন্স চাই' বলে তারস্বরে দূর
আকাশ ফাটাই। কখনো-বা মাছ শিকারির মতো
ব'সে থাকি, নিবিড় অপেক্ষমাণ। এ বন্ধ ঘরেও
ভিড়ছে সোনার তরী, আপনারা স্বচক্ষে দেখুন।

মাতামহের মৃত্যু

অনেক পায়ের নিচে তিনি;
মাটির পালঙ্কে শুয়ে অবসর ভোগ
করছেন যেন আরামের
সুশান্ত চাদরে ঢেকে আপাদমস্তক।
আমরা ওপরে স্তব্ধ, প্রায়-স্তব্ধ, নিচে তিনি। আমার পিতার
কালো আচকানটার, দেখলাম, একটি বোতাম নেই; ঢোলা
পাজামায় ভেজা মাটি। আমার নতুন হাফপ্যান্টে
হঠাৎ কাদার ফুল ফুটেছে দেখেই মনমরা

হলাম কেমন।

আমাদের পায়ের তলায় মাতামহ,
মাটির গভীরে মাতামহ,
মাতামহ এক খণ্ড হুহু সাদা কাপড়ের মোড়কে জড়ানো,
যেন প্রেরিতব্য সওগাত কোনো, যাবেন সুদুরে।
একজন ফেরেস্তা গাছের মগডালে, নাক তার মাতামহের ফরসির
নলের মতন আর চুল আগুনের ঝোপ, গোঁফে
প্রজাপতি বাঁধা পড়ে গেছে; হাতে টফির রঙিন বাক্স নিয়ে
বিড়বিড় পড়ছে দরুদ।

কান্না-ক্লান্ত কিছু মুখ। কেউ শূন্য দৃষ্টি মেলে চায়,
চেয়ে থাকে দূর মসজিদের মিনারে, কেউ খুব
মগ্ন হয়ে দেখে নেয় কবর তৈরির শিল্প। আমার নিজের
কান্না পাচ্ছিল না বলে লজ্জা বোধ হ'ল। মধ্যে মধ্যে
শুধু মাতামহের ঘরের মালিশের ঝাঁ ঝাঁ গন্ধ এলো ভেসে (পক্ষাঘাত
পঙ্গু করেছিল তাঁকে) উজিয়ে অনেক ঘর, বিশীর্ণ হলুদ গাছপালা,
ঊর্ণাজাল। তাল তাল মাটি ঝরে পড়ে মাতামহের ওপর,
সবাই মাটির ঢেলা সাগ্রহে দিলেন ছুড়ে তাঁর
প্রতি, যেন কী এক খেলায় উঠলেন মেতে আর
আমি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তখন
আইসক্রিমের কথা শুধু ভাবছিলাম আড়ালে।

অকথ্য এক অন্ধকারে

অকথ্য এক অন্ধকারে মগ্ন আমি
খুপরিটাকে আঁকড়ে ধরে;
বাঁচার নেশা অদ্যাবধি বেশ ঝাঁঝালো,
তাই তো টিকি এই শহরে।

জগৎ জুড়ে জোর কলহ চলছে এখন,
উলুখড়ের ঘোর বিপদ।
এরই মধ্যে চায়ের বাটি সামনে রেখে
রাজা উজির করছি বধ।

বুঝতে পারা সহজ তো নয় পাচ্ছি কী-যে
মজা খালের কাদা সেঁচে।

অকথ্য এক অন্ধকারে, স্বীকার করি,
মন্দ-ভালোয় আছি বেঁচে।

জানলা ছেড়ে শীতের কালো সন্ধ্যাবেলা
ফের টেবিলে কথার গানে
মও হয়ে রাত্রি জেগে পদ্য লিখে
বেহুঁশ খুঁজি বাঁচার মানে।

লেখার ফাঁকে ছন্দ মিলের হাতছানিতে
মধ্যপথে খন্দে পড়ি,
রেশমী কোনো শব্দ শুনে ব্যাকুল হয়ে
আবার নতুন ছন্দে নড়ি।

শয্যা ছেড়ে সিঁড়ির ধাপে হঠাৎ থেমে
চড়ুইটাকে ডাকি কাছে।
আমার হাতের নড়া দেখেই লেজ দুলিয়ে
পালায় চড়ুই সজ্‌নে গাছে।

আমার ওপর ছোট্ট পাখির নেই ভরসা,
পালায় দূরে কিরাত ভেবে।
চতুর্দিকে খুনখারাবি আছেই লেগে,
চড়ুইটাকে দোষ কে দেবে?

এ যুদ্ধের শেষ নেই

এ যুদ্ধের শেষ নেই। প্রতি পল অনুপল শুধু
গোলা বর্ষণের ধুম, ক্রুদ্ধ এরোপ্লেনের ছোঁ মারা
চলে অবিরাম, চূর্ণ ব্রিজ। সাবমেরিন হঠাৎ
ফুটো করে জাহাজের তলা। ট্রেঞ্চ খুঁড়ি প্রাণপণে,
কখনো মাইন পাতি সুকৌশলে : একান্ত জরুরি
শত্রুকে ঘায়েল করা ছলে বলে। দিগন্ত-ডোবানো
চিৎকারে চমকে উঠি, প্রেতায়িত পড়ে থাকে কত
মাটি-মগ্ন হেলমেট, শতচ্ছিন্ন টিউনিক, হাড়।

রাজত্ব জয়ের নেশা শিরায় তুমুল নাচে আজও
ঝাঁঝাল জ্যাজের মতো। কিন্তু জানা নেই সে-রাজ্যের
মৌলিক সীমানা। শুধু জানি ভীষণ ছুটতে হবে,

বিশ্রাম অকল্পনীয়, অসম্ভব রণে ভঙ্গ দেয়া।

কখনো নিঃসঙ্গ ট্রেঞ্চে রসদ ফুরিয়ে আসে, এক
টুকরো সিগারেট ফুঁকি কত বেলা। শূন্য টিন আর
উজাড় মগের দিকে চেয়ে থাকি সতৃষ্ণ, কাতর।
কখনো জ্বরের ঘোরে দেখি, ওরা আসে উদ্ধারের
প্রবল আশ্বাস নিয়ে– বিশেষণ, বিশেষ্য এবং
ক্রিয়াপদ, আমার আপন সেনা, ওরা আসে; কিন্তু
তারাই আমার শত্রু, অতর্কিতে করে আক্রমণ–
ঘামে-ভেজা ক্লান্ত চোখে দোলে জয়, দোলে পরাজয়।

ময়ূরগুলো

আমার বুকে রাতবিরেতে
রাতবিরেতে ময়ূরগুলো
বেড়ায় নেচে।
রক্তে আমার ভীষণ ডাকে
ভীষণ ডাকে ময়ূরগুলো
রাতবিরেতে।

নখর-ঘায়ে বুকের টালি,
হৃদয়পুরের চার কুঠুরি
নাকাল হল।
মাথার ভেতর পেখম তোলে,
চঞ্চু রাখে ঘাড়ে মুখে,
রক্ত মোছে।

চঞ্চু থেকে ঝরায় কী-যে,
ঠুকরে বেড়ায় অনেক কিছু
মাতাল হয়ে।
ব্যগ্র আমার পায়ের ছাপে
একলা ঝোড়ো ঘরের মেঝে
তপ্ত হ'ল।

ঘরকে আমার শ্মশান বলি,
রাতবিরেতে শয্যা যেন
দারুণ চিতা।

বিধবাদের নিদ্রাহারা
প্রহর শুধু আমায় জোরে
দখল করে।
তীব্র চোখের ময়ূরগুলো
খাদ্যাভাবে আমায় ছেঁড়ে
সিক্ত লোভে।
ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে উঠি,
ইচ্ছে করে আকাশ ছিঁড়ি
দশটি নখে।

হঠাৎ দেখি মুখ রেখেছি
গন্ধভরা রেশমি ঝোপে;
মত্ত আছি
যমজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে।
যুগল টিলা মুঠোয় কাঁপে
অন্ধকারে।

গুপ্ত শিরার লাল মদিরা
ফেনিয়ে ওঠে রাত্তিরেতে
বিনোদ চেয়ে।
আমার বুকে, মাথার ভেতর
নেচে বেড়ায় ময়ূরগুলো
ময়ূরগুলো।

এ শহর

এ শহর ট্যুরিস্টের কাছে পাতে শীর্ণ হাত যখন তখন,
এ শহর তালিমারা জামা পরে নগ্ন হাঁটে, খোঁড়ায় ভীষণ।
এ শহর রেস খেলে, তাড়ি গেলে হাঁড়ি হাঁড়ি, ছায়ার গহ্বরে
পা মেলে রগড় করে আত্মার উকুন বাছে, ঝাড়ে ছারপোকা।
কখনো-বা গাঁট কাটে, পুলিশ দেখলে
মারে কাট। টকটকে চাঁদের মতন চোখে তাকায় চৌদিকে,
এ শহর বেজায় প্রলাপ বকে, আওড়ায় শ্লোক,
গলা ছেড়ে গান গায়, ক্ষিপ্র কারখানায়
ঝরায় মাথার ঘাম পায়ে।
ভাবে দোলনার কথা কখনো-সখনো,

দ্যাখে সরু বারান্দায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির রূপ।

এ শহর জ্যৈষ্ঠে পুড়ে এবং শ্রাবণে ভিজে টানে
ঠেলাগাড়ি, রাত্রি এলে শরীরকে উৎসব করার
বাসনায় জ্ব'লে সাত তাড়াতাড়ি যায় বেশ্যালয়ে।
এ শহর সাদা হাসপাতালের ওয়ার্ডে কেবলি
এপাশ ওপাশ করে, এ শহর সিফিলিসে ভোগে,
এ শহর পীরের দুয়ারে ধরনা দেয়, বুকে-হাতে
ঝোলায় তাবিজ তাগা, রাত্রিদিন করে রক্তবমি,
এ শহর কখনো হয় না ক্লান্ত শবানুগমনে।
এ শহর দারুণ দুক্ষোভে ছেঁড়ে চুল, ঠোকে মাথা
কালো কারাগারের দেয়ালে,
এ শহর ক্ষুধাকেই নিঃসঙ্গ বাস্তব জেনে ধুলায় গড়ায়;
এ শহর পল্টনের মাঠে ছোটে, পোস্টারের উল্কি-ছাওয়া মনে
এল গ্রেকো ছবি হয়ে ছোঁয় যেন উদার নীলিমা,
এ শহর প্রত্যহ লড়াই করে বহুরূপী নেকড়ের সাথে।

কতবার ভাবি

কতবার ভাবি তার উদ্দেশে লিখব না আর কবিতা।
প্রতিটি শব্দে ব্যথার তুষার জমিয়ে
কবিতা-মুক্তো কোনো দিন তাকে করব না উৎসর্গ।

সেই কবে তার কেশতরঙ্গে হৃদয় টালমাটাল
নৌকোর মতো প্রহরে প্রহরে নিত্য উঠত দুলে,
সেই আমাদের জীবন-রাঙানো বনভোজনের দিন,
সূর্য ডোবার মুহূর্তে মৃদু স্বর দিয়ে প্রাণ ছোঁয়া,
পাহাড়ি পথের ঝরনার ধারে উড্ডীন পাখি দেখা–
এসব খুচরো ঘটনাবলির স্বাক্ষর আজও বই।

আমার ওষ্ঠ তার ওষ্ঠের গাঢ় বন্দরে
ভিড়তে অধীর হয়েছে যখন,
মৃত চড়ুইটা পড়েছিল চুপ মেঝের ওপর,
হাওয়ায় জড়ানো স্তব্ধ শরীর।
নৈঃশব্দের হৃৎপিণ্ডের মতো আমরাও
যুগ্ম দোলায় কেঁপেছি শুধুই।

উথালপাথাল ঢেউয়ের চূড়ায় হৃদয়ের সাঁকো
ভেসেছে চকিতে একদা যখন,
দুপুরের লাল এজলাসে দুলে জারুলের শাখা
করেছিল বুঝি জজিয়তি খুব।
আমাদের প্রেম ফুলের মতন উঠেছিল ফুটে,
তোমরা বলতে পারো।
আমাদের দেখে সন্ধ্যার মেঘ উঠেছিল জ্ব'লে,
তোমরা বলতে পারো।

কতবার তাকে এই তো এখানে, মানে খোলা এই
বারান্দাটায়
অথবা ঘরের সুশ্রী ছায়ায় চেয়ারে বসিয়ে
হয়েছি নিবিড়।
এই ব'সে থাকা, কথা বলা আর কথা না-বলা,
কিছু বিশ্বাস
কিছু সন্দেহ, কিছু রোমাঞ্চ– এই তো প্রেমের
ভাষান্তরণ।

তার সে বুকের নাক্ষত্রিক অলিন্দ আর
চোখের বাগানে হাতের মহলে অবক্ষয়ের
দারুণ বেলায় কার অধিকার? নেই তথ্যের
মূল্য কী আজ? সময় তো এক তুখোড় পাচক,
সোনালি-রুপালি ল্যাজা-মুড়ো সব হাতায় হাতায়
করে একাকার। আমাকেও তার হাঁড়িতে চাপিয়ে
দিচ্ছে তীব্র জাঁহাবাজ আঁচ। অবান্তরের
আবর্জনায় অনেক কিছুই চাপা প'ড়ে যায়।
সেই জঞ্জালে প্রায়-নিভন্ত অঙ্গার এক
রটায় হাওয়ায় : একদা কখনো সে ছিল আমার।
আমার স্বরের ব্যাকুল কোকিল– ভাবি রাত্তিরে মিশে–
কখনো আবার পৌঁছে যাবে কি তার বাসনার নীড়ে?
এই মুহূর্তে সে যদি আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে,
চোখ জ্বেলে রাখে চোখের ওপর, চুন-খসা দেয়ালের
বয়েসী ঘড়ির নিশ্চলতায় জাগবে কি ফের দোলা?
আগের মতোই হৃদয় আমার আরক্ত নাচ হবে?
এর যথার্থ উত্তর দিতে আমার ভীষণ বাধে।

এ-যুগে শুনছি, রটায় সবাই, হৃদয় থাকাটা বিপজ্জনক;
ভালোই হয়েছে, সুনীল নেকড়ে ছিন্নভিন্ন করেছে হৃদয়।
অতীত-প্রেতের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় শিহরিত ঘাস; মরা পাখিদের
ভয়ানক সাদা কংকাল নিয়ে খুব খসখসে কাগজের মতো
এলোমেলো আর ছেঁড়া-খোঁড়া সব পাখা নিয়ে মাঠ হাহাকার হয়।

কতবার ভাবি তার উদ্দেশে লিখব না আর কবিতা,
তবু তার প্রেত অতনু স্মৃতির রুমাল ওড়ায়

আমার রচিত শব্দে,
গন্ধ বিলায় ছন্দে।

পশু বিষয়ক কবিতা

খুব জনসমাগম হয়েছিল; ছেলেমেয়েগুলো ঘর ছেড়ে
পার্ক ছেড়ে, মাঠ ছেড়ে রাঙা ঘুড়ি এবং বেলুন
ওড়াতে ওড়াতে,
মহিলারা সেজেগুঁজে বাতাসে মেয়েলি ঘ্রাণ ছড়াতে ছড়াতে
সেখানে নিবিড় এলো, যুবকেরা ছিমছাম, কেউ কেউ রাগী
দৃষ্টি মেলে চারদিকে এলো ভিড়ে, বুড়োরা স্মৃতির
পদশব্দ শুনে-শুনে।

খাঁচার ভেতরে কিছু জমকালো পশু। স্বাস্থ্যল পেশির খেলা
ভালো লাগে, বুঝি তাই খুব জনসমাগম হয়েছিল। বন ছেড়ে এই
সংকীর্ণ খাঁচায় যতটুকু ভালো থাকা যায় খেয়ে দেয়ে কিংবা
আলস্যে ঝিমিয়ে,
ভালো আছে ওরা সব। হঠাৎ লাফায় কেউ, দোল খায় কেউবা মজায়,
একজন করে ঘোরা-ফেরা, যেন গিন্নী ডেপুটির,
এবং শিম্পাঞ্জিটিকে দেখে মনে হয় দেকার্তের
শাণিত পাতার স্বাদ জানা আছে তার। কেউ এত পায়চারি
করছে ভারিক্কি চালে, যেন হোমরা-চোমরা নেতা কেউ,
এক্ষুণি ধরবে ছেঁকে তুখোড় রিপোর্টারের ঝাঁক।

পরিচর্যা চলে যথারীতি, বস্তুত খাঁচায় নেই
খাদ্যাভাব উপরন্তু দর্শকেরা শৌখিন আদরে
দেয় খেতে ছোলা কলা ইত্যাদি, ইত্যাদি। দূরে থেকে
ক'জন ভিখারি, লুব্ধ দৃষ্টি, চলে যায় মাথা হেঁট করে।

মা

ছিলেন নিভৃত গ্রামে। সর্বক্ষণ সংসারের খুঁটিনাটি কাজে
মগ্ন, আসমানে রৌদ্র কাঁপে, মেঘের পানসি ভাসে, কখন যে ক'টা বাজে
থাকে না খেয়াল কিছু। দৃশ্য খুবই চেনাশোনা, মৃদু রঙমাখা,
নানা সূক্ষ্ম সূত্রে গাঁথা; চুলায় চাপানো হাঁড়ি পুঁইশাক-ঢাকা
মাছ পড়ে গোটা দুই শিক্ষক স্বামীর পাতে। লাউয়ের মাচায়
কখনো রাখেন চোখ, কাঁঠাল গাছের ডালে হলদে পাখি লেজটি নাচায়
ঘন ঘন, বেলা বাড়ে। ইঁদারার পানিতে গোসল সেরে কাঁচা-পাকা চুলে
চালান কাঁকই দ্রুত আর ভাবেন খোকন স্কুলে
নামতা মুখস্থ করে। বৈয়মে রাখেন নকশি পিঠা, মনে পড়ে
বড় ছেলেটির কথা, চোখ যার বড় বেশি জ্বলজ্বলে, পড়াশোনা করে যে শহরে।

এ বাড়ির গণ্ডি ছাড়া কোথায়ও পড়ে না তাঁর পায়ের পাতার
কালো ছাপ, সারাক্ষণ থাকেন আড়ালে আর খসে না মাথার
কাপড় ভুলেও কারো সমুখে কখনো। বেঁচে নেই বাপজান
আম্মাও ওপারে আজ, তবু মাঝে-মাঝে প্রাণ করে আনচান।

ক্রুদ্ধ দেবতার মতো তোলে মাথা সারা দেশ।
কত যে খবর আসে, কত আত্মদান
রাঙায় দেশের মাটি; সন্তানের রক্তমাখা জামার আহ্বান
টানে গ্রাম্য জননীকে। অনেক পেছনে রইল প'ড়ে
লাউয়ের সবুজ মাচা, নদী, মাঠ,
কলাইয়ের ক্ষেত আর পুকুরের ঘাট।
পড়ছে পায়ের ছাপ আজ তাঁর জনপথে, আনাচে-কানাচে, সবখানে
মেলালেন পুত্রহীন হৃদয়ের দীপ্ত কান্না শ্লোগানে, শ্লোগানে।

স্বর্গচ্যুতির পরে

তুই না ডাকলে এ জনাকীর্ণ
নকল স্বর্গে আসত কে?
ঘৃণা করি তোকে যেমন জীর্ণ
অসুস্থ লোক স্বাস্থ্যকে।

রূপ দেখি তোর যেমন দীপ্ত
চাঁদকে গলির খঞ্জটা।
ঈর্ষায় জ্বলি, চির অতৃপ্ত
চক্ষে ঘৃণার ঘনঘটা।

তোর বিচ্ছেদে আত্মহত্যা
করব ভেবেই সুখ পেলি।
কিন্তু এখনও আমার সত্তা
লুটছে দিনের লাল চেলি!

চিন্তার জ্ঞানী জটিল সর্প
আমাকে ফেরায় বাস্তবে।
এত যদি তোর সাধের দর্প,
চুম্বন কেন চাস তবে?

মরব হারিয়ে নকল স্বর্গ,
জানি ছিল তোর বিশ্বাস।
ঝুলুক নরকে ত্রাসের খড়্গ
সেখানেই নেব নিঃশ্বাস।

দাঁত

বয়স আমার চল্লিশ হল
এবং তোমার থরোথরো ষোলো।
কৃতী নই কোনো, আমি অভাজন;
অনেক আশায় নষ্ট গাজন।

কলেজের বাস ক'টি বসন্ত
নিয়ে থামলেই মাঝে মাঝে দেখি।
তোমার জুতোর খুরে ওড়ে কাল,
হৃদয় স্মৃতির জোছনায় সেঁকি।

হঠাৎ কখনো তোমার গালের
রক্তাভা দেখে লাগে বড় চেনা–
যেন তা ট্রয়ের সূর্যাস্তের
অতীব বিধুর মেঘেদের ফেনা।

তোমার ও-মুখমণ্ডল দেখে
মনে পড়ে আরও দৃশ্য ভিন্ন,
এক লহমায় মনে প'ড়ে যায়
নভোচারীদের পায়ের চিহ্ন।
একদা তোমার বয়স যখন
পাঁচটি চাঁপার মতো অবিকল,
দেখেছি সেদিন তুমি কচি দাঁতে
কামড়ে কামড়ে খেতে কত ফল।

আজও অবশ্য শুভ্র দাঁতের
ধারে ছিঁড়ে নাও ফলের চামড়া
এবং মাংস। শুধু তাই নয়,
আরও কিছু কথা জেনেছি আমরা।

তোমার তীক্ষ্ণ দাঁতের ফলায়
ক্ষতবিক্ষত রক্তগোলাপ;
বাঘিনীর মতো ঠোঁট চাটো আর
দু'পায়ে মাড়াও পাখির বিলাপ।

তোমার দাঁতের শরশয্যায়
বুক পেতে দিয়ে সুখ যারা চায়,
সেই গোষ্ঠীর আমি নই কেউ;
মজ্জা চাটছে বয়সের ফেউ।

দুঃস্বপ্নে একদিন

চাল পাচ্ছি, ডাল পাচ্ছি, তেল নুন লাকড়ি পাচ্ছি,
ভাগ-করা পিঠে পাচ্ছি, মদির রাত্তিরে কাউকে নিয়ে
শোবার ঘর পাচ্ছি, মুখ দেখবার
ঝকঝকে আয়না পাচ্ছি, হেঁটে বেড়ানোর
তকতকে হাসপাতালি করিডর পাচ্ছি।
কিউতে দাঁড়িয়ে খাদ্য কিনছি,
বাদ্য শুনছি।

সরকারি বাসে চড়ছি,
দরকারি কাগজ পড়ছি,
কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি,
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা
পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনি কথা শুনছি,
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।
আপনারা নতুন পয়ঃপ্রণালী পরিকল্পনা নিয়ে
জল্পনা-কল্পনা করছেন,
কারাগার পরিচালনার পদ্ধতি শোধরাবার
কথা ভাবছেন (তখনো থাকবে কারাগারে)
নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে, মাটি কাটছে ট্রাক্টর,
ফ্যাক্টরি ছড়াচ্ছে ধোঁয়া, কাজ হচ্ছে,
কাজ হচ্ছে,

কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি।

মধ্যে মধ্যে আমার মগজের বাগানের সেই পাখি
গান গেয়ে ওঠে, আমার চোখের সামনে
হঠাৎ কোনো রুপালি শহরের উদ্ভাসন।
দোহাই আপনাদের, সেই পাখির
টুঁটি চেপে ধরবেন না, হত্যা করবেন না বেচারীকে।

কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি,
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা

পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনি কথা শুনছি,
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।

আকাশের পেটে বোমা মারলেও

আকাশের পেটে বোমা মারলেও ছাই এক কাচ্চা
বিদ্যে-বুদ্ধি বেরুবে না, ঠিকরে পড়বে না পরামর্শ।
অথচ সুদূর
আকাশেরই দিকে ফ্যালফ্যাল চেয়ে থাকি বারবার।

পা-পোষে পাম্পশু ঘষে ঘষে কতদিন গেল, তবু
পদোন্নতি মাঠে মারা যাচ্ছে,
দপ্তরের খিটখিটে কিন্তু ফিটফাট বড় কর্তা
কেবলি ধমকাচ্ছেন হপ্তায় হপ্তায়।
যিনি হলে হতে পারতেন আমার শ্বশুর, তিনি তাঁর
আত্মজাকে পশুর মতোই
অন্যত্র চালান দিতে করেননি কসুর, হায় রে,
আমি শুধু আকাশের দিকে চেয়ে থাকি ফ্যালফ্যাল।
বোনগুলো আইবুড়ো থেকে যাচ্ছে ক্রমাগত আর
অনুজ ক'মাস ধরে ছেঁড়া প্যান্ট পরে যাচ্ছে স্কুলে।
উপরন্তু বিমুখ পাড়ার মুদি; বাবার বাতের
মালিশ কেনার পয়সাও নেই হাতে;
হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে দ্রুত জননী হচ্ছে ফৌত আর
আমি শুধু আকাশের দিকে ফ্যালফ্যাল চেয়ে থাকি।

শান্তির দোহাই পেড়ে সবাই মটকে দিচ্ছে পায়রার ঘাড়
এবং প্রগতিশীল নাটকের কুশী-
লবের কমতি নেই, পার্ট জানা থাক
অথবা না-থাক সমস্বরে চেঁচালেই কেল্লা ফতে।

অপরের পাকা ঘুঁটি বাঁচিয়ে নিজের ঘুঁটি ঘরে
তুলছে অনেকে,
একজন দিনদুপুরেই স্রেফ ছুরির ফলায়
নিপুণ ফাঁসিয়ে দিচ্ছে অন্যের উদর,
আমি শুধু আকাশের দিকে চেয়ে থাকি ফ্যালফ্যাল–
অথচ সুদূর
আকাশের পেটে বোমা মারলেও ছাই।

আমি কথা বলাতে চাই

আমি কথা বলাতে চাই,
কথা বলাতে চাই আমার ঘরের আসবাবপত্রকে,
ছাদের কার্নিশ আর জানলাকে, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে যে-গাছ,
গাছের ডালে লাফাচ্ছে যে-কাঠবিড়ালি,
আর আস্তাবলে ঝিমোচ্ছে বুড়োটে যে-ঘোড়া,
তাদের আমি কথা বলাতে চাই।

গাছের যত পাতা, আকাশের যত নক্ষত্র,
নদীর ঢেউ, হাওয়ার প্রতিটি ঝলক,
প্রতিটি ফুল, শিশিরের প্রতিটি বিন্দু,
আমার চোখের মণি, আমার হাত-গাছ,
ওদের সবাইকে আমি কথা বলাতে চাই।

কী ওরা বলবে, এক্ষুণি বলা মুশকিল।
সবাই কি বলবে একই কথা
ঘুরে ফিরে? না কি প্রত্যেকেই বলবে নিজস্ব কথা
অনন্য উচ্চারণে!
ওরা কি শোনাবে কোনো তত্ত্বকথা?
বলবে কি হাইড্রোজেন বোমার জন্মকাহিনী?
বলবে কি হিরোশিমা ভয়াবহভাবে
পঙ্গু হওয়ার পর
কী করে আধুনিক চৈতন্যে জমলো দুঃস্বপ্নের ভিড়?
ওরা কি দেবে স্বৈরতন্ত্রী মিথ্যার একনিষ্ঠ বিবরণ?

ওরা বলুক যে যার কথা, যেমন ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা বলুক।
সত্যাগ্রহের আগেই
ওদের সবাইকে আমি বাক-স্বাধীনতা দিতে চাই।

বন্দি শিবির থেকে

প্রথম প্রকাশ	পৌষ ১৩৭৮ [জানুয়ারি ১৯৭২]
প্রকাশক	অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা
প্রচ্ছদ-শিল্পী	পূর্ণেন্দু পত্রী
উৎসর্গ-পত্র	[অমুদ্রিত]

বন্দি শিবির থেকে

ঈর্ষাতুর নই, তবু আমি
তোমাদের আজ বড় ঈর্ষা করি। তোমরা সুন্দর
জামা পরো, পার্কের বেঞ্চিতে বসে আলাপ জমাও,
কখনো সেজন্যে নয়। ভালো খাও দাও
ফূর্তি করে সবান্ধব, সে জন্যেও নয়।

বন্ধুরা তোমরা যারা কবি,
স্বাধীন দেশের কবি, তাদের সৌভাগ্যে
আমি বড় ঈর্ষান্বিত আজ।
যখন যা খুশি
মনের মতন শব্দ কী সহজে করো ব্যবহার
তোমরা সবাই।
যখন যে শব্দ চাও, এসে গেলে সাজাও পয়ারে,
কখনো অমিত্রাক্ষরে, ক্ষিপ্র মাত্রাবৃত্তে কখনো-বা।
সে সব কবিতাবলি, যেন রাজহাঁস,
দৃপ্ত ভঙ্গিমায় মানুষের
অত্যন্ত নিকটে যায়, কুড়ায় আদর।

অথচ এ দেশে আমি আজ দমবন্ধ
এ বন্দি শিবিরে,
মাথা খুঁড়ে মরলেও পারি না করতে উচ্চারণ
মনের মতন শব্দ কোনো।
মনের মতন সব কবিতা লেখার
অধিকার ওরা
করেছে হরণ।

প্রকাশ্য রাস্তায় যদি তারস্বরে চাঁদ ফুল পাখি
এমনকি নারী ইত্যাকার শব্দাবলি
করি উচ্চারণ, কেউ করবে না বারণ কখনো।
কিন্তু, কিছু কিছু শব্দকে করেছে
বেইনি ওরা
ভয়ানক বিস্ফোরক ভেবে।
স্বাধীনতা নামক শব্দটি
ভরাট গলায় দীপ্ত উচ্চারণ করে বার বার
তৃপ্তি পেতে চাই। শহরের আনাচে-কানাচে

প্রতিটি রাস্তায়
অলিতে গলিতে
রঙিন সাইনবোর্ডে, প্রত্যেক বাড়িতে
স্বাধীনতা নামক শব্দটি
লিখে দিতে চাই
বিশাল অক্ষরে।
স্বাধীনতা শব্দ এত প্রিয় যে আমার
কখনো জানিনি আগে। উঁচিয়ে বন্দুক
স্বাধীনতা, বাংলাদেশ– এই মতো শব্দ থেকে ওরা
আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে সর্বদা।

অথচ জানে না ওরা কেউ
গাছের পাতায়, ফুটপাতে
পাখির পালকে কিংবা নারীর দু'চোখে
পথের ধুলায়
বস্তির দুরন্ত ছেলেটার
হাতের মুঠোয়
সর্বদাই দেখি জ্বলে স্বাধীনতা নামক শব্দটি।

কিছুই নেই

কী আছে আমার আজ? এমন কিছুই নেই যার
হিরন্ময়তায় দেবতার
দ্যুতি হবে ম্লান আর বিত্তবানগণ
হবেন আমার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।

বান্ধববর্জিত আমি, গুণীরা করেন অবহেলা
সর্বক্ষণ, ইতর সংসর্গে কাটে বেলা
এখন আমার। কেউ ডুগডুগি বাজায়,
করতালি দেয় আমার চান্দিকে, কেউ যায়
চলে বাঁকা দৃষ্টি ছুড়ে, কেউ দেয় শিস
যেন জাদুকরের বানর আমি আছি অহর্নিশ
খেলার দড়িতে বাঁধা। ভুল
খেলা দেখোনোর ফলে সারাক্ষণ দিতেছি মাশুল।

কী আছে আমার আজ? কিছু নেই, শুধু

বিভারিক্ত ধু-ধু,
পথপ্রান্তে আছি পড়ে, পরিত্যক্ত একা;
প্রার্থিত জনের দেখা
মেলে না কখনো। এমনকি কবিতাও
নিয়েছে ফিরিয়ে দৃষ্টি। নেই যেন কোথাও
সান্ত্বনার অমল উদ্যান। আমি আজ
আবহকুক্কুট প্রায়, কম্পমান, বাতাস বড়ই জাঁহাবাজ।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মত চিৎকার করতে করতে,
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হল। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে বলে ছাই হল গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে বলে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করল একটা কুকুর।
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিল পিতামাতার লাশের উপর।
তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে এক থুত্থুরে বুড়ো
উদাস দাওয়ায় বসে আছেন– তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্ণের

দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধরে দগ্ধ ঘরের।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
বসে আছে পথের ধারে।
তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহাবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী বলে যে নৌকো চালায় উদ্দাম ঝড়ে,
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্‌শাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে–
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা তুমি

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা–
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা,

স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল,
স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ-খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক,
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়া তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্ত জোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক,
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন,
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদির রঙ।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালোচুলে,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকির অমন তুলতুলে গালে রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

প্রবেশাধিকার নেই

প্রবেশাধিকার নেই। এখন আমার আনন্দের
দুঃখের ক্রোধের
ক্ষোভের প্রেমের
প্রবেশাধিকার নেই মনুষ্যসমাজে।
আগে আমি আনন্দিত হলে
একটি কবিতা লিখে খাতার পাতায়
সেই আনন্দের ছায়াটিকে রাখতাম ধরে।
আমার শয্যার পাশে দুঃখ কোনো দিন
হাঁটু মুড়ে বসলে নিঃশব্দে
আমি তার ছবি শব্দে ছন্দে আঁকতাম খুব
বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে। ক্রোধান্বিত হলে,
ক্রোধের গরগরে চিহ্নগুলি থাকত ছড়িয়ে
দুর্বাসার মতো জেদী পয়ারের প্রতিটি সারিতে।
ভালোবাসা পল্লবিত বৃক্ষের মতন
কেমন দাঁড়াত ঋজু শব্দের অরণ্যে।

আমার আনন্দ, দুঃখ, ক্রোধ, ক্ষোভ, ভালোবাসা
নানান কবিতা হয়ে মানুষের কাছে
পৌঁছে যেত যথারীতি, এখন আমার আনন্দের
দুঃখের ক্রোধের
ক্ষোভের প্রেমের
প্রবেশাধিকার নেই মনুষ্যসমাজে।

এখন আমার ক্রোধ দুঃখ
আনন্দ অথবা ভালোবাসা কবিতার ছদ্মবেশে
কেবলি লুকায়
দেরাজের একান্ত কোটরে
নিভৃত আলমারি কিংবা সুটকেসে। যেন
ওরা পার্টিকর্মী,
গোয়েন্দা এবং পুলিশের
চোখে ধুলো দিয়ে
আড়ালে থাকতে চায় ধরপাকড়ের মরসুমে।

পথের কুকুর

অবশ্য সে পথের কুকুর। সারাদিন
এদিক ওদিকে ছোটে, কখনোবা ডাস্টবিন খুঁটে
জুড়ায় জঠরজ্বালা, কখনো আবার প্রেমিকার
মনোরঞ্জনের জন্য দেয় লাফ হরেক রকম।
হাড় নিয়ে মুখে বসে গাছের ছায়ায়,
লেজ নাড়ে মাঝে-মধ্যে ফুর্তিবাজ প্রহরের, কখনো
ধুলায় গড়ায়। কখনো সে
শূন্যতাকে সাজায় চিৎকারে

আমি বন্দি নিজ ঘরে। শুধু
নিজের নিঃশ্বাস শুনি, এত স্তব্ধ ঘর।
আমরা কজন শ্বাসজীবী।
ঠায় বসে আছি
সেই কবে থেকে। আমি, মানে
একজন ভয়ার্ত পুরুষ,
সে, অর্থাৎ সন্ত্রস্ত মহিলা,
ওরা, মানে কয়েকটি অতি মৌন বালক-বালিকা–
আমরা ক'জন
কবুরে স্তব্ধতা নিয়ে বসে আছি। নড়ি না চড়ি না
একটুকু, এমনকি দেয়াল-বিহারী টিকটিকি
চকিতে উঠলে ডেকে, তাকেও থামিয়ে দিতে চাই,
পাছে কেউ শব্দ শুনে ঢুকে পড়ে ফালি ফালি চিরে মধ্যবিত্ত
নিরাপত্তা আমাদের! সমস্ত শহরে
সৈন্যেরা টহল দিচ্ছে, যথেচ্ছ করছে গুলি, দাগছে কামান
এবং চালাচ্ছে ট্যাঙ্ক যত্রতত্র। মরছে মানুষ
পথে ঘাটে ঘরে, যেন প্লেগবিদ্ধ রক্তাক্ত ইঁদুর।
আমরা ক'জন শ্বাসজীবী–
ঠায় বসে আছি
সেই কবে থেকে। অকস্মাৎ কুকুরের
শাণিত চিৎকার
কানে আসে, যাই জানলার কাছে, ছায়াপ্রায়। সেই
পথের কুকুর দেখি বারংবার তেড়ে যাচ্ছে জলপাইরঙ
একটি জিপের দিকে, জিপে
সশস্ত্র সৈনিক কতিপয়। ভাবি, যদি
অন্তত হতাম আমি পথের কুকুর।

প্রতিশ্রুতি

কথা দিচ্ছি, তোমার কাছেই যাব, গেলে
তুমি খুশি হবে খুব, মেলে
দেবে ধীর অনাবিল আপন গ্রহণ সত্তা। আজ
আমাকে ডেকো না বৃথা। তোমার সলাজ
সান্নিধ্যে যাওয়ার মতো মন নেই। শহুরে বাগান
রাখুক দরজা খুলে, তোমার ত্বকের মৃদু ঘ্রাণ
পারব না নিতে। যখন সময় হবে দিচ্ছি কথা,
অঞ্জলিতে নেব তুলে মুখ– হে রঙিন কোমলতা।

আমাদের বুকে জ্বলে টকটকে ক্ষত,
অনেকে নিহত আর বিষম আহত
অনেকেই। প্রেমালাপ সাজে না বাগানে
বর্তমানে আমাদের। ভ্রমরের গানে
কান পেতে থাকাও ভীষণ বেমানান
আজকাল। সৈন্যদল অদূরেই দাগছে কামান।

আমাদের ক্ষত সেরে গেলে
কোনো এক বিনম্র বিকেলে
তোমার কাছেই যাবে হে আমার সবচেয়ে আপন গোলাপ,
করবো না কথার খেলাপ।

কাক

গ্রাম্য পথে পদচিহ্ন নেই। গোঠে গরু
নেই কোনো, রাখাল উধাও, রুক্ষ সরু
আল খাঁ-খাঁ, পথপার্শ্বে বৃক্ষেরা নির্বাক
নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।

প্রাত্যহিক

যথারীতি বিষম নিয়মপরায়ণ
কাক চেরে ঘুম ভোরে। শয্যাত্যাগী আমি
দাঁত মাজি, করি পায়চারি, মাঝে-মধ্যে

আওড়াই তর্জমায় এলিয়টি পঙক্তি–
এপ্রিল নিষ্ঠুরতম মাস। প্রাতরাশ
যৎসামান্য, চা আর বাকরখানির গন্ধে
অভ্যস্ত গার্হস্থ্য দিন। সংবাদপত্রের মিথ্যা গেলি
একরাশ, তাকাই কখনো
আকাশের দিকে। অকস্মাৎ জঙ্গি জেট
ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় নীলিমাকে।

নিরানন্দ ডালভাত নাকে মুখে গুঁজে
মন দিই আপিস যাত্রায়
বেলা দশটায়।
মুখের প্রতিটি খাঁজে সন্ত্রাস কাঁকড়া হয়ে আছে।
পথে দেখি,
ধাঁ করে একটি ট্রাক যাচ্ছে ছুটে, আরোহী ক'জন
চোখ-বাঁধা, হাত-বাঁধা আবছা মানুষ,
পাশে রাইফেলধারী পাঞ্জাবি সৈনিক।

ছাত্র নই, মুক্তিসেনা নেই কোনো, তবু
হঠাৎ হ্যান্ডস আপ বলে
পশ্চিমা জোয়ান আসে তেড়ে
স্টেনগান হাতে আর প্রশ্ন দেয় ছুড়ে ঘাড় ধরে–
বাঙালি হো তুম। আমি রুদ্ধবাক, কি দেব জবাব?

জ্যোতির্ময় রৌদ্রালোকে বীরদর্পী সেনা
নিমেষেই হয়ে যায় লুটেরা, তস্কর।
খুইয়ে সামান্য টাকা কড়ি,
শ্বশুর প্রদত্ত হাতঘড়ি কোনোমতে
প্রাণপক্ষী নিয়ে ফিরি আপিস-কন্দরে।

এদিকে বিষম
পানাসক্ত প্রেসিডেন্ট– ইনিও সৈনিক–
দিচ্ছেন ভাষণ
বেতার টেলিভিশনে, ঢুলু ঢুলু গলায় কেমন

গাইছেন গণ-
হত্যার সাফাই।
বিদেশী সংবাদদাতাগণ মিছেমিছি করছেন বাড়াবাড়ি
অর্থাৎ তিলকে তাল। লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র লোককে

নাকি তাঁর বীর সৈনিকেরা
কখনো করেনি হত্যা, পোড়ায়নি শহর ও গ্রাম।
সব ঝুট হ্যায়, সব ফালতু গুজব।
সত্যের মৌরসীপাট্টা একা তাঁরই। একেই তো বলে
কসাইখানার হেকমত। মাইরি হুজুর বটে
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

দুনিয়ার সব শৃঙ্খলিত কৃষক মজুর শোনো,
সর্বহারা নিধনের জন্যে অবিরাম
আসছে বারুদ বোমা স্বৈরাচারী শাসকের হাতে,
কখনো-বা, বলিহারি যাই, গুঁড়া দুধ।
খাসা কূটনীতি,
চীনা ও মার্কিন কালোরাতি।

বড় আটপৌরে এ জীবন,
প্রশংসা অথবা নিন্দা কিছুই জোটে না
এ পোড়া কপালে।
সত্যের বলাৎকার দেখে, নিরপরাধের হত্যা
দেখেও কিছুতে মুখ পারি না খুলতে।
বুটের তলায় পিষ্ট সারাদেশ, বেয়নেটবিদ্ধ
যাচ্ছে বয়ে রক্তস্রোতে, কত যে মায়ের অশ্রুধারা।

পাড়ায় পাড়ায় খাল কেটে
কুমির আনছে কেউ কেউ। রাত হলে,
এমনকি দিনদুপুরেই
কেবলি দৌরাত্ম্য বাড়ে রাজাকার, পুলিশ এবং
সৈনিকের। ধরপাকড়ের নেই শেষ। মাঝে-মাঝে
মধ্য রাতে নারীর চিৎকারে ভাঙে ঘুম,
তাকাই বিহ্বলা গৃহিণীর দিকে। ভাবি,
জান দিয়ে মান রাখা যাবে তো আখের?

তুমুল গাইছে গুণ কেউ কেউ কুণ্ঠাহীন খুনি
সরকারের, কেউ কেউ ইসলামী বুলি ঝেড়ে তোফা
বুলবুল হতে চায় মৃতের বাগানে।
কেউবা জমায় দোস্তি নিবিড় মস্তিতে
ভ্রাতৃঘাতকের সাথে। গদগদে দালাল,
বখাটে যুবক আর ভাড়াটে গুণ্ডারা

রটাচ্ছে শান্তির বাণী লাঠিসোটা নিয়ে।
অলিতে গলিতে দলে দলে
মোহাম্মদী বেগ ঘোরে, ঝলসিত নাঙা তলোয়ার।

নেপথ্যে মীরজাফর বঙ্কিম গোঁফের নিচে মুচকি হাসেন।

উদ্ধার

কখনো বারান্দা থেকে চমৎকার ডাগর গোলাপ
দেখে, কখনো-বা
ছায়ার প্রলেপ দেখে চৈত্রের দুপুরে
কিংবা দারুমূর্তি দেখে সিদ্ধার্থের শেলফ-এর ওপর
মনে করতাম,
যুদ্ধের বিপক্ষে আমি, আজীবন বড় শান্তিপ্রিয়।
যখন আমার ছোট্ট মেয়ে
এক কোণে বসে
পুতুলকে সাজায় যতনে, হেসে ওঠে
ভালুকের নাচ দেখে, চালায় মোটর, রেলগাড়ি
ঘরময়, ভাবি,
যুদ্ধের বিপক্ষে আমি, আজীবন বড় শান্তিপ্রিয়।

যখন গৃহিণী সংসারের কাজ সেরে
অন্য সাজে রাত্রিবেলা পাশে এসে এলিয়ে পড়েন,
অতীতকে উস্‌কে দেন কেমন মাধুর্যে
অরব বচনাতীত, ভাবি–
যুদ্ধের বিপক্ষে আমি, আজীবন বড় শান্তিপ্রিয়।

আজন্ম যুদ্ধকে করি ঘৃণা।
অস্ত্রের ঝনঝনা
ধমনীর রক্তের ধারায়
ধরায়নি নেশা কোনো দিন।
যদিও ছিলেন পিতা সুদক্ষ শিকারি
নদীর কিনারে আর হাঁসময় বিলে,
মারিনি কখনো পাখি একটিও বাগিয়ে বন্দুকে

নৌকোর গলুই থেকে অথবা দাঁড়িয়ে
একগলা জলে। বাস্তবিক

কস্মিনকালেও আমি ছুঁইনি কার্তুজ।

গান্ধিবাদী নই, তবু হিংসাকে ডরাই
চিরদিন; বাধলে লড়াই কোনোখানে
বিষাদে নিমগ্ন হই। আজন্ম যুদ্ধকে করি ঘৃণা।
মারী আর মন্বন্তর লোকশ্রুত ঘোড়সওয়ারের
মতোই যুদ্ধের অনুগামী। আবালবৃদ্ধবনিতা
মৃত্যুর কন্দরে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে
অবিরাম। মূল্যবোধ নামক বৃক্ষের
প্রাচীন শিকড় যায় ছিঁড়ে, ধ্বংস
চতুর্দিকে বাজায় দুন্দুভি।
আজন্ম যুদ্ধকে করি ঘৃণা।

বিষম দখলিকৃত এ ছিন্ন শহরে
পুত্রহীন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করুন,
সৈনিক ধর্ষিতা তরুণীকে
জিজ্ঞেস করুন,
যন্ত্রণাজর্জর ঐ বাণীহীন বিমর্ষ কবিকে
জিজ্ঞেস করুন,
বাঙালি শবের স্তূপ দেখে দেখে যিনি
বিড়বিড় করছেন সারাক্ষণ, কখনো হাসিতে
কখনো কান্নায় পড়ছেন ভেঙে– তাকে
জিজ্ঞেস করুন,
দগ্ধ, স্তব্ধ পাড়ার নিঃসঙ্গ যে ছেলেটা
বুলেটের ঝড়ে
জননীকে হারিয়ে সম্প্রতি খাপছাড়া
ঘোরে ইতস্তত, তাকে জিজ্ঞেস করুন,
হায়, শান্তিপ্রিয় ভদ্রজন,
এখন বলবে তারা সমস্বরে, যুদ্ধই উদ্ধার।

দখলি স্বত্ব

টিলার ওপর নয়, নদী তীরে নয়, এমনকি
পুকুর পাড়েও নয়, গলিতেই দাঁড়ানো আমার
একতলা বাড়ি।
হরিণ পাবে না খুঁজে বাড়ির তল্লাটে

অথবা কুকুর হতে সাবধান নামক নোটিশ
দেখবে না গেটে যদি আসো
হঠাৎ এখানে কোনো দিন। আসবাব-
পত্র জমকালো নয় মোটে, আছে শুধু
যা না থাকলেই নয়। তবু
আমার অত্যন্ত প্রিয় এই জীর্ণ বাড়ি। ভালো লাগে
এর সব ক'টি ঘর। একরত্তি উঠোনে যখন
শিশুরা উজ্জ্বল খেলে কিংবা
করে ছোটাছুটি
মিনিটে মিনিটে, ভালো লাগে,
বড় ভালো লাগে আর বাড়ির কোণের
সেই ছোট ঘর,
যেখানে রয়েছে পাতা খাট, বইময় একটি টেবিল,
যেখানে ঘুমাই, পড়ি, লিখি,
প্রুফ দেখি ইত্যাদি, ইত্যাদি,
সেই ঘর ছেড়ে অন্য কোনো ঘরে-
হোক তা যতই চোখ-ধাঁধানো, আয়েশী-
কখনো করব বসবাস, কিছুতেই
পারি না ভাবতে
অথচ আমার
বাড়ির দখলি স্বত্ব হারিয়ে ফেলেছি।
সব ক'টি ঘর জুড়ে বসে আছে দেখি
বিষম অচেনা এক লোক-
পরনে পোশাক খাকি, হাতে কারবাইন।

না, আমি যাব না

না, আমি যাব না
অন্য কোনোখানে।

আমিও নিজেকে ভালোবাসি
আর দশজনের মতন। সকালের
টাটকা মাখন-রোদে জেগে ওঠা, প্রাতরাশ সেরে
তুমুল আড্ডায় মাতা, চেনা রাস্তা দিয়ে
ওয়া, রাত্রি জেগে বই পড়া, আলাপ জমানো

বন্ধুদের সাথে
আমারও অত্যন্ত ভালো লাগে।

আমিও নিজেকে ভালোবাসি
আর দশজনের মতন। ঘাতকের
অস্ত্রের আঘাত
এড়িয়ে থাকতে চাই আমিও সর্বদা।
অথচ এখানে রাস্তাঘাটে
সবাইকে মনে হয় প্রচ্ছন্ন ঘাতক।
মনে হয়, যে কোনো নিশ্চুপ পথচারী
জামার তলায়
লুকিয়ে রেখেছে ছোরা, অথবা রিভলবার, যেন
চোরাগোপ্তা খুনে
পাকিয়েছে হাত সকলেই।

জানি, গুপ্তচর
করছে অনুসরণ সারাক্ষণ। কখনো নিজেরই
ছায়া দেখে ভীষণ চমকে উঠি। রাজাকার, পুলিশ, জওয়ান
যারা খুশি তুলে নিয়ে যেতে পারে মধ্যরাতে অথবা দুপুরে
আমার সামান্য মৃতদেহ
বুকে নিয়ে বুড়িগঙ্গা বয়ে যেতে পারে নিরবধি।

তবু আমি যাব না কখনো
অন্য কোনোখানে। খুঁজব না
নিশ্চিন্ত আশ্রয়
অন্য কোনো আকাশের নিচে।

এখন পড়ে না চোখে চেনা মুখ কোথাও তেমন
কোনোখানে। কখনো চমকে উঠি দেখে
কাউকে নির্জন বাসস্টপে। মনে হয়,
চিনি তাকে, সান্নিধ্যে গেলেই
ভাঙে ভুল, মাথা হেঁট করে
পথ চলি পুনর্বার। বন্ধুরা অনেকে
দেশান্তরী, বস্তুত প্রত্যহ
হচ্ছে বাস্তুত্যাগী
সন্ত্রাসতাড়িত
হাজার হাজার লোক, এমনকি অসংখ্য কৃষক

আদি ভিটা জমিজমা ছেড়ে
খোঁজে ঠাঁই যেমন-তেমন ভিন দেশে।

তবু আমি যাব না কখনো
অন্য কোনোখানে
থাকব তাদের সঙ্গে এখানেই, বাজেয়াপ্ত হয়েছে যাদের
দিনরাত্রি, যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে সকল সময় সারিবদ্ধ
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা যাদের নিয়তি।

আমারও সৈনিক ছিল

আমারও সৈনিক ছিল কিছু–
মাথায় লোহার টুপি, সবুজ ইউনিফরম পরা,
হাতে রাইফেল। শৈশবের বারান্দায় নিরিবিলি
কল টিপে দম
দিলেই চকিতে ওরা কুচ-
কাওয়াজে উঠত মেতে। কি নিরীহ ভঙ্গি–
মুখে হাসি আঁটা। থেমে যেত
দম ফুরুলেই। আমি বড়
ভালোবাসতাম শৈশবের
সেই সৈন্যদের।
একদা হঠাৎ
আমার অনুজ
একটি সৈন্যের ঘাড় ভেঙে ফেলেছিল বলে আমি
তার সঙ্গে তিন
আড়ি দিয়েছিলাম আজও তা মনে পড়ে।
আমার সুদূর শৈশবের
ক্ষুদে সৈনিকেরা আজ যেন তিন ডাইনীর মন্ত্রে
ভয়ানক দীর্ঘকায় হয়ে ট্রাকে জিপে
শহরে টহল দিচ্ছে। যখন তখন
তেড়ে আসে আমার দিকেই
উঁচিয়ে মেশিনগান আর আমি পালিয়ে বেড়াই
জাঁহাবাজ সৈন্যদের দৃষ্টি থেকে দূরে।
কী আশ্চর্য এখন ওদের প্রত্যেকের ঘাড়
গাছের ডালের মতো মটমট ভাঙতে পারলে
আমি ভারি আনন্দ পেতাম।

মধুস্মৃতি

দু'দশক পরেও স্ফটিক মনে পড়ে–
বৈশাখের খটখটে স্বেদাক্ত দুপুরে,
প্রথম কদম শিহরিত
আষাঢ়ের জলজ দিবসে
ব্রাউন পাখির মতো অঘ্রাণের রেশমি বিকেলে
ক্যান্টিনে ঢুকেই বলতাম তৃষ্ণাতুর,
মধুদা চা দিন তাড়াতাড়ি,
গরম সিঙাড়া চাই, চাই স্বাদু শীতল সন্দেশ।

ক্লাস শেষ হলে, লাইব্রেরি ঘরে না বসলে মন
আপনার ক্যান্টিনে আশ্রয় খুঁজতাম
বিবর্ণ চেয়ারে
চায়ের তৃষ্ণায় নয় তত
যতটা আড্ডার লোভে আমরা ক'জন।
একে একে অনেকেই জুটত সেখানে–
মদনরাজ্যের অনুগত প্রজা কেউ কেউ, কেউবা নবীন
সামন্ত প্রতাপশালী। কেউ
ক্ষীণকায়, প্রায় রোগী, কবি,
কেউবা বিপ্লবী নেতা, কেউবা বৃত্তিভোগী
মসৃণ দালাল। আমাদের কারো কারো
মনে ছিল ব্যাপ্ত কার্ল মার্কস-এর মহিমা।
টেবিলে টেবিলে কত তর্কের তুফান
যেত বয়ে, আপনি সামলাতেন শেড।

কাউন্টারে বসে হাসতেন মৃদু, নাড়তেন মাথা
মাঝে-মধ্যে। এক কোণে চেয়ারে এলিয়ে
কখনো আওড়াতাম ডানের তির্যক পঙ্‌ক্তি, সদ্যপড়া, আর
হ্যামলেটি স্বগত ভাষণে
উঠতাম মেতে লরেন্স অলিভিয়ারের মতোই।
নিজের কবিতা
দিতাম ব্যাকুল ঢেকে বন্ধুর শ্রুতিতে কখনো-বা। অন্য কোণে
বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ অথবা বাঙালি মানসের বিবর্তন
উঠত ঝলমলিয়ে দিব্যি তার্কিকের
জাগর মনস্বিতায়। কখনো আবার

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ইত্যাদি শব্দের
কোলাহলে প্রবল উঠত কেঁপে শেড্।
কখনোবা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে, গণ-আন্দোলনে
থরথর শহুরে রাস্তায়

কি আশ্চর্য, যেত উড়ে আপনার অলৌকিক মধুর ক্যান্টিন।

আপনাকে মনে হতো বৃক্ষের মতন,
উদার নিরুপদ্রব ডালে যার কাটায় সময়
নানান পাখির ঝাঁক, তারপর সহসা উধাও
কত যে বিচিত্র দিকে ফেরে না কখনো।

আমতলা এখনও হৃদয়ে
সবুজ দাঁড়িয়ে আছে এখনও রোদ্দুরলিপ্ত পাতা
শিহরিত হয়, প্রতিবাদী সভা, উত্তোলিত হাত,
প্রখর পোস্টার
চকিতে ঝলসে ওঠে এখনও হৃদয়ে। এখনও তো
আমতলা, মোহন টিনের শেড, ক্লাসরুম আর
নিঝুম পুকুর পাড়ে জ্বলে
দামি পাথরের মতো আপনার চক্ষুদ্বয়।

আপনি ছিলেন প্রিয়জন আমাদের
বড় অন্তরঙ্গ নানা ঘটনায়

উৎসব এবং দুর্বিপাকে। বুঝি তাই
আপনার রক্তে ওরা মিটিয়েছে তৃষ্ণা।

আমাদের প্রিয় যা কিছু সবই তো ওরা
হত্যা করে একে একে। শহীদ মিনার
অপবিত্র করে, ভাঙে মর্টারের ঘায়ে,
ফারুকের সমাধিস্থ লাশ খুঁড়ে তোলে
দারুণ আক্রোশে
ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে, কে জানে কোথায়।
বটতলা করে ছারখার।
আমাদের প্রিয় যা কিছু সবই তো ওরা
হত্যা করে একে একে।

আপনার নীল লুঙ্গি মিশেছে আকাশে,
মেঘে ভাসমান কাউন্টার। বেলা যায়, বেলা যায়

ত্রিকালজ্ঞ পাখি ওড়ে, কখনো স্মৃতির খড়কুটো
ব্যাকুল জমায়। আপনার স্বাধীন সহিষ্ণু মুখ–
হায়, আমরা তো বন্দি আজও– মেঘের কুসুম থেকে
জেগে ওঠে, ক্যাশবাক্স রঙিন বেলুন হয়ে ওড়ে।

বিশ্বাস করুন,
ভার্সিটি পাড়ায় গিয়ে আজও মধুদা মধুদা বলে খুব
ঘনিষ্ঠ ডাকতে সাধ হয়।

এখানে দরজা ছিল

এখানে দরজা ছিল, দরজার ওপর মাধবী-
লতার একান্ত শোভা। বারান্দায় টব, সাইকেল
ছিল, তিন চাকা-অলা, সবুজ কথক একজন
দ্বারবন্দি। রান্নাঘর থেকে উঠত রেশমী ধোঁয়া।

মখমল গায়ে কেউ, এঁটোকাঁটাজীবী, অন্ধকারে
রাখত কখনো জ্বেলে এক জোড়া চোখ। ভোরবেলা
খবর কাগজে মগ্ন কে নীরব বিশ্ব-পর্যটক
অকস্মাৎ তাকাতেন কাকময় দেয়ালের দিকে।

ভাবতেন শৈশবের মাঠ, বল-হারানোর খেদ
বাজত নতুন হয়ে। মুহূর্তে মুহূর্তে শুধু বল
হারাতেই থাকে, কোনো হুইসিল পারে না রুখতে।
ক্ষতির খাতায় হিজিবিজি অঙ্কগুলি নৃত্যপর।

এখানে দরজা ছিল, দরজার ওপর মাধবী-
লতার একান্ত শোভা। এখন এখানে কিছু নেই,
কিচ্ছু নেই। শুধু এক বেকুব দেয়াল, শেল-খাওয়া,
কেমন দাঁড়ানো, একা। কতিপয় কলঙ্কিত ইট
আছে পড়ে ইতস্তত। বাঁ দিকে তাকালে ভাঙাচোরা
একটি পুতুল পাবে, তা ছাড়া এখানে কিছু নেই।

ভগ্নস্তূপে স্থির আমি ধ্বংসচিহ্ন নিজেই যেনবা;
ভস্ম নাড়ি জুতো দিয়ে, যদি ছাই থেকে অকস্মাৎ
জেগে ওঠে অবিনাশী কোনো পাখি, যদি দেখা যায়
কাবুর হাসির ছটা, উন্মীলিত স্নেহ, ভালোবাসা।

তুমি বলেছিলে

দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার।
পুড়ছে দোকানপাট, কাঠ,
লোহালক্কড়ের স্তূপ, মসজিদ এবং মন্দির।
দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার।

বিষম পুড়ছে চতুর্দিকে ঘরবাড়ি।
পুড়ছে টিয়ের খাঁচা, রবীন্দ্র রচনাবলি, মিষ্টান্ন ভাণ্ডার,
মানচিত্র, পুরোনো দলিল।
মৌচাকে আগুন দিলে যেমন সশব্দে
সাধের আশ্রয়ত্যাগী হয়
মৌমাছির ঝাঁক
তেমনি সবাই
পালাচ্ছে শহর ছেড়ে দিগ্বিদিক। নবজাতককে
বুকে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত জননী
বনপোড়া হরিণীর মতো যাচ্ছে ছুটে।

অদূরে গুলির শব্দ, রাস্তা চষে জঙ্গি জিপ। আর্ত
শব্দ সবখানে। আমাদের দুজনের
মুখে আগুনের খরতাপ। আলিঙ্গনে থরথর
তুমি বলেছিলে,
'আমাকে বাঁচাও এই বর্বর আগুন থেকে, আমাকে বাঁচাও'
আমাকে লুকিয়ে ফেল চোখের পাতায়
বুকের অতলে কিংবা একান্ত পাঁজরে,
শুষে নাও নিমেষে আমাকে
চুম্বনে চুম্বনে।

দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার,
আমাদের চৌদিকে আগুন,
গুলির ইস্পাতি শিলাবৃষ্টি অবিরাম।
তুমি বলেছিলে,
'আমাকে বাঁচাও।'
অসহায় আমি তা-ও বলতে পারিনি।

রক্তাক্ত প্রান্তরে

এখন চরে না ট্যাঙ্ক ভাটপাড়া, ভার্সিটি পাড়ায়
দাগে না কামান কেউ লক্ষ্য করে ছাত্রাবাস আর।
এখন বন্দুক
জানালার ভেতরে হঠাৎ
দেয় না বাড়িয়ে গলা অন্ধকারে জীবনানন্দীয়
উটের মতন। ফৌজি ট্রাক কিংবা জিপ
রাস্তায় রাস্তায়
পাগলা কুকুরের মতো দেয় না চক্কর। এখন তো
হেলমেটকে মানুষের মস্তকের চেয়ে
বেশি মূল্যবান বলে ভুলেও ভাবি না।

এখন বিজয়ানন্দে হাসছে আমার বাংলাদেশ
লাল চেলী গায়ে, কী উদ্দাম। গমগমে
রাস্তাগুলো সারাক্ষণ উজ্জ্বল বুদ্বুদময়। শুধু আপনাকে,
হ্যাঁ, আপনাকে মুনীর ভাই,
ডাইনে অথবা বাঁয়ে, কোথাও পাচ্ছি না খুঁজে আজ।
আপনার গলার চিহ্নিত স্বর কেন
এ শহরে প্রকাশ্য উৎসবে
শুনতে পাব না আর? সেই চেনা স্বর? ঝরা পাতার ওপর
খরগোশের মৃদু পদশব্দের মতন?
আপনার মতো আরও কতিপয় মুখ
চেনা মুখ আর
এখানে যাবে না দেখা, যাবে না কখখনো।

মনে পড়ে, জুনে জলে-ঘোলা পচা ডিমের বিশদ
কুসুমের মতো এক ঘোলাটে বিকেলে
এই শত্রু প্লাবিত শহরে হ'ল দেখা

আপনার সঙ্গে পথপার্শ্বে। দেখলাম,
আপনি যেনবা সেই জলচর পাখি,
ডাঙ্গায় চলতে গিয়ে ব্যর্থ,
হোঁচটে হোঁচটে
বিষম ক্ষতবিক্ষত, পরাজিত, দারুণ নিষ্প্রভ।
আমাদের সবার জীবনে
নেমেছে অকালসন্ধ্যা, হয়েছিল মনে,

আপনার চোখে চোখ রেখে।
তখন সে চোখে কবরের পরগাছার কী কর্কশ
বিষণ্নতা আর হানাবাড়ির আঁধার
লেপ্টে ছিল, বারুদের গন্ধ ছিল সত্তায় ছড়ানো।

'এই যে, কেমন আছ শামসুর রাহমান, তুমি?
খবর আছে কি কিছু?'–যেন আপনারই ছায়া কোনো
করল প্রশ্ন রক্তাক্ত প্রান্তরে। অসামান্য
বাগ্মীও কেমন আর্ত হন, হায়, বাক্যের দুর্ভিক্ষে,
বুঝেছি সেদিন।

আপনার চোখে বুঝি ফুটেছে অজস্র বনফুল,
নেমেছে জ্যোৎস্নার ঢল মুখের গহ্বরে, প্রজাপতি
পেলব আসন পাতে বৃষ্টি ধোয়া ললাটের মাঠে,
আপনাকে ঘিরে দৈনন্দিন
ঘাস আর পোকামাকড়ের গেরস্থালি।

আপনি মুনীর ভাই কুকুর কি শেয়ালের পায়ের ছাপের
অন্তরালে ঢাকা পড়ে থাকবেন, হায়,
কী করে আপোষ করি এমন ভীষণ অত্যাচারী
ভাবনার সাথে?
বলুন মুনীর ভাই, আপনি কি আগাছার কেউ?
আপনি কি ক্রীড়াপরায়ণ প্রজাপতিটার কেউ?
আপনি কি শেয়ালের? কুকুরের? ঘাসের? পিঁপড়ের?
শকুনের? আপনি কি ক্রূর ঘাতকের?

শুনুন মুনীর ভাই, আপনার বারান্দার নিভৃত বাগান
কেমন উদগ্রীব হয়ে আছে গৃহস্বামীর প্রকৃত
শুশ্রূষার লোভে আজও। একটি বিশুষ্ক ঠোঁট বৈধব্যের ঘাটে
জেগে থাকে আপনার উষ্ণ চুম্বনের প্রতীক্ষায়,
একটি টাইপরাইটার আপনার একান্ত স্পর্শের জন্যে
নিঝুম নীরব হয়ে থাকে। ফের কবে
পাতা উল্টাবেন বলে সকালে দুপুরে মধ্যরাতে
পথ চেয়ে থাকে শেল্‌ফময় গ্রন্থাবলি
আপনার পদধ্বনি আবার শুনবে বলে ঐ তো
এখনও ফ্ল্যাটের সিঁড়ি কান পেতে রয় সারাক্ষণ। কোনো কোনো
সভাগৃহ আপনার ভাষণের জন্যে আজও কেমন উৎকর্ণ

হয়ে পড়ে। আপনার অভ্যস্ত ছায়ার জন্যে এখনও পড়ে না
দর্পণের চোখের পলক।

'আছে কি খবর কিছু?'–আপনার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা
সাঁতরে বেড়ায় আজও আমার মগজে ক্ষান্তিহীন।
কেলিপরায়ণ
মাছের মতন কোন সংবাদে লেজ ধরে সেদিন বিকেলে
রক্তাক্ত প্রান্তরে
আপনাকে পারিনি দেখাতে।
অথচ এখন নানারঙা পাখি হয়ে ডেকে যায়
খবরের ঝাঁক ইতস্তত। শুনুন মুনীর ভাই
কালো জঙ্গি পায়ের তলায় চাপা-পড়া
আপনার বাংলাদেশ লক্ষ লক্ষ বুটের চেয়েও
বহু ক্রোশ বড় বলে বর্গীরা উধাও। বহুদিন
পরে আজ আমাদের মাতৃভূমি হয়েছে স্বদেশ,
ইত্যাদি ইত্যাদি
খবর শুনুন।

শুনুন মুনীর ভাই, খবর শুনুন বলে আজ
ছুটে যাই দিগ্বিদিক, কিন্তু, কই কোথাও দেখি না আপনাকে।
খুঁজছি ডাইনে বাঁয়ে, তন্ন তন্ন, সবদিকে, ডাকি
প্রাণপণে বার-বার। কোথাও আপনি নেই আর।

আপনি নিজেই আজ কী দুঃসহ বিষণ্ন সংবাদ।

তার কোট

কী করত সে? যদি প্রশ্ন তোলে কেউ, বলা যায়, প্রায়শ নিশ্চুপ
থাকত কোথাও বসে। ক্রিয়ায় পাখির মতো অথবা গাছের অনুরূপ
ছিল সে-ও; হাতে প্রজাপতি এসে অনায়াস ঢঙে
মুহূর্তগুলোকে তার অনুবাদ করে নানা রঙে
উড়ে যেত। বিন্দুভর্তি বোর্ডের মতন
নৌকোময় নদী দেখে কখনো কাটত বেলা, বন
উপবন যেন তার পায়ে পায়ে লগ্ন আর হাজার হাজার
পাখি তাকে পাখিময়তার
বৃত্তান্ত শুনিয়ে যেত প্রত্যহ দু'বেলা। জানতাম

সে নয় সাধক কোনো সন্ত জটাধারী, পেশিও সুদৃঢ় থাম
নয় কোনো কর্মে বলিয়ান। জগৎ-সংসার
ছিল কি ছিল না সত্য অনুভবে, বোঝা দায়; তবু ক্ষুরধার
সত্যের সান্নিধ্যে যেতে চেয়েছিল বুঝি,
তাই আজও ঘাসে ঘাসে মরালপঙ্‌ক্তিতে তাকে খুঁজি।

এভাবে কুড়াত কুটো কিংবা নুড়ি, যেন কোন প্রাচীন রানীর
রত্নহার করতলগত তার, শহুরে পানির
ফোয়ারা শোনাত তাকে জলকিন্নরীর কত গান
বার বার, তার হাতে মাইক চকিতে কী অম্লান
অর্ফিয়ুস-বাঁশি হয়ে যেত। থাকত সে রোজ প্রতীক্ষায়
মোড়ে মোড়ে, যদি কেউ ডাকে ছলচ্ছল আকাঙ্ক্ষায়।

পরনে পুরোনো কোট শীতগ্রীষ্মে, নক্ষত্র প্রতিম
ছিদ্র ছিল কোটময়; বর্ণ তার পীত না রক্তিম,
বলা মুশকিল; সে তো পথবাসী। যখন উজাড় হ'ল পথ,
মেশিন গানের বন্য বর্বর চিৎকারে লুপ্ত সকল শপথ,

সে থাকে দাঁড়িয়ে অবিচল কী অবুঝ দৃষ্টি মেলে
চতুর্দিকে। পলায়ন অর্থহীন ভেবে অবহেলে

পকেট উল্টিয়ে দেয় চৌরাস্তায়– রাজার মুকুট,
স্বর্গের সোনালি নকশা ঝরে যায়, কোথায় ক'ফুট
জায়গায় ঘুমায় কারা, বুঝি ভাবল সে; দেখি
হঠাৎ মাথার খুলি তার চাঁদ হলো নীলিমায় এবং সাবেকি
কোট তার টুকরো টুকরো পড়ল ছড়িয়ে কী ব্যাপক, প্রতি খণ্ডে বরাভয়
স্ফুলিঙ্গ-অক্ষরে লেখা 'আমি মৃত্যুঞ্জয়'।

গেরিলা

দেখতে কেমন তুমি? কী রকম পোশাক-আশাক
পরে করো চলাফেরা? মাথায় আছে কি জটাজাল?
পেছনে দেখতে পাব জ্যোতিশ্চক্র সন্তের মতন?
টুপিতে পালক গুঁজে অথবা জবরজং ঢোলা
পাজামা কামিজ গায়ে মগডালে একা শিস দাও
পাখির মতন কিংবা চাখানায় বসো ছায়াচ্ছন্ন।

দেখতে কেমন তুমি?—অনেকেই প্রশ্ন করে, খোঁজে
কুলুজি তোমার আঁতিপাঁতি। তোমার সন্ধানে ঘোরে
ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য, পাড়ায় পাড়ায়। তন্ন তন্ন
করে খোঁজে প্রতি ঘর। পারলে নীলিমা চিরে বের
করত তোমাকে ওরা, দিত ডুব গহন পাতালে।
তুমি আর ভবিষ্যৎ যাচ্ছ হাত ধরে পরস্পর।

সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ-তাড়ানিয়া;
তুমি তো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার।

আন্তিগোনে

শহর-মরু বিজন বড়,
নীরব তো সব গায়ক পাখি।
আন্তিগোনে, আন্তিগোনে
রুক্ষ পথে ব্যাকুল ডাকি।

প্রেত নগরী নগ্ন, ফাঁকা,
নেই যে ভালো একটি প্রাণী।
দরদালানে, রাস্তা ঘাটে
ভাসছে শুধু মৃতের ঘ্রাণই।

আন্তিগোনে নামেই যেন
একলা চলার করুণ পথ।
আন্তিগোনে তুমিই জানি
বস্তু-ছেঁড়া নীল শপথ।

সান্ত্রী-সেপাই দিক পাহারা,
নগর-জোড়া থাক না ত্রাস।
তোমায় তবু শংকা কোনো
পারেনিকো করতে গ্রাস।

প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে
খুঁড়লে মাটি ক্ষিপ্র হাতে,
সোদর তোমার তাই তো পেল
ক্ষণিক কবর ভুল প্রভাতে।

কোন সাহসে হেলায় তুমি

উড়িয়ে দিলে রাজার বিধান?
কিসের টানে রুদ্ধ গুহায়
আনলে টেনে দারুণ নিদান?

জানতে ক্রূর ক্রেয়োন তোমার
একনায়কী দণ্ড দেবে,
মৃত্যুপুরে দেবে ঠেলে–
দেখলে না তো একটু ভেবে।

সহোদরের ছিন্ন শরীর
করলে আড়াল সংগোপনে।
সৎকার সে তো উপলক্ষ,
অন্য কিছু ছিল মনে।

আন্তিগোনে দ্যাখো চেয়ে–
একটি দুটি নয়কো মোটে,
হাজার হাজার মৃতদেহ
পথের ধুলায় ভীষণ লোটে।

রৌদ্রে শুকায় রক্তধারা,
মাংস ছেঁড়ে শবাহারী,
কে দেবে গোর দুর্বিপাকে?
নেই যে তুমি উদার নারী।

জনৈক পাঠান সৈনিক

কখনো জঙ্গলে কখনোবা খানাখন্দে ইতস্তত
বাঙ্কারে অথবা ক্যাম্পে উঁচিয়ে বন্দুক
ঘামে রক্তের গন্ধে কী প্রকার আছি
সর্বদা হত্যায় বুঁদ হয়ে–
বলা অবান্তর।
আমার স্মৃতিতে কোনো নিশান দোলে না
ক্ষণে ক্ষণে, দোলে না কামান কারবাইন।
এখন স্মৃতিতে
আমার সুদূর গ্রাম, ছোট ঘর, শিশু
চিঠি হাতে অশ্রুময় বিবি জেগে ওঠে বার বার
আলেখ্য স্বরূপ। দেয় হাতছানি আমার আপন সরহদ।

কেমন নিঃসঙ্গ লাগে মধ্যে-মধ্যে, যখন তাকাই
ডবকা নদীর দিকে, যুগল পাখির দিকে দূরে।

এ মুল্লুকে জিপসির মতো ঘোরে মৌত, বড় ক্ষিপ্র;
হচ্ছে ফৌত বেশুমার লোক, বড় নিরস্ত্র নিরীহ,
দেহাতি, শহুরে, দিনরাত। গ্রামে গ্রামে
দেয় হানা সাঁজোয়া বাহিনী, মানে আমরাই। যুবা,
বৃদ্ধ, নারী, শিশু
শিকার সবাই– চোখ বুজে ছুড়ি গুলি ঝাঁক ঝাঁক।
মনে হয়, যেন আমি নিজেই কাবিল।
কিছু বুঝি আর না-ই বুঝি, এটুকু ভালোই বুঝি
আমাদের সাধের এ রাষ্ট্র পচা মাছের মতন
ভীষণ দুর্গন্ধময় আর
ক্ষমতান্ধ শাসকের গদি সামলাতে
আমরা কাতারবন্দি ফৌজ সর্বদাই।

যে ক্যাপ্টেন আমাকে এগোতে বলে শুধু
বিপক্ষের দিকে,
হোক সে নিরস্ত্র কিংবা সশস্ত্র তুখোড়,
দেয় ঠেলে গায়েবী মৃত্যুর ঝোপঝাড়ে
নদীতে নালায়,
সে কি মিত্র কখনো আমার?
শত্রু সে আমার সন্তানের,
আমার শয্যার শত্রু সুনিশ্চিত জানি।

যুদ্ধে পক্ষ-বিপক্ষ থাকেই চিরকাল।
অথচ বুঝি না কিছুতেই
আমার মৃত্যুর পরে ফের
কোন দলে থাকব এই গুলিবিদ্ধ আমি?

ললাটে নক্ষত্র ছিল যার

বস্তিতেই আবির্ভাব, সংকীর্ণ বাথানে না হলেও
পুরানো টিনের ঘরে সময়ের সাথে
প্রথম সাক্ষাৎ তার। পড়শিরা কেউ কেউ খুশি
হয়েছিল দেখে ফুটফুটে শিশুটিকে।

ভিনদেশী প্রাজ্ঞজন আনেনি
উপঢৌকন সেদিন,
ওঠেনি দিগন্তে কোনো জ্বলজ্বলে তারা।

ঘর ছেড়ে বারান্দায়, একদিন উঠোনে,
পেয়ারা গাছের নিচে রঙিন বৃক্ষের দিকে, ফের
গ্রন্থের প্রান্তরে তীর্থযাত্রী। ক্রমশ মনের ঘাটে
স্মৃতির শ্যাওলা ভাসমান। বিস্মিত সবাই দেখে,
ললাটে নক্ষত্র জ্বলে তার।
অথচ নিজে সে
দেখে না তারার দীপ্তি। কেউ
সহজে ঘেঁষে না তার ত্রিসীমায়, যেন
প্লেগের বীজাণু বয়ে বেড়াচ্ছে সে, লাজুক তরুণ।

সর্বদা পেছনে তার ঘোরে ফেউ। কেউ
চকিতে লেলিয়ে দেয় ডালকুত্তা, কেউবা ক্ষুধার্ত
নেকড়ের পাল, কেউ কেউ
নিয়ে যেতে চায় বধ্যভূমিতে কেবলি। বোঝে না সে
কী যে তার অপরাধ। সর্বক্ষণ পালিয়ে বেড়ায়
বর্শা, ছোরা, রাইফেল থেকে দূরে দূরে।

যায় না হাওয়ার লোভে পার্কে, নদীতীরে
কিংবা মাঠে, ওঠে না ভুলেও বাসে, এড়িয়ে অজস্র
কৌতূহলী চোখ পথ চলে কোনো মতে, বিশেষত
অন্ধকারে। অথচ আঁধারেও
ললাটের নিভৃত নক্ষত্রটিকে তার
পারে না লুকোতে কিছুতেই।

ললাটস্থ নক্ষত্রের রক্তিম স্ফুলিঙ্গে
আলোকিত চিলেকোঠা, পথঘাট, নিস্তব্ধ উদ্যান
অথবা কোমল সরোবর। বিপ্লবেরই
নিরুপম অরুণিমা বুঝি চতুর্দিকে।

ঝাঁক ঝাঁক খাকি টুপি, দারুণ ইস্পাতি গন্ধ ভাসে
শহরে ও গ্রামে। গোলা বারুদের গাড়ির ঘর্ঘরে
নিষিদ্ধ রাতের ঘুম। রাইফেলধারী ওরা সব,
হুলিয়া ছাড়াই ধরে তাকে,
ললাটে নক্ষত্র ছিল যার।

গুলির ধমকে হাত ভূলণ্ঠিত পতাকা যেনবা,
জানু দেহচ্যুত নিমেষেই, ঝাঁঝরা বুক।
মাটিতে গড়ায় ছিন্ন মাথা
মুকুটের মতো,
অথচ ললাট থেকে কিছুতেই নক্ষত্র খসে না।

সারস

মাঝে মাঝে দেখতাম তাকে দূরবর্তী
বাড়ির চূড়ায় কিংবা সাদা মেঘভর্তি
আকাশের মাঠে, যেন স্বপ্নের নিঝুম বিল থেকে
এসেছে সে কী প্রকার গোপনতা নিয়ে। ওকে দেখে
সারস হওয়ার বড় সাধ
হতো কোনো কোনো দিন। রেশমি অবাধ
ডানা মেলে সাধ হতো চঞ্চুর ডগায় আনি ছেঁকে
অনন্তের ক্ষীর, যা অনেকে
চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়। অনেক সময়
কোনো কোনো সাধ বড় দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কখনো আঁতুড় ঘরে, কখনোবা সমাধি ফলকে
পাখার ঝলকে
নেচে ওঠে রাঙা তালে কেমন ভুবন। পক্ষী গূঢ় প্রত্যাশায়
আমার ছায়ায় ঘোরে, কখনো ঘুমায়।
ছড়ায় পাণ্ডুর জ্যোৎস্না মাথার ভিতর
পাখার বিস্তারে আর হঠাৎ ইতর
বাসনার রোখে অগোচরে
নাৎসি গোয়েন্দার মতো পথচারী হৃৎপিণ্ডের চরে।

এখন সে ছেঁড়া কাগজের মতো রুক্ষতায়
বিদ্ধ কালো, অন্ধ কাঁটাতারে নিরুপায়।

শমীবৃক্ষ

হাওয়ায় হাওয়ায় দুঃসংবাদ প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি
শব্দহীন মর্শিয়ায় মর্শিয়ায় কেমন শীতল

সমাচ্ছন্ন, অত্যন্ত বিধুর। কে কোথায় গুম খুন
হয়ে যায়, মেলে না হদিস। লোকজন
পথ চলে, অবনত মাথা, যেন মৃতের মিছিল
সকাল সন্ধ্যায়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সন্দেহভাজন অকস্মাৎ
কখনো গভীর রাতে যাত্রাবাড়ী, গ্রিন রোডগুলির ধমকে
কেঁপে ওঠে, কখনো-বা বুড়িগঙ্গা নদীর সুশান্ত
প্রতিবেশী গ্রাম দগ্ধ; আহত গাছের
ডালে ঝোলে বৃদ্ধ মৃতদেহ। আলে রক্তরাঙা শাড়ি। বন্দুকের
নলের হুকুমে গ্রাম্যজন নেয় মেনে অবরুদ্ধ যন্ত্রণায়
যান্ত্রিক কাতারবন্দি মৃত্যু।

সহসা শহরে কারফিউ, সবখানে
সন্ত্রাস দখলদার। পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে পড়ে
নরকের ডালকুত্তাগুলো; সঙ্গে নেড়ী
কুকুরের দল, ধার-করা তেজে আপাত-তুখোড়।
ঘরে ঘরে জোর
চলেছে তল্লাশি। মারণাস্ত্র খোঁজে ওরা
অলিতে গলিতে, গাছতলায়, আড়তে,
ছায়াচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে, পুকুরে এমনকি
বনেদী ভবনে
খোঁজে রাইফেল
গ্রেনেড, মেশিনগান, মুক্তিফৌজ, বিদ্রোহী তরুণ।

খাঁচার টিয়েটা
সবুজ চিৎকারে দিচ্ছে গুঁড়িয়ে অদ্ভুত
স্তব্ধতার ঘাঁটি; টবে উদ্ভিন্ন গোলাপ
ভীষণ ফ্যাকাশে ভয়ে। হঠাৎ কপাটে
বুটের বেদম লাথি, হাঁক-ডাক। তুই-তোকারির
ডাকে বান, নিমেষে উঠোনে
খাকি উর্দি কতিপয়; মরণলোলুপ কারবাইন
গচ্ছিত সবার কাঁধে, কারোবা বাহুতে
চওড়া সবুজ ব্যাজ। ভয়-পাওয়া জননী তাকান
তরুণ পুত্রের দিকে, লাফাচ্ছে বাঁ চোখ
ঘন ঘন; বিমূঢ় জনক প্রস্তরিত
তরুণী কন্যার হাত ধরে ত্রস্ত খুব,
ঘরের চেয়েও বেশি নিরাপদ আশ্রয় খোঁজেন

দিগ্বিদিক। যদি পারতেন
আত্মজ ও আত্মজাকে
রাখতেন লুকিয়ে পাতালে
নক্ষত্রবীথির অন্তরালে কিংবা রক্তকণিকায়,
হৃদয়ের গহন স্পন্দনে।

পাড়ায় পাড়ায় ওরা মাতে অস্ত্রোদ্ধারে,
নিত্য করে তছনছ যখন যা খুশি।
শহরের খাঁ খাঁ বুকে চেপে ধরে বুট,
ঘাতক সঙ্গিন।
লুকানো অস্ত্রের লোভে ওরা বার বার
দেয় হানা মহল্লায় মহল্লায়, খোঁজে
শস্ত্রপাণি যত্রতত্র শমীবৃক্ষ
বাংলাদেশের হৃদয়ে হৃদয়ে
ঝলকিত। চোখগুলো গ্রেনেডের চেয়ে
বিস্ফোরক বেশি আর শূন্য কোটি হাত
যতটা বিপজ্জনক, ক্রূর মারণাস্ত্র নয় তত।

যে-পথে আমার পদধ্বনি

যে-পথে আমার পদধ্বনি,
সে-পথ পুষ্পিত নয়। সে-পথ কণ্টকাবৃত বড়,
খানা-খন্দময়।
সে-পথে কখনো বুলবুলি
ওঠে না অমর্ত্য সুরে মেতে,
অথবা পাপিয়া।

যে-পথে আমার পদধ্বনি,
সে-পথে বাজে না দিলরুবা,
দামামাই বাদ্য একা সর্বদা সেখানে।

যে-পথে আমার পদধ্বনি,
সে-পথে বাজে না দিলরুবা,
ভয়াল ঘর্ঘর, ভগ্ন সেতু, আহতের চিৎকার,
পোড়া মাংস, কর্দমাক্ত জুতো আর উন্মত্ত আগুন।

দ্যাখো জীবকুল,

কী ভীষণ হিংস্র আমি, কী প্রকার ভয়ানক। দ্যাখো
আমার দু-হাত রক্তে লাল,
ধোঁয়াচ্ছে আমার নাক ঘন ঘন,
আমার চোয়ালে দ্যাখো ঝুলছে অসংখ্য মৃতদেহ,
আমার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অঙ্কিত
কী বিচিত্র শব্দাবলি, করো পাঠ–
হত্যা, প্রতিরোধ,
বিস্ফোরণ, দগ্ধ মাঠ, হাহাকার, উজাড় বসতি।

অথচ আমারই প্রতীক্ষায়
তোমরা বিছিয়ে রাখো দৃষ্টি
গ্রাম ও শহরে। পথে পথে
সাজাও তোরণ, করো নিবিড় বন্দনা।

যখনই প্রবল আমি আসি,
আমার দু-চোখে জ্বলজ্বল
ধ্বংস আর সৃষ্টি
কাঁপে পাশাপাশি;
আমি স্বাধীনতা।

তার উক্তি

এখন বালাই নেই ক্ষুৎ পিপাসার। গলাবন্ধ
কোটের দরকার ফুরিয়েছে এই শীতে। আত্মরক্ষা অর্থহীন,
অস্ত্রও লাগে না তাই। দেখুন সবাই সাদা চোখে
কিংবা ক্যামেরার যান্ত্রিক ওপার থেকে,
শহরের এক কোণে, শনাক্তের পরপারে উপাধিবিহীন
কেমন নিস্পৃহ শুয়ে আছি, কী প্রকার নিশ্চেতন,
রায়ের বাজারে।
এই যে করোটি দেখছেন, একদা এটাই ছিল
স্বীকৃত আমার দামি মাথা আর সেই মাথার ভেতর
নানাবিধ চিন্তা পুঞ্জ পুঞ্জ
মেঘের মতন সূর্যোদয় কি সূর্যাস্তে
মোহন রঙিন
এবং গভীর বিবেচনা–
সেখানে ফ্রয়েড, কার্ল মার্কস, রিল্কে, ডস্টয়ভস্কির

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ছিল না বাধা কোনো।
এই যে যমজ লাঠি, সরু, সাদা, এরাই আমার
দুটি বাহু, কোনো দিন কী আবেগে ধরত জড়িয়ে
দয়িতাকে। আর এই শূন্য জায়গাটায়
স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড ছিল, যা ওরা নিয়েছে উপড়ে পাশব আক্রোশে
আর এই মাত্র যেটা লোভাতুর কুকুর শেয়াল
পালাল সাবাড় করে, একেই তো জানতাম আমার নিজস্ব
কণ্ঠ বলে, যে-কণ্ঠে ধ্বনিত হত বারংবার অসত্য অন্যায়
ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো প্রতিবাদ, যে-কণ্ঠে ধ্বনিত হত
কল্যাণের, প্রগতির কী সজীব জিন্দাবাদ আর স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।
এ জন্যেই জীবনের বৈমাত্রের দ্বিপ্রহরে হলাম কংকাল।

প্রতিটি অক্ষরে

আমার মগজে ছিল একটি বাগান, দৃশ্যাবলিময়।
কখনো তরুণ রৌদ্রে কখনোবা ষোড়শীর যৌবনের মতো
জ্যোৎস্নায় উঠত ভিজে। জ্যোৎস্নাভুক পাখি
গাইত সুস্নিগ্ধ গান, আমার মগজে ছিল একটি বাগান।
মদির অভিনিবেশে পাখি গান গেয়ে উঠলেই
শিরায় শিরায় সব দিকে
উঠত ঝিকিয়ে
নতুন কবিতাবলি মগজের রঙিন নিকুঞ্জে।
আমার সে সব কবিতায়
থাকত জড়িয়ে সেই উদ্যানের স্মৃতি।
এখন যা কিছু লিখি, কবিতা অথবা
একান্ত জরুরি কোনো চিঠি
কিংবা দিনলিপি,
এখন যা কিছু লিখি সব কিছুতেই
ভর করে লক্ষ লক্ষ গুলিবিদ্ধ লাশ।
প্রতিটি অক্ষরে আজকাল
প্রতিটি শব্দের ফাঁকে শুয়ে তাকে লাশ। কখনোবা
গোইয়ার চিত্রের মতো দৃশ্যাবলি খুব
অন্তরঙ্গ হয়ে মেশে প্রতিটি অক্ষরে।
প্রতিটি পঙ্‌ক্তির রন্ধ্রে রন্ধ্রে
বিধবার ধু-ধু আর্তনাদ

জননীর চোখের দু'কূলভাঙা জল
হু হু বয়ে যায়। প্রতি ছত্রে
নব্য হিরোশিমা, দাউ দাউ
কত মাই লাই।

আমার প্রতিটি শব্দ পিষ্ট ফৌজি ট্রাকের তলায়,
প্রতিটি অক্ষরে
গোলা বারুদের
গাড়ির ঘর্ঘর,
দাঁতের তুমুল ঘষ্টানি,
প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে শব্দে প্রতিটি অক্ষরে
কর্কশ সবুজ ট্যাঙ্ক চরে, যেনবা ডাইনোসর।
প্রতিটি পঙ্‌ক্তির সাঁকো বেয়ে
অক্ষরের সরু আল বেয়ে উদ্বাস্তুরা যাচ্ছে হেঁটে
সারি সারি, বিষম পা-ফোলা, শুকনো গলা,
লক্ষ লক্ষ যাচ্ছে তো যাচ্ছেই,
প্রতিজন একেকটি হু হু দীর্ঘশ্বাস।
এখন আমার কবিতার
প্রতিটি অক্ষরে
বনবাদাড়ের গন্ধ, গেরিলার নিঃশ্বাস এবং
চরাচরব্যাপী পতাকার আন্দোলন।

সান্ধ্য আইন

এ শহরে কি আজ কেউ নেই? কেউ নেই?
এই তো প্রতিটি নীরব বারান্দায়
বিষাদ দাঁড়ানো কবির মতন একা।

এ শহরে কি আজ কেউ নেই? কেউ নেই?
আমার সমান-বয়সী দুঃখ দেখি
বসে আছে চুপ নিথর আঁধার ঘরে।
এ শহর আজ মৃতের নগরী নাকি?
মৃতেরা এবং গোরখোদকের দল
একটি ভীষণ নকশায় নিষ্প্রাণ।

এ শহরে কি আজ কেউ নেই? কেউ নেই?

আশেপাশে আছে গাছ-গাছালির শোভা।
পাতার আড়ালে জ্বলছে সে কার চোখ?

কাঁটাতার

কাঁটাতার, কাঁটাতার।
ড্রাগনের বিষদাঁতের মতন
চৌদিকে কী যে সন্ত্রাস ছোড়ে
কাঁটাতার, কাঁটাতার।

কালো কাঁটাতারে, হায়,
বাঁধা পড়ে আছি আষ্টেপৃষ্ঠে;
চোখে-মুখে-হাতে, ক্ষণিক স্বপ্নে
কাঁটাতার, কাঁটাতার।

কাঁটাতারময় খুন।
যৌথ রক্ত ঝরছে কেবল,
চোখগুলো কাঁটাতারের আড়ালে
অন্য চোখের মতো।

এ ব্যাপক কাঁটাতারে
জীবন ঝুলছে, যেন ক্রুশকাঠ;
শহরে শহরে, ধু-ধু প্রান্তরে
কাঁটাতার, কাঁটাতার।

কাঁটাতারে বাঁধা চোখ।
ঘাসের ডগায়, এমনকি ঐ
তুচ্ছ কাকের দিকেও এখন
তাকাই না কিছুতেই।
কাঁটাতার, কাঁটাতার।
শুধু চেয়ে থাকি পায়রা রঙের
ভবিষ্যতের দিকে অপলক্ষ।
মুছবে কি কাঁটাতার?

সম্পত্তি

দাঁড়ালে দেয়ালে পড়ে ছায়া,
আমার নিজেরই ছায়া। চশমার আড়ালে
আছে দুটি চোখ, দেখি খাকির মিছিল
শহরে প্রত্যহ।
ঘাড়ে মাথা আছে,
মাথাভরা কাঁচাপাকা চুল। যথারীতি
নাকের টানেলে হাওয়া বয়।

আমার একটি মুখ আছে,
আছে দুটি হাত, আর এই তো আমার
শার্ট, ট্রাউজার, হাতঘড়ি।
এই তো আমার বুক আছে,
বুকের তলায় হৃৎপিণ্ডের টিকটিক
অবিরাম। আছে
একটি কলম আছে, ক্যাপবন্দি। আর এখন তো
হাওয়ায় হাওয়ায় লিখি, পাতায় পাতায়।
এবং আমার
একটি শনাক্তপত্র আছে, নিত্যসঙ্গী,
যেমন শহুরে সব পোষা কুকুরের
গলায় ঝোলানো থাকে চাকতি রুপালি।

উদ্বাস্তু

আমি কি কখনো জানতাম এত দ্রুত
শহরের চেনা দৃশ্যাবলি লুপ্ত হয়ে যাবে? একটি রাত্রিরে
আমার সারাটা মাথা বিষম রুপালি হয়ে যাবে?
কেমন বদলে গেছি অতি দ্রুত নিজেরই অজ্ঞাতে।
আমার চাদ্দিকে দরদালান কেবলি যাচ্ছে ধসে,
আমার সম্মুখে
এবং পেছনে
দেয়াল পড়ছে ভেঙে একে একে, যেন
মাতাল জুয়াড়ী কেউ নিপুণ হেলায়
হাতের প্রতিটি তাশ দিচ্ছে ছুড়ে। আমি
কত ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে হাঁটি
করাল বেলায়। জনসাধারণ ছিন্ন
মালার মুক্তোর মতো বিক্ষিপ্ত চৌদিকে।

সমস্ত শহর আজ ভয়াবহ শবাগার এক। কোনোমতে
দম নিই দমবন্ধ ঘরে। জমে না কোথাও আড্ডা,
রেস্তোরাঁ বিজন। গ্রন্থে নেই মন, আপাতত জ্ঞানার্জন বড়
অপ্রয়োজনীয় ঠেকে। ঘর ছেড়ে পথে

পা বাড়াতে ভয় পাই। যেদিকেই যাই,
ডাইনে অথবা বাঁয়ে, বিষণ্ন স্বদেশে বিদেশীরা
ঘোরে রাজবেশে। রেস্তোরাঁয়, পার্কে, অলিতে-গলিতে
শহরতলিতে শুধু ভিনদেশী ভাষা যাচ্ছে শোনা।
বস্তুত বিষণ্ন এ শহরে হত্যাময় এ শহরে
স্বদেশীর চেয়ে বিদেশীর সংখ্যা বেশি। নাগরিক
অধিকারহীন পথ হাঁটি, ঘাড় নিচু, ঘাড়ে মাথা
আছে কি বা নেই বোঝা যায়। এই মাথার ওপর
আততায়ী, শাসক সবার
আছে পাকাপোক্ত অধিকার। কেবল আমারই নেই।

যদিও যাইনি পরবাসে, তবু আমি
বিষণ্ন উদ্বাস্তু একজন। ক্লান্ত মনে ধরে ঘুণ, শুধু ঘুণ।

মৃতেরা

কোথায় সে যুবা? কোথায় সে নির্ভীক?
কোথায় নাট্যবিলাসী অধ্যাপক?
কোথায় আত্মভোলা সে দার্শনিক?
কোথায় সে যার মাছ ধরা ছিল শখ?
খাকির ছাউনি শহরের মোড়ে মোড়ে,
মৃত্যু চালায় সুনিপুণ হারপুন।
ভীষণ ভাসছি ঘাতক ঢেউয়ের তোড়ে।
কে জানে কখন বয়ে যাবে কার খুন।

জেলায় জেলায় হত্যা ছড়িয়ে পড়ে,
যেমন প্লেগের বীজাণু চতুর্দিকে।
শহর উজাড়, গ্রামের প্রতিটি ঘরে
কালো পরোয়ানা মৃত্যু দিচ্ছে লিখে।
অথচ এখনও রাস্তায় চলে লোক।
দপ্তরও খোলা; বেশ্যা, গুপ্তচর
করে গিজগিজ। ভয়-আঁটা চোখ
অনেকের মুখে, শোকের তেপান্তর।

মৃতেরা সুশীল, মৃতেরা দয়ালু খুবই;
বড়ো ক্ষমাশীল। নইলে নিমেষে সব
গুঁড়ো হয়ে যেত, হত, হায়, ভরাডুবি;
নিভে যেত ঠিক নকল এ উৎসব।

সংবর্ধনা

হে বিদেশী প্রতিনিধিবর্গ, মাননীয় আপনারা
এলে এদেশের জনসাধারণ কাড়া ও নাকাড়া
বাজাবে এবং লাল শালুর ওপর শুভ্র লিখে
তুলোর সুহাস সুবিশাল স্বাগতম দিকে দিকে
সাজাবে তোরণ এ শহরে। গণ্ডগ্রামে হয়তোবা
যাবেন না আপনারা; সেখানে তো কাদা, পচা ডোবা
এবং মাথার হুল। সংবর্ধনা পাবেন সবাই
যথারীতি; সাম্য মৈত্রী, অমুক তমুক ভাই ভাই

ইত্যাদি স্লোগানে হবে সচকিত সুসজ্জিত মঞ্চ।
বক্তৃতামালায় গানে যাবে ভেসে রাতের মালঞ্চ।
আপনারা এলে পথে ঘাটে নামাতে হবে না আর
লাল গালিচার ঢল। ইয়াহিয়া, নব্য অবতার
হিটলারের, আগেই রেখেছে মুড়ে বড় ক্ষিপ্রতায়
কী এলাহি কাণ্ড, সারা বাংলাদেশ রক্ত গালিচায়!

পড়শি

আমার বাড়ির ছোট্ট এ প্রাঙ্গণে
বসত করে একটি ফুলের চারা।
খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ে, ঢেলে
জলের ধারা লালন করি তাকে।

খুব শুকোলে চারার জিভের ডগা
এক নিমেষে আমার গলা মরু।
যখন চারা জল শুষে নেয় গলায়
তখন আমার ধু-ধু তৃষ্ণা মেটে।

গেলাম চলে সুদূর গণ্ডগ্রামে
ছোট্ট আমার চারাটিকে রেখে
গর্জে-ওঠা মেশিনগানের মুখে।

আমরা এমন স্বার্থপরই বটে।

ফিরে এসে অবাক কাণ্ড একি
সেই চারাটি দুলছে দেখি সুখে।
সন্ত্রাসে সে যায়নি কুঁকড়ে মোটে,
বরং তেজী খুব উঠেছে বেড়ে।

আমাদের মৃত্যু আসে

আমাদের মৃত্যু আসে ঝোপে ঝাড়ে নদী নালা খালে
আমাদের মৃত্যু আসে কন্দরে কন্দরে
আমাদের মৃত্যু আসে পাট ক্ষেতে আলে
গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে
আমাদের মৃত্যু আসে মাঠে
পথে ঘাটে ঘরে
আমাদের মৃত্যু আসে হাটে
সুডৌল ট্রাফিক আইল্যান্ডে ধু-ধু চরে

আমাদের মৃত্যু আসে কাদায় মাটিতে
আমাদের মৃত্যু আসে ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে
পরিখায় বিবরে ঘাঁটিতে
আমাদের মৃত্যু আসে বরিশাল, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, ঢাকায়
আমাদের মৃত্যু আসে কুমিল্লা, সিলেট, চাটগাঁয়
আমাদের মৃত্যু আসে প্লেনে চেপে, জাহাজ বোঝাই করে আসে
আমাদের মৃত্যু আসে সুপরিকল্পিত নকশারূপে
আমাদের মৃত্যু আসে দূর ইসলামাবাদ থেকে
আমাদের মৃত্যু আসে কারবাইনে বারুদের স্তূপে
আমাদের মৃত্যু বিউগলে বিউগলে যায় ডেকে

এরপরও

এরপরও আর ক'জন থাকবে টিকে?
ক'জন পারবে মৃত্যুকে দিতে ফাঁকি?
বিদ্বজ্জন দেশে নেই আর বাকি।
একি হত্যার তাণ্ডব চৌদিকে!

বন্ধুরা ক্রমে যাচ্ছেন দূরে সরে–
কেউ কেউ মৃত, অনেকে দেশান্তরী।

এই দুর্যোগে আমি কোন পথ ধরি?
কাঁটাতারে মুখ থুবড়ে থাকব পড়ে?

মৃত্যুর সাথে দাবা খেলি প্রায়-মৃত।
কোথাও একটি চেনা মুখ যদি দেখি,
বিস্মিত ভাবি, সত্যি ঘটনা একি?
করি সন্দেহ কাউকে দেখলে প্রীত।

আতংকময় শহরে অবিশ্রাম
মানুষ ঝরছে, যেন সব পচা ফল!
এখন ব্যক্তিগত চিঠি ঝলমল
করলে স্বস্তি, পেলে কোন টেলিগ্রাম।

গ্রামীণ

কেন তবে রক্তে উঠেছিল ঝড় উথাল পাথাল?
আমি তো ছিলাম দূরে অতিশয় শান্ত গ্রামে তাল-
তমালের ভিড়ে, মাঠে, নিসর্গের উদার ডেরায়।
কখনো দেখেছি আর্ত চোখে, হায়, ঘরের বেড়ায়
বেজায় ধরেছে ঘুণ, খুঁটি নড়বড়ে। তবু শক্ত
মুঠোয় লাঙল ধরে চষেছি কাজল জমি, রক্ত।
অবাধ্য শিশুর মতো হ'ত নতুন শস্যের ঘ্রাণে।
নোলক উঠত দুলে যার চিড়ে-কোটা তালে, প্রাণে
যে জন ফোটাত ফুল চম্পক আঙুলে, তার মুখ
ইঁদারার পাশে, ঘাটে দেখলেই হৃদয় কিংশুক।

হে রাখাল, হে দোতারা তোমাদের কাছ থেকে দূরে
কখনো পারিনি যেতে। আলুথালু পরাণ বধূরে
ফেলে রেখে গৃহকোণে বিরান কোথাও দরবেশী
আস্তানায় কম্বলে ঢাকিনি দেহ কিংবা পরদেশী
হইনি কড়ির লোভে। কেন তবে সহস্র বাসুকি
তুলল ফণা আমার তরুণ রক্তে? কেন ঠোকাঠুকি
অস্ত্রেশস্ত্রেও মগজের কোষে কোষে? আমিও হঠাৎ
কেন গণ্ডগ্রামে অস্ত্রাগারে ক্ষিপ্র বাড়ালাম হাত?
কখনো শুনিনি কোনো নেতার বক্তৃতা, কোনো দিন
যাইনি মিছিলে, হাতে তুলিনি নিশান। গণচীন,
মার্কিন মুলুক কার কেবা শত্রু-মিত্র, এই তথ্যে
ঘামাইনি মাথা। আমার কী কাজ কূট তর্কে, তত্ত্বে?

যাকে ভালোবাসি সে যেন পুকুরে ঘাটে ঘড়া রোজ
নিঃশঙ্ক ভাসাতে পারে, যেন এই দুরন্ত ফিরোজ,
আমার সোদর, যেতে পারে হাটে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বাজান টানতে পারে হুঁকো খুব নিশ্চিন্তে দাওয়ায়,
তাই মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এই এঁদো গণ্ডগ্রামে
ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম কী দুর্বার সশস্ত্র সংগ্রামে।

ধ্বস্ত দ্বারকায়

আবার ঘর ছেড়ে তুমি তো আসবে না।
বাইরে নীল শাড়ি যাবে না দেখা রাতে।
মধ্যরাতে আজ তোমার শয্যায়
তীব্র আগুনের ফুলকি নেই কোনো,
এখন তুমি ঘরে নিভাঁজ ঘুমে কাদা।
তোমার বুকে আর যমুনা দুলবে না?

দুয়ারে মঙ্গল কলস দুটি শুধু
প্রতীক্ষায় থাকে। রয়েছি আমি দূরে
পথের ধারে একা, নিসর্গেরই কেউ?
হয়তো আরেকটি বৃক্ষ বনানীর।
ঘুমের বনে মুখ রেখেছ ঢেকে তুমি,
আমার শিরা উপশিরায় টর্নেডো।

দৃশ্য থেকে চোখ ফেরানো দায় তবু।
কাঁপছে থর থর শেমিজ জ্যোৎস্নার–
মর্ত ঘাতকের অট্টহাসি বাজে
ঠেকাতে অক্ষম নানীর লাঞ্ছনা
ব্যর্থতার এই দারুণ দংশন
লুকিয়ে চলে যাব, ফেরারি যেন কেউ।

এখনও আঙুলের শীর্ষভূমি আর
দীর্ণ হৃদয়ের গুপ্ত তটরেখা
সুরের নন্দিত জোয়ারে যায় ভেসে।
অথচ অপারগ তুলতে কোনো সুর;
আমার বাঁশি এই ধ্বস্ত দ্বারকায়
নিয়েছে কেড়ে সেই দস্যু বর্বর।

শূন্যতায় তুমি শোকসভা

প্রথম প্রকাশ	বৈশাখ ১৩৮৪ [এপ্রিল ১৯৭৭]
প্রকাশক	সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী	কাইয়ুম চৌধুরী
উৎসর্গ-পত্র	আবুল হোসেন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সংকটে কবির সত্তা

সংকটে কবির সত্তা আরও বেশি চিন্তাশ্রয়ী হয়,
কতিপয় খর স্বপ্ন তাকে
বিচলিত করে খুব, বিশেষত মাথার বিষয়ে
ভাবে রাত্রিদিন–
শৈশবে জননী তার মাথার সতেজ ঘ্রাণ নিয়েছেন কত,
কখনোবা স্নেহভরে মাথার ওপর হাত রেখে,
মনে পড়ে, পড়েছেন দোয়া আর দরুদ অনেক,
এখনও তো মাঝে মাঝে পড়ন্ত বেলায় স্মৃতি জাগানিয়া স্পর্শে
বিলি কেটে দেন চুলে। দয়িতা মাথাটা তার কম্পিত দু-হাতে
নিয়ে বুকে কী বিপুল আবেগের খরস্রোতে ভেসে
জড়িয়ে ধরেছে কতবার।

প্রায় প্রতিদিন হয়তোবা সারাক্ষণ কোনো কোনো
নির্ঘুম রাত্তিরে কবি তার একা মাথার ভিতর
নিজেই ভ্রমণকারী; দ্যাখে সে মরাল কতিপয়
নীলিমার সঙ্গে রিশতা পাতে,
উড়ে চলে অন্তহীন আলাদা আকাশে, দ্যাখে দুস্থ
মাদারির দল হাটে, অদূরে বেদের ডেরা আর
জখমি শহরতলি হাবাগোবা ছায়া নিয়ে ভারি
অপ্রস্তুত, ভাঙা মঞ্চে বেজায় অপটু অভিনেতা,
স্মৃতিভ্রষ্ট, থেমে থেমে আওড়ায় পার্ট। কবি অন্যমনে তার
মাথার ভিতর করে ঘোরাফেরা– দ্যাখে এক কোণে
পুরোনো রুপালি তস্তরিতে
আধ-খাওয়া আম তার অন্তর্গত বাস্তবতা মেলে
ধরেছে হাওয়ায় রোদে। দুলছে একটি গাছ দ্রুত
ভিন্নতর বৃক্ষ হয়ে ওঠায় ইচ্ছায়, একজন
রমণী অধিক রমণীয় হয়ে জেগে থাকবার
তীব্র আকাঙ্ক্ষায়
অলিন্দে অপেক্ষমাণ। কবি দ্যাখে, ভ্রমণকারীর
ঔৎসুক্য নিয়েই দ্যাখে মাথার ভিতর মিছিলের
শেষাংশ, আকাশে দিগন্তের মতো ঠোঁট,
সবুজ এলিয়ে-থাকা মানবীয় ভাস্কর্য বিশাল।
সত্তার সংকটে দীর্ণ কবি দ্যাখে তার অগণিত
প্রতিধ্বনিময়

মাথার ভিতর অন্য এক দীপ্র মাথা শূন্যতায়
দ্বীপের মতোই দৃঢ়। নিজস্ব মাথাই বটে তার
ধুলোয় গড়ানো নয়, বেশ উঁচু, সোনালি থালায়
মখমলে রাখা,
যেনবা মুকুট এক। কবি তার মাথার চাদ্দিকে
কেবল চক্কর কাটে, শেষমেশ চুমো খায় খুব
ভালোবেসে মাথাটার গালে!

কবির মাথাকে ডেকে বলে বহুরূপী কারাগার,–
তুই তো আমারই।
ঘাতকের হাত বলে, তোর প্রতি আমার প্রতিটি
রোমকূপ বিষম আকৃষ্ট।
বন্দুকের চোখ বলে, আয়, দাঁড়া এখানে নিথর
লাগুক চুলের স্পর্শ পাথুরে দেয়ালে, শেষ স্তোত্র
কর পাঠ, তুই তো আমারই।

জামিন কবির মাথা মেঘমালা আর পরিযায়ী
পাখি আর লতাগুল্মময় স্নিগ্ধ জমিনের কাছে,
জামিন কবির মাথা নক্ষত্রগুচ্ছের কাছে আর
পুশিদা পথের কাছে, ভিখিরি, উদাস পথচারী,
ভবঘুরে, সার্কাসের ভাঁড় আর দুখিনী নর্তকী,
ক্লান্ত বাঁশি-অলা, পুষ্টিহীনতায় অতিশয় শীর্ণ
শিশুদের কাছে, শহরের উঁচু মিনারের কাছে,
জামিন কবির মাথা তৃষ্ণাদীর্ণ কবিদের কাছে।

আমিও তোমারই মতো

আমিও তোমারই মতো রাত্রি জাগি, করি পায়চারি
ঘরময় প্রায়শই, জানালার বাইরে তাকাই,
হাওয়ায় হাওয়ায় কান পাতি, অদূরে গাছের পাতা
মর্মরিত হ'লে ফের অত্যন্ত উৎকর্ণ হই, দেখি
রাত্রির ভেতরে অন্য রাত্রি, তোমার মতোই হু হু
সত্তা জুড়ে তৃষ্ণা জাগে কেবলি শব্দের জন্যে আর
মাঝে মাঝে নেশাগ্রস্ত লিখে চতুর্দশপদী,
শেষ করি অসমাপ্ত কবিতা কখনো ক্ষিপ্র ঝোঁকে।

কোনো কোনো দিন বন্ধ্যা প্রহরের তুমুল ব্লিজার্ডে
ভুরুতে তুষার জমে, হয়ে যাই নিষ্প্রাণ, জমাট
রাজহাঁস যেন, দিকগুলি আর হয় না সঙ্গীত।
অবশ্য তোমার তটে উজ্জ্বল জোয়ার রেখে গেছে
রত্নাবলি বারবার।.যখনই তোমার কথা ভাবি,
প্রাচীন রাজার সুবিশাল তৈলচিত্র মনে পড়ে।

তোমার অমিত্রাক্ষর হিরন্ময় উদার প্রান্তর,
তোমার অমিত্রাক্ষর সমুদ্রের সুনীল কল্লোল,
তোমার অমিত্রাক্ষর ফসলের তরঙ্গিত মাঠ,
তোমার অমিত্রাক্ষর ধাবমান স্বপ্ন-অশ্বদল,
তোমার অমিত্রাক্ষর উন্মথিত উনিশ শতক,
তোমার অমিত্রাক্ষর নব্যতন্ত্রী দীপ্র বঙ্গভূমি।

হেনরিয়েটার চোখে দেখেছিলে কবিতার শিখা?
না কি কবিতাই প্রিয়তমা হেনরিয়েটার চোখ?
হাসপাতালের বেডে শুয়ে সে চোখের অস্তরাগে
তুমি কি খুঁজেছ কোনো ট্রাজেডির মেঘ? হয়তোবা
অভ্যাসবশত বেডে অসুস্থ আঙুল ঠুকে ঠুকে
আস্তেসুস্থে বাজিয়েছ ছন্দ মাঝে-মাঝে, বাষ্পাকুল

চোখে ভেসে উঠেছিল বুঝি দূর কাব্যের কানন।
কখনো দেয়ালে ক্লান্ত চোখ রেখে হয়তো ভেবেছ–
কি কাজ বাজায়ে বীণা? এ আঁধারে কিবা মাইকেল
কি মধুসূদন কার প্রকৃত অস্তিত্ব অনন্তের
নিরুদ্দেশে রেণু হয়ে ঝরে, কে বলে দেবে, হায়?

আমিও তোমারই মতো প্রাদেশিক জলাভূমি ছেড়ে
দূর সমুদ্রের দিকে যাত্রা করি, যদিও হোঁচট
খেয়ে পড়ি বারংবার। রক্তে নাচে মায়াবী ইউরোপ,
ইতালি ভ্রমণ করে, সুদূর গ্রিসের জলপাই
পল্লবে বুলিয়ে চোখ, বুলেভার ছেড়ে ফিরে আসি
সতত আপন নদে তোমার মতোই কী ব্যাকুল–
আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কপোতাক্ষ আছে।

পারিপার্শ্বিকের আড়ালে

শামসুর রাহমান বলে আছে একজন, যার
জন্যে মধ্যরাতে কোনো নদী,
মাছের মতন চকচকে কোনো স্বপ্নাবৃত প্রখর শরীর
বিছানায় একা
অপেক্ষা করছে কিনা, সে জানে না। কোথাও এখন
দরজা জানালা তার জন্যে খোলা আছে কিনা কিংবা
অন্ধের ইস্কুলে আলো জ্বেলে কেউ চক্ষুষ্মান খুব
ধৈর্যভরে ব'সে আছে কিনা,
সে জানে না। জানে তার মনের নিভৃত ছায়াচ্ছন্ন
ঘাটে কী সুদূর
অরণ্যের প্রাণীর মতন পানি খেতে আসে স্মৃতি। জানে তাকে
সারারাত এলোমেলো জাগিয়ে রাখবে অলৌকিক হুইসিল।

শামসুর রাহমান বলে আছে একজন, নিজের কাছেই
বন্দি সর্বক্ষণ।
প্রতিদিন শহরের সবচেয়ে করুণ গলির মুখচ্ছবি
মুখের রেখায় নিয়ে হাঁটে ফুটপাতে,
সুনিবিড় বিশঙ্কা তার রহস্য নামক অতিশয়
লতাগুল্মময় প্রান্তরের সঙ্গে, কেমন অচিন
দৃশ্যাবলি সমেত বিপুল
অদৃশ্যের সাথে!
একদিন মরে যাবে ভেবে তার মনের ভেতরে
আবার ঘনায় একরাশ, মনোবেদনার রেখা
ফোটে মুখমণ্ডলে গভীর,
কিছুকাল এভাবেই কাটে, ফের চকিত আনন্দে নেড়ে দেয়
সময়ের থুতনি ঈষৎ।

বয়স বাড়ছে তার, বাঁচলে কার না বেড়ে যায়?
নিজেকে জপায় সে-ও প্রায়শই– হৃদয় সতেজ রাখা চাই,
নইলে কবিতার সূক্ষ্ম শিকড় কংকালসার হবে।

কবিতার জন্যে উন্মাদ হতেই হবে, আজও মানে না সে;
অবশ্য একথা ঠিক, কোনো কোনো কবি মানসিক
ব্যাধিতে ভুগেও কাগজের শূন্যতায় এনেছেন
পাখির বুকের তাপ, দুপুরের হলুদ নিঃশ্বাস,

তন্দ্রিল সঙ্গীতময় দ্বীপপুঞ্জ, বাঘের পায়ের ছাপ আর
প্রাচীন দুর্গের সিঁড়ি, দেবদূত, অজানার দ্যুতি;
জীবনকে দিয়েছেন বাস্তবিক স্বপ্নের গড়ন।
শৈল্পিক ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ঘোরে দিগ্বিদিক;
নিজেকে লুকিয়ে রাখে স্বরচিত কুয়াশায় আর
করে সে উজাড় পাত্র বারবার ইয়ারের সাথে।
নিজের আড়ালে তার একজন স্বতন্ত্র মানুষ
স্বপ্নের রঙের মতো মুখ নিয়ে ব'সে থাকে একা,
জানে না কখন উঠে যাবে ফের আপন পুশিদা
আস্তানায়; জানে না সে কোথায় যে নিরাময় তার
হাসপাতালের বেডে নাকি কোনো নারীর হৃদয়ে।

শামসুর রাহমান বলে আছে একজন, যার
প্রতি ইদানীং
বিমুখ নারীর ওষ্ঠ, শিল্পকলা, বাগানের ফুল।
সবাই দরজা বন্ধ করে দেয় একে একে মুখের ওপর,
শুধু মধ্যরাতে ঢাকা তার রহস্যের অন্তর্বাস খুলে বলে–
ফিরে এসো তুমি।
মধ্যরাতে ঢাকা বড় একা বড় ফাঁকা হয়ে যায়,
অতিকায় টেলিফোন নেমে আসে গহন রাস্তায়, জনহীন
দীর্ঘ ফুটপাত
ছেয়ে যায় উঁচু উঁচু ঘাসে আর সাইনবোর্ডের বর্ণমালা
কী সুন্দর পাখি হয়ে রেস্তোরাঁর আশেপাশে ছড়ায় সংকেত।
একজন পরী হ্যালো বলে ডায়াল করছে অবিরাম,
মধ্যরাতে ঢাকা বড় একা বড় ফাঁকা হয়ে যায়
খোলা পথে ঝলসিত সরোবর, রাজহাঁস যেন
টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না,
স্পর্শাতীত হাঁটে
ঝরিয়ে জটিল স্বপ্ন চতুষ্পার্শ্বে, একজন বামন চার্চের
চূড়ায় চুরুট ফোঁকে, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় খোয়া গেছে
একটি সপ্রাণ চোখ তার, মধ্যরাতে বুড়িগঙ্গা নদীটির বুকে
জলজ প্রাসাদ জাগে,
রেডক্রস চিহ্নিত বাড়ির ছাদে ফেরেশতামণ্ডলী
অলীক কনফারেন্সে মাতে, অ্যাম্বুলেন্সে স্বর্গীয় মদ্যপ
গান গায়, নাচে
এবং টহলদার পুলিশ কখন অর্ফিয়ুস বনে যায় চমৎকার;

মধ্যরাতে ঢাকা বড় একা বড় ফাঁকা হয়ে যায়।

শামসুর রাহমান বলে আছে একজন, যার চক্ষুদ্বয়
কখনো কোমল হয়ে আসে হৃদ্‌স্পর্শে, কখনো-বা
শিরাপুঞ্জে কাঁটাঝোপ হয়ে কাঁপে বন্য নিষ্ঠুরতা!
মগজে প্রবেশ করে কালপুরুষের তলোয়ার,
চোখে তার গাঢ় হয় সম্রাজ্ঞীর আংটির ঝলক,
রূপবান সিংহ ডাকে বারবার চুলের জঙ্গলে,
বনদেবী ছুটোছুটি করেন নিভৃতে, ঝোপঝাড়ে,
বৃক্ষশ্রেণী চেয়ে থাকে অপলক, দেবীর বাকল
লুটায় গাছের নিচে। শামসুর রাহমান বলে
আছে একজন, যার পাশে হেনরি মুরের এক
সর্বদা এলিয়ে-থাকা নারীমূর্তি গুহার মতন
খুব ফাঁকা উদরসমেত শুয়ে থাকে, বাউলের
একতারা স্বপ্ন দ্যাখে নিরালা শিয়রে; চতুর্দিকে
পাখির মতন দৃষ্টি মেলে কিছু দেখে তাকে
অত্যন্ত নিকট থেকে বিষাদ, অসুখ, গৃহত্যাগে!
এবং আপনকার রক্তমাংসে লোভ আছে তার,
মানে সেই লোকটির, সহজেই বলে দিতে পারি।

যে কোনো দোকানে

সামগ্রী সৌন্দর্য; রাশি রাশি ওরা জগৎ সংসারে
জেগে আছে থরে থরে, কখনোবা খুব এলোমেলো,
চেতনার নানা স্তরে। এমনকি অবচেতনায়
সামগ্রীর গ্রীবা লীলায়িত; নৃত্যপর চোখ যৌথ
স্মৃতির আভায় জ্বলজ্বলে। অকস্মাৎ গুহাগুলি
জ্যোৎস্নার জোয়ারে ভেসে যায়। সুপ্রাচীন পানপাত্র,

চিত্রিত বাসন, কলসের কানা আর অলংকার
গভীর সংগীতময়। গুহাগাত্র ছায়া ধরে কত,
রাত্তিরে আগুন নিভে গেলে কেউ কেউ মাংস ছেড়ে
করে স্তব প্রত্যুষের। অনেকেই সামগ্রীর দিকে
পুনরায় ধাবমান জাগরণে নেশাগ্রস্ত প্রায়।
স্বপ্নেও সামগ্রী ঝরে, কতিপয় নান্দনিক ফোঁটা।
নানা সামগ্রীর সঙ্গে দেখা হবে ভেবে বারবার
আমিও দোকানে যাই। এর রকম দেখাশোনা ভালো

লাগে বলে বহু ঘণ্টা দোকানেই কাটে মাঝে মাঝে
এবং দোকানে গিয়ে দেখি খুব লোকজন আছে;
দোকান গুঞ্জনময়, দরাদরি চলে কমবেশি।
প্রতিটি শো-কেস যেন বর্ণোচ্ছল ফুলের কেয়ারি।

দোকানে নানা দ্রব্য, প্রতিটি দ্রব্যকে খুঁতখুঁতে
গ্রাহকের কাছে অতিশয় লোভনীয় করে তোলা
দোকানদারির তরকিব। আমি এক কোণে একা
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে নিই এটা সেটা, কোনো কোনো
দ্রব্য হাতে তুলে, যেন নির্জন স্বপ্নাংশ নিচ্ছি তুলে,
খানিক পরখ করি; তারপর যথাস্থানে রাখি

অত্যন্ত নির্মোহভাবে। স্মিত মুখে ব্যস্ত, চটপটে
সেলসম্যানের দিকে সলজ্জ তাকাই। পুনরায়
দৃষ্টি ঘোরে চারপাশে– প্রতিটি সামগ্রী থেকে কিছু
আভা বিচ্ছুরিত ক্ষণে ক্ষণে, দেখি তাদের অস্তিত্বে
অনেক সকালবেলা, দিগন্তের মেদুর ইশারা।
দ্রব্যের আড়ালে কিছু গোপনীয় মায়া সৃষ্টি হয়।

দোকানে অপেক্ষা করি। প্রতীক্ষা সুদীর্ঘ হ'লে বলি,
নিজেকেই বলি, তুমি এই কোণে জীবনানন্দের
হরিণ মুখস্থ করো, দ্যাখো এ দোকান নিমেষেই
আচ্ছাদিত আগাগোড়া ওডেসির পাতায় পাতায়,
অথবা স্মরণ করো মার্বেল কুড়াতে গিয়ে দ্রুত
সে কখন খেয়েছিলে চুমো বাল্যসখীকে হঠাৎ।

কখন যে দোকানের অভ্যন্তরে আরেক দোকান
জেগে ওঠে সপ্তবর্ণ কলরব নিয়ে। সে দোকানে
কোনো দ্রব্য নেই, তবু কেমন প্রোজ্জ্বল প্রদর্শনী–
কিন্নরের কণ্ঠে শুনি সেলসম্যানের শব্দাবলি,
জলকন্যা কাউন্টারে মূল্য তালিকার চতুষ্পার্শ্বে
তোলে সমুদ্রের সুর। গ্রাহকেরা বন্দনা-মুখর।

তোমাকেই ভাবে

আমার দরজা আমার জানালা তোমাকেই ভাবে
সারাদিনমান,

তোমার স্বপ্নে বিভোর আমার লেখার টেবিল।
কোনো দিন তুমি আসোনি এঘরে, দাঁড়াওনি হেসে
দরজার কাছে, র্যাক থেকে তুলে নাওনি নুতন
কবিতার বই
কিংবা বসোনি কাঠের চেয়ারে, শরীর তোমার
দাওনি এলিয়ে এই শয্যায়। তোমাকেই ভাবে
আমার রুক্ষ জেগে-থাকা আর উচ্ছৃংখল
রাত্রির ঘুম।
তোমাকেই ভাবে আমার উঠোন, সন্ধ্যালোকের
রক্তগোলাপ, রান্নাঘরের ফোকরে উষ্ণ
পায়রায় বুক, শূন্য রেকাবি এবং আমার
কবিতার খাতা।

আমার আঙুল, আমার চোখের অভিজ্ঞ পাতা,
পাঁজরের হাড়, প্রতি রোমকূপ তোমাকেই ভাবে।
কোনো দিন তুমি
আসোনি এখানে, বসোনি আমার পাশে কতকাল
তুমি আসো তবু মধ্যরাত্রি পেরুনো প্রহরে
চিত্রকল্পে,
হৃদয়ের কত অন্তরঙ্গ ধ্বনির মতন
শব্দমালায় স্বপ্নের মতো পঙ্ক্তিপুঞ্জে।

কে যেন সহসা বলে রাত্তিরে এভাবেই তুমি
এভাবেই থাকো–
নীরবতা ভালো, নীরবতা ভালো, নীরবতা ভালো।
কিন্তু তবুও পাথরের নিচে স্পন্দিত একা
টিকটিকিটার
মতো কিছু কথা সাবলীলভাবে জন্মাতে চায়।
সুনীল তোয়ালে ঢেউয়ের মতন পড়ে আছে চুপ,
মুখস্থ করি তোমার মুখের রেখা কালো চুল,
যে-ফুল তোমার খুব ভালো লাগে, ভাবি তার কথা,
আমার ত্বকের
ভেতরে চকিতে কোমল পাপড়ি ঢুকে যেতে দেখি,
অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে ক্ল্যারিওনেটের
খুব পুরু সুর–
জানলায় হাত রাখে দেবদূত, ঢেকে ফেলে মুখ–
বস্তুত স্মৃতি এক ধরনের জীবনযাপন।

হ্যাঙওভার

[মাহমুদুল হক প্রিয় বরেষু]

কিছুই খাব না আজ, যে-কোনো আহার্যে ভয়ানক
অরুচি আমার।
কাল সারারাত আমি তারাস্রোত আর এক একর অন্ধকার
আকণ্ঠ করেছি পান, রাত্রিকে নিয়েছি শুষে; আজ
আমাকে বিরক্ত করবার কোনো মানে নেই, দ্যাখো
স্বস্তিতে কোথাও ব'সে থাকা দায়। একটি রাত্তির
স্মৃতিতে কেবলি দিচ্ছে হানা, যে-সৌন্দর্য চেতনাকে
নিমেষে ঝলসে দেয়, তাকে পান করে সংজ্ঞা প্রায়
লুপ্ত হয়েছিল,
মনে পড়ে। মনে পড়ে কার শরীরের স্মিত অববাহিকায়
চাঁদ উঠেছিল আমি কিরণ করেছি পান কাল সারারাত।
রাত্রি
গ্রীবা
চোখ
হাত
চুল
একটি কাচের পাত্রে তরলিত কেমন সোনালি, মনে পড়ে–
একটি চুমুকে সব পান করে কোথায় দাঁড়িয়ে এলেবেলে
কী যে
কাকে
সামনে
রেখে
আস্তে
উচ্চারণ করে আরেকটু জ্যোৎস্না, গাছগাছালির
সবুজাভ রেশমি ধারা পান করেছিলাম রাত্তিরে,
পুরোপুরি নয়, শুধু একটু একটু মনে পড়ে, মনে পড়ে।
কাল রাত বড় বেশি খাপছাড়া ছিল নাকি? দাঁড়াও ইয়ার,
স্মরণ করতে দাও, এই তো পড়ছে মনে, চিত্রিত দেয়ালে
পিঠ রেখে
কাঁদছিল কেউ, তাকে নারী বলে শনাক্ত করাটা
ছিল না মুশকিল;
শুধু নারীরাই

অমন কাঁদতে জানে, তার
গভীর চোখের জল ঝরনার মতন নেমে গেল তৃষাতুর
মসৃণ আমার কণ্ঠনালি বেয়ে। দেখি ভীষণ কর্কশ
একদল লোক
গালমন্দ দিতে দিতে, খিস্তির প্রচুর থুতু ছিটোতে ছিটোতে
কবরে শুইয়ে দিল হেলায় তাদের,
যাদের আস্তানা ছিল আমার নিজের
হৃদয়ের কাছে।
নিমেষে সেসব সদ্য কবর চৌচির, লাশগুলি গুচ্ছ গুচ্ছ
নীল মুক্তো হয়ে ফের কেমন মদিরা হয়ে যায়,
পান করে বুঁদ হয়ে যাই।

পূর্বপুরুষের কিছু স্মৃতির অস্পষ্ট ঝোপঝাড়ে
নিঃসঙ্গতা বোধ বাড়ে। একটি রাত্তির
এখনও বুকের মধ্যে থরথর করে। একজন, তার মুখ
বিষণ্ন সুন্দর,
আমাকে এড়িয়ে যেতে চেয়ে মোমবাতির মতন গলে যায়–
নিশীথসমেত
গলিত মোমের বিন্দু পান করে বুঁদ হয়ে যাই, বিন্দুগুলি
এখনও বুকের মধ্যে থরথর করে। গ্লাস থেকে
শূন্যতা উপচে পড়ে, বুঁদ হয়ে থাকি, তার বসে-থাকা, তার
আসা-যাওয়া পান করে বারবার বড় বেশি বুঁদ হয়ে যাই;
টলে পড়ে যেতে যেতে আবার সামলে নিই বিব্রত অস্তিত্ব।
রক্তিম কাদায় ক্রল করতে করতে হাঁটু আর
কনুই আহত, অবসন্ন;
বিশ শতকের প্রায় অন্তিম গোধূলি পান করে;
ক্ষয়ের ভাটিতে ভেসে যাচ্ছি ক্রমাগত বুঁদ হয়ে, নিরুপায়।

কিছুই খাব না আজ, যে-কোনো আহার্যে ভারি অরুচি আমার।

দেখার ধরন

কোনো কোনো দিন প্রাত্যহিক আচ্ছাদন কী প্রবল
বিস্ফোরিত হ'লে অস্তিত্বের কিছু খোসা ঝরে যায়,
অনেক গভীর থেকে ছবি উঠে আসে কতিপয়,
চোখের ভেতরে অন্য চোখ গান গায়, ওষ্ঠে ভিন্ন

দৃষ্টি ফোটে বসন্ত দিনের মতো, সব বড় বেশি
ওলট-পালট হয়ে যায়। মাথার ভেতরে কত

পেঁচানো জটিল দৃশ্য ভাসমান– আগুনের ধারে
যৌথ নৃত্য, গাছে নড়ে অনেক মুখোশ জলাশয়ে
বিম্বিত চুম্বন আর গোধূলি-জোয়ারে ভেজা এক
প্রাচীন প্রাসাদে কলরোল, নগ্ন পাত্রে সন্ন্যাসীর
কী দিব্য খণ্ডিত মাথা, নর্তকী বিভ্রমে পাক খায়,
যেন সে লাটিম। কোনো কোনো দিন এরকমভাবে

অনেক গভীর থেকে ছবি উঠে আসে– মনে হয়
যেন আমি দূর গলগোথায় ছিলাম সেই ক্ষণে,
যখন মধ্যাহ্নে দ্রুত সন্ধ্যা নেমেছিল; মনে পড়ে
কোন সে নিশীথে সুরভিত ঘরে ম্যাগডালিনের
উত্তপ্ত অধরে আমি ওষ্ঠ রেখেছিলাম এবং
মনে পড়ে আমার বাঁশির সুরে পশু-পাখি এসে
জমত আমার চতুষ্পার্শে কী বিহ্বল, নদীতীরে
আমার আপন ছিন্ন শিরে বয়ে যেত গীতধারা!

নিজেরই অজান্তে এক দেখার ধরন জন্মে যায়
বেলাবেলি, স্বপ্নে হাঁটে গোধূলিতে দেখা
বৃক্ষশ্রেণী, ভাসে বলাকার প্রেত, অভ্রের মতন
গুঁড়ো হয়ে নড়ে ক্লিওপেট্রার কবর, ফসলের
ক্ষেতে ওড়ে ডন জুয়ানের প্রস্তুরিত ডান হাত;
পেছনে পেছনে আসে প্যানের স্পন্দিত কর্ণমূল ॥

কোনো কোনো দিন প্রত্যহের অন্তরালে এরকম
মোহ তৈরি হয়, যেন আমার নিজের থেকে আমি
সহজে বেরিয়ে গিয়ে শজারুর মতো অন্ধকারে
করে ফেলি সাবলীল তারার আঞ্জাম। তাকালেই
দৃশ্যাবলি– আমার গতায়ু পিতা আবরে বিছিয়ে
কোমল জায়নামাজ উদাস ভ্রমণকারী, তিনি
কী যেন আঁকেন আসমানে। তাঁর হস্তধৃত নীল
তশ্‌তরিতে সেজানের ফল। চকিতে কুকুরীগুলি

জলকন্যা হয়ে নামে শহুরে নদীতে; নিশীথের
শূন্য ডাকঘর বোধিদ্রুম যেন, আনন্দ, সুজাতা
চেয়ে থাকে অপলক। সুদূর শতক আজকের

রবিবার বুধবার হয়ে রাজহাঁসের গ্রীবায়,
বাস টার্মিনালে, কলোনিতে, তরুণীর নেত্রপাতে
আর গিরগিটির নিঃশ্বাসে হু হু দীর্ঘ বয়ে যায়।

তোমার নীরবতার কাছে

এ কেমন আচরণ? এ কেমন ধরন তোমার?
আমার ভেতরকার গেরস্থালি এক লহমায়
অলক্ষ্যে করেছ তুমি ওলটপালট।
অকস্মাৎ নিরিবিলি নিজস্ব নিবাস থেকে হু হু নিরাশ্রয়ে
চলে যাবে, কখনো ভাবিনি।
নিজের রহস্যে মজে আছ উদাসীন
আমার ব্যাকুলতার প্রতি।
আমার নিকট
একটি হেঁয়ালি হয়ে থাকতে কি চাও চিরদিন?
এ কেমন আচরণ? এ কেমন ধরন তোমার?

ম্যানিফেস্টো রচনার মতো দীপ্র মনোযোগে আমি
তোমাকে গড়েছি
রাত্রিদিন সুচেতন মনের ভূভাগে অনলস,
আমার নিকট থেকে তবু দূরে সরে যাচ্ছ শুধু।
তবে কি হঠাৎ কোনো বাসি পদ্য হয়ে যাবে তুমি
স্মৃতিতে আমার?
সেদিন তোমার তন্বী প্রহরের প্রতি
আমার নিজস্ব ব্যাকুলতা
ঝুঁকেছিল ভুল করে, ভুল করে নিজেরই অজ্ঞাতে
কিছুটা চটুল করেছিলাম নিজেকে,
তোমার কথার তাপে নিয়েছি হৃদয় সেঁকে বড় ভুল করে।

তোমার সৌন্দর্য তুমি অন্ধকারে রেখেছ বলেই
আমিও সে আঁধারের অনুগত– তোমার ভাবনা
আমার রাত্তিরে অনিদ্রার ডাকটিকিট লাগায়
বিরামবিহীন।
সর্বদা তোমাকে ঘিরে ওড়ে প্রজাতির মতন
আমার স্বপ্নেরা,
এবং তোমার দিকে প্রসারিত আমার সকল পথরেখা।

তোমার গ্রীবার বাঁকে, তোমার চোখের
সুদীর্ঘ ছায়ায়
কেশর দুলিয়ে ছোটে অজস্র স্বপ্নাশ্ব দিগ্বিদিক,
তোমার ঘুমের ঢেউয়ে সহস্র তরীর ভরাডুবি
হয় বারবার,
তোমার চুলের মেঘে অস্ত যায় হৃদয়ের সূর্য
শতবার,
বুকের চূড়ায় আকাঙ্ক্ষার চন্দ্রোদয় শতবার,
তোমার ওষ্ঠের কাছে নত হয় দেবদ্রুত কত,
তোমার নিঃশ্বাসে গলে যায় কত প্রাচীর, মিনার,
তোমার গোপন হ্রদে ঠোঁট রাখে শিল্পের সারস।

তোমার শাড়ির কাছে যেমন সহজ তুমি হও,
তেমনি সহজ আমি স্বপ্নের নিকট।
তোমার স্খলিত শাড়ি একপ্রস্থ স্বপ্ন হয়ে একা
আমার চৈতন্যে নেমে আসে।
স্বপ্ন ভেঙে গেলে
স্বপ্নের ভগ্নাংশ নিয়ে ছুটে যাব কবিতার কাছে,
তোমাকে স্মৃতির মতো করব লালন
গীতিকবিতায়।

আমার কবিতা এই শহুরে দেয়াল ভেদ করে
উড়ে যায় ফ্যাক্টরির চোঙে,
আমার কবিতা অন্ধকারে শিস দেয় ফুটপাতে,
আমার কবিতা মৃত্যুপথযাত্রীর অধর থেকে
অত্যন্ত রহস্যময় অনুভূতি ছেঁকে আনে,
আমার কবিতা দ্রুত নিউজ প্রিন্টকে অলৌকিক
ব্যানার বানায়,
পাখিও কখনো।
আমার কবিতা গোরস্থানে চুমো খায় সাবলীল।

আমার কবিতা গূঢ় সংকেতে রুপালি এরোপ্লেনকে নামায়
বিমান বন্দরে,
আমার কবিতা রাস্তা এবং দোকানপাট, যান
ট্রাফিক পুলিশ, বাস টার্মিনাল, ব্যাংক আর পেট্রোল
পাম্প আর বাণিজ্যিক এলাকাকে করে নৃত্যপর–
প্রতিটি বস্তুকে সহজেই অনুবাদ করে গানে।

তোমার নীরবতার কাছে আমার কবিতা বড়
অসহায়, কী দারুণ পতনপ্রবণ ইকারুস।

মৃতাঞ্জলি

[আবুল হাসানের স্মৃতির উদ্দেশে]

মানুষ চলেই যায় শেষ অব্দি, তা বলে কি এ রকমভাবে
চলে যেতে হয়?
চলে গেলে, আমাদের বড় এলোমেলো করে দূরে
মেঘের পালঙ্কে ভেসে ভেসে তুমি চলে গেলে
আরও বেশি মেঘের ভেতরে।
মেঘে ছিল রহস্যের হাওয়া, কী রকম স্বপ্নময় ভিন্ন বনস্থলী
কেমন নগর
ছিল হয়তোবা।
তীরের বেবাক নৌকো ভীষণ পুড়িয়ে চলে গেলে।

কতিপয় শব্দের ভিতর বৃষ্টি আর হেমন্তের রূপ খোঁজা,
মুহূর্তের মধ্যে বহু শতাব্দীর বসন্তের শোভা,
জন্ম-জন্মান্তের দেখা খেলা ছিল আমাদের। হঠাৎ খেলার
মাঝখানে 'চললাম' বলেই
তুমি অন্তর্হিত।

তোমাকে দিইনি বাধা, অভিভূত দেখেছি তোমার চলে যাওয়া–
বাধা দিলে তুমি শুনতে না।
জীবন যাপনের শিল্পে তুমি নিয়মের কাছ থেকে
স'রে গেছ বারবার, প্রস্থানেও নিয়ম মানোনি এতটুক।
এই যাওয়া ঘরে ফেরা নয় আর, নয় নিসর্গের
অভ্যন্তর থেকে
ফিরে আসা নিরিবিলি। অনেক দশক মুছে যাবে
নিশীথের রেস্তোরাঁর আলোর মতন,
তবুও প্রত্যাবর্তন অতি গাঢ় কুয়াশায় ডুবে
থাকবে সর্বদা।
হঠাৎ এখন যদি দরজায় কড়া নাড়ো ঘন ঘন, যদি
দাঁড়াও একাকী
সন্ধ্যা-ঢাকা, খুব ফাঁকা উঠোনো, অথবা রঙচটা

শরীর এলিয়ে দাও, অপ্রস্তুত হবো না মোটেই, ছমছমে
ভয়ে মুখ ঢাকব না দু'হাতে আঁধারে;
বরং বাড়িয়ে দেব হাত, সিগারেট, টলটলে
চায়ের পেয়ালা।
তখন ঘরের আর্ত আলোয় চকিতে
ভ্রান্তিহীনরূপে মনে হবে–
বসে আছি মৃত্যু নয়, ভিন্ন জীবনের মুখোমুখি; এ জীবন
গোলাপ গন্ধের মধ্যে, উদ্ভিদের রঙে,
ঝরনার নুড়ির মধ্যে, পাতার ভেতর অন্তহীন বয়ে যায়।
তুমি এসে দেখে যাও রাত্তিরে বিষণ্ন প্লাজা, ফাঁকা
ফুটপাত বুক পেতে রাখে দুঃখী কবির মন্থর
পদস্পর্শ পাবে বলে আর
কাতর এ শহরের চোখ ভাসে অবিরল শোকার্ত ধারায়।

ব'সে থাকি চুপচাপ, কখনো মুখর হই চায়ের আসরে;
কখনো হঠাৎ ইচ্ছে হয়
তিন হাত মাটি খুঁড়ে, শত হাত মেঘ খুঁড়ে এক্ষুণি তোমার
মুখ দেখে আসি।

কবিতা আমার ওষ্ঠে

কবিতা আমার ওষ্ঠে চুম্বন এঁকেছে বলে আমি
কেবলি আপনকার অস্তিত্বের বালিতে (যা কষ্ট)
কাঁকড়ার মতন গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে কেমন একাকী
হয়ে গেছি অতিশয়। কী যে ভয় সর্বক্ষণ, পষ্ট
বোঝা দায়, কেন আমি নীল ঘোড়াটির অনুগামী
সেই ঘোড়া, যে কেশরে দুলিয়ে সময় দ্রুত পাখি
হয়ে উড়ে যায় দূরে, ঘাসে ঘাসে নক্‌শা রেখে যায়,
বলা মুশকিল খুব। কবিতা আমার অস্তিত্বের

প্রতি রেণু কী তুমুল উড়ায় হাওয়ায়, পুনরায়
বেদাগ সংহত করে। মুহূর্তে মুহূর্তে মাছ-পড়া
ছিপের মতন হই এবং প্রকৃত মানুষের
নিকটে আসার জন্যে স্নেহজাত নিভৃত ডেরায়
করি বাস, মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকি।
কবিতা চৈতন্যে জন্ম-জন্মান্তর, পাতা, পাতা ঝরা।

এমন থাকতে পারি

কোনো তাড়াহুড়ো নেই, আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষায়
এমন থাকতে পারি অবিচল। ক্লান্তি করবে কি
আহার আমাকে কোনো দিন? কিংবা আমাকে ভীষণ
ম্রিয়মাণ, সদ্য মৃত ভেবে আকাশে রচিত হবে
পক্ষীচক্র? পোকা-মাকড়ের ঝাঁক আসবে কি ধেয়ে
নিষ্পলক চোখ আর ওষ্ঠের উদ্দেশে? নাভিমূলে
ঘুরবে পিঁপড়ের দল? চাঞ্চল্য আমাকে আর বেশি
ঘোরায় না চোরাপথে, দীর্ঘ বন-বাদাড়ে অথবা
বলে না দেখতে মুখ সারাক্ষণ স্বচ্ছ নগ্ন জলাশয়ে।
ব্যস্ততার পরপারে আমি দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকি।

কী এক পাখির গানে তরঙ্গিত হৃদয়ের ঝোপ,
চোখ বিস্ফারিত, সুরে সুরে অতীত ও বর্তমান
বড় বেশি মেশামেশি করে, কাল টুকরো টুকরো হয়ে
ঝরে চারপাশে আর কেমন মদির ঘ্রাণ হয়
দিকগুলি অকস্মাৎ কোত্থেকে একটি নীল ঘোড়া
মন্থর বাড়ায় গ্রীবা, ফেরায় আমার প্রতি, যেন
ভালোবাসা চিয়ে শান্ত এখানে আশ্রয় কিছুকাল।
ভয় হয়—এ অতিথি হবে না তো উধাও এক্ষুণি?

গোলাপ গন্ধের মধ্যে স্মৃতি, স্মৃতির ভেতরে কিছু
মুখচ্ছবি, পদধ্বনি হাতের ঈষৎ নড়া, সাঁকো
এবং ঝরনার পাশে নিদ্রাতুর নিরালা শরীর।
স্বপ্নেরা স্মৃতিরই অন্তর্গত, বুঝি তাই স্বপ্নস্থিত
আমার শরীর কোনো বিশাল উদ্যান, শূন্য বাড়ি,
মৃত পাখি, স্বর্ণরেণু বিবর্ণ বেহালাসহ স্মৃতি।
শূন্যে হাত ছুড়ব না অথবা মাটিতে এলোবিলি
করব না পদাঘাত। এমন থাকতে পারি আমি...
দীর্ঘকাল এই মতো অস্থিরতা-রহিত সর্বদা
অবচেতনায় ঘরে অপেক্ষায় বুদ্ধমূর্তি প্রায়।

অন্য কেউ

আমার উদ্দেশে কেন এই স্তব, এই শোভাযাত্রা?
আমি তো দীনাতিদীন, আমার সুকৃতি নেই কোনো।

আমি কি দিয়েছি ডাক যে তোমরা করে ভিড়
এখন আমাকে ঘিরে? তোমাদের চন্দনের ফোঁটা,
বরমালা গ্রহণের যোগ্যতা আমার নেই, আমি
যে গান বানাই তার সুর তরঙ্গিত ব্যর্থতায়।
তোমাদের জন্যে হাঁটি দীর্ঘ পথ, কত রাত্রি আজও
নির্ঘুম কাটাই, দ্যাখো, কেবলি আমার রক্ত ঝরে
পথের নুড়িতে, নদীতীরে, কাঁটাবনে তোমাদের
উদ্দেশেই, কিন্তু নই পরিত্রাতা। বস্তুত আমার
মাথার পেছনে নেই আলোর মণ্ডল। আমি শুধু
বিজন প্রান্তরে এক দুঃখিত, নিঃসঙ্গ কণ্ঠস্বর।
তোমাদের অভ্যর্থনা আর প্রতীক্ষার যোগ্য যিনি,
অমাবস্যা ফুঁড়ে তিনি স্বপ্নেশ্বর আসবেন পরে।

গাড়ল

কোন দেশী গাড়ল এ লোক? কোন দেশী?
গোত্র নেই, দেশ নেই তার। সে কি ছদ্মবেশী
শৃঙ্খলিত কিন্তু করজোড়ে তোতা পাখির মতন
ধন্যবাদ ধন্যবাদ বলে সারাক্ষণ।

কখনো বকুলতলা, নদী, ছেলেবেলা,
যৌবন মুখস্থ করে, কখনো দেখায় কত খেলা–
অতিশয় সরু
দড়ির ওপর হেঁটে যায় বারবার। বুকে মরু,
তবু শূন্যে গর্ত খুঁড়ে কী স্নিগ্ধ ফোয়ারা দ্যায় খুলে।
কখনো হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলে, ভুলে
হঠাৎ বেরিয়ে এলে চক্ষুদ্বয়ে জল,
সকলের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চায় সে গাড়ল।

গোলাপের কাছে তার ঋণ আছে; সঙ্গীতে, সে জানে
ঋণের চেয়েও বেশি কিছু থাকে। রমণীর টানে
বেলাবেলি ঘরে ফিরে দেখেছে সে বস্তুত শূন্যতা সীমাহীন।
দক্ষ এ্যাক্রোবেটের মতই কতদিন
ঘূর্ণমান গোলকের ভেতরে দিয়েছে লাফ আর
ঘোড়ার পেছনে ছুটে, স্বেচ্ছায় মাটিতে প'ড়ে গিয়ে বারংবার
বাড়িয়েছে ফুর্তি দর্শকের; এভাবেই বেলা যায়।

নিঃসঙ্গতা নিত্যসঙ্গী, বিষাদের পাশে ব'সে বেহালা বাজায়।

খেলা শেষ হ'লেই সে শৃঙ্খলিত পুনরায়, কেউ তার
চুল ধরে টানে কেউ কেউ ছোড়ে লাথি, যন্ত্রণার
রেখাবলি ফোটে মুখে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে ভারি
মজা পায় নানা পথচারী,
ছুড়ে দ্যায় ছোলা কিংবা বাদামের খোসা কত ছলে,
সে শুধু ধ্যানীর মতো সর্বক্ষণ ধন্যবাদ ধন্যবাদ বলে।

যে গেল নগ্ন পায়ে

যে গেল নগ্ন পায়ে এমনি গেল,
কেমন নিঝুম শূন্য গেল,
খুব একাকী উদাস গেল।
শহরধুলো বনস্থলী, জুতো জোড়া,
কোমল মুঠি, নৈশ ভ্রমণ,
ছন্নছাড়া ঘরে ফেরা—
সবাই মাতে প্রত্যাহারে।
শব্দ শব্দ গেরস্থালি এলোবিলি
গুমরে ওঠে এলোমেলো।
প্রত্যহের তাড়া এলোমেলো।

যে গেল সে নগ্ন পায়ে এমনি গেল,
কেন নিঝুম শূন্য গেল,
খুব একাকী উদাস গেল।

সত্তা কি তার ছিল গোপন স্বপ্নমোড়া?
ছিল কি সে রিক্ত শ্রমণ?
পৌঁছুলে সেই বিভুঁই ডেরায়
কেউ জেতে কি? কেউ কি হারে?

কেমন জেদী একরোখা সে; আগের মতো
তাকায় না আর পিছন ফিরে
ভালোবাসার গহন তীরে।

যেসব শব্দ সোহাগ ভরে ঘনিষ্ঠতায়
এসেছিল তার নিকটে,

জ্যোৎস্নাধোয়া তীক্ষ্ণ তটে,
এখন ওরা দেখছে আপন তীব্র ওড়া,

তেজী সাদা ঘোড়ার গমন,
এখন ওরা দুঃখঘেরা
মেঘের মতো ছায়ায় বাড়ে।
হেলায় ফেলে যৌবনেরই দীপ্ত বছর—

নগ্ন পায়ে তবু গেল,
খুব একাকী উদাস গেল।

সেই আজনবি

কোত্থেকে এলো সে কেউ বলতে পারে না, তাকে ঘিরে ভিড় জমে
সকালবেলার রোদে; কেউ
সম্মুখে এগিয়ে যায়, কিছুটা পেছিয়ে আসে কেউ।
পরস্পর কানাঘুষো চলে, কী সুন্দর কী সুন্দর বলে কেউ,
ফ্যালফ্যাল তাকায় কেউবা।
সবুজ শরীর তার স্নেহজাত সমর্থন পায়নি কখনো
গেরস্তের ঘরে;
বাতাসে সোনালি চুল ওড়ে, নিরিবিলি চক্ষুদ্বয় পৃথিবীর
সম্পর্করহিত আর পদযুগ কস্মিনকালেও পাঁকে
ডোবেনি এবং
চিন্তা তার সারসের মতো ওড়ে আকাশে আকাশে, ফুলে ওড়ে,
পাখিদের চোখে চোখে, লতাগুল্মময় চিন্তা তার পাতালের
প্রতিবেশী।
বড় বেশি চুপচাপ কান্তিমান যুবা তবুও অস্তিত্ব তার
গীতধারা।
তাকে দেখে বোঝা যায় নিজে-নিজে খুশি থাকা বলে কাকে।
যখন বাড়ায় হাত ভালোবাসা মর্মরিত হয় গাছে গাছে,
মাটিতে কী যেন ফোটে ফুলের মতন, অনেক পায়রা ওড়ে
দূরের রোদ্দুরে।
কেউ তার চুল ছুঁয়ে দ্যাখে, কেউ আঙুল বুলোয় ঝলমলে
সবুজ শরীরে,
এ কোন অতিথি এলো আজনবি— সকলেই ভাবে।
কেউবা বসাতে চায় বৈঠকখানায় তাকে, ভিতরমহলে

কেউ নিয়ে যেতে চায়, কেউ তার সখ্য একান্ত কামনা করে
সকল সময়।

আজনবি থাকে তবু বাইরে সর্বদা চুপচাপ, একা-একা,
বলে না কারুর সঙ্গে কোনো কথা, বুঝি নীরবতা
একান্ত আরাধ্য তার। যখন সে হেঁটে যায় প্রতিটি সকাল
আরেক সকাল হয়, রাত্রি ভিন্ন রাত্রি, ফুলের কেয়ারি থেকে
জেগে ওঠে স্বপ্নময় গান, তার সঙ্গে চলে পশুপাখি আর
নক্ষত্রমণ্ডল।
জানে না সে হিংসা বলে কাকে, কাকে ক্রোধ কিংবা ঘৃণা;
সর্বদা নিঃশ্বাসে তার বয়ে যায় ক্লান্তিহীন প্রেমের নিঃশ্বাস।
সকলেই তাকে চায়, কান্তি দ্যাখে, বিশ্লেষণী বোধ লোপ পায়
তার কাছে গেলে।

এভাবে সময় যায়। কেউ সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে, ভাবে ওরা–
কী করে এমন হয়? এ-ও কি সম্ভব এত ভালো কেউ
আমাদের মধ্যে তার খুঁজবে নিবাস? কেউ কেউ সুকৌশলে–
দারুণ হিংসুক ওরা, বড়
বেশি হিংস্র–
রটায় নানান কথা, বলে আমরা ফেরেবে প'ড়ে
একটি নকল স্বপ্নে বন্দি হয়ে আছি, এই আজনবি শুধু
অশুভের বীজ
কৌশলে ছড়াচ্ছে লোকালয়ে। একদিন সকলেই সমস্বরে
যেও না যেও না কেউ ওর নজদিক,
বন্দি করো তাকে বলে পথে পথে হল জড়ো, তারপর
খাঁচায় পুরল সেই কান্তিমান অচেনা যুবাকে।
আজনবি চিত্রবৎ, যেন রক্ত নেই তার শিরার গলিতে,
করেনি সে কোনো প্রতিবাদ।
বড় বেশি চুপচাপ খাঁচায় রইল সে, শুধু তার চক্ষুদ্বয়
তখনো রহস্যময় খুব।

এভাবে সময় যায়। সবুজ শরীর তার ঝলমলে তবু,
নিরিবিলি চক্ষুদ্বয় জ্বলজ্বলে।
অকস্মাৎ একদিন কৌতুকের তোড়ে এসে সকলেই দ্যাখে
সকালবেলার রোদে দ্যাখে–
শূন্য খাঁচা, কী যেন হিংসার মতো শুধু কালো, অস্থিচর্মসার
পড়ে আছে একরত্তি, মৃত।

পিঞ্জরে শরীর ঘ'ষে

চিন্তিত ব্যক্তি সে আজও, উদ্বেগের পীড়িত শিকার।
অতীত, আগামী ভাবীকাল– যেন কয়েকটি বল–
নিয়ে যারপরনাই ক্রীড়াপরায়ণ সদাই।
তখনো নিদ্রার থেকে উত্থিত, ব্যথিত কথঞ্চিৎ,
দ্যাখে অপসৃয়মাণ স্বপ্ন তাকে দিচ্ছে টিট্‌কিার।
পিঞ্জরে পাখায় ঘুণ, ম্রিয়মাণ পাখিটির গীত
প্রবঞ্চিত সৌন্দর্যের মতো কোথাও উধাও; তাই
পিঞ্জরে শরীর ঘষে হতে চায় কিছু শব্দোচ্ছল।

অপরাহ্ণে হৃদয়েরও, নিঃসঙ্গতা এলানো মগজে–
সে ভাবে, শব্দের মায়া কতকাল এভাবে গীতের
বনস্থলী ব্যেপে খুব মধুরতা, কিছুবা অস্থির
বিষণ্নতা বওয়াবে? এখন তো সকলেই ভজে
সমুন্নত সিংহাসন। সে একাকী বেজায় শীতের
মরশুমে বুভুক্ষায় গরম রুটির মতো তাপ।

খোঁজে অসহায় শব্দের নিবাসে, কী অধীর
রৌদ্রের পরিখা আর জ্যোৎস্নার বাসর, লোকালয়,
মুখচ্ছবি গ'ড়ে যায়। চেনে না নিজেরই পদচ্ছাপ
রক্তচোষা সিঁড়ি আর পথে; হাঁটে কর্কশ আলোয়,
ছাড়িয়ে গাছের শীর্ষ নক্ষত্রের আড়ালে সে থাকে;
অকস্মাৎ গীত পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত করে তাকে।

তার মনে প'ড়ে যায় সড়কে কিসের দাগ, ঘরে
কারা ছিল, গাছ তার মাথার ভিতর কিংবা মাথা
স্তব্ধ মনুমেন্টের ভিতর ঢুকে গিয়েছিল আস্তে।
এখন প্রচুর দৃশ্য ভাসমান মনের নানান স্তরে
এলেবেলে, লুকাচুরি চলে। খাঁ-খাঁ বাড়ি, বৃক্ষ পাতা,
তস্তরিতে জলপাই– সে আনত স্বপ্নের ওয়াস্তে।

স্বপ্নে কি পিঞ্জর থাকে? দীর্ঘ পথ চূর্ণ হয়? স্মৃতি
মৃত্যুর অনেক কাছে চলে যায়? ধ্বস্ত সেতু চোখে
নিয়ে কেউ কথোপকথন সারে কফিনের পাশে?
পিঞ্জরে শরীর ঘষে ঘষে অবরুদ্ধ শোকগীতি
বুকে পুষে ঠিকঠাক থাকা চলে ভুতুড়ে আলোকে?
সে ভাবে, এখন স্মৃতি যাক বয়ে আপন নিঃশ্বাসে।

মৃত্যু

মৃত্যু যদি গন্ধ হয়ে ভাসে,
আমার তবে কী-ইবা যায় আসে?
মৃত্যু তুমি আলুফা নেশা নাকি
কিংবা কোনো গোপন রঙা পাখি?
আমাকে বুঝি ঠুকরে খেতে চাও–
এই তো আমি, তোমার ঠোঁটে নাও।
মৃত্যু তুমি রাঙাও কেন চোখ?
একটি নদী হবেই গাঢ় শোক।
মৃত্যু তুমি পাথরে, নীল জলে,
তৃণাঙ্কুরে বন্ধ্যা মেঘদলে
বেড়াও বয়ে কত যে গোপনতা–
মৃত্যু তুমি রাখো না কোনো কথা!

চকিতে একটি বাক্য

চকিতে একটি বাক্য মগজের কোষ থেকে একা
সারসের মতো উড়ে গেল ডালিম গাছের
শীর্ষ ছুঁয়ে দূরবর্তী ছাদের ওপারে, তারপর
কোথায় যে। শুধু ডানা ঝাপটানি স্মৃতি
এ মুহূর্তে; সেই বাক্যে নিশি ছিল, সমুদ্র গর্ভের
লতাগুল্ম স্মৃতি-বিস্মৃতির অনুরণন, কিছুবা
ঢাকির কাঠির নৃত্য, জলকেলি, শোভাযাত্রা ছিল।
সেই বাক্যে পূর্ব পুরুষের মুখচ্ছবি, নারীঘ্রাণ,
সৈনিকের আর্তনাদ, প্রেমিকের হৃদয়স্পন্দন,
তিতিরের কীটাহারকালীন নজর, তৃষাতুর
সাপের চলন, দীর্ঘ পথ, পান্থশালা আভাসিত।
সেই বাক্য মধ্যরাত্রি, অকপট গহন বিহান।

সেই বাক্য অকস্মাৎ আমার নিজস্ব চোখ হয়ে
তাকায় আমার দিকে, বলে, চলো যাই, উড়ে উড়ে
বনস্থলী, যা শ্যামল অনুভূতি, শহরের সব
বাড়িঘর, যা প্রচুর স্মৃতিময়, মাথার ভিতর
নিয়ে চলো উড়ে যাই।' সেই বাক্য ইশারায় ডাকে,

আমিও কী মোহাবিষ্ট পাখার আশ্রয় পেয়ে যাই।

আমরা দু'জন– আমি, সেই মগজ উদ্ভূত বাক্য,
চন্দ্রালোকে শহরের অনেক উঁচুতে উড়ে উড়ে
দূর শতাব্দীর রূপরসগন্ধ পাই, অস্তমিত
শতাব্দী কখনো হই। সকালের নাবালক আলো
স্ফুরিত হওয়ার আগে আমার কোমল পাখা দুটি
কাষ্ঠবৎ ভয়ানক নিস্পন্দ, নিশ্চল। দিকগুলি
ভয়াবহ প্রতিধ্বনি, আমাকে গিলতে আসে, আমি
ভীষণ পতনশীল, তবু আমাকেই লুফে নেয়
নারীর বুকের মতো ফুলের কেয়ারি ভালোবেসে।
একা সেই বাক্য পরিযায়ী পাখিদের ছন্দোময়
মালার একটি ফুল হয়ে উড়ে গেল, উড়ে গেল।

বাক্যটির জন্যে আমি কেবলি দুঃখিত হতে থাকি।

এয়ারপোর্ট বিষয়ক পঙ্‌ক্তিমালা

প্রায় চোখ মুখ বুজে ছুটছি, ছুটছি উর্ধ্বশ্বাসে,
এক্ষুণি পৌঁছুতে হবে বিমান বন্দরে। রাস্তাঘাট
কেবলি পিছলে যাচ্ছে পায়ের তলায়। গাছপালা,
ভিখিরি, দোকানপাট, রিকশাঅলা, আইসক্রিমের
বাক্স, হকারের মুখ এবং বিজ্ঞাপনের ফুল্ল
ব্রা-পরা তরুণী গলে যাচ্ছে ক্রমাগত এলেবেলে
আমার চোখের মধ্যে; আমি শুধু ছুটছি, ছুটছি।
কুকুর, ট্রাফিক আইল্যান্ড, নারী স্মৃতি হয়ে যায়।

এই তো আমার মুখ আমার মুখের কাছ থেকে
এবং আমার হাতে আমার হাতের কাছ থেকে
এবং আমার চোখ আমার চোখের কাছ থেকে
বারবার সরে যাচ্ছে অতিদ্রুত, বড় নৈর্ব্যক্তিক।

দেখছি আমার মুখ একটি মৌচাক হয়ে ভাসে,
এবং আমার হাত ছায়ার ক্ল্যারিওনেট হয়ে
বাজতে বাজতে শূন্যে লীন হয়ে যায়, মেঘ হয়
এবং আমার চোখ পাখি হয়ে হাওয়ায় উড্ডীন।

এয়ারপোর্টের প্রতি আমার গভীর অনুরাগ,
এয়ারপোর্টের প্রতি ছুড়ে দিই গোলাপের তোড়া,
এয়ারপোর্টের সঙ্গে খুনসুটি ভালো লাগে খুব,
তার ওষ্ঠে ওষ্ঠ রাখি, তাকে নিয়ে ঘুমাই গভীর,
কখনো সাজাই তাকে স্বপ্নময় প্রধান ঝালরে,
কখনোবা গাঢ় গোধূলির মতো মনো-বেদনায়।

এক্ষুণি পৌঁছুতে হবে, কিন্তু পথ দীর্ঘ হয়ে যায়,
শুধু দীর্ঘ হয়ে যায়, তবু আমি ছুটছি ছুটছি।
প্লেনের সিঁড়ির কাছে ছিমছাম স্টুয়ার্ড অথবা
সুস্মিতা এয়ারহোস্টেসকে বলব কায়দা করে–
তোমার স্বাগত সম্ভাষণের প্রত্যাশী নই আর
আমার নিজস্ব সিট আমি নিজে খুঁজে নিতে জানি।
বস্তুত এয়ারপোর্টে হন্তদন্ত, ক্লান্ত পৌঁছে দেখি–
আমাকে ফেলেই প্লেন নীলিমায় ধাতব মরাল।

নকশা

নকশা আছে মনোব্যাপী, ছন্দোময় নিঝুম গড়ন–
প্রাচীন সুরাই যেন, যৌথ কারুকর্মে কান্তিমান।
এই নকশা জ্বলজ্বলে, প্রাণবান কখনো নিতান্ত
চেনা, কখনোবা মায়া, বহুমুখী রহস্যে অচেনা।

ফুলের কেয়ারি বুঝি এই নকশা, যেখানে পাখির
ছায়া পড়ে, রৌদ্রানন্দ ঘন হয়, জ্যোছনা গহন
গীতধারা, নিরিবিলি সৃজনপ্রবণ আর মালী
অলস অমনোযোগী হ'লে কেবলি উৎপন্ন হয়
রাশি রাশি পরগাছা, কোনো কোনো ঋতু ভয়ানক
নিষ্ফলা, রোরুদ্যমান দিনরাত্রি, পত্রপুষ্পহীন
ডাল কাঁপে বিরান হাওয়ায়। কারো কারো বেলা যায়
সুরাইয়ে একটি রেখা এঁকে, ভাগ্যবান হ'লে কেউ
মুখচ্ছবি আঁকে কোনো; নকশা বড় শোণিত পিপাসু,
ক্রমাগত সত্তার বিশদ ক্ষয়ে নকশা জায়মান।

অন্তর্গত এই নকশা বিশ্বপ্লাবী তুমুল আঁধারে
নিত্য প্রাণ জাগানিয়া সুগভীর সংকেত নিরালা–

সে সংকেতে একটি মানুষ অন্য মানুষের কাছে,
খুব কাছে চলে আসে, যদিও পরস্পরের দেখা
হয় না কখনো; এভাবেই অন্তরালে পরিচয়
প্রসারিত চিরদিন মানুষের মধ্যে দিকে দিকে।

সে এক আশ্রয় বটে ভ্রান্তিহীনরূপে মানসিক।
যেমন ওষ্ঠের সঙ্গে চুম্বনের, আপেলের সাথে
তার অন্তর্গত গূঢ় রসসিক্ত মাংসের সম্পর্ক,
বলা যায়, তেমনি এক সম্পর্ক মনের চিরকাল
নকশার সহিত। এই নকশা থেকে দূরে কেউ কেউ
সহসা পালাতে চায়, তছনছ করে দিতে চায়
তাকে, বড় বেশি এলোমেলো, তবু নকশা থেকে যায়
রূপান্তরে, অস্তিত্বের গীতময়তায় বন্দনীয়।

তুমি চলে গেলে

যখন আমার কাছে এসে বসো, করো পায়চারি,
তাকাও আমার দিকে আড়চোখে, গালগল্পে মেতে
কাটাও অনেক বেলা, কখনো ওল্টাও তাড়াতাড়ি
সাহিত্যপত্রের পাতা এলোমেলো অথবা মেঝেতে
রাখো চোখ, কী যে ভাবো– আমি অতিশয় নিরুত্তাপ
ঘড়িতে সময় পড়ি, যেন তুমি নেই কাছাকাছি,
যেন হৃদয়ের ঘরে পড়েনি তোমার পদচ্ছাপ।
নিজের আড়ালে আমি নিজের বৈরিতা নিয়ে বাঁচি।

তুমি চলে গেলে অস্থিরতা জেগে ওঠে, অকস্মাৎ
আমার ভিতরকার একাকী পুরুষ শব্দ নিয়ে
খেলা করে, অদৃশ্যের প্রতি ব্যগ্র বাড়ায় সে হাত,
লুকিয়ে নিশীথে মুখ কাঁদে খুব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

প্রজাপতি

প্রজাপতি সারারাত আমার ঘরেই ছিল খুব
চুপচাপ দেয়ালের এক কোণে বিন্দুর মতন।
আমি তো না জেনে তাকে এই ঘরে দিয়েছি আশ্রয়।

সারারাত বই প'ড়ে, কিছু লিখে এবং ঘুমিয়ে
কেটেছে আমার, আমি তাকে লক্ষ্য করিনি মোটেই।
আমরা পরস্পরের অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন
ছিলাম সমস্ত রাত একই ঘরে। অকস্মাৎ ভোরে
পিতার প্রাচীন ফটোগ্রাফের সান্নিধ্যে প্রজাপতি
তরঙ্গিত, দেখলাম; এখন সে আমার নিজস্ব
ভাবনায় অন্তর্ভুক্ত অতিশয় সাবলীলভাবে।
সে-ও কি আমার কথা সমস্ত শরীর দিয়ে তার
চিন্তা করে? প্রজাপতি নড়ে হৃৎস্পন্দনের মতো।

কাতরতা বেড়ে যায়

কাতরতা বেড়ে যায়, মধ্যপথে বেড়ে যায় বলে
থমকে দাঁড়াতে হয় কিছুক্ষণ এদিক ওদিক,
বিশেষত ছায়াচ্ছন্ন সুদীর্ঘ পেছনে কী উৎসুক
দৃষ্টি মেলে দিতে হয়, কত কিছু খসে হাত থেকে,
কী এক অস্পষ্ট কষ্ট অবশেষে শ্বাসকষ্ট হয়ে যায়
নিমেষেই, কুকুরের মতো কিছু দেখা যায় কিনা
আশেপাশে জনশূন্যতায়, দেখে নিতে চাই।

মধ্যপথে নিজেকেই দেখে আমি হয়েছি কাতর।
এখন পাথর বলে, এখানে মাথাটা রেখে তুমি
খানিক ঘুমাও, গাছতলা ডাকে ছায়া নেড়ে নেড়ে,
নদীতীর টলটলে আতিথেয়তার মখমল
হয়ে থাকে, পাখিগুলি ডানা মেলে বলে, পথচারী
এখানে ঘুমাও এসে কিছুকাল, পালকেরও আছে
স্বপ্ন বুননের শিল্প। মাথায় নিসর্গ গলে যায়।

মাথার ভেতর সূর্যোদয় ক্ষীয়মাণ, অস্তাচল
অত্যন্ত করুণ হয়ে আসে, একেকটি রাজহাঁস
আমার নিকট এসে গলে যায় তুষারের মতো
পেছনে অনেক কণ্ঠ বেজে ওঠে, অলীক ঝংকার,
কখনোবা দীর্ঘশ্বাস, কান্না আমাকে স্বজন ভেবে
ঘিরে ধরে, বলে দূরে যেও না, সেখানে মিনারের
চূড়ায় শ্যাওলা আছে, শতাব্দির কাতরতা আছে।

আমার বেবাক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলগা হয়ে আসে।
কোথেকে এমন ক্লান্তি উড়ে এলো? তবে কি আমিও
শূন্য, কাতরতাময় প্রান্তের তৃষ্ণায় পানি ভেবে
রুক্ষ মাটি খাব শুধু? দেখব ওপরে লোভাতুর
পাখিদের ক্রূর চক্র বারবার? এক্ষুণি আমাকে
আহত পাঁজর খুঁড়ে ফোয়ারা জাগাতে হবে আর
দশটি আঙুল থেকে ছেড়ে দিতে হবে শত পাখি।

গুপ্ত সেতু

একটু হাঁটলেই গুপ্ত পথ,
কোথাও সাড়া নেই, বন্ধ দ্বার।
এভাবে দিনগুলি ফুরিয়ে যাক,
ফুরিয়ে যাক রাত প্রতীক্ষার।

কবর খুঁড়ে নিজে সেখানে থাকি,
প্রেতের সহবাসে দুঃখু বই।
এভাবে দিন যায়, রাত্রি যায়,
স্মৃতির দাঁতে রোজ বিদ্ধ হই।

আমার রক্তের ফেনিলতায়
নৌকো হয়ে ভাসে দু'চোখ তার।
আমার সত্তার প্রান্তে বয়
মোহন নিঃশ্বাস কামুকতার।

তাকেই মুখস্থ করছি শুধু
উষ্ণ থরথর উচ্চারণে।
আমার ঠোঁটে তার নগ্ন ছোঁয়া
একদা নেমেছিল, পড়ল মনে।

হঠাৎ তার কথা পড়লে মনে
ধড়মড়িয়ে উঠি জীর্ণ খাটে,
কী ঘোর অনিদ্রা রাত্রিভর
জ্বালার সাথে ষড়যন্ত্র আঁটে।

আমার স্বপ্নের তেপান্তরে
লুটোয় তার চুল, দীর্ঘ, কালো।

আমার চিন্তার ছিন্ন মেঘে
জরির মতো হাসি ঝলমলালো।

অকূল রিক্ততা করলে গ্রাস,
আমার কংকাল হয় কাতর
গোপন নিঃশ্বাস লাগলে মুখে
দু'চোখ হয়ে যায় নীল পাথর।

সে যদি আসে তবে পাথর হবে
ঝরনা সাবলীল প্রাণের গানে।
কিন্তু তার আসা হবে না আর,
গুপ্ত সেতু ভেসে গিয়েছে বানে।

একজন রুপালি কবির কাছে

একজন কী সুদূর রুপালি কবির কাছে আমি
প্রায়শ যেতাম অগোচরে, যন্ত্রণা গভীর হ'লে
হৃদয়ের; দেখতাম রাজহাঁস তাঁর অনুগামী
মোহন অভ্রের কুটিরের কাছাকাছি; কথাচ্ছলে
পাখিকে ডাকার মতো ডাকতেন কবিতাকে, তাঁর
পায়ের তলায় নুড়ি কী আনন্দে হতো হৃৎস্পন্দন।

নক্ষত্রের বাক্সে পায়রার মতো ব্যালট পেপার
ফেলেছেন বারবার : ছিঁড়ে-খুঁড়ে রীতির বন্ধন
নিজের ভেতরে তীব্র দিয়েছেন ভেটো সর্বদাই
ধ্বংসের বিপক্ষে, রেখেছেন বাক্য অর্ধবাক্য আর
বিশেষ্য ও বিশেষণ শুইয়ে দিঘিতে, ঘাসে ঘাসে।
কখনো চালান মেঘে মেঘে মেরুন মোটরকার
এবং জুতোর নাকে জ্বলে স্বপ্ন, সুদূর নিঃশ্বাসে
তাঁর প্রান্তরের আর সুপ্ত পাতালের ঘ্রাণ পাই।

অন্তরালে থাকা ছিল সে রুপালি কবির স্বভাব।
নিভৃত আস্তানা থেকে তাঁর দূরে চলে গেলে কানে
মধুর বাজত সুর, স্পন্দমান অদৃশ্য রবাব।
বয়স বুঝিনি তাঁর, এমনকি তাকেও বুঝিনি
কোনো দিন; সবুজ আয়ত তাঁর চোখে কী যে আছে,
কী যে আছে হাতে, ক্ষিপ্র পারেন লাগাতে ছিটকিনি

অন্তর্গত দরজার। চৈতন্যের অত্যন্ত গহনে
অক্লান্ত সাঁতারু তিনি, নিজেই নিজের অন্তর্যামী।

মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যি কি গিয়েছি তার কাছে?
বলতেন, তুমি ঐ হরিণের পেছনে পেছনে
ছুটে যাও, তার স্পর্শ যদি পাও, বিশুষ্ক বাগানে
জাগবে বর্ণিল শোভা, আমি পথ ছেড়ে বনে নামি–
সর্বত্র বেড়াই ছুটে, অথচ হরিণ পলাতক
সে কোন অরণ্যে। হরিণের পদধ্বনি যত দূরে
যায় তত স্পষ্ট হয় আপনার সমাধি ফলক।
একটি জীবন বাজে ক্রমাগত হরিণের খুরে।

প্রশ্নোত্তর

যখন আড়ালে পথ চলি,
'কী খবর, আরে, বলুন তো কী খবর',
প্রশ্ন করে, গাছপালা, পাখি, আমি বলি–
প্রেরণাবিহীন কবি রুদ্ধশ্বাস বন্ধ ডাকঘর।

কী করে কেবলি স্বরময়ী

কী করে কেবলি স্বরময়ী হয়ে যাও নিরালায়?
আমার মানসে তুমি মাঝে-মাঝে হয়ে ওঠো ধ্বনির প্রতিমা।
তোমার অমন কণ্ঠস্বরে একটি সামান্য যন্ত্র
কী মোহন পরীর খেলনা
হয়ে যায় নিমেষেই, কেমন সঙ্গীতময় হয় অগোচরে।
কম্পিত আঙুল হয়ে, ঠোঁট হয়ে তোমার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর
নিভৃত আমাকে ছোঁয় আমার এ ক্ষয়িষ্ণু বেলায়।

মুহূর্তের ঢেউগুলি তোমাকে অনেক দূরে সরিয়ে কোথায়
নিয়ে যায় বলেই আমার
এত কাছে এসে যাও। যখন হঠাৎ একা রূঢ় সমাজের
কাছ থেকে, তোমার নিজস্ব নাম থেকে নিজেকে লুকিয়ে তুমি
শুধু স্বর হয়ে
শুধু স্বর হয়ে

শুধু স্বর হয়ে
আমার অস্তিত্বে তুমি পূরবীর নির্জন সুরভি,
তখন আমিও লোকচক্ষুর আড়ালে গ্রন্থ আর
টেবিল চেয়ার থেকে, ডায়েরির পাতা থেকে নিজেকে সরিয়ে
নিজস্ব চায়ের কাপে চুমুক দেয়ার মতো
পান করি একটু সময়,
পান করি অবিরল তোমার শিশিরগন্ধী স্বর।

শুনেছি তোমার কণ্ঠস্বরে যেন কোনো একাকিনী
দূর কারাবাসিনীর কাতর প্রার্থনা
পাথরে পাথরে গুমরানো,
কখনোবা মধ্যসমুদ্রের
স্পর্শাতীত মৌনে জেগে ওঠা জলকিন্নরীর গান।
হে সুদূরতমা, শোনো, তুমি-ধন্য তোমার নিবাস
আমার আপনকার মৃত্যুহীন স্বপ্নের প্রদেশ।
ক্ষয়িষ্ণু বেলায় একা বসে থাকি উৎকর্ণ, অধীর–
ফের বাজাবে কি সেই কণ্ঠস্বর স্বপ্নের জ্যোৎস্নায়?

বিষাদ আমার প্রতি

বিষাদ আমার প্রতি প্রবল আকৃষ্ট বলে তাকে
আমার নিকট দেখা যায় ঘন ঘন, তার সাথে
বড় বেশি মেশামেশি হয়। বিষাদ আমার হাতে
মধ্যরাতে অশ্রুপাত করে অবিরত, মুখ ঢাকে
আমার বুকের অভ্যন্তরে; মাঝে-মাঝে খুনসুটি
করে, যেন বিষণ্ণতা বলে কিছু নেই, নেই কিছু
চোখের পানির মতো ব্যথাময়। কখনোবা ঘুঁটি
চেলে বসে থাকে সতরঞ্জে, আমি খুব মাথা নিচু
করে ভাবি, এ কেমন খেলার পদ্ধতি? প্রতিদ্বন্দ্বী
স্বেচ্ছায় হারার ছলে আমাকে হারিয়ে দেয় শুধু।
বিষাদ চৌদিকে গণ্ডি এঁকে আমাকে করেছে বন্দি,
হরিণের চোখ হয়ে ঘোরায়, প্রান্তর রুক্ষ, ধু-ধু।

বিষাদ আমার জন্যে পারস্য গালিচা কিনে আনে,
কিনে আনে বাঘছাল, সোনার গেলাশ, হাতপাখা
এবং গোলাপ-পাশ। বিষাদ আমাকে কাছে টানে,

সস্নেহে আমার মুখে কেমন আপেল দেয় পুরে,
নাইয়ে বিজন হ্রদে পরায় জরির আঙরাখা।
অথচ নিজেকে দেখি নগ্ন, পোশাক গিয়েছে উড়ে
কখন কোথায় কোন ঝড়ে। মুখে জ্বলে ধূলিরেখা।

বিষাদ আমাকে পোষে দীর্ঘকাল ধরে, কতকাল
একান্ত বাহন হয়ে তার ঘুরেছি ভীষণ একা।
বিষাদ আমাকে বলে, 'তোমাকে দিয়েছি তাল তাল
স্বপ্ন, তুমি আড়ালে নির্মাণ করো অজর প্রতিমা।'
বিষাদ আমাকে রাখে প্রহরায়, যেমন ড্রাগন
তার খুব জ্বলজ্বলে গোপন সম্পদ। চতুঃসীমা
গলে যায়, বিষাদ নিঃশব্দে হয় শিল্পের বচন।

বিষাদ আমাকে পোষে নাকি আমি বিষাদকে পুষি–
বিষাদই বলুক আজ স্পষ্ট ভাষায় তার যা খুশি।

পাখিরে তুই

পাখিরে তুই ডাকিস কেন আজ?
অমন করে ডাকা তো ভালো নয়।
পাখিরে তোর জিগির ছায়াময়।
কেমনতরো দিলি যে সুর পেতে,
গেরস্তের হবে না ভালো এতে।
জিগিরে তোর ভয়ের ছায়া মেশে,
পাখিরে তুই উড়ে যা দূর দেশে।

দুঃখ হয়ে স্তব্ধতায় যদি
বেড়াস উড়ে এখানে নিরবধি,
তোর কী ক্ষতি? পারিস যদি তুই
ডাকের ফাঁকে ঝরিয়ে দে-না জুঁই।

পাখিরে তোর কেমনতরো কাজ?
শহরময় ছড়ালি কী বিলাপ,
অন্ধকারে মরুভূমির তাপ!
দিলি তো ছেড়ে বিভীষিকার ঝাঁক–
পাখিরে তুই দিসনে আর ডাক।
জিগিরে তোর মৃত্যু আসে ভেসে,
পাখিরে তুই উড়ে যা দূর দেশে।

ফুটপাত

সকালে দুপুরে কিংবা মধ্যরাতে এ ফুটপাতের কানে কানে
বলতে চেয়েছি কথা কিছুক্ষণ একা একা। ফুটপাতটির
সঙ্গে চেনাশোনা আছে বহুকাল, এই ফুটপাত দূরগামী
পথিকের মতো চলে গেছে ধীরে নদীর নিতান্ত নজদিক।
জোছনাও জলধারা হয়ে ফুটপাতটিকে কিছু নিরিবিলি
কাহিনী শোনাতে চায়, আমি জোছনায় মিশে যাই পক্ষীপ্রায়।
ফুটপাতটির সঙ্গে কথা বলি অনর্গল পারম্পর্যহীন–
দোলায় সে মাথা ঘন ঘন, কখনোবা ভ্রান্তিহীনরূপে
উদাসীন; ফুটপাত রূপকথা ভালোবাসে? নাকি রস পায়
হাসি তামাশায় খিস্তি খেউড়ে প্রচুর? তার পিঠে বারবার
কোমর বুলিয়ে দিই, যেন সে সৌন্দর্য ময়ূরের; কিন্তু এ কি
আমার নিজস্ব করতলে বহু মৃত শতাব্দীর বিষণ্ণতা
জেগে ওঠে নিমেষেই ফুটপাত সোহাগ বোঝে না এতটুকু।
আমার অঢেল রক্তে চঞ্চু সে ডুবিয়ে নিতে চায় বারংবার।

গোপনতা

সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু গোপনতা থাকে–
নেত্রপাতে কারো, কারো মগজের কোষে, অন্ত্রপুঞ্জে,
শোণিত প্রবাহে নববধূর দৃষ্টির মতো খুব
সংগোপনে গোপনতা বয়ে যায় সারা দিনমান।
গোপনতা ঘাতকের মারণাস্ত্র ডাগর আঁধারে,
কখনো প্রবল উত্তেজক স্রাব সত্তাময় আর
গোপনতা হিংস্র শ্বাপদের অগোচরে নম্রপ্রাণ
নিরীহ প্রাণীর জলাশয়ে অবতরণ যেনবা।
কবিরও সম্পদ বটে অফুরান, যখন আড়ালে
সে হাঁটে একাকী মনে বনভূমি, জনপদ নিয়ে,
পারম্পর্যহীন কত বস্তুতে বস্তুতে যোগাযোগ
রচনায় অনলস। গোপনতা চুমু খায় তাকে।

বাস্তবিক লোকটাকে

বাস্তবিক লোকটাকে একেবারে পছন্দ করি না।
সাতরঙা পালকের টুপি তার মাথায়, দু'চোখ

ভীষণ অরুণবর্ণ; তার দিকে তাকালেই মনে হয়,
ভয়ংকর কিছু বয়ে বেড়ায় সত্তায় সারাক্ষণ।
আগুন আহার করে আর বিষলতার নির্যাস
করে পান। কারো সঙ্গে কথা সে বলে না, এক ভিড়
মানুষের মধ্যে চুপ থাকবার তরিকা কেমন
আয়ত্তে রয়েছে তার। চুলের ডগায় সূর্যোদয়,
নখাগ্রে সূর্যাস্ত নিয়ে হেঁটে যায় একা ঔদাস্যের
ছায়ায় নিঃশব্দে হেঁটে যায় গোধূলিতে নেমে পড়ে
কোথায় গোপন নিচে, করে ওজু শোকের দিঘিতে।

মধ্যরাতে শহরের মধ্যপথে অভ্রের নদীতে
ভাসায় সুনীল নৌকো, রাশি রাশি বাঁশির স্থাপত্যে
বানায় সুদীর্ঘ সাঁকো সড়কে সড়কে সব দিকে।
বাতাসের, গোধূলির, নিঃসঙ্গ শহুরে কুকুরের,
পাখির ক্রীড়ার সায় আছে তার প্রতি। পাহাড়ের
কাছাকাছি থাকে, নাকি হ্রদের কিনারে অতিশয়
নিরালা নিবাস তার? তাকে দেখে দৃষ্টি পুড়ে যায়।

হৃদয়ের বহুমুখী ক্ষত তার চোখ হয়ে জ্বলে
সর্বক্ষণ, বেড়ে যায়। ক্ষতের পাশেই স্মৃতিময়
উপত্যকা তৈরি করে লাগায় জাগর গাছপালা।
গভীর শিকড় নিমেষেই শুয়ে নেয় ক্ষতরস!

বাস্তবিক লোকটাকে একেবারে পছন্দ করি না।
তবু সে প্রায়শ মধ্যরাতে আমার টেবিলে বসে
ছিটোয় বিস্তর কালি খাতার পাতায়, কখনোবা
ঘন ঘন করে পায়চারি কালো বারান্দায় কিংবা
খুপরিতে, মাথা নাড়ে, তাকায় আমার দিকে তীক্ষ্ণ
ক্ষুধিত দৃষ্টিতে, বুঝি নেবে শুষে অস্তিত্ব আমার।
আমার শিয়রে রাখে তরবারি, আমি নিরুপায়,
রুদ্ধবাক পড়ে থাকি, যেন ক্লান্ত, শীর্ণ পথরেখা।

যত বলি চলে যাও স্বেচ্ছাচারী, এখানে তোমার
প্রবেশাধিকার নেই, গেরস্থালি করো না বেবাক
তছনছ, ততবার আমাকে ভীষণ ফুঁড়ে একা
ঘরে ঢুকে প'ড়ে বসে আমার টেবিলে, খুব ভোরে
সহসা প্রস্থান করে মোরগ ডাকলে পরে। রৌদ্রে

ঘর নিরিবিলি হেসে উঠলে দেখি আমার টেবিলে
পড়ে থাকে পাতালের লতাগুল্ম, মৎস্যকুমারীর
জলজ নিঃশ্বাস আর সুদূর নীলিমা এক রাশ,
প্রাচীন সোনালি তন্তু, হাহাকার খানিক দিব্যতা।

যখন আমার মেধা রটে মুদ্রাক্ষরে দিগ্বিদিক,
অথবা মাইক্রোফোনে আমার প্রতিভা আমি খুব
নিমগ্ন আবৃত্তি করি, মালা আসে, বাজে করতালি,
তখন সে ভাঙা কবরের ওপর নিঃসঙ্গ বসে
মড়ার খুলিতে দ্রুত তবলা বাজায়, চুমো খায়
মৃত্যুর ঘাগড়া-পরা বারবনিতার ওষ্ঠময়।

বাস্তবিক লোকটাকে একেবারে পছন্দ করি না।

প্রেমের কবিতা হ'য়ে যায়

কিছুদিন হল ভারি বদরাগী বলে বদনাম
রটেছে আমার।
অথচ বন্ধুরা জানে যখন তখন
দেশলাইয়ের কাঠির মতন ফস করে
বিষম ওঠে না জ্ব'লে আমার মেজাজ।
হঠাৎ সেদিন
আপিস ফেরত আমি ক্রোধের বিকারে সারা পথে
ছড়িয়ে এসেছি কাঁটা অবলীলাক্রমে। স্বপ্নে দেখি,
পথের বেবাক কাঁটা রাশি রাশি হয়ে সুখে
দোল খায় নিশীথের তন্দ্রিল হাওয়ায়।

কী-যে হয়, অকস্মাৎ আমার দু'হাত
কোত্থেকে মুখোশ এনে আমার নিজেরই মুখে ঠিক
দেয় সেঁটে, পরমুহূর্তেই
কী অবাক কাণ্ড,
কালো সে মুখোশ
তন্বী হয়ে নেচে নেচে দূর স্বর্গপথে চলে যায়।

দুর্নিবার ক্ষোভে একরাশ অন্ধকার নিয়ে দ্রুত
বানাই আদিম গুহা চতুর্দিকে, অপদেবতার
মতো হাসি ক্ষণে ক্ষণে, শাবাস শাবাস বলে করি

প্রস্থান নিদ্রায়, জেগে দেখি উৎফুল্ল জ্যোৎস্নার তোড়ে
আঁধার গিয়েছে ভেসে, নিশ্চিহ্ন সে-গুহা,
প্রেতের বদলে
বিপুল জ্যোৎস্নায় তৈরি রাজহাঁস হাঁটে প্রতিবেশে।

কেন যে এমন রেগে যাই বারবার? কেন দাঁতে দাঁত ঘষি?
লেখার টেবিলে বসে রাত জেগে সাজাই কেবলি
ঘৃণার অক্ষরমালা, কী জাদুতে ওরা সহজেই
প্রেমের কবিতা হয়ে যায়।

ক্লিষ্ট স্মৃতি

যখন তোমাকে পথে ছেড়ে ফিরে আসি, ফুটপাতে
কেবল আমার সঙ্গে আমি হাঁটি স্মৃতির ভিতর।
ভয়ানক একা লাগে, মনে হয় আমার শরীরময় ঘাস
গজিয়ে উঠেছে এক লহমায়। উদ্বেগ সর্বদা থরথর,
পথকে বান্ধব ভেবে একা হাঁটি তবু অন্ধ রাতে।
ফুরোতে চায় না পথ, প্রতি পদক্ষেপে জাগে খাদ;
চতুর্দিক থেকে ডাকে অবিরাম ক্ষুধিত পাতাল,
হঠাৎ তাকায় নিচে কটমট ঐ বৈরী আকাশ।

পুড়িয়ে বিস্তর স্বপ্ন জানালার কাছে ভাবি, সে কোন নিষাদ
অন্তরালে জেগে আছে? ভাবি, দূরের একাকী তালগাছটার
দিকে চোখ রেখে ভাবি, আবার হবে কি দেখা তার
সঙ্গে মানে তোমার সঙ্গেই? এই ব্যাপ্ত ঊর্ণাজাল
অতিশয় রূপময় হয় ক্রমান্বয়ে। ঠোঁটে পোড়ে শীর্ণ স্টার,
কিছু ক্লিষ্ট স্মৃতির মতন জেগে রয় কটু স্বাদ।
ভাবি যদি আর
কখনো না হয় দেখা, যদি ভোরে মৃত্যুস্পৃষ্ট শরীর আমার
প'ড়ে থাকে খাটে, যদি ভোরে
দুঃস্বপ্নের ঘোরে
জেগে উঠে পোকা-মাকড়ের রূপে শীতল পাটির খুব কাছে
ঘষি শুঁড় মেঝেতে, যেমন কাফকার গল্পে আছে।

মধ্যরাতে ঘুম ভাঙলে

ইদানীং রাত কাবার না হতেই
আমার ঘুম ফুরিয়ে যায়। অর্থাৎ মধ্যরাতে
প্রায়শই আমার নিদ্রা তার জাল গুটিয়ে নেয়।
আর মধ্যরাতে হঠাৎ জেগে উঠলে
এক ধরনের আদিমতা আমাকে আচ্ছন্ন করে বারবার।

বিছানায় শুয়ে দেখি, চারপাশে বিশেষ্যগুলি
স্থিরচিত্র, যেন এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে
অপেক্ষমাণ যাত্রী।
বিশেষণ এখন আয়নায়, সৌন্দর্য তার গ্রীবা বেয়ে
নামছে নাভিমূলে। বিশেষণের রঙ-করা চোখের পাতা
আমার ওপর নেমে আসে
(মনে পড়ে, একদা কেউ ঝুঁকেছিল বনঘেরা নদীর জলে)
নেমে আসে আমার শরীরের মঞ্চে।

ক্রিয়া ডালিম গাছে বসে পা দোলাচ্ছে,
তার হাত লাল নীল বল ছুড়ছে অবিরাম।
দুটো বল দু'হাতে পড়ছে, উঠছে,
তৃতীয়টি শূন্যে।

পাশ ফিরে দেখি, বাক্যবন্ধ জমাট
পরিযায়ী পাখির পঙ্ক্তির মতো আকাশে বিস্তৃত।
সংযোগী অব্যয়ের সাঁকো ঘোলা পানির ওপর
এবং, কিন্তু, যদি, আওড়ে চলেছে আর
হঠাৎ কী খেয়ালে সে আমাকে ঘুমের ঝরনার সঙ্গে
যুক্ত করার জন্যে বাড়িয়ে দিল হাত।
অথচ কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না আর।

নিঃসঙ্গতা

মেঘে ঝুলে থাকা
তরঙ্গমালায়
ভাসমান পুণ্য
দেবদূতগণ এই

স্তব্ধতাকে খুব
সম্মানিত করে
সুস্পষ্ট বলুন
আমার হৃদয় কার কাছে তুলে ধরব এখন দ্বিধাহীন
কার কাছে হৃদয় তো জামা নয় কোনো দড়িতে টাঙিয়ে দেব
ক্লিপ এঁটে খোলামেলা হাওয়ায় দুলবে কাছে এসে কেউ কেউ
বিহ্বল তাকাবে কেউ মাথা নেড়ে চলে যাবে হেঁটে বহু দূরে
আমার হৃদয়
ভীষণ নৈঃসঙ্গে
মোড়া প্রতিদিন
কম্পমান আমি
দুঃস্বপ্নের খুব
অভ্যন্তরে নিজে
একাকী দুঃস্বপ্ন
জন্মান্ধ পেরেক
মাথায় ঠুকবে
যারা তারা বন্ধু
ঘরে খেলে পাশা
তীব্র পচা মাছ
যন্ত্রণাকাতর
মুখের রেখার
মতো রাস্তা শুধু
সম্মুখে আমার
উন্মাদের চোখ
দ্যায় সিগন্যাল

তার ঘুড়ি

সকালসন্ধ্যা বালক ঘুড়ির প্রতি ছুটে যায়, প্রায় উড়ে যায়,
কখনো দীর্ঘ সুতো ছেড়ে দিয়ে লাল নীল ঘুড়ি নিজেই ওড়ায়।
কখনো নিহত ঘুড়ির পেছনে দ্রুত ধাবমান, কখনোবা শুধু
অপলক ধু-ধু
আকাশের দিকে চেয়ে থাকে কিছু, রঙের ঈষৎ কম্পন হেতু।
হয়তো আকাশে দ্যাখো সরোবর, ফুলময় সেতু,
হারানো বোনের পরবের ফ্রক। বিস্মিত দেখি
সাদা চোখে একি
বালকের চোখ নাক কান মুখ ঘন চুল থেকে বেরোয় কেবলি

সাতটি রঙের ঘুড়ি অবিরত– চমকিত ছাদ, বিকেলের গলি–
বংশাবলির স্মৃতির ভিতরকার স্মৃতিগুলি যেন ভাসমান।
রাঙা আসমান।

রাত্রে ক্লান্ত বালক ঘুমোলে বেবাক রঙিন ঘুড়ি পাখি হয়,
ছায়া দেয় তাকে, স্নেহের মতন ঘোরে ঘরময়।
আচানক ওরা ভীষণ ঝাঁঝালো মেশিনগানের শব্দে পাগল;
ঘরের চালায়,
মেঝেতে, কাঁথায় প'ড়ে থাকে কিছু অধরা পালক।
ঘুমের ভিতর চমকে উঠেও ঘুড়ির স্বপ্ন দ্যাখে সে বালক।

একজন মানুষকে নিয়ে

একজন মানুষকে নিয়ে কত গল্প করা যায়
চায়ের আসরে।
যে মানুষ খায় দায় এবং ঘুমায়, ক্যামেরায়
ছবি তোলে, দিনে
অন্তত কয়েকবার চুলে আঁচড়ায়, রাত জেগে বই পড়ে,
একা একা বারান্দায় করে পায়চারি, ঘন ঘন
ডাকঘরে যায়, কথা বলে পাথরের কানে কানে,
তার হাতে গোধূলির রঙ ক্রীড়াপরায়ণ হ'লে
চকিতে নিজস্ব হাত তার ভিন্ন হাত হয়ে যায়,
কবিতা সহজে মেলে চোখ।
একজন মানুষকে নিয়ে এরকম কিছু গল্প হতে থাকে।

অথবা আলাদাভাবে বললে দাঁড়ায় এইমতো–
একজন মানুষের মগজের কোষে নিরিবিলি
ফুলের কেয়ারি থাকে, থাকে
পলকে কোমল ঢেকে মুখ পাখির সুনিদ্রা,
চেয়ারে বৃদ্ধের বসে থাকা
তরুণীর চুল-মেলে দেয়া, তরুশ্রেণী, বনশোভা,
আবছায়া থাকে, যা সৃজনে উন্মুখর।
একজন মানুষের মগজের কোষে থাকে প্রাচীনকালের
চিত্রিত সুনীল জালা, জালার ভেতরে মৃতদেহ।
হরিণের মাথা
ভেসে আসে তার কাছে কোন দূর থেকে, বালিহাঁস
আঁধারে উদ্ধৃতি দ্যায় চরের জ্যোৎস্নার,

তার প্রত্যাবর্তনের পথে গেট খুলে রাখে স্বপ্নমগ্ন বাড়ি।
একজন মানুষের এরকম কিছু গল্প থাকে এলেবেলে।
এরকম গল্প থেকে নিভৃতে বেরিয়ে এসে একটি মানুষ
বারবার নগ্ন হয়ে নিজের কাছেই, কখনো সে
নীলাকাশে গর্ত খোঁড়ে নখে,
কখনো আবার মেঘে মেঘে
কতিপয় কালো
পুরোনো কবর দ্যাখে, হাতের লোমের মতো ঘাস
দীপ ঢেকে দ্যায়,
স্বপ্নে দ্যাখে বৃষ্টিপাত, দ্যাখে
ছুরির মতন
একটি আঙুল দ্রুত কী নগ্ন প্রবেশ করে মাথার ভেতরে।
একজন মানুষের মগজের কোষে জেগে থাকে
অন্তহীন ধূলিরঙ পথ, নাম যার 'মনে রেখো।'

প্রতীক্ষা

এতদিনে জেনে গেছি, সে তোমার পরিহাস ছিল
পুরোপুরি, হয়তো কোনো দিন
দেখা হবে,—কতবার ভেবেছি আবেগভরে আর
তোমার আসার পথে দিয়েছি বিছিয়ে স্বপ্নময়
বাসনার রক্তিম গালিচা।
কিন্তু অলিখিত কবিতার মতো তুমি থেকে গেছ
অদ্যাবধি চেতনায়। সে কোন রহস্যময় প্রাণী
পরম সোহাগে করে পান সারাবেলা
আমার আপন
হৃদয়ের জল, কোনো কোনো দিন কিছুবা শোণিত!

এখন তোমাকে দেখি (মনে হয় দেখি) পথে পথে,
গাছের ছায়ায় পার্কে, স্মৃতির মতন গোধূলির ছোপ-লাগা
বারান্দায়, বাস টার্মিনালে,
প্রত্যেক নারীর মধ্যে তোমাকেই দেখি, মানে খুঁজি
ইতস্তত বারবার। এখনও তোমার রূপ নিতান্ত অচেনা
আমার নিকট?
অস্পষ্ট ধারণা তুমি এক? স্বপ্নকুয়াশায় ঢাকা?

যখন তোমার মুখে চিবুকে গ্রীবায় স্তনমূলে
নামে জলধারা,

তখন তোমাকে কী রকম মনে হয়,
পারব না বলতে কখনো;
যখন তোমার পিঠে শ্যাম্পু করা চুল একরাশ
গীতিকবিতার মতো শুয়ে থাকে কোমল-উজ্জ্বল,
তখন তোমার মুখে কতটুকু তুমিত্ব বিরাজে,
জানি না, অথবা
কারো অভিযানপ্রিয় হাত তোমার স্তনের দিকে
অগ্রসর হ'লে তুমি কেমন বিহ্বল হয়ে যাও,
এবং তোমার ওষ্ঠে কেউ চুমু খেলে
তোমার চোখের পাতা অতি দ্রুত নেমে আসে কিনা–
আমি তা জানি না।

এখন তোমাকে খুঁজে বেড়ানোর অসুখ নিয়ত
ভোগাচ্ছে আমাকে।
যে কোনো নারীর মুখ হঠাৎ দেখলে
বুক ধক করে ওঠে– সে কি তুমি? হৃৎস্পন্দন, ওষ্ঠ, বাহু–
চোখ হয়ে যায় সবই একটি নিমেষে। সে কি তুমি?

কোনোখানে তোমাকে না দেখে বারংবার
কেবলি আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।
তবে কি স্বপ্নের ঘোরে আজীবন জ্বলন্ত রাত্তিরে
তোমার উদ্দেশে আমি বিষণ্ন কবিতা লিখে যাব?
এক্ষুণি আমাকে এসে বলে দাও সাফ–
তুমি আর প্রতীক্ষায় থেকো না নির্বোধ।

কোনো একজনের কথা ভেবে

বুকের ভেতর মেঘের মতো
একটা কিছু বেড়ায় ভেসে,
অনেক আগে দেখা কোনো
গাছের পাতা স্বপ্ন হয়ে
কাঁপতে থাকে চোখের বনে–
এই কি আমার চাওয়া?

যখন তুমি কাছে আসো,
নগ্নতাকে প্রখর জ্বেলে
আমার পাশে শুয়ে থাকো,
শূন্যতারই ছায়া দেখি।

একলা মনে প্রশ্ন করি–
একেই বলে পাওয়া?

কিন্তু তুমি আমায় ফেলে
একটু শুধু দূরে গেলেই,
তোমার জন্যে হৃদয় জুড়ে
কেমন যেন তৃষ্ণা বাড়ে,
বুকের মধ্যে যায় বয়ে যায়।
মরুভূমির হাওয়া।

একজন কবির উদ্দেশে

একটি পঙ্‌ক্তির মধ্যপথে অকস্মাৎ কবেকার
দীর্ঘ গাছ ফেলে ছায়া, কার আত্মহত্যা গান গায়;
একটি শব্দের শেষে বসিয়ে কোমল কমা তুমি
দেয়ালে কী যেন খোঁজো বারবার; কিছু পথরেখা
স্মৃতিরূপ ভেসে ওঠে, কোনো কোনো রাস্তার কি নাম
কিছুতে পড়ে না মনে। একটি পঙ্‌ক্তির মধ্যপথে

মনে পড়ে যায় পার্কে দেশলাই ধার চেয়ে তুমি
আঁধারে ধরিয়েছিলে সিগারেট। একটা সন্ধ্যায়
পথে যেতে যেতে দূর থেকে দেখেছিলে পথপ্রান্তে
পুরোনো বর্ষায় কী নিঃসঙ্গ ভিজছে নতুন গণিকা
তেঁতুল গাছের নিচে, প্রসাধন তার মুছে গেছে
বলে তাকে বড় বেশি বালিকার মতো লেগেছিল।

বাক্যের শুরুতে কিছু ডোরাকাটা প্রাণী ধেয়ে আসে,
অর্ধযতি টেনে ভাব তোমার টাইপরাইটার
নেই, ঘরে ইঁদুরের বড় উপদ্রব, বর্ষাকালে
শোবার ঘরের ছাদ ভীষণ প্রস্রাব করে, ভাব
তোমার একটি ঘড়ি চাই, শার্টে বোতাম লাগানো
দরকার, তাছাড়া জুতো জোড়া পাল্টে নিলে ভালো হয়।
কখনো একটি পঙ্‌ক্তি খুব বেঁকে বসলে ভীষণ
বিরক্তিতে তড়িঘড়ি দাঁড়াও চেয়ার ছেড়ে, যাও
বারান্দায়, যেন বুনো ঘোড়াটিকে বাগ মানানোর
সরঞ্জাম আছে সেখানেই; নিজেকেই প্রশ্ন করো–
তোমার জীবন কি রকম মূল্যবান? কতটুকু

প্রকৃত জীবন তুমি যাপন করেছ? কখনোবা

কলম সরিয়ে রেখে ভাব ক্লান্ত তোমার গৃহিণী
রাঁধে বাড়ে, কোনো কোনো দিন কাঁদে অভ্যস্ত বালিশে
মাথা রেখে, যথারীতি সন্তান পালন করে, তুমি
পার্টিতে চুমুক দাও স্বপ্নের মতন গ্লাসে, শিল্প-
সমালোচকের সঙ্গ ছেড়ে কথা বলো সুসজ্জিতা
মহিলার সঙ্গে, করো মুখস্থ মুখশ্রী কারো কারো।

রাত্রির পার্টিতে তুমি রাত্রির মতোই হয়ে যাও;
কখনো দাঁড়িয়ে একা এক কোণে এলেবেলে শব্দ
তুলে নাও কারো চোখ, চুল কিংবা ঘরের দেয়াল
থেকে অগোচরে, ধীরে সুস্থে স্বপ্নাংশে রচনা করো।
এই আসবাব, এইসব মুখ, এসবের সঙ্গে
সম্পর্ক আছে কি কিছু সরাসরি তোমার শিল্পের?

এই বাড়ি, যা বয়স্ক, বেশ জীর্ণ বটে, যা তোমার
আপন নিবাস, এই বাড়ি প্রতিদিন তোমাকেই
লক্ষ্য করে তীক্ষ্ণ গুপ্তচরের নিষ্ঠায়, এ বাড়ির
থেকে ঝরে এক রাশ রঙিন পালক, পালকেরা
তোমার স্বপ্নের অভ্যন্তরে ঝরে, হয়ে যায় ফের
শিল্পের শিশির; এ বাড়ির অতিশয় নোনাধরা
দেয়ালে দেয়ালে ঠোকরায় প্রাচীন স্বপ্নের লোভে
রুক্ষ কাগজের মতো পাখি ঠোকরায় বারংবার।

টেবিলে তোমার হাত পড়ে থাকে স্তিমিত কখনো,
অলস কলম যেন; ভাব চাঁদ উঠলেই হাতে
আবার জাগবে স্রোত প্রখর রুপালি। কোনো কোনো
মুহূর্তে একটি বাক্য লেখা হলে দ্যাখো সবিস্ময়ে
বৃষ্টিপাতে ডোবে চক্ষুময় নৌকা, বনস্থলী, সেতু
রত্নসম্ভারের মতো জলকন্যা, যুদ্ধের জাহাজ।

অকস্মাৎ মধ্যরাতে একটি পঙ্‌ক্তির মধ্যপথে
মনে পড়ে সেই কবে কারো কাছে কি যেন চাইতে
ভুলে গিয়েছিলে; অনন্তের শুভ্রতায় এ তোমার
কেমন ভিখিরিপনা? অন্ধকারে কাঙালের হাত
তোমাকে মুদ্রার মতো তুলে নিতে চায়। ফুল ফোটে
তোমার মুখের হাড়ে, বারংবার ধ্বনিপুঞ্জ তুমি।

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে

প্রথম প্রকাশ	বৈশাখ ১৩৮৪ [এপ্রিল ১৯৭৭]
প্রকাশক	সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী	কাইয়ুম চৌধুরী

উৎসর্গ-পত্র এ. বি. সি. অর্থাৎ প্রিয় বন্ধু
আবদুল বারিক চৌধুরীকে

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি, নিথর বিশাল,
মাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠে গভীর রাত্তিরে!
মুখে শতাব্দীর গাঢ় বিশদ শ্যাওলা আর ভীষণ ফাটল,
যেন বেদনার রেখা। ব্রোঞ্জের অদ্ভুত চক্ষুদ্বয় খুব স্থির
চেয়ে থাকে অন্ধকারে; মনে হয়, ওরা কোনো দিন
দ্যাখেনি কিছুই,
যদিও দ্যাখার কথা ছিল শতাব্দীর মতোই ব্যাপক বহু কিছু।
কী যেন বলতে চায় সেই মূর্তি, কণ্ঠস্বর তার স্তব্ধতায়
টোকা দিতে চেয়ে
হাওয়ায় হারায়, দুটি হাত বুঝি ধরে রেখেছে অতীত কিছু।
ব্রোঞ্জমূর্তি প্রশ্ন চিহ্ন, উত্তরবিহীন; ঘাস ক্ষিপ্র চাটে তার পদযুগ।

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে বনপোড়া একটি হরিণী
ছোটে দিগ্বিদিক, তীব্র তৃষ্ণায় কাতর; জলাশয়ে মুখ রেখে
মরুর দুরন্ত দাহ মেখে নেয় বুকে এবং আপনকার
মাংস আর হাড়ের ভেতরে
সে ঘুমায় নিরিবিলি। বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে– জুয়ার টেবিলে
সহসা নক্ষত্র ঝরে, সন্ত সন্ত বলে জুয়াড়ীরা
শূন্যের উদ্দেশে
তোলে হাত, কখন যে হাত বেয়ে সাপ নেমে আসে,
উত্তেজনা হেতু
কিছুতে পায় না টের, ভাবে দ্রাক্ষালতা জীবনের
ওষ্ঠে দেবে ফেলে কিছু সোনালি মদিরা বেলাবেলি।
বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে ৫– মধ্যরাত্রির শহরে এক
সুনীল জাহাজ
সহজে প্রবেশ করে, নাবিকেরা গাঙচিল হয়ে
কলোনির, বাণিজ্যিক এলাকার ছাদে ছাদে ওড়ে,
একজন অন্ধ, ক্রূর, বণিকের হাতে বাজপাখি;
নগর পুলিশ অর্ফিয়ুস না কি বলে কেউ কেউ
করোটিতে তবলা বাজায়।

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে মৃত শিশু মেঘে ভাসমান ক্ষমাহীন,
কার্পেটের তলা থেকে, জানালার পুরু পর্দা থেকে,
টেলিগ্রাম আর কিছু পুরোনো চিঠির তাড়া থেকে

এবং মাছের পেট থেকে নারী আর শিশু আসে ভেসে ভেসে,
মেহেদি পাতার ভিড় থেকে, বেলুনের ঝাঁক থেকে
নারী আর শিশু ভেসে আসে। বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে
পতাকার নিচে কত আহত প্রেমিক নতজানু
গোধূলিতে, চতুর্দিকে উন্মাদের পাদধ্বনি, কার সে বাঁশিতে
নস্টালজিয়ার মতো সুর, কী সুন্দর প্রাণী পথের ধুলায়
বিকলাঙ্গ, ক্লাউনের টুপি সবুজ ঘোড়ার পায়ে পায়ে ঘোরে,
ক্লাউন কফিনে ব'সে পিট পিট চেয়ে থাকে ভীষণ একাকী।
বৃষ্টি পড়ে রঙ-করা গালে তার, বৃষ্টি পড়ে মৃত্যুর পাহাড়ে।

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে– কতিপয় লোক দেবদূতের নগ্নতা
বড় বেশি কাম্য ভেবে উন্মাদের মতো নগ্ন হয়ে যায়,
তরুণীর ওষ্ঠে বারবার চুমো খায় কর্কশ কঙ্কাল আর
লোহিত বনের ধারে পাথরের ঘোড়ায় সওয়ার
অত্যন্ত পাথুরে যোদ্ধা, স্তব্ধ অস্ত্রে চির-জ্যোৎস্না বয়।
বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে একজন অসুস্থ নৃপতি শয্যাশায়ী
একটি সোনালি খাটে, অলৌকিক ফলের আশায়
প্রহর ফুরায়, তাহলে কি দীপ নিভে যাবে গহন বেলায়?
কোন তেপান্তরে আজ হাঁপাচ্ছে বিশীর্ণ পক্ষীরাজ,
ভাবেন নৃপতি, চোখ বুজে আসে, তৃতীয় কুমার তাঁর এখনও ফেরেনি!

অচেনার মধ্যে এই ডেকে যাওয়া

মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে কি তোমার? প্রমাদের পাশাপাশি
থেকে তুমি নিজে
প্রমাদ গুনেছ কতবার, মনে পড়ে? উদ্ধার-রহিত তুমি
এবং স্বভাবদোষে প্রতিটি সকালবেলা সন্ধ্যা পান করো।
আনন্দমেলাকে কালো ব্যাজ পরিয়ে বানাও দীর্ঘ শোকসভা
বারংবার আর
সমাজে থেকেও তুমি ভীষণ অসামাজিক, রুক্ষ হয়ে যাচ্ছ,
একাকীর চেয়েও একাকী।

তবে কি তোমার
নৈরাশের কেশপাশে বন্দি হতে ভালো লেগেছিল?
কী যে ভালো লাগে আর লাগে না তোমার, বোঝা দায়।

কখনো ফুলের পাশে দাঁড়াও এভাবে, যেন ফুল
ছাড়া কিছু আর নেই পৃথিবীতে, কখনোবা ক্রোধে
পুষ্পের ঘাতক হয়ে ঘোরো একা বাগানে বাগানে।
ঘোড়ার কেশরে হাত ডুবিয়ে দাঁড়াতে ভালো লাগে?
ভালো লাগে অন্ধকার ঘরে ঢুকে-আটকানো কোনো
কঙ্কালের দোলা কিংবা নীলিমায় বামন এবং
অপ্সরীর মেলামেশা? কোথাও ঘৃণের কিছু চিহ্ন
দেখলে তোমার মুখ বিরক্তির কুশে ঢেকে যায়,
ভালোবাসাবাসি নিয়ে কেউ আদিখ্যেতা করলেই
তাকাও বঙ্কিম, ক্রূর হেসে ওঠো, আবার নিজেই
ভালোবাসা মানুষের প্রকৃত পতাকা জ্বলজ্বলে
বলে মগ্ন হও প্রেমে। টিন আর সিসার জঞ্জাল
ফুঁড়ে ক্লান্ত পরিবেশে একটি সারস এলে তুমি
ফিরিয়ে নেবে কি চোখ? হত্যাকারী হবে কি পাখির?
বুঝি ভালো লাগে খুব করোটিতে স্বপ্নের কম্পন।
এখানে তোমার কেউ নেই,
সেখানে তোমার কেউ নেই,
কোথাও তোমার কেউ নেই,
ব্যাপক 'নেই'-এর মধ্যে যাকে
একান্ত তোমার বলে ভাব, সেও কি তোমার কেউ?
তুমি তো অবহেলিত অতিশয়, যেন বাংলা ভাষা। সেই কালো
অবহেলা মুছে নিতে পারে যে ওষ্ঠ সে ওষ্ঠে অমাবস্যা দ্রুত
ঘনায় বেকলি।

তুমি তো বোতলে বাণী বন্দি করে দিয়েছ ভাসিয়ে লোনা জলে–
তরঙ্গে তরঙ্গে নেচে কোথায় যে যাবে কে তা জানে। কোনো দিন
হয়তো পড়বে
কারো আবিষ্কারপ্রিয় হাতে অথবা হারিয়ে যাবে দূরে চিরতরে।
এক্ষুণি বিদায় নিতে চাও? তুমি রুমাল উড়িয়ে চলে যাবে
এত শীঘ্র নিরুদ্দেশে? কেন যাবে এই পার্ক আর ঝলমলে
রেস্তোরাঁ বন্ধুর ডেরা, নিজস্ব চেয়ার,
বিমান, বলাকা ছেড়ে? অলৌকিক ঘণ্টার মতন
কারো কণ্ঠস্বর, বৃষ্টিভেজা নৈশ পথ, কত গীতিকবিতার
সোনালি কম্পন ছেড়ে নিরিবিলি সিঁড়ির গোলাপ
বারান্দা, পুরোনো চিঠি, ব্যাংক নোট, স্বপ্নময় টেলিফোন ছেড়ে

কেন যাবে এমন একাকী?
মৃত্যু ছাড়া সব কিছু মুঠি থেকে ঝরে যায় বলে
এক্ষুণি বিদায় নিতে চাও?
শহীদ মিনার আর ধারালো অস্ত্রের মতো মুক্তিযুদ্ধের গৌরব আর
স্বাধীনতা ছেড়ে দূরে বহুদূরে চলে যেতে চাও?

পুরোনো গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ডাকছ ক্রমাগত,
আকাশ বধির,
ডাকছ, ডাকছ তুমি গলা ছেড়ে, হাওয়া মুছে ফেলে ডাক,
তোমার প্রবল ডাক প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে কিছুকাল, নদী উদাসীন,
নিয়ত ডাকছ তুমি, তোমার সে ডাক
খেয়ে ফেলে গাছ।
এ-ও কি তোমার ভুলে? না থেমো না, বেলাবেলি এই ডেকে যাওয়া
অচেনার মধ্যে এই ডেকে-যাওয়া গান হয়ে ঘুরবে
হয়তো মাঝে মাঝে।

একজন কবি শুধু

মগজে পাখির ঘ্রাণ, টানেলের অন্তর্গত রূপ, বংশীধ্বনি,
হৃদয়ে অনেক প্রতিধ্বনিময় স্তর নিয়ে ঘুমায় বলেই
হয়তো-বা স্বপ্নে তার জ্বলজ্বলে কালো নীল সবুজ বাদামি
এবং ফিরোজা ঘোড়া, ভেলা,
একটি ইস্পাতি বাড়ি, বেহুলার রাঙা চেলী, উজাড় খামার
মিশে যায় আর গোরখোদকের নিঃশ্বাস হঠাৎ
লাগে যেন গালে ভোরবেলাকার স্বপ্নে। দীর্ঘ ঘাসে
কোদাল ঘুমিয়ে থাকে কর্পূর আতর ইত্যাদির স্মৃতি নিয়ে,
কোদাল ঘুমিয়ে থাকে, স্মৃতির মতন সাদা হাড়
আর মাটিমাখা করোটির স্বপ্ন নিয়ে
কোদাল ঘুমিয়ে থাকে, যেমন শ্রমিক তার হাড়ভাঙা খাটুনির পর,
কোদাল ঘুমিয়ে থাকে চুম্বনরহিত শুষ্ক ওষ্ঠের মতন।

'হয়তো-বা স্বপ্নে' এই শব্দ ক'টি মনে-মনে আউড়ে সে
নিজের ভেতরে যে-স্তব্ধতা থাকে, তাকে
নিঃসঙ্গ স্বজন ভেবে গাংচিল গাংচিল বলে মনের দ্বীপের
মাটিতে দবিজ লেখে নিভৃত দলিল।
'হয়তো' শব্দটি যেন থরথর চোখের নিবিড় পক্ষচ্ছায়া,

রোদে কম্পমান,
জ্যোৎস্নায় নিথর।
কখনো পাতার শিহরণ হয়ে আর কখনো-বা মাছরাঙা
পাখিটির চোখ হয়ে হৃদয়স্পন্দন হয়ে সদ্য প্রেমিকের জেনেছে সে
'হয়তো' হারিয়ে-যাওয়া যুবতী বোনের
প্রত্যাবর্তনের
ছায়াচ্ছন্ন আহত প্রত্যাশা,
'হয়তো' বেকার যুবকের দ্রুত কর্মখালি বিজ্ঞাপন পাঠ,
'হয়তো' পদ্মার বুকে শেষ রাতে জেলেদের জাল,
'হয়তো' টেবিলে খুব ঝুঁকে-থাকা কবির খাতার সাদা পাতা,
'হয়তো' অনেক দূরে স্মৃতিবিস্মৃতি মধ্যবর্তী ডাকবাংলো,
'হয়তো' রোদের আঙুলের স্পর্শে চকিতে শিউরে-ওঠা হ্রদ,
'হয়তো' শারদ আকাশের নীলে স্বপ্নবিন্দুর মতন কিছু
চকচকে কবুতর,
'হয়তো' হেমন্ত গোধূলিতে গুহাহিত
স্তব্ধ টেলিফোন,
'হয়তো' আপন শহরের শেষপ্রান্তে পরিত্যক্ত বাসডিপো,
'হয়তো' নির্জন গোরস্থানে পড়ে-থাকা ভাঙা বাঁশি,
'হয়তো' প্রাচীন চীনে কবির গভীর
সংকেতে মেদুর কোনো হাইকুর আভা,
'হয়তো' সমুদ্রতীরে অভ্রে-গড়া নিরিবিলি স্বপ্নের ফ্যাক্টরি।

'হয়তো' এখনও তার জীবনকে খানিক দুলিয়ে দেয় বলে
একটি ঘুমন্ত
সিংহকে জাগায় ভায়োলিনে ছড় টেনে
এবং পাড়ায় ঘুম গণ্ডারকে গিটারের সুরে।
সিংহের কেশরে আস্তেসুস্থে স্বপ্ন রেখে, রেখে কিছু আকাঙ্ক্ষার
রাধাচূড়া
দ্যাখে সে কখনো কোনো কোনো হ্যাংলা কলমের নিচে
বাংলা ভাষা তীরবিদ্ধ পাখির মতোই
আর্তনাদ করে।
কখনো-বা ময়লা পোস্টকার্ড স্নেহাশিস, শুভাশিস হয়, হয়
ব্যাকুল কুশল,
ভিন্ন ভিন্ন পোস্টকার্ড বকুলের মতো ঘ্রাণ নিয়ে
যে যার গন্তব্যে যায়। কোনো কোনো কার্ড মৃত গাংচিলের মতো

বাক্সে পড়ে থাকে সর্বদাই।

স্ট্রিটকার নর্তকীর মতো ক্ষিপ্র মুদ্রায় চঞ্চল চৌরাস্তায়,
পুলিশের হাতে কিছু সজীব গোলাপ গান গায়, গান গায়,
ভিখিরি বালক রুক্ষ ফুটপাতে একটি দুঃখিত কবিতার
পঙ্‌ক্তির মতন একা দুর্দশার ছায়ায় ঘুমায়।
কবর খননকারী যেন কালপুরুষ, একাকী গোধূলিতে
বিড়ি ফোঁকে ঘন ঘন, ঘাম মোছে কপালের, কোদালের মুখে
হীরের ঝলক দেখে হেসে ওঠে অকস্মাৎ, পা ঠোকে মাটিতে,
হাত দুটি মেলে দেয় আসমানে, কী যে খোঁজে, আর
বানায় কিসের তোড়া করোটির মতো;
কবর খননকারী কান পেতে শোনে কত খুলির গজল
এবং কখনো নিজে খনখনে গলায় পুরোনো গান গায়, গান গায়...

তিনজন দীপ্র ফিল্ড মার্শাল ম্যাপের দিকে তাকাতে তাকাতে
কিংবা কালো কফি খেতে খেতে
বিপুল বেলুন হয়ে মহাশূন্যে জমালেন পাড়ি, মারহাবা!
পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত খোঁড়া সৈনিক চায়ের কাপ থেকে
অতীতের ক্বাথ করে পান। সাতজন বাজিকর অপরাহ্ণে
সোৎসাহে বাজিয়ে ভেঁপু প্রজাপতি হয় এবং সতের জন
গলা-ফোলা, মঞ্চপ্রিয় জননেতা কী মোহন মাতলামি শেখাতে শেখাতে
নিমেষে গড়েন কত হিতবাদী ক্লাব, নামে বঞ্চনার ধস।

একজন কবি শুধু বারবার পুড়ে গিয়ে কেমন ধূসর
ভস্ম ফুঁড়ে পুনরায় নিঃশঙ্ক ওঠেন বেঁচে সতেজ পালক
নিয়ে বুকে, তারপর 'শব্দ গান হও' বলে স্বপ্নের গ্যারাজে
ব'সে একা-একা
লেখেন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কী তন্ময় রূপান্তরে।
পাশে তার চিতাবাঘ, ভায়োলিন এবং একটি সাদা হরিণ ঘুমায়।

হাঁটতে হাঁটতে শেষ অবধি
(মতিউর রহমান বন্ধুবরেষু)

হাঁটতে হাঁটতে শেষ অবধি বেলাশেষে কোথায় যাব?
ঠিক জানি না।
এখন পথে রৌদ্র নেই, জ্যোৎস্না গেছে হঠাৎ উবে–

একটা কিছু মনে রেখে হাঁটতে থাকি, হাঁটতে থাকি
এই অবেলায়।
হাঁটতে হাঁটতে শেষ অবধি বেলাশেষে কোথায় যাব?

তোমরা যারা কাদার খেলা ভালোবাসো, হরহামেশা
তোমরা যারা
পথের বুকে হিংস্র কাঁটা দাও বিছিয়ে,
আড়াল থেকে তীর ছুড়ে দাও জহরমাখা, তাদের বলি–
বন্ধু শোনো,
তোমাদের ঐ পাকা ধানে মই দেব না, ছাই দেব না
বাড়া ভাতে।
তোমাদের সব কাকাতুয়া দুলবে দাঁড়ে, বিষ দেব না।
ভেব না ঠিক চায়ের সময় কথার ফাঁকে হাসতে হাসতে
হঠাৎ আমি
হাসতে হাসতে সজীব বুকে বসিয়ে দেব আমূল ছোরা।

আমার আপান দুঃখ-কষ্ট আমারই থাক, কাউকে কিছুই
ভাগ দেব না!
আমার বুকে বাঘের পায়ের দাগ বসে যায়,
আমার গায়ে ক্রুদ্ধ সাপের হিসহিসানি
লেগে থাকে,
আমার পিঠে ক্রুশের গাঢ় চিহ্ন আছে,
বুকের দু'দিক ক্রমাগত যাচ্ছে ক্ষ'য়ে।
সমাজজোড়া প্রতারণার প্রবল তোড়ে যাচ্ছি ভেসে,
কোন আমলে মৃত্যুদণ্ড পেয়েছিলাম, মাঝে-মধ্যে
স্মরণ করি।

তোমরা যারা এলেবেলে আমার নামের ওপর শুধু
ছড়াও কালি,
ভয় পেয়ো না; অস্ত্রত্যাগের পরে কেমন
বিষাদে মন খুব ছেয়ে যায়, এখন শুধু দিতে পারি
ভালোবাসা।
ভালোবাসার স্বত্ব যদি ক্রোক করে নাও,
নিঃস্ব হয়ে মিছেমিছি কাঁদুনি আর গাইব না হে।

তোমরা যারা অন্ধতার এক চুক্তিপত্রে সই করেছ
অন্ধ রাতে,

ভ্রান্তিভরা এই বলয়ে তারাই বুঝি আমাকে
বাৎলে দেবে?
অগ্রগামী দেবতাদের হাঁড়ির খবর জানা আছে;
যখন খুশি পরের ভিটায় ঘুঘু চড়াও, এমনি আরও
কাণ্ডে তোমরা বেজায় দড় জানা আছে।
শববাহকের স্মৃতির মতো স্মৃতি ওড়ে ইতস্তত।

কী যে আমার প্রাপ্য ছিল ভুলেছি তাও হট্টগোলে।
কারো চোখের এক ফোঁটা জল স্বপ্ন হ'ল
রূপান্তরে,
শববাহকের কানের ফাঁকে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটেছে;
হাঁটতে হাঁটতে শেষ অবধি বেলাশেষে কোথায় যাব?
ঠিক জানি না।
ঠিক জানি না কেন যে এই নিশান পুঁতি পথে পথে।

হে আমার দীর্ঘ উপবাস

কোথায় রাখবে চোখ হে আমার দীর্ঘ উপবাস?
তুমি তো গুহায় আছ দীর্ঘদিন যোগাযোগহীন;
ঘাড় বেয়ে নেমে গেছে রুক্ষ কটা চুল, ওষ্ঠ যেন
খরা-কবলিত মাটি, চক্ষুদ্বয় ভীষণ উজ্জ্বল–
ক্রমাগত উপবাসে হে আমার দীর্ঘ উপবাস
এ রকমই হয়, এরকম কম্পমান নিশিদিন।

কোথায় রাখবে চোখ হে আমার দীর্ঘ উপবাস?
এতদিন ফলমূল অথবা তণ্ডুল আশেপাশে
দ্যাখোনি এবং কেউ দেয়নি তোমার হাতে তুলে
ভরা পাত্র টলটলে, আহার্য ও পানীয়ের ঘ্রাণ
তুমি ভুলে গিয়েছিলে। এখন তোমার গুহাগাত্রে
কেমন কোমল ছায়া, মৃদু ঝরনাধ্বনি যাচ্ছে শোনা।

অবিরল; তুমি চোখ মেলে দ্যাখো দ্রাক্ষালতা খুব
কাছে এসে এই বর্তমানের মতন আলিঙ্গন
করছে তোমাকে নিরিবিলি। অতীত সজীব প্রাণী হয়ে
শুঁকছে তোমার পদযুগ, বুঝি চেখে নিতে চায়
ত্বকের উত্তাপ কিছু কিংবা হাড়ে উত্তুরে বাতাস

ছড়িয়েছে কত হিম পরখ করার লোভ তার।

হে আমার দীর্ঘ উপবাস, কতকাল পরে যাবে
পরবাসে পুনরায়? তোমার অসামাজিক রীতি
নদীতীরে কিংবা বনে পায় সমর্থন। খরস্রোতে
চোখ রেখে নদী হও, পর্বতারোহীর নিঃসঙ্গতা
বুকে পুষে গিরিচূড়া হয়ে যাও; হও প্রতীক্ষায়
তীক্ষ্ণ আরও, যেন বঞ্চনাকে ভালোবেসে অকাতরে

খুলে দিতে পারো মুঠি। এখন তোমার খুব কাছে
কত কিছু লোভনীয় রূপে এসে যাচ্ছে সাবলীল;
কোথায় রাখবে চোখ হে আমার দীর্ঘ উপবাস?
থাকবে কি চোখ বুজে? যে তোমার ধু-ধু উপবাসে
বইয়ে দেবে জলধারা, সে যদি গুহায় ছুটে আসে?
যদি সে পরিবেশন করে বিষলতা বারংবার?

আমার বয়স আমি

আমার বয়স আমি পান করে চলেছি সর্বদা। বয়সের
ওষ্ঠে ঠোঁট রেখে দেখি দূরে
বয়স দাঁড়িয়ে থাকে বালকের মতো
আলোজ্বলা গলির ভেতরে,
কখনো আর্মেনিয়ান গির্জের সমীপবর্তী মাঠে
বৃষ্টিভেজা কিশোরের ভঙ্গিমায়, কখনো-বা রোদে
আমার বয়স যুবা ভাঙা মন্দিরের পাশে থরথর বুকে
নিসর্গ, নারীর কাছে সমর্পিত। এখন তোমরা যারা খুব
জ্বলজ্বলে তীরে ব'সে গপ্পো করো হাওয়ায় উড়িয়ে
বাদামের খোসা,
বাতাসের মুখে দাও মেখে গোল্ড-ফ্লেক-ঘ্রাণ কিংবা
মধ্যরাতে শহরের পথে দ্যাখো সুনীল নাবিক,
দ্যাখো নিজেদের স্বপ্ন হেনরি মুরের
মূর্তির ভেতরে নিরালায় কী সবুজ ঘুমায় এবং শোনে
শ্মশানে সানাই,
তাদের নিকট এই বয়স আমার গালগল্প কিংবা কোনো
ম্যানিফেস্টো এলেবেলে ভাষায় রচিত।

আমার বয়স আজ চায়ের কাপের ঠোঁটে সাতচল্লিশটি
চুমো খায়, পদযুগ দেয় মেলে ডাগর সূর্যাস্তে,
এক বুক জলে একা দাঁড়িয়ে কখনো দ্যাখে সূর্যোদয় আর
কখনো টেবিলে হাত, হাতে ঠেকিয়ে চিবুক
আমার বয়স পড়ে অপরূপ মানচিত্র আকাঙ্ক্ষার, সুদূর স্বপ্নের।
মাঝে-মাঝে বয়সের চোখে পাতায় ক্যাকটাস
বসায় বিষাক্ত দাঁত, অকস্মাৎ বয়সের মাথা থেকে
খুসকি ঝরে যায়, খুসকি ঝরে যায়, খুসকি ঝরে যায়।

আমার বয়স গোনে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত
আট নয় দশ
এক দুই তিন চার, গোনে, শুধু গোনে, মাঝে-মধ্যে
কড়িকাঠে রাখে চোখ, রাখে
আস্তিনে উচ্ছিষ্ট কণা স্বাপ্নিকের, অজস্র বিমর্ষ কাকাতুয়া
তার বুকে নেমে আসে। আমার বয়স ঘোরে গোলক ধাঁধায়,
দ্যাখে কিছু নেই, এমনকি ক্রূর মিনোটরের অস্পষ্ট
পদচ্ছাপও নেই।
আমার বয়স কাশে একা ঘরে মধ্যবয়সের
তামাটে প্রহরে
এবং পেশেন্স খেলে, বেড়ালের পিঠে হাত রেখে
কখনো ভাবুক হয়, মুখ ধোয়া স্বপ্নের বেসিনে বারংবার।
আমার বয়স কাঁধে ঈগল-কপোত নিয়ে হাঁটে
ফুটপাতে, কখানো-বা থমকে দাঁড়ায়, যেন কোনো
একান্ত নিঃসঙ্গ ঘোড়া মোটরের ভিড়ে;
কখনো সিংহের পিঠে চ'ড়ে বেড়ায় সমুদ্রতীরে
আয়ুভুক বয়স আমার।
আমার বয়স শার্ট, ট্রাউজার, গেঞ্জি, আন্ডারওয়ার খুলে
মেঝেতে গড়ায়, ভাবে কেন এত হিংসা দ্বেষ গ্রন্থের পাতায়?
কেন হু হু জল অবিরল পাবলিক লাইব্রেরির দু'চোখ বেয়ে ঝরে?
ফুটপাতগুলি কেন এমন ঔদাস্যে ভরপুর?

আমার বয়স জন্ম শাসনের বিজ্ঞাপনগুলিকে নিমেষে
বানায় বৈষ্ণব পদাবলি,
বন্দুককে ম্যান্ডোলিন, জংধরা কৌটাকে ললিপপ।
আমার বয়স চোখ হ'লে পরিপার্শ্ব হয়ে যায় সহসা ডিজনিল্যান্ড,
আমার বয়স চোখ হ'লে ক্লোজ শট, ডিম শট, লং শটে

বিভক্ত, সম্পূর্ণ ফের চিত্রময় বিশদ জগৎ।
কারা কী ফোঁড়ন কাটে, বাঁকা চোখে তাকায় ক'জন,
কারা করে নফরৎ ইত্যাদিকে কখনো দেয় না পাত্তা আমার বয়স।
বলে সে, কী লাভ এই খিস্তি খেউড়ের প্রতি মনোযোগী হয়ে?
বরং রঙিন নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াব একা-একা
অথবা ঝরনার পাশে শুয়ে শুনব পাখির রাঙা
প্রেমালাপ; কারো মুখচ্ছবি– ফেড ইন–
স্বপ্নের জোয়ারে
আসবে সোনালি ভেসে। আমার বয়স কিছু ফেড আউটের
স্মৃতি বয়ে দূরবর্তী সুবর্ণরেখার দিকে ছুটে যায়।

আমার বয়স কৃষকের রৌদ্রদগ্ধ মুখের মতন স্পষ্ট
চেয়ে থাকে ফসলের দিকে,
দ্যাখে পঙ্গপাল আসে ঝাঁক ঝাঁক, কী হিংস্র ঝাঁপিয়ে
পড়ে মাঠে সর্বনাশা ক্ষুধায়, মেঘ না পোকামাকড়ের দল, বোঝা দায়।

আমার বয়স আজ কবির চোখের মতো নাচে
চরাচরে, যায় দূরে নক্ষত্রটোলায়, পাতালের
অন্ধকারে, মাছ আর বনহংসীর হৃদয়ে আর
কবরের নিস্তব্ধ গভীরে।
আমার বয়স তার করতলে অদৃশ্য মোহর পেয়ে খুশি,
আমার বয়স তস্করের মতো চতুষ্পার্শ্ব থেকে
এলেবেলে কত কিছু নিয়ে যায় ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় স্মৃতির গুহায়।
প্রাচীন পাথর আর লতাগুল্মের ভেতর হেঁটে যেতে যেতে
আমার বয়স ক্রমাগত মেপে চলে
একান্ত আপন মহাদেশ।

অপরাহ্নে একদল মিউজিসিয়ান

অপরাহ্নে একদল মিউজিসিয়ান রকমারি বাদ্য নিয়ে
দাঁড়ায় গলির মাড়ে। যেন গলিতেই কনসার্ট
বিপুল ফুলের মতো পাপড়ি মেলে ভেসে যাবে মেঘে।
অকস্মাৎ একজন ড্রামে নাচায় নিপুণ কাঠি, অন্যজন
বাজায় ক্ল্যারিওনেট, কেউ স্যাক্সোফোন, ভায়োলিনে ছড় টানে কেউ,
কেউবা ট্রাম্পেটে তোলে সুর, শহরের চোখ স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়।
ঘর ছেড়ে লোক

সোৎসাহে বাইরে আসে, মানুষের বাগান সমস্ত গলিপথ।

সমাগত এইসব মিউজিসিয়ান কী রকম খায় দায়, সুখে আছে কিনা,
নাকি অন্তহীন স্বপ্নে ডুবে আছে নিজ নিজ বিশদ গুহায়?
ওরা কি কখনো ছুটি পায়? কে যোগায় ওদের বেতন
কিংবা কোথায় প্রকৃত ডেরা বেঁধে
এখানে এসেছে অপরাহ্নে? করে না এমন প্রশ্ন কেউ, শুধু
শোনে, বাদ্য শোনে!

মিইজসিয়ানগণ শাগালের ছবির মতন– কেউ কেউ
ভাসমান, সঙ্গে ঘোড়া অথবা বাছুর, ভায়োলিন
মালাসহ দোলে, কেউ পথে শোয়ানো লোকের পাশে
দাঁড়িয়ে চাঁদের নিচে ব্যাঞ্জো নিয়ে মাতে, গান গায়!

ড্রাম চায় জ্বলজ্বলে দুই বিঘা জমি,
স্যাক্সোফোন অরণ্যের অন্তর্গত স্বপ্নের প্রপাত,
এবং ক্ল্যারিওনেট চায় যাবতীয় কমলালেবুর
বাগানের একান্ত দখলীস্বত্ব আর
ভায়োলিন চায় স্তব্ধ নদীতীর, কবিতার বর্ণিল টেরেস,
সোনালি ট্রাম্পেট চায় একগুচ্ছ সতেজ গোলাপ,
ব্রাউন গিটার চায় তারে তারে সুন্দরীর ঘুমন্ত শরীর।

তিনটি বিয়ার ক্যান শহরের অনেক ওপরে, প্রায় মেঘমালা
ছুঁয়ে তীব্র মরুঘ্রাণ নিয়ে এ শহরে অবেলায়
কোত্থেকে হঠাৎ এক ভিড় উট এসে মিউজিসিয়ানদের
উদ্ভট ভঙ্গিতে দূরে, বহুদূরে হটাতে হটাতে
খাদের কিনারে নিয়ে যায়।
বিরান প্রান্তর থেকে, খাদের কিনার থেকে ফের
অপরাহ্নে ফিরে আসে একদল মিউজিসিয়ান।

এ-ও কি বিভ্রম নাকি? বাস্তবিকই একদল মিউজিসিয়ান
এসেছে এখানে অপরাহ্নে? কে আমাকে বলে দেবে এই অবেলায়?
আমি তো দেখছি আজরাইল রাশি রাশি ইশতাহার
বিলি করে অলিতে-গলিতে,
চৌরাস্তায়, বাস টার্মিনালে এবং চালান করে কালো চুমো
ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে, বেঘোর বস্তিতে।
কতিপয় কফিনের পাশে স্যাক্সোফোন, ট্রাম্পেট, গিটার আর
ভায়োলিন পড়ে আছে। তবে কি সকল স্পন্দমান

মিউজিসিয়ান মৃত? শত শত রক্তমাখা ইঁদুর এখানে
ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ সারাবেলা।
সে কোন মড়কে গেল মুছে জরিগাঁথা ঝলমলে
পোশাক-আশাকে মোড়া টেরিকাটা মিউজিসিয়ান?

ভাবতে ভালোই লাগে
মিউজিসিয়ানগণ এ শহরে সুর তোলে যখন তখন,
ভাবতে ভালোই লাগে,
সেই সুরে এক ঝাঁক কবুতর স্বপ্নের ভগ্নাংশ হয়ে যায়,
ভাবতে ভালোই লাগে
সেই সুরে সূর্যমুখী আর দীপ্র সিংহের সম্প্রীতি
নেচে ওঠে গহন দুপুরে,
সেই সুরে সব বাড়ি হেঁটে যায় কবিতার পঙ্‌ক্তির মতন।

ভাবতে ভালোই লাগে
সেই সুরে রোগশয্যা উৎসবের দ্বীপ হয় ক্ষিপ্র রূপান্তরে,
ভাবতে ভালোই লাগে,
সেই সুরে আফ্রিকার চেয়ে বেশি অন্ধকার আরেক আফ্রিকা
নিমেষেই মৃত্যুহীন আলো-স্নানে মুক্তির মতোই জেগে ওঠে।
ভাবতে ভালোই লাগে
সেই সুরে বড় ক্লান্ত ক্ষুধার্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবিরল ঝরে,
শস্যকণা ঝরে।

হ্যাঁ

হ্যাঁ আমি হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ তোমরা হ্যাঁ আমরা
হ্যাঁ আমাদের কিছু একটা করার থাকে কখনো না কখনো
হ্যাঁ এমন কিছু যা হয়তো সোনালি রেখার মতো রহস্যময় নয়
হ্যাঁ জ্যোৎস্না রাতে সারসের হঠাৎ পক্ষধ্বনির মতো নয় হয়তোবা
অথচ আমাদের বেঁচে থাকার সংকেত

হ্যাঁ সংবাদপত্রে যৌথ দুর্দশা পড়া ডাকঘরে চিঠি পোস্ট করা
হ্যাঁ বাসে চড়া হ্যাঁ চায়ের কাপে ঝড় তোলা
হ্যাঁ দুঃসময়ের ছায়ায় চুমো খাওয়া
হ্যাঁ নিসর্গের অন্তঃপুরে কারো হাত ধরে হেঁটে যাওয়া
হ্যাঁ টাইপরাইটারে স্বপ্ন লেখা খাটে ব'সে পা দোলানো

হ্যাঁ চুল আঁচড়ানো খুসকি তুলে আনা
হ্যাঁ মধ্যাহ্নে পাখিডাকা পার্কের প্রিয় সম্ভাষণ শোনা
হ্যাঁ অপরাহ্ণে সিঁড়ি বেয়ে কলিংবেল বাজানো
হ্যাঁ অন্ধকারে লিরিকের মতো রাজহংসী দেখা
হ্যাঁ সকালবেলার রোদে প্লেটে ফলের ঘুম দেখা

হ্যাঁ এ ধরনের কত কিছু করার থাকে হ্যাঁ থাকে কখনো না কখনো
হ্যাঁ এই তো সেদিন ম্যান্ডোলিন শুনে
হ্যাঁ একরাশ সূর্যমুখীর ভেতর থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে এলো
হ্যাঁ সেই বাঘ ডোরাকাটা কিনা মনে নেই
হ্যাঁ জ্বলজ্বলে সেই বাঘ সূর্যমুখী ফুলগুলি খেতে খেতে
হ্যাঁ নিজেই বিপুল এক সূর্যমুখী
হ্যাঁ সেই উন্মাদ ভ্যানগগ তাঁর শীতার্থ ঘরে কিংবা হলদে ক্ষেতের ধারে
হ্যাঁ ত্রিকাল চিবোতে চিবোতে কালো রুটির মতো চিবোতে চিবোতে
হ্যাঁ সূর্যমুখী এঁকেছিলেন নিজেকে প্রতিটি পাপড়িতে মেলে দিয়ে

হ্যাঁ আমি মাঝে মাঝে সূর্যমুখী নয় শব্দ লিখি
হ্যাঁ লিখি

হ্যাঁ সেই শব্দাবলির শরীর থেকে ভেসে আসে
হ্যাঁ ভেসে আসে সূর্যমুখী চিতাবাঘ আর হরিণের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে গোরখোদকের ঘামের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে শ্রমিকের ঘুমের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে লতাগুল্ম ফলমূলের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে আসবাবপত্রের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে মা আর সন্তানের চুমোর ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে নারীর ভেজা চুল আর স্তনের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে প্রেমিকের স্বপ্নের ঘ্রাণ
হ্যাঁ ভেসে আসে দুঃখিত মানুষের অশ্রুর ঘ্রাণ

হ্যাঁ আমি হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ তোমরা হ্যাঁ আমরা
হ্যাঁ আমাদের একটা কিছু দেখার থাকে কখনো না কখনো
হ্যাঁ দেখি টিলায় দাঁড়িয়ে দেখি আকাঙ্ক্ষার সূর্যোদয়
হ্যাঁ বালিয়াড়িতে শুয়ে শুয়ে দেখি প্রেমের সূর্যাস্ত
হ্যাঁ দেখি আধপোড়া সিগারেট আর বিয়ারের শূন্য বোতল নাচে
হ্যাঁ অন্তহীন প্রান্তরে স্বপ্নের মতো ঘোড়া
হ্যাঁ দেখি একটা সিংহ চাঁদকে চুমো খেতে খেতে ব্যাঞ্জো নিয়ে

হ্যাঁ জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে যায়
হ্যাঁ দেখি ঝরনার ঝলমলে পাতা হয়ে দোলে মরূদ্যানে
হ্যাঁ লিওনার্দো দা ভিঞ্চির হাত একালের চুলে বিলি কাটে
হ্যাঁ দেখি খৈয়ামের খুলি গোলাপে তোড়া হয়ে
হ্যাঁ পড়ে থাকে পুরোনো প্রাসাদের নাচঘরে
হ্যাঁ দেখি ইয়ুং স্বপ্নারণ্যে হেঁটে যান ছড়ি হাতে
হ্যাঁ দেখি ইয়ুংয়ের
কোট অবচেতনের মুখোমুখি মাতাডোরের পোশাক
হ্যাঁ দেখি র‍্যাবো ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন কবিতা
হ্যাঁ দেখি আইনস্টাইন ওভারকোট আর বেহালার বাক্স নিয়ে
হ্যাঁ পার হচ্ছেন গনগনে জার্মানির সীমান্ত
হ্যাঁ দেখি মরুশেয়াল রুমেলের মুঠো থেকে বেরিয়ে আসছে ট্যাঙ্ক

হ্যাঁ দেখি বুখেনওয়াল্ড আর আউসউইজ-এ পুরোনো জুতোর
স্তূপ কাটা চুল
হ্যাঁ দেখি বুলেটবিদ্ধ বাংলাদেশের ভাঙ্গা চুড়ি ছেঁড়া পুঁতির মালা
হ্যাঁ দেখি বাংলাদেশের আগুনে ঝলসে যাওয়া মুখ

হ্যাঁ দেখি জনাব মরণ বায়তুল মোকাররমে লাল নীল সবুজ শার্ট
হ্যাঁ হলদে বেগুনি ফিরোজা ট্রাউজার
হ্যাঁ দেখি জনাব মরণ বায়তুল মোকাররমে লাল নীল সবুজ শাড়ি
হ্যাঁ হলদে বেগনি ফিরোজা ব্লাউজ
হ্যাঁ দেখি জনাব মরণ রাশি রাশি সাদা বাদামি ব্রা
হ্যাঁ দেখি বেলুনের মতো ছুড়ে দিচ্ছেন আকাশের দিকে
হ্যাঁ দেখি জনাব মরণ আতর-অলার কাঁধের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে
হ্যাঁ জনাব মরণ সংবাদপত্রে পড়ছেন শোক সংবাদ
হ্যাঁ জনাব মরণ দস্তানা খুলে ঈগলের চোখের মতো আংটি দেখাচ্ছেন
হ্যাঁ দেখাচ্ছেন যখন তখন যেন কালো স্যুট পরা জাদুকর
হ্যাঁ দেখি সভ্যতার চোখে সূর্য অস্ত যায় অস্ত যায়

হ্যাঁ আমি হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ তোমরা হ্যাঁ আমরা
হ্যাঁ আমাদের সামনে কালো পাখির মতো ঝাঁক ঝাঁক না উড়ছে
হ্যাঁ ওরা ঝাঁক ঝাঁক না বসছে কার্নিশে মিনারে চঞ্চু ঘষছে বারংবার
হ্যাঁ আমি হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ তোমরা হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ রৌদ্রে
হ্যাঁ হ্যাঁ রৌদ্রে মুছে ফেলব ওদের ডানার কালো রঙ
হ্যাঁ ওদের রুপালি নক্ষত্র বানিয়ে দেব

হ্যাঁ ওদের বানিয়ে দেব আগামীর একগুচ্ছ গোলাপ
হ্যাঁ প্রত্যেক ধূলিকণাকে দেব গিটারের সুর
হ্যাঁ শহরের প্রতিটি ঘরের ছাদকে বানাব মুকুট
হ্যাঁ হ্যাঁ-স্পর্শে হ্যাঁ-চুম্বনে শূন্যতাকে বানাব সঙ্গীতময় জলসা

শতাব্দীর বিদীর্ণ হৃদয় থেকে

প্রত্যেকের কাছ থেকে আপনার সুখের অভাব
লুকিয়ে রাখাই চিরদিন
আমার স্বভাব।

কখনো চলতি পথে যখন জিজ্ঞেস করে কেউ
ভাবলেশহীন
বাড়িয়ে গেরস্ত হাত, 'কেমন কাটছে দিন ইদানীং', বলি–
ভালো, বেশ ভালো, পুনরায় পথ চলি
নিপুণ গোপন রেখে আমার প্রকৃত মনোভাব।

একদা স্বপ্নিল করিডরে যার শরীরের চন্দ্রোদয় দেখে
ছিলাম আচ্ছন্ন সারাক্ষণ তাকে ঝিল, ঝাউগাছ,
অথবা সোনালি মাছ
প্রাচীন ইঁদের কিংবা পাখি রূপে হৃদয়ের অভ্যন্তরে রেখে
বস্তুত সংসারকানা আজও আমি। আগে
অথবা অনেক পরে– কখনো সময় খুব করে প্রতারণা–
স্মৃতিকে গোধূলি শেষে বনভোজনের পোড়া কাঠ, বাসি খাদ্যকণা
ভেবে আপাতত এই অদ্ভুত শহরে করি বসবাস
কখনো বিরাগে, কখনো-বা অনুরাগে।

জানালার কাছে এসে শুনি ফুটপাত, গাছপালা,
পাবলিক লাইব্রেরি, নিউ মার্কেটের বাণিজ্যিক
পথ ল্যাম্পপোস্ট যেন স্বপ্নভঙ্গজনিত বিষাদে
ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
যন্ত্রণা আমার অস্তিত্বের রুক্ষ বিদীর্ণ ভূ-ভাগে
নিয়ত প্রগাঢ় লেখে তার হিজিবিজি বর্ণমালা।

সহসা কখন কী-যে হারিয়ে ব্যাকুল দিগ্বিদিক
কেবলি খুঁজতে থাকি। ফের বাঁশি বাজাবে কি উধাও বিশ্বাস
নিষ্ফলা প্রান্তরে, দগ্ধ বনে, জনশূন্য নদীতীরে,

অসুস্থ শহরে?
অনাহারী শিশু আর পঙ্গু নারীদের সাদা পাখি নেবে তুলে
চঞ্চুর আশ্রয়? অনাথের ক্ষতি নিরিবিলি ঝরে
নক্ষত্রের আলো, তুমি কপটতা ছেড়ে দুস্থ ভিড়ে
মিশে গিয়ে জেনে নাও জগৎ-সংসার কবিতার
খাতা কিনা। সুখ চাই সুখ চাই বলে সত্তার নিভৃত মূলে
কখনো এনো না ডেকে বিষপিঁপড়ের ঝাঁক; তুমি

দূরত্ব আবৃত্তি করে যখন নিকটে চলে আসো কারো, তার
লতাগুল্মময় মনোভূমি
দুলে ওঠে, সোহাগের সিংহাসনে ব'সে পা দোলানো ভালো লাগে,
ভালো লাগে কবেকার ক্ষতচিহ্নে জ্যোৎস্নাধারা বয়ে
যেতে দেখে অবসরে। হঠাৎ আবার মগজের কোষে জাগে
পদহীন ভিখিরি দল, বন্ধ ঘরে কে এক উন্মাদ ভয়ে
জড়ো-সড়ো কিংবা নোংরা নখে দেয়ালে থেকে রোদ
মুছে ফেলবার জেদে দাঁতে দাঁত ঘষে। ঘুরে দেখি, ডানপাশে
আর্কাইভ জেগে ওঠে—প্রাচীন দ্রব্যের স্তূপ থেকে
আস্তে একাকিনী নারী, কবে যেন হয়েছিল দেখা, উঠে আসে
ছড়িয়ে স্মৃতির মসলিন; একজন দার্শনিক মূল্যবোধ
বিষয়ে ভাবিত, হাতে তাঁর নষ্ট সভ্যতার ভগ্নাংশ, বিবেকে
প্রভূত পীড়ন, অলিন্দের খোলা হাওয়া চাই বলে
জংধরা চেয়ারের কাছ থেকে বাঁ দিকে দাঁড়ান সরে; কবি
করোটিতে সুরা পান করে খসখসে পাণ্ডুলিপি জ্বলজ্বলে
পাখির মতন দেন ছেড়ে। আর্কাইভে আরো কত মুখচ্ছবি

প্রাচীনতা ভেদ করে ঘাসে ঘাসে, আকাশে আকাশে
কেবলি রটাতে চায় বার্তা, একজন প্রেমিকের
মৃতদেহ গোলাপের গুচ্ছ হয়, ঝরে যায় ক্লান্ত প্রহরের
সঙ্গীত ফুরোলে, হে আমার আপন করুণ বিউগল
বাজো, বেজে ওঠো এ বিশদ সূর্যাস্তের ক্ষণে গভীর আশ্বাসে,
চেয়ে দ্যাখো শতাব্দীর বিদীর্ণ হৃদয় থেকে রক্তবিন্দু ঝরে অবিরল।

যখন আমার মৃত্যু হবে

যখন আমার মৃত্যু হবে, হবেই তো কোনো দিন,
তখন হয়তো তুমি রাত্রির শয্যায় ঘুমে লীন,

বালিশে স্খলিত খোঁপা, স্বপ্নময় ঘুমে অকস্মাৎ
উঠবে শরীর কেঁপে সুখঘোরে, পুরুষের হাত
তোমার কোমরে লগ্ন, সে-হাত দস্যুতা জানে খুব।
যখন আমাকে মৃত্যু অতর্কিতে বানাবে বেকুব,
তখনি হয়তো তুমি গল্পের আসরে বাছা বাছা
চালাক মন্তব্য দেবে ছুড়ে আর কাকে বলে বাঁচা
বলবে শিল্পিত সুরে। যখন আমার মৃত্যু হবে,
তখন হয়তো তুমি সমর্পিত দীপ্র কলরবে।

যখন আমার মৃত্যু হবে, হয়তোবা জানালার
বাইরে তাকাবে তুমি, একাকিনী যাবে বারান্দার
অন্ধকারে, আস্তেসুস্থে গাছপালা, নক্ষত্রের তোড়া
দেখবে, বসবে এক কোণে; সহসা নিঃসঙ্গ ঘোড়া
তোমার হৃদয় জুড়ে খুরে ওড়াবে রঙিন ধূলি
এবং তোমার দিকে ফ্লাওয়ার ভাসের ফুলগুলি
নিঃশব্দে থাকবে চেয়ে অপলক; হয়তোবা যাবে
খাবার টেবিলে তুমি, ঝিরিঝিরি প্লেয়ারে বাজাবে
পুরোনো দিনের গান। সেকালের কোনো কোনো গান
একদা আমার মধ্যে দিত গ'ড়ে স্মৃতির উদ্যান।

যখন আমার মৃত্যু হবে, হয়তোবা দ্বিপ্রহরে
শুয়ে শুয়ে নব্য নভেলের স্বাদ নেবে, হা-হা স্বরে
বাতাস প্রবল যাবে বয়ে, একজন স্বপ্নময়
উদভ্রান্ত কবির কথা হয়তো পড়বে মনে। ভয়
পেয়ে টেনে দেবে পর্দা জানালার? হয়তোবা
ছেলেটা পাশের ঘরে একা বসে মেঘ, বনশোভা
আঁকবে খাতায় কিংবা ছুটে এসে ধরবে জড়িয়ে
তোমাকেই, তুমি পিঠে দীর্ঘ চুল কোমল ছড়িয়ে
চিত্রবৎ; যখন আমার সত্তা অসাড়, তুহিন,
তখন হয়তো তুমি বুনে যাবে উল ক্লান্তিহীন।

অন্ধ দেয়ালের সাথে

তবে কি যাইনি ভুলে? এতদিনে সব কিছু ফিকে
হয়ে গেলে, খুব শূন্য পাখির বাসার মতো মন
হয়ে গেলে খড়কুটোহীন কার কী বলার ছিল?

সুদূর সকাল ডাকে, দুপুর হাঁপায় ঘন ঘন,
বিকেল হরিণ হয়ে আসে, খুরে তার বনস্থলী,
ঝিল, দিকচিহ্ন প্রকাশিত। রাত্রি, যেন ক্লিওপেট্রা,
অঙ্গবাস খুলে ফেলে অমর আকাঙ্ক্ষাগুলি করে
উন্মোচন, বুকে ক্ষুদ্র সাপের দংশন জেগে থাকে।
করতল থেকে কত বিশ্ব নিচে ভীষণ গড়ায়,
চোখের পাতায় ব্যেপে আসে সুনসান কত যুগ।

চায়ের সময় হল, সিগারেট কই? দেশলাই
প্রতিবার অতিশয় ব্যস্ত হয়ে খুঁজতেই হয়
পকেটে টেবিলে কিংবা একান্ত দেরাজে। সিগারেটে
আগুন ধরাতে গিয়ে অকস্মাৎ কী অন্যমনস্ক
হয়ে পড়ি, পুনরায় তড়িঘড়ি ফস করে কাঠি
জ্বালাই এবং দূরে তাকাই ট্যুরিস্টবৎ আর
সহসা নিজের ট্রাউজারে, দেখি লেগে আছে কিছু
চোরকাঁটা কবেকার। মায়া লাগে, সস্নেহে বুলোই
হাত সেই শুকনো নৈসর্গিক কণাগুলির ওপর।
চায়ের পেয়ালা ঠাণ্ডা, আগুনের ফুলকি শিরাপুঞ্জে।

অতীত বাড়ায় গলা হৃদয়ের ভেতরে, যেন সে
রাজহাঁস, চঞ্চু ঘষে উরুতে আমার, ডানা তার
কেবলি আমাকে ডাকে মোহিনী স্বপ্নের ছায়াচ্ছন্ন
সুদূর নিবাসে, রাজহাঁসের নয়ন সারাক্ষণ
নিবদ্ধ আমার দিকে, বুঝি স্পষ্ট দেখে নিতে চায়
বেলাবেলি কতটুকু আমি আছি আমার ভেতরে?
তার গীতপ্রায় গ্রীবা ছুঁয়ে বলি– পথ যত দূরে
চলে যাক, হোক দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের রাত্রির মতন,
হোক যত ভাঙাচোরা, পথ, তবু পথ চিরদিন
আমাকে শোনাও তুমি পান্থনিবাসের কলস্বর।

এখনও বিকেলে হেঁটে যেতে যেতে কেন বারংবার
পিছনে তাকাই ফিরে? কেন মন মরুর মতন
হয়ে যায় অকস্মাৎ? আছে কি এমন কেউ যার
শরীর স্পন্দিত হচ্ছে একা ঘরে এখন আমারই
পথ চেয়ে সারাক্ষণ? নাকি অন্তর্গত দুর্বলতা
ডেকে নিয়ে যেতে চায় যাত্রার বিন্দুতে পুনরায়?
উদ্দীপনা যত টেনে নিয়ে যাক দূরে মাঝে-মাঝে

পিছনে তাকাতে হয় আর কিছু দীর্ঘশ্বাস ফেলে
প্রতিবাদহীন চলে যেতে হয়– কোথায় যে যাওয়া–
অতিক্রম করে বৃক্ষশ্রেণী, ফুটপাত, লেক, সাঁকো।

কতিপয় উপরাজ ল্যাম্পপোস্ট পেরিয়ে এই যাওয়া
স্বপ্নের ভেতরে হেঁটে যাওয়ার মতন মনে হয়–
যেন আমি বড়ো বুনো লতাগুল্মময় পৌরাণিক
সমাধি ফলক থেকে সমাধি ফলকে যাচ্ছি একা!
যে-হাত এগিয়ে আসে করমর্দনের অভিলাষে,
সে-হাত বালির তৈরি, ঝরে যায় নিঃসীম সৈকতে।
ব্যাকুল আবৃত্তি করি প্রেমকথা কর্কশ আঁধারে
আর ভাবি আছে কেউ সুনিশ্চিত সেখানে আড়ালে,
অথচ পাই না সাড়া কিছুতেই। তবে কি এভাবে
অন্ধ দেয়ালের সাথে কথা বলে যাব একা একা?

হাত-বিষয়ক কবিতা

হাতের বিষয়ে আমি প্রায়শই ভাবি। প্রতিদিন
না হলেও কোনো কোনো দিন নিজের হাতের দিকে
তন্ময় তাকাই, যেন কিছু পাঠোদ্ধারে বড় বেশি
মনোযোগী হয়ে পড়ি। উত্তেজিত মাছের মতন
হাত উল্টেপাল্টে দেখে নিই, রেখাবিদ নই, তবু
হাতের তালুর স্থির লতাপাতা করি উপভোগ।

টেবিলে আমার হাত। কে তুমি? হঠাৎ চক্ষুদ্বয়
প্রশ্ন করে, কেন তুমি এমন ঘুমিয়ে আছ একা
এই টেবিলের বুকে? তুমি কি বধির কোনো শাখা?
নাকি জলচর কোনো প্রাণী ডাঙায় পোহাচ্ছে রোদ?
কখনো শয্যায় হাত পড়ে থাকে এক পাশে, আমি
সবিস্ময়ে দেখি তাকে, সেকি আমারই প্রকৃত কেউ?

স্মৃতির শিশির চোখে নিয়ে হাত অপলক গাঢ়
তাকায় আমার দিকে; সে দৃষ্টিতে নদী, বালিয়াড়ি,
শূন্য তাঁবু; জ্যোৎস্নাময় উটের স্বপ্নিল গ্রীবা, ক্ষেত,
সূর্যাস্ত এবং ক্রুদ্ধ পাখির বিবাদ, সে দৃষ্টিতে
কবির করোটি, সদ্য ক্ষত, নর্তকীর শরীরের

কত ঢেউ, কালো ভেনাসের মতো বর্ষার নিশীথ।

যখন আমার হাত আমাকে বলতে চায় কিছু,
আমার হাতকে মুখচ্ছবি হতে দেখি, শুধু কথা
পিঁপড়ের মতো ঘোরে হাতে। মাঝারি আমার হাত
কিছুবা অবুঝ, ত্রস্ত, কিঞ্চিৎ বেঢপও, বলা যায়–
দেখি সে বাতাস হয় উড়ুক্কু প্রান্তরে, ঘাসে ঘাসে;
মাঝারি আমার হাত বেড়ে যায় স্বপ্নের হাওয়ায়।

কখনো চমকে উঠি আমার আপন হাত দেখে,
ক্ষয়িষ্ণু ছায়ার মতো কত লোক লুটোচ্ছে এ হাতে,
লোমকূপগুলি যেন দারুণ মড়ক-কবলিত
পল্লীপুঞ্জ, আর্ত হিরোশিমা, একাত্তরের বিদীর্ণ
বাংলাদেশ। ভয় পাই, কখনোবা ভয় না পাওয়ার
ভান করি; হাতের ভেতরে দ্রুত হাত নিয়ে যাই।

আকাঙ্ক্ষার আয়ু

দেখি তাকে, ব'সে থাকে এক প্রান্তে নীরব, স্বপ্নিল–
সকলের কাছাকাছি থেকেও অনেক দূরে তার
এ কেমন অবস্থান? কখনো ধরায় সিগারেট,
ধোঁয়া ছাড়ে, ইতস্তত করে পায়চারি কখনোবা।
দ্যাখে সে একটি পাখি ব'সে আছে ভীষণ একাকী;
পাখিটির চোখে বুঝি স্বপ্নের মতন জ্বলে কারো
মুখচ্ছবি, ভাবে; দ্যাখে পাখির গহন চোখে তার
আপন আকুল চোখ। বিহঙ্গ, মানুষ দীর্ঘশ্বাস।

চতুষ্পার্শ্বে বাজে কী ব্যাপক অনুপস্থিতির সুর।
হঠাৎ নাছোড় তৃষ্ণা বুকে কালো মড়কের মতো
ত্বরিত ছড়িয়ে পড়ে। চোখে তার দুলে ওঠে কত
করোটি, কঙ্কাল আর বালির কর্কশ সিংহগুলি
কেশর দুলিয়ে করে তুমুল গর্জন। পুনরায়
জ্যোৎস্নাময় বালিয়াড়ি গোলাপ বাগান হয়ে ডাকে।

একেই প্রতীক্ষা বলে? মাঝে-মধ্যে লজ্জাবোধ হয়।
বহুদিন কেটে গেছে তার এরকম প্রতীক্ষায়।

গাছপালা পাখি কিংবা ভ্রাম্যমাণ মেঘে চোখ রেখে,
চোখ রেখে আসবাবপত্রে, পথে অনেক সময়
কাটিয়েছে, মনে হয়, কত যে শতাব্দী চলে যায়
দীর্ঘ ছায়া ফেলে তার কাতর হৃদয়ে, শূন্যতায়
ব্যাকুল মুহূর্তগুলি ব্যর্থ যায়, আঁধারে গড়ায়।

'দয়া করো' সে সর্বদা তার দৃষ্টি মেলে দ্যায়
পথে, দ্যাখে খুব ঝঞ্ঝাচিহ্ন নিয়ে একটি প্রাচীন
জাহাজ বন্দরে আসে পণ্যহীন, যাত্রীরা উধাও;
কাপ্তান, নাবিক কেউ নেই। বনশোভা দূরে স'রে
যেতে থাকে; 'দয়া করো' হাওয়ায় মিলায় বার-বার।

কী এক দুঃখের গান রাত্রির হৃদয় থেকে যেন
পল্লবিত হয়, সুর কোথায় যে তাকে নিয়ে যায়
আর সে নিজে ঘুমে-হেঁটে-বেড়ানো লোকের মতো একা
ক্রমাগত পথ চলে। দুঃস্বপ্নসংকুল কোনো বাঁকে
সহসা ফেরালে চোখ কিছু পতনের শব্দ শোনে–
কে যেন ছায়ার মতো দ্রুত সরে যায় বহু দূরে;
কে তুমি কে তুমি বলে ডোবে সে অতল হাহাকারে।

প্রতীক্ষা ফুরোয় তবু ফুরোয় না আকাঙ্ক্ষার আয়ু।

মূকাভিনয়

আমরা মূকাভিনয় করি অনেকেই সারাক্ষণ,
আমাদের এ রকম করে যেতে হয় বহুকাল।
এত যে মূকাভিনেতা চুতষ্পার্শে আনাগোনা
করে নিত্য সারি সারি, তা দেখে অবাক মানি। তারা
হাঁটে, বসে, মাথা নাড়ে, কখনো দুদ্দাড় দেয় লাফ,
আবার ঝিমোয় কিছুক্ষণ। মাঝে মাঝে নেচে ওঠে
পুতুলের মতো ঠিক এবং ফুরোলে দম থামে
অকস্মাৎ কখনোবা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে গাঢ়
অন্ধকারে বহুক্ষণ, দেয়ালের আলেখ্য যেনবা।

আমি কি আলাদা কেউ? বস্তুত আমার প্রাতিস্বিক
ধরন রয়েছে কিছু– যেমন হাঁটার ভঙ্গি আর
সহসা আড়াল থেকে সকলের মুখোমুখি একা

দাঁড়ানোর ঢঙ কিংবা রৌদ্রের সহিত ব্যক্তিগত
যোগাযোগ, অন্ধকার টানেলে সুদীর্ঘ বসবাস।

আমিও মূকাভিনয় করি রাত্রিদিন। হাত-পা নাড়ি,
মাথায় চালাই হাত ঘন ঘন, ঠোঁট ফাঁক করে
হাসতে সচেষ্ট হই, চেয়ারে গা এলিয়ে মৃদুমন্দ
পা দোলাই বারংবার। অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ আলো পড়ে
সারা মুখে, গাল বেয়ে পানি নামে। কেন এই উষ্ণ
জলধারা, কাউকেই জানাতে পারি না। প্রাণপণ
চেঁচিয়ে উঠতে চাই, শুধু ঠোঁট নড়ে এলোমেলো,
কখন হারিয়ে গেছে কণ্ঠস্বর, নিজেই জানি না।

কেবলি মূকাভিনয় করি এলেবেলে সারাক্ষণ,
এ রকম করে যেতে হবে দীর্ঘকাল, মনে হয়।

মানুষ এসেই যায়

বহুদিন ধরে যাচ্ছি, কখনো আনন্দে, কখনোবা কায়ক্লেশে
অত্যন্ত কাতর পথ হাঁটি। মাঝে-মধ্যে
পান্থনিবাসের প্রেতায়িত নিরালায়
থাকি মধ্যরাতে; মধ্যরাত মগজের
ভেতরে বেড়াল হয়ে ঘুমোয় পেলব, নিরিবিলি।

বহুদিন ধরে যাচ্ছি, কখনো হঠাৎ কোনোখানে
যাত্রা থেমে গেলে দ্বিপ্রহরে
কিংবা গোধূলিতে
আশেপাশে কুয়োতলা, কল খুঁজে নিই, জলপান করে দীর্ঘ
স্মৃতির মতন পথরেখা
স্মৃতিতে মিশিয়ে, অন্য তৃষ্ণা নিয়ে, আবার নিঃসঙ্গ পথচারী

আমার ফেরার কথা ছিল নিশীথের মৃত্তিকায়
কামিনী ঝরার আগে। সেই কবে রজনীগন্ধাকে
কথা দিয়ে চলে গেছি কতদিন ভাবলেশহীন,
কাঁটার খতরা ছিল পদে পদে, অথচ আমার
সৌজন্যসম্মত ভঙ্গি খায়নি কখনো টোল; শুধু
প্রত্যাবর্তনের গান ভুলে
অচেনা পথের দিকে চোখ রাখি বারংবার, সামনে বাড়াই

পদযুগ; পদযুগ ধূলিময়, বীণাধ্বনি, স্বপ্নের মহলে
মখমলে ঢাকা। মমতায় প্লুত কোনো মৃত্তিকায়
শেকড় লাগে না; এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে
চলে যেতে হয় বলে চলে যাওয়া? অস্থায়ী ডেরায়
রাত্রিশেষে কাঠখড় ভস্মীভূত হ'লে, পাখিদের পাড়া খুব
নিঝুম বিবশ হ'লে শবব্যবচ্ছেদ মনে করে
আমি কি মুছি না চোখ? থাক,

শোকগাথা রচনায় কাজ নেই। রিক্ততার রুক্ষ তপোবনে
কেটে গেছে বহু বেলা, তপোক্লেশ বেড়ে যায় ক্রমাগত; এবার সত্তার
সম্ভ্রম বাঁচিয়ে অন্ধকার
পথের আড়ালে পথ খুঁজে নেব, খুঁজব দিগন্তে অশ্বপাল।

আমার ফেলার কথা ছিল বনস্থলী থেকে খুব
কান্তিমান সাদা ঘোড়া বেরিয়ে আসার আগে; আমি
প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি রাখিনি বলে ওরা
সেই কবে থেকে ব'সে আছে পথপ্রান্তে, নদীতীরে।
মাঠে তাঁবু, কেউ কেউ অপেক্ষায় কাবু সন্ধ্যালোকে।
ওদের সবার জন্যে বীজ নিয়ে আসব বলেই
দিগন্তের দিকে মুখ রেখে ব'সে আছে বহুজন।
কেউ কেউ হাই তোলে, চুল টানে; ধনুকের ছিলার মতন
কেউ কেউ। মরমীয়াবাদী যেন কেউ কেউ, ওদের দু'চোখে
প্রতীক্ষার মতো কত প্রহর গড়িয়ে যায়, যায় নিত্য যায়।

'সে আসবে' বলে অনেকেই গল্পে মাতে, গেরস্থালি
ছিন্নমূল মানুষের গন্ধে ভরপুর। জ্যোৎস্না আর গীতধারা
একই স্রোতে মিশে যায়, কখনো দোলনা দুলে ওঠে
ঘুমপাড়ানিয়া গানে। আকাশ কবির
খাতার মতন সম্ভাবনাময়, কেউ দূর আকাশের দিকে
আঙুল দেখিয়ে বলে,– 'এই তো আমার কাঁথা, রুপোলি নকশায়
অর্থময়, আমি এর অনন্ত ঔদাস্য
সমর্থন করি।' একজন বৃদ্ধ বলে,
প্রান্তরে দাঁড়িয়ে বলে, 'যে গেছে সে প্রতারক,
আসবে না কস্মিনকালেও;
'যদি সে কখনো আসে, আমার মাথায় মাবুদের
'লানত আসবে নেমে, লিখে রাখো তোমরা সবাই।'
একজন নারী তার চুলরাশি মেঘময় সন্ধ্যায় ছড়িয়ে

বলে মৃদুস্বরে, 'যে গেছে সে বিশ্বাসঘাতক
'হৃদয়ে পাথর তার, চক্ষুদ্বয় দাগাপ্রিয় খুব,
'আসবে না, আমি চুল ছিঁড়ে নদীতীরে উন্মাদিনী হয়ে ছুটে
'বেড়ালেও আসবে না খল, প্রবঞ্চক।'

আমার ফেরার কথা ছিল পাখির চোখের মতো
লোকশ্রুত নৌকো ঘাটে লাগার আগেই।
ওদের ক্ষেতের জন্যে বীজ অত্যন্ত স্বপ্নিল হয়ে
প্রগাঢ় রয়েছে জমা আমার মুঠোয়, যতদিন যায় বীজ তত স্বপ্ন হয়।

সর্বদা জমিন ডাকে, বীজ কী প্রবল ছুটে যেতে চায় শূন্য
মৃত্তিকার প্রতি
আমার মুঠোর খোসা ছিঁড়ে। বীজ নিয়ে এসে দেখি
আমার আপন প্রত্যাবর্তনের পথে, রাত্তিরেই ফেরা, কোনো
মশালের চিহ্ন নেই, বাদ্যরব নেই, নেই নারীর বিস্ময়।
জমিনে ছিটিয়ে বীজ আমি স্বপ্ন হই, বীজ স্বপ্ন, স্বপ্ন সোঁদা
ধান গন্ধময়, বীজ মরালের ওড়াউড়ি, নিদ্রায় কাতর
ওদের ঘুমন্ত ওষ্ঠে, গালে বীজ চুমো খায়। প্রত্যাবর্তনের
পথে আমি দেখি এক কবির কঙ্কাল বর্ষাভেজা
হাওয়ায় দোদুল্যমান যূথিবনে, তার অক্ষিগর্ত যেন গায় গান–
মানুষ এসেই যায় শেষে নিরুদ্দেশ থেকে মানুষের আপন নিবাসে।

ট্যান্টালাস

এখন তো পুশিদা সে জলশায় অত্যন্ত নিকটে
উচ্ছ্বসিত, রৌদ্রঝলসিত, জ্যোৎস্নাচমকিত; দেখি
আমার নিজের মুখ টলটলে জলে, ঝলমলে
ফলের গাছের ডাল ছায়া রাখে পানির তালুতে।
বিশাল চোখের মতো জলাশয় চেয়ে থাকে স্থির
একান্ত আমার দিকে, স্বপ্ন হয়ে ওঠে মাঝে-মাঝে।

শান্ত মেঘ আঁকে মৃদু চুম্বন সে-হ্রদে কিংবা পাখি
করে স্নান, কখনোবা জলপান; বিনম্র লাজুক
কোনো প্রাণী রাখে মুখ তার বুকে মুছে নিতে খর
পিপাসা অস্তিত্ব থেকে। দাঁড়িয়ে রয়েছি তীরে একা
সেই কবে থেকে, পদযুগ ভেজা খুব, ফুটিফাটা

পথ সারা বুক, ওষ্ঠে কেবলি শুকোয় রক্তধারা।

ভীষণ তৃষিত চোখে জলাশয়; শুধু জলাশয়
নাচে নক্ষত্রের মতো। কী কাতর অস্তিত্ব আমার!
আমার অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনিদ্রার রক্তজবা
করেছি অর্পণ এই জল দর্পণে। বহুক্ষণ
ঝুঁকে থাকি নিষ্পলক, কখনো দাঁড়াই, ফিরে আসি
পুনরায়, তীরবর্তী ফল ছুঁতে গিয়ে দেখি ওরা

লাফিয়ে শতেক দূর স'রে যায়। আমার যন্ত্রণা
দেখে দেখে পানি আসে গাছের পাতার চোখে আর
কুঞ্চিত ফলের চোখ, পাথরের নিচে শত কীট
ভীষণ শিউরে ওঠে। ওষ্ঠ রাখি জলাশয়ে, তবু
পারি না করতে পান এক বিন্দু জলও। বারবার
এরকম প্রতিহত হবো আমি– এই তো নিয়তি।

উদ্ভিদ আমার চোখে, কাঁধে, গ্রীবায় একাকী বাড়ে,
পানি কাঠগুঁড়ো হয়ে ঝরে ঠোঁটে, মুখের ভেতরে।
ভয় পাই, অবশেষে গাছের শিকড় হয়ে যাব?
আমি তো ফিরি না ঘরে আর, পুড়ে যাই। জলাশয়,
হে পুশিদা জলাশয়, তুমি পারো নাকি ধুয়ে নিতে
আমার এ অভিশাপ নিমেষেই একটি চুম্বনে?

আমার কবিতা দ্যাখো

আমার কবিতা দ্যাখো তোমার দিকেই চেয়ে আছে
অপলক সদ্য-প্রেমে-পড়া তরুণের মতো। গাছে,
দেয়ালে টেবিলে, বারান্দায় বাল্বে, টবে,
ড্রইংরুমের স্মিত শোভন বৈভবে,
স্নানাগারে শাওয়ারের ছিদ্রময় মুখে, রান্নাঘরে,
যেখানেই রাখো চোখ, নিশ্চিত দেখব তুমি প্রহরে প্রহরে
আমার কবিতা তীব্র চেয়ে আছে তোমার দিকেই, কী উন্মুখ!
লজ্জায় যতই ঢাকো মুখ
অথবা ঔদাস্যে দূরে সরে যাও, কবিতা আমার
তোমাকে করবে আলিঙ্গন বারংবার।

আমার কবিতা যেন এক ঝড়ে-পড়া পথচারী,
কোনো কোনো দিন দেবে ক্ষিপ্র টোকা দরজায়, তুমি তাড়াতাড়ি
খুলবে তো খিল? পারবে তো তাকে ডেকে নিতে কাছে?
অথবা যদি সে প্রজাপতি হয়ে নাচে
তোমার শয্যার পাশে, তাকে
চিনতে পারবে তো অকস্মাৎ? যদি সে সেখানে থাকে
প'ড়ে কোনো আহত প্রাণীর মতো আর্তিময়তায়,
করবে সতেজ তাকে তোমার কোমল শুশ্রূষায়?
যখন তোমাকে ছোঁবে আমার কবিতা নিরিবিলি, অত্যন্ত সোহাগভরে
রাখবে প্রগাঢ় ওষ্ঠ ঠোঁটে, তাকে ফেরাবে কী করে?

যখন তোমার কাছাকাছি কেউ নেই,
আমার কবিতা মৃদু হেসে বলবে তোমাকে, 'এই
শোনো, কোনো দিন ভেবে দেখেছ কি বেশি সুন্দর, তুমি নাকি
আমি?' তার হাসি দূরে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলে দেখবে যে পাখি
রেলিং-এ গাইছে গান, সে আমারই কবিতা আপন।

রাত্তিরে যখন খোপে যুগল পায়রা করে প্রহর যাপন,
তুমি কারো দস্যুতায় আর্তনাদ করো, কী সুদীর্ঘ হাহাকার
হয়ে যায় তোমার শরীর আরো নৈঃসঙ্গে, তখনও দুর্নিবার
কবিতা আমার চেয়ে থাকে তোমার দিকেই আর
চোখের বাষ্পময় জল হয়ে কাঁপে, কখনো আবার
ঘুমহীন কৌচে কি শয্যায়
নগ্ন, অসহায়,
গোপনে তোমার পথে
অত্যন্ত পীড়িত হয়, ধু-ধু আর্তনাদ হয় একটি রোমশ ক্রূর হাতে।

কাঙাল

একজন হতচ্ছাড়া লোককে আমি প্রত্যহ দেখি,
সারাক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকে
আমার দরজার সামনে, তার মুখে টুঁ শব্দটি নেই।
এক মাথা ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল, তোবড়ানো তার
ট্রাউজার, শার্ট বোতামহীন,
সমস্ত শরীরে দেশ-বিদেশের নানা স্ট্যাম্প।

যেন সে মুঠি খুললেই করতলে
স্বপ্ননগরীর পায়রাময় সিংহদ্বার ঝলমলিয়ে উঠবে,
প্রস্ফুটিত হবে দিনান্তের ছাপ-লাগা মরূদ্যান!

প্রত্যহ দেখি তাকে, একই রকম, উদাস দৃষ্টি মেলে
দাঁড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ দরজার সামনে, চুপচাপ।
কী অন্ধকারে, কী জ্যোৎস্নায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে
প্রহরের পর প্রহর।
সেসব প্রহর কুষ্ঠরোগীর ওষ্ঠের মতো ভারি
মনে হয় আমার।
আমি তাকে 'আমার দরজা থেকে দূর হ' বলে তাড়িয়ে
দিতে চাই বারংবার; সে এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে যায় না,
ভাস্কর্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকে একা।

এ কেমন কাঙাল তুই দাঁড়িয়ে থাকিস নির্বিকার?
তোর কণ্ঠ থেকে যাঞ্চা ঝরে না এক ফোঁটা,
হাত দুটো বুকের ওপরেই থাকে আড়াআড়ি।
যদি এতই অহংকারী, তবে কেন আমার মতো নৈরাশ
মুখে নিয়ে অপেক্ষা করিস এখানে প্রতিদিন?

জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি সবিস্ময়ে—
রৌদ্র পোড়ায় তাকে, বৃষ্টি করায় স্নান।
শত শত মাকড়সা ওকে ঘিরে বুনতে থাকে জাল,
কোত্থেকে উন্মাতাল এক জেব্রা ছুটে এসে
প্রবেশ করে ঊর্ণাজালে। উন্মাদের স্মৃতির মতো
ছিন্নবিচ্ছিন্ন জাল ঝুলতে থাকে তার চোখে-মুখে
ওষ্ঠে, হাতে, গ্রীবায় আর একা সে দাঁড়ানো
পুরাকালের শিলীভূত যোদ্ধার মতো।
যত তাড়াতে চাই, তত তীব্র দাঁড়িয়ে থাকে, অনড়।

আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই সে নেই।

আমার মুখস্থ হয়ে গেছে

আমার মুখস্থ হয়ে গেছে ধুলো, নুড়ি, ঝরা পাতা।
আজকাল বড় নত হয়ে চলি, মাথা
তোলা দায়। পোড়া মানব মাংসের গন্ধ শুঁকে শুঁকে

ক্লান্ত, শুতে যাই, অভ্যাসের দাস, ধুঁকে
ধুঁকে কোণঠাসা আর্ত পশুর মতন শুধু কাটাই সময়
আর বুলেটের গর্তময়
দেয়ালের মতো আকাশের দিকে চেয়ে থাকি, ঘুম
আসে না কিছুতে, পাড়া বেজায় নিঝুম।

কিছুক্ষণ

দূরে বা কাছেই
মৃত্যু তো আছেই
ওত পেতে, ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তোমার চোখের
পাতার কম্পন কিছুক্ষণ দেখে নিই এ শোকের
ব্যাপক প্রহরে।
দেখে নিই নিস্তব্ধতা অধিকৃত ঘরে
তোমার হাতের নাড়া চায়ের সময়,
কখনো বলি না প্রিয় কোনো কথা আমাদের, দেয়ালের ভয়।
এখনও বিস্কুটে দাঁত বসাই, চায়ের কাপে খুব চুক চুক
দিচ্ছি তো চুমুক।
কখনোবা কালো এক ফোঁটা চোখের জলের মতো মনে হয়
এই লোকালয়।

মর্সিয়া

নিমেষেই প্রকৃতি ও মানুষের চোখ মুখ সুনসান, সিয়া,
চোখের, গাছের পাতা লতাগুল্ম কী ব্যাপক গাইছে মর্সিয়া!

চাঁদ

ভেবেছিলাম সে, চাঁদ, অভিমানী কৃষকের মতো
আর ফিরে আসবে না আকাশের মাঠে।
যে-দেশে একদা অবিরত
বয়ে গেছে রক্তস্রোত, হয়েছে নারীর চোখ নদী; গোঠে, হাটে
আর পথে ঘাটে
লাশের গম্বুজ আর যে-দেশে মৃত্যুর লোভী ফাঁদ

ছিল পাতা প্রতি ইঞ্চি মাটিতে, শবের রিক্ত হাত
পৌঁছেছিল নীলিমায়, সেখানে আসবে কেন চাঁদ?
তবু এলো শহীদের বুকের গর্তের মতো চাঁদ, এলো রাত
নিয়ে, নির্বিকার; তার ঠোঁট থেকে অবিরাম ঝরছে বিষাদ।

মধ্যরাতে

পুরোনো দেয়াল ঘড়ি আওড়ায় গাঢ় মধ্যরাত,
মধ্যরাত শিরাপুঞ্জে বোনে সুর, যেনবা সরোদ
ঝংকৃত গুণীর হাতে। তন্দ্রার চুম্বন চোখে, হাত
থেকে আস্তে খসে যায় আক্ষরিক দান্তের নরক।
আমি কি হারাচ্ছি পথ মধ্যপথে? হায়রে নির্বোধ,
কেন তুই নিশীথকে করিস বিশ্বাস? কেন তোর
ঘরে এত মৃত গাংচিলের ভিড়? এ কেমন ঘোর
সত্তাময়? নিষ্প্রদীপ হৃদয়ের জটিল সড়ক।

অকস্মাৎ দেখি, গাংচিলের স্তূপ ফুঁড়ে তুমি এই
মধ্যরাতে অন্ধকার ঘরে এলে, আমি অনশনে
কম্পমান; রাত্রি-রাত্রি গন্ধ সারা শরীরে তোমার–
চোখে জ্যোৎস্নাপায়ী ট্রেঞ্চ, সেতু, বাগানের ফলভার
এবং নির্জন পথ। ছুটে যাই, বাঁধি আলিঙ্গনে,
ওষ্ঠের শিশির নিই। তারপর নেই, তুমি নেই।

বিচ্ছেদ

কোনো কোনো দিন
গভীর রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে, প্রায়শই ভাঙে আজকাল,
নিজেকে ভীষণ একা লাগে। যেন আমি
প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে অত্যন্ত ভেতর থেকে জেগে
প্রথম দেখছি পৃথিবীকে।

'কে তুমি এখানে এই আঁধার নিবাসে ব'সে আছ',–
নিজেকেই প্রশ্ন করে খুব
বিচলিত হই। কাকে যেন ডেকে ডেকে

হৃদয়ের গলা ফেটে যায়, রক্তস্রোতে
আকাঙ্ক্ষার নৌকাডুবি বারংবার। অকস্মাৎ স্মৃতি,
প্রধান ফোয়ারা বুঝি এভেন্যুর, উচ্ছ্বসিত হয়! পলাতক
স্বপ্নেরা কখনো দূরে শূন্য উঠোনের
বৃষ্টিজালে ধরা-পড়া মাছ,
কখনোবা ধাবমান ঘোড়ার কেশরে মুক্তোমালা।

কেবলি বাড়াই হাত জাল আর কেশরের দিকে,
হাত ঝুলে থাকে
ফাঁসির মঞ্চের কোনো মৃতের জিভের মতো। কেউ,
মনে হয়, ছোরা থেকে নিচ্ছে মুছে রক্তের চিৎকার,
নিচ্ছে ধুয়ে অস্থিরতা বৃষ্টির গহন
জলে; ধু-ধু অন্ধকারে আমার কেবল ব'সে থাকা, চেয়ে থাকা,
কেউবা বিচ্ছেদ শব্দটিকে ঠেলে দেয়
আমার জানালা দিয়ে।

সারা রাত একা
জানালার চোখ থেকে টপকে টপকে পড়ে জল।

ভোট দেব

তোমার ভোটাধিকার আছে বলে ক'জন নিঝুম প্রজাপতি
ক্যানভাসারের মতো উড়ে যায় গহন দুপুরে
আমার চুলের গুচ্ছ ছুঁয়ে, কান ছুঁয়ে।

ব্যালটবাক্সের গায়ে বহুবর্ণ স্বপ্নের কামিজ ঢিলেঢালা,
নানান প্রতীক ওড়ে চতুর্দিকে। স্বর্ণকণ্ঠ পাখিরা এখন
কেবলি স্লোগান গায়, পরীদের নাচ জমে ওঠে
বেবাক ব্যালটবাক্স ঘিরে। ভোট দিন ভোট দিন
বলে দেবদূত কতিপয় পা দোলান দূরে অলীক কার্নিশে!

সহসা বিলোন তারা রঙিন পুস্তিকা, ম্যানিফেস্টো;
করি না কখনো পাঠ। সেসব কাগজ, মনে হয়,
নীলিমায় উড়ে যাওয়া ভালো;
ওরা মেঘে গেলে পাবে ভিন্ন অবয়ব,
কিছুটা সত্যতা পেতে পারে।

কতবার ভোটকেন্দ্র ছেড়ে আমি
এসেছি নিজের খুব কাছে ফিরে, পা মেলে আপন
হৃদয়ে একলা চত্বরে,
নতুন প্যাকেট থেকে তাজা সিগারেট বের করে
খানিক ভেবেছি কারো কথা, ধোঁয়া ছেড়ে
ভেসেছি সমুদ্রে হোমারের আর যেহেতু ইউলিসিস নই,
এসেছি আবার ফিরে জীর্ণ ঘরে মশার গুঞ্জনে,
স্বপ্নের চিবুক ধরে শুয়ে থাকি, কখনো চেয়ারে ঢুলি আর
অকস্মাৎ তড়িঘড়ি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চাই বলে করি পায়চারি ঘরময়।
কখনো আমাকে ক্ষিপ্র শোঁকে স্বপ্ন, যেমন শশক লতাগুল্ম।

তবু আমি ভোটকেন্দ্রে যাব, বসব সহাস্য মুখে
নতুন কাপড়-ঘেরা এলাকায় প্রীত ম্যাজিশিয়ানের মতো,
হঠাৎ উড়িয়ে দেব রুমাল, পায়রা।
ব্যালট পেপারে খুব ঝুঁকে
আমি ভালোবাসাকেই ভোট দিয়ে ঘরে
কিংবা পার্কে যাব শিস বাজাতে বাজাতে।

সে এক খননকারী

একমনে সে খুঁড়তে থাকে, খুঁড়তে থাকে মাটি।
অমন করে কেন যে সে অষ্টপ্রহর
খুঁড়ছে মাটি একা একা,
কেউ জানে না।
একমনে সে খুঁড়তে থাকে, খুঁড়তে থাকে মাটি।

মাঝে-মধ্যে কান পাতে সে মাটির অনেক নিচে
শোনার মতো গল্প কিছু আছে নাকি?
পোকামাকড়, হাড়ের গুঁড়ো
বলবে কিছু?
যখন তখন ওকে ঘিরে দাঁড়ায় এসে ওরা।

নখ দিয়ে তার মাটি খোঁড়া দ্যাখে সবিস্ময়ে।
অমন করে ক'হাত মাটি খুঁড়লে মেলে
খুব-লুকোনো স্মৃতিকণা?
কেইবা জানে?

কাউকে তুলে আনবে সেকি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে?

রোদকে বাজায় দশ আঙুলে পুশিদা এক সুরে।
শেকড়-বাকড় উপড়ে ফেলে, পা মেলে দ্যায়
অনেক দূরে– যেন সে ঐ
আকাশ ছোঁবে।
জ্যোৎস্না চেটে নেয় তুলে সে রাতের শরীর থেকে।

ছায়ার ভেতর ছায়া হয়ে লুকিয়ে থাকে একা।
হঠাৎ কখন ছায়া ঝেড়ে নোংরা নখে
কিসের ঘোরে খুঁড়তে থাকে
শক্ত মাটি।
ছায়ার ভেতর ছায়া খোঁড়ে, কেমন খননকারী?

কখন আবার খুঁড়তে থাকে অক্ষিগোলক দুটি,
খুঁড়তে থাকে নিজের রুক্ষ বুকের পাঁজর,
খুঁড়তে থাকে শরীরটাকে।
কেউ জানে না।
গভীরভাবে নিজেকে সে খুঁড়তে থাকে শুধু।

আমার লোহিত ম্যান্ডোলিন

স্বপ্নের গহন লোকালয়ে একা হেঁটে যেতে যেতে
সেই কবে আমি পেয়েছিলাম একটি ম্যান্ডোলিন।
গভীর সোনালি ঝোপ থেকে রাজহাঁসের মতন
বাড়িয়ে নিস্তব্ধ গ্রীবা এসেছিল আমার নিকটে–
আমার আঙুলে চুমো খেয়ে একরাশ রইল ঝুলে
নিভৃত গলায় স্বপ্ন এবং অশ্রুত সুর নিয়ে।
কখনো বাজাই ওকে ভয়ে-ভয়ে, যেমন নিঃসঙ্গ
কেউ বন্দিনিবাসে বাজায় সুর খুব সাবধানে।

যখন পাখির রক্তে অজস্র বুদ্বুদ গান গায়,
সহসা ফুলের গন্ধে যখন ধুলায় প'ড়ে-থাকা
অত্যন্ত নীরব হাড় বেহালার আদল নিজেই
পেতে চায় অথবা যখন কোনো একাকী কুকুর
ডাগর চাঁদের দিকে মুখ তুলে প্রায় ভবঘুরে
প্রেমিকের মতো করে প্রহর যাপন, ম্যান্ডোলিন

দেয়ালের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে অন্য স্বপ্নে ডোবে,
রাত্রিকে পরায় কত সুরময় স্বপ্নিল কাতান।

যমজ ভায়ের মতো আমরা দু'জন সর্বদাই
আছি কাছাকাছি, অবিচ্ছিন্ন, আমি আর
আমার লোহিত ম্যান্ডোলিন। প্রহরে প্রহরে বাজে
সত্তা তার, সুরে কোন ভূগর্ভস্থ নগরের মৃত
কলরব, কোনো খ্রিস্টপূর্ব শতকের সুন্দরীর
সোনালি শরীর, দীর্ঘশ্বাস, খনি আর টানেলের
অন্ধকার, জাহাজের ভগ্নাংশ এবং পথরেখা
জেগে ওঠে; কখনোবা বর্তমান বাজে ম্যান্ডোলিনে।

কোনো কোনো শেষ রাতে প্রেমিকার ছায়ার মতন
একটি নিঃশব্দ সুর আমাকে মাতিয়ে রাখে খুব,
এখন সে দূরবর্তী গাছের আড়ালে যেন ক্লান্ত
ডোরাকাটা চাঁদ, চাঁদ অকস্মাৎ নামে ম্যান্ডোলিনে,
নাচে তারে তারে, কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, বারে বারে
বিহ্বল আমাকে নিয়ে যায় জনশূন্য এভেন্যুতে।
দেখি স্তব্ধ চৌরাস্তায় এক অলৌকিক অর্কেস্ট্রায়
বাজিয়ে চলেছি আমি আমার লোহিত ম্যান্ডোলিন।

তবে কি এখন আমি অন্তরাগে মাতাল বাদক?
আহত এ-যুগ ঘন ঘন ছুড়ছে পা যন্ত্রণায়,
কষে ফেনা, চোখে তার দুঃস্বপ্নের ক্রূর ঊর্ণাজাল
এবং সেবার্থে তার আসে দলে দলে অন্ধ নার্স
চতুর্দিক থেকে–কালো, সাদা, পীত, বাদামি; একাকী
আমি ছুটি দিগ্বিদিক, কখনোবা ভাবি ক্লান্ত মনে–
আগুন লাগুক বনে, নামুক ব্যাপক ধস পথে,
আমৃত্যু আমাকে ম্যান্ডোলিনে তুলতে হবে সুর।

তুই চোখে বন্ধ কর

তবে কি আমার চক্ষুদ্বয় বাস্তবিক অপরাধী?
কী লাভ দৃষ্টি খুঁত খুঁজে? আমি তো সৌন্দর্যবাদী,
অনাবাদী জমিনের স্তরে স্তরে ফুলের বিকাশ
সৃষ্টি করে নিই আর দীপ্র রক্ত-মাংসের উচ্ছ্বাস

দেখি কঙ্কালের কড়ি-সাদা হাড়ে। শবব্যবচ্ছেদ
করে যে নিকটে আসে তার সঙ্গে এ্যাপোলোর ভেদ
সহজে পাই না খুঁজে মাঝে মাঝে। আমার দু'চোখে
নাকি বড় বেশি ব্যাকুলতা খেলা করে, বলে লোকে।

বলো তো তোমরা কেন আমার চোখের অপরাধ
সর্বদা মুখস্থ করো? কেন শুধু বাধাও বিবাদ
আমার বোধের সঙ্গে? আমি গাছের ভিতরে গাছ
স্তনের আড়ালে ভিন্ন স্তন মাছের ভেতরে মাছ
দেখি বলে আমার এ চক্ষুদ্বয় অপরাধী আখ্যা
পায়, তবু রাত্রিময় সুনসান শ্মশানও কামাখ্যা
আমার দৃষ্টিতে আর কারো ঊরুভেজা ভেনাসের
সামুদ্রিক ঘ্রাণমাখা ঊরু। দৃশ্য দেখি বিনাশের।
যে মুখে সকাল মগ্ন, অপরাহ্ণ সঙ্গীতমুখর,
রাত্রির নিঃশ্বাস বহমান, তার দিকে থরথর
হৃদয়ে প্রখর চেয়ে থাকি, বুঝি পড়লে পলক
দেখব না তাকে আর। অতীতের রুপোলি ঝলক,
বর্তমান, ভবিষ্যৎ চোখের সবুজে কম্পমান,
কবেকার একাকিনী স্রোত বয়ে যায় খরশান
আমার শরীর ছুঁয়ে, আমি হই নদী, ধু-ধু মাঠ;
কখনোবা পিপাসায় নিজের নিয়তি করি পাঠ
আমার চোখের নিচে জ্বলজ্বলে চোখের ভিতরে,
এবং কদম ফোটে সত্তার নিভৃত স্তরে স্তরে।

বাড়িকে ব্যথিত দেখি, পথকে প্রফুল্ল অতিশয়,
সুসময় ব্যেপে এলে, উৎসবের দীপাবলি নয়,
দেখি দুঃসময় দরজার কাছে রয়েছে দাঁড়িয়ে
ব্যগ্র অতিথির মতো। গেরস্থালি দেবে সে নাড়িয়ে।
যে আমার সঙ্গে থাকে অথবা থাকে না, দূরে থাকে,
যদি সে লুকায় মেঘে, গাছের ভিতরে, তবু তাকে
অক্লেশে দেখতে পাব— এই তো চোখের অপরাধ।
বুঝি তাই ওরা বলাবলি করে, লোকটা উন্মাদ।

সহজেই বাড়ে নিত্য আমার এ দেখার ভুবন—
দেখি কারো ধু-ধু জন্ম জন্মান্তরব্যাপী অনশন
অহর্নিশ জ্বলে সত্তাময়, কেউ দেয়ালে পেরেকে

ভীষণ রক্তাক্ত সাঁটা, কেউ কেউ স্বপ্ন ব্যতিরেকে
ঘোরে পথে বিপথে এবং সামনে তার ভগ্ন সেতু
দেখে কেঁপে ওঠে বারংবার। আমার দৃষ্টির হেতু
হয় না কারুর ক্ষতি। তাহলে একটি কণ্ঠস্বর
কেবলি আবৃত্তি করে কেন 'তুই চোখ বন্ধ কর?'

কবির ঘর

(বেগম সুফিয়া কামালকে নিবেদিত)

বিনীত শোভিত ঘর, সামান্যই আসবাবপত্র, কতিপয়
ফটোগ্রাফ দেয়ালে, টেবিলে,
দেয়ালে সর্বদা জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষ।
ঘরময় পেলব বেড়াল
করে আনাগোনা,
কখনো ঘুমিয়ে থাকে এক কোণে শব্দহীন ট্রানজিস্টারের
মতো একা, আলস্যের স্তূপ।
ঘরের অত্যন্ত অভ্যন্তরে প্রায়শই মধ্যরাতে
কে যেন বাজায় এক করুণ বেহালা,
মধ্যরাত ঝরে তার হৃদয়ের নিঝুম চাতালে।

কোনো কোনো দিন
অতিথি আসেন কেউ কেউ,
দেশী কি বিদেশী; কেউ চুপচাপ চেয়ারে থাকেন ব'সে, দৃষ্টি
বুলোন চাদ্দিকে, যেন কোনো পুরাকীর্তি
দেখার উদ্দেশ্যে এসেছেন খুব দূর দেশ থেকে,
কেউবা করেন প্রশ্ন খুঁটিনাটি, কেউ কেউ তাঁর
সত্তায় সন্ধানী চোখ রেখে জেনে নিতে চান বুঝি
একটি যুগের সূর্যোদয়, অস্তরাগ।

জননীর হৃদয়ের মতো ঘর, প্লুত নিরালায়,
সেখানে থাকেন কবি। মেঝেতে লুটিয়ে-পড়া রোদ,
জানালার জ্যোৎস্না তিনি করেন সেলাই
খাতার পাতায়, অকস্মাৎ কেউ তার মুখ দেখে
চমকে উঠতে পারে– দীর্ঘ তপঃক্লেশে চক্ষুদ্বয়
ওষ্ঠ, নাক এবং চিবুক বুঝি এরকমই হয়। অন্তর্গত

দহন পায় না কেউ টের, দ্যাখে তিনি কী নির্মল

হাসেন, বলেন কথা আনন্দ ছড়িয়ে চতুষ্পার্শ্বে।
অবশ্য কাঁদেন কোনো কোনো রাতে অন্তরালে বিছানায় শুয়ে
ভীষণ একাকী।
তাঁর প্রতি আছে বনবাদাড় পাহাড় চিতাবাঘ আর তৃষিত হরিণ,
দিনের এ্যাভেন্যু আর রাত্রির কলোনি আর রজনীগন্ধার সমর্থন।
কখনো নিজের ঘরে নিজেই অতিথি, যেন এই
প্রথম এলেন, গল্পগুজবের শেষে
তাহলে বিদায় বলে বাগান পেরিয়ে হেঁটে হেঁটে
নিঃশব্দে যাবেন চলে কে জানে কোথায়।
কখনো দ্যাখেন তিনি ঘরের দেয়ালে একজন
সুদূর কিশোরী ঘন ঘন পা দোলায় খাটে ব'সে,
কুয়োতলা নিমজ্জিত কুয়াশায়, সাঁঝবাতি গভীর ইশারা;
কখনোবা কারো স্মিত শরীরেব প্রথম বানারসী জ্বলে, যেন
সূর্যোদয়; দ্যাখেন কোত্থেকে
সহসা একটি ঘোড়া ঢুকে পড়ে ঘরে তার মেঝেতে পা ঠুকে
ঠুকে খুব সহজেই জাগায় ঝরনার গান, বনস্থলী। নুড়ি
গড়াতে গড়াতে সুপ্রাচীন মুদ্রা হয়, মুদ্রা শিল্পীর আঙুল;
ক্ষেতের আইল জাগে ঘরে, জাগে চৌরাস্তা, মিছিল—
কবির সামান্য ঘর নিমেষেই সারা বাংলাদেশ হয়ে যায়!

ছায়ায় যেও না মিশে

পিছনে তাকানো মানা। যতক্ষণ এই পাতালের
হিম অন্ধকারে আছি, পারব না তাকাতে কখনো
তোমার মুখের দিকে। যদি তুমি আগুনের তাপে
নিমেষে মোমের পুতুলের মতো গলে যাও কিংবা
উবে যাও অকস্মাৎ, তবু দৃষ্টি অন্য কোনো দিকে
নিবদ্ধ রাখতে হবে। গলায় ঝুলবে ম্যান্ডোলিন।

পেরিয়ে এসেছি বহু দীর্ঘ পথ, পায়ে বহু ক্ষত,
তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই সাবলীল
শুকোবে এ ক্ষত, মুছে যাবে নৈরাশের রেখাবলি।
তোমার শরীর থেকে শীতল কুয়াশা ঝেড়ে ফেলে
তুমি এসো, তুমি এসো দীপ্র রাজহাঁসের মতন।

ভয় নেই, তাকাব না। কিছুতেই ফিরে তাকাব না।

আমাকে চিনতে পারছ না? তাহলে কি পাতালের
ছায়ায় পড়েছে ঢাকা আমার একান্ত পরিচয়?
আমার হাতে কি তুমি দেখতে পাওনি ম্যান্ডোলিন?
এখনও তুলতে পারি কত সুর ব্যাকুল আঙুলে,
সেই সুর শুনে পাখি এখনও সান্নিধ্যে আসে, নুড়ি
গড়াতে গড়াতে চলে আসে কাছে, পশুরা হিংস্রতা
ভুলে যায় নিমেষেই। শোনো, আমি ম্যান্ডোলিনে সুর
তুলে সব নরখাদককে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি,
সব প্রহরীর দৃষ্টিপথে তৈরি করে মায়াপুরী
এখানে এসেছি এই অন্ধকার নীরক্ত মণ্ডলে।
কিন্তু তুমি দূরে সরে যাচ্ছ কেন এরকমভাবে?
তবে কি তোমাকে দেখে ফেলেছি হঠাৎ পুনরায়?

তবে কি আবার লোভী হয়ে গেছি ক্ষয়িষ্ণু বেলায়?
ফিরে এসো, আর ফিরে তাকাব না; আমার নিকটে
ফিরে এসো; দেখে নিও, আমি হেঁটে যাব ধু-ধু পথে,
নগ্ন প্রান্তরের ধার ঘেঁষে ম্যান্ডোলিনে সময়কে
বাজাতে বাজাতে যাব অত্যন্ত একাকী। ফিরে এসো,
ছায়ায় যেও না মিশে, আমার হবে না আর ভুল।

নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি

হে নিশীথ, আজ আমি কিছুই করতে পারব না।
বই পড়া, চিঠি লেখা অথবা বন্ধুর পাশে ব'সে
নিবিড় আলাপ– আজ কিছুই হবে না। সারা রাত
নির্ঘুম কাটবে অতিশয়; আমি কি অসুস্থ তবে?

থার্মোমিটারের নেই প্রয়োজন; যদিও শরীর
পুড়ে যাচ্ছে তাপে, তবু নেবু পানি, বার্লি, তপ্ত জল
কমলালেবুর রস চাই না কিছুই আজ রাতে।
কোমল অনল আমি পান করে এসেছি এক্ষুণি।

আমার সম্মুখে ছিল একরাশ মদির স্নিগ্ধতা,
তবে আমি মিছেমিছি অনলের কথা কেন বলি?
রজনীগন্ধা কি আগুনের রেণু শিরায় শিরায়
তুমুল ছড়াতে পারে এই মতো, হে নিশীথ, বলো?

ঘর কি সমুদ্র হতে পারে? নইলে কী করে সেখানে
সহজেই আফ্রোদিতি আসে তার সমস্ত শরীরে
স্বপ্নের মতন ফেনা নিয়ে? যখন সে এলো ভেসে,
ঘরের দেয়াল মুছে গেল; গেল উবে আসবাব।

এ কাকে দেখেছি আমি? এত চেনা, তবুও কেমন
সুদূর অচেনা; তার কণ্ঠস্বরে কথা নয়, ঝরে
স্মৃতি, স্মৃতি গান হয় স্তব্ধতায়। সহসা বিদায়,
যেন স্বপ্ন জাতক্রোধে ছুড়ে দেয় ধুলায় আমাকে।

ব্যর্থ মানুষের মতো চেয়ে থাকি, ঘরের দেয়াল
ফিরে আসে, দেখি ঠিক মাথার ওপরে আছে ছাদ।
এ্যাশট্রেতে পোড়া সিগারেট, তার সত্তার সৌরভ
ঘরে, সে মুহূর্তে বন্ধ হতে পারত হৃদয়স্পন্দন।

আমি একজন রাগী মানুষের মতো আকাশকে
সে মুহূর্তে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলতে চেয়েছি। সূর্যাস্তকে
চেটেপুটে সাফ করে দিতে লাগে কতক্ষণ বলে
সেদিকেই দৌড়ে গেছি, দৌড়ুতে দৌড়ুতে ক্লান্ত বড়।

হে নিশীথ, আজ আমি কিছুই করতে পারব না।
আমার মগজে ফণিমনসার বন বেড়ে ওঠে,–
দেখি আমি পড়ে আছি যুদ্ধ-ধ্বস্ত পথে কী একাকী;
ভীষণ আহত আমি, নেকড়ের মুখে আফ্রোদিতি!

যখন টেবিলে ঝুঁকে থাকি

যখন টেবিলে ঝুঁকে থাকি,
একটি নির্জন দীর্ঘশ্বাস, যেন ক্লান্ত পথচারী কোনো
আমার ঘাড়ের ধু-ধু একাকী প্রান্তরে
আস্তেসুস্থে ছড়ায় তুষার।

যখন টেবিলে ঝুঁকে থাকি,
একটি সোনালি সিংহ, তার চকচকে কেশর-দোলানো স্ফীত
গলায় ফুলের মালা, আসে দেয়ালের পলেস্তারা ফুঁড়ে, মুখ
থেকে ব্যাঞ্জো, রত্নরাজি, প্রেমিকের দীপ্র চোখ, সুন্দরীর মুখ বের করে।
যখন টেবিলে ঝুঁকে থাকি,

আমার আপন ঘরে সহসা প্ল্যাটোর গুহা জাগে;
গুহায় অনেক ছায়া, কম্পমান, গুহাগাত্রে একজন তার
আধপোড়া সিগারেট চেপে ধরে, কেউবা ঝোলায় পাণ্ডুলিপি।

যখন টেবিলে ঝুঁকে থাকি,
স্বপ্নের সবুজ লনে চারজন নিপুণ খেলোয়াড়
টেনিস বলের সাথে ঘন ঘন লাফিয়ে বেড়ায়,
র‍্যাকেট বাদামি ভায়োলিন হয়ে শূন্যে নেচে ওঠে বারংবার।

যখন টেবিলে ঝুঁকে থাকি,
এ্যালবাম থেকে কিছু ফটোগ্রাফ প্রবল বেরিয়ে দৃষ্টিপথে
কয়েকটি মুখ হয়। একজন বলে, 'আমি দুঃখ হয়ে পুড়েছি সর্বদা',
'আমি যন্ত্রণাকে ছুটি দিয়েছি দিঘিতে সন্ধেবেলা', বলে অন্যজন।

যখন টেবিলে ঝুঁকে থাকি,
টেলিফোন দেয়ালের সঙ্গে কথা বলে, বই নৈঃসঙ্গের সাথে,
নিশীথের সাথে চক্ষুদ্বয়। কোত্থেকে কেমন পাখি এসে বলে–
আমি তো তোমার নই, কারো নই, পুনরায় স্বপ্নের চিতায় চলে যাব।

যখন টেবিলে ঝুঁকে থাকি,
সংবাদপত্রের রাশি রাশি কালো অক্ষর ছাপিয়ে
আট কলামের পরপারে কতিপয় শীর্ণ মুখ, শূন্য থালা,
প'ড়ে থাকে; ছাদ গুলিবিদ্ধ মানুষের মতো করে আর্তনাদ।

যখন টেবিলে ঝুঁকে থাকি,
পৃথিবীর মানচিত্র পর্দার মতন ঝোলে জানালায়,
সাবমেরিনের চূড়ো মেঝেতে চকিতে দেখা দেয়,
আমার সম্মুখে ব'সে চুরুট ফোঁকেন তেরোজন রাষ্ট্রদূত।

যখন টেবিলে ঝুঁকে থাকি,
সকালবেলার মতো কারো হাত, যমজ সোনালি
আপেল এবং টেলিফোন, প্রজাপতি, ফটোগ্রাফ, আসবাব
গান গায়, গান গায় কবিতার জাগ্রত পঙ্‌ক্তির কানে কানে।

দীর্ঘশ্বাস

শরীরের কত ধুলো লাগলে, কত কাঁটা বিঁধলে পায়ে
একটি দীর্ঘশ্বাসের জন্ম হয়?

একটি দীর্ঘশ্বাস খুব বেশি
দীর্ঘ নয়, নিমেষেই শেষ হয়; অথচ তার জন্মলগ্ন
অতিশয় ইতিহাসময়। বিন্দু বিন্দু। বিষ ঝরে কণ্ঠনালিতে,
মোহন আগ্রহে তুমি হাত বাড়ালে
যার জন্যে, সে হারিয়ে গেল কুয়াশায়,
ভাবলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনোমতে
আরেকটু এগোলেই নেচে উঠবে প্রস্রবণ, কিন্তু
পদযুগ রক্তাক্ত করে সেখানে পৌঁছে দেখলে
ধুলোর পাহাড় ছাড়া কিছুই নেই;
এ রকম মুহূর্তেই একটি দীর্ঘশ্বাসের জন্ম হয়।

কতবার তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছ?
কতবার তোমার হৃদয়ে ঝাঁক ঝাঁক টিয়ের মৃত্যু হয়েছে?
তোমার মগজের ফুলের কেয়ারি শুকিয়ে গিয়েছে কতবার?
কতবার তোমার আকাঙ্ক্ষা করেছে আত্মহত্যা?
কতবার তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছ, কতবার?

যখন কোনো ঠোঁটের দিকে তোমার ওষ্ঠ যাত্রা করে,
পায় শুধু শূন্যতা,
যখন প্রতীক্ষার মুহূর্ত ফুরোতে না ফুরোতেই
গোধূলির মতো বিদায়বেলা এসে যায়,
'আবার হবে কি দেখা?'—এই নগ্ন ব্যাকুলতা
আবৃত্তি করেও যখন কোনো
স্পষ্ট উত্তর মেলে না,
যখন এক গা ধুলো নিয়ে, উষ্কখুষ্ক চুল আর
ভীষণ তৃষ্ণার্ত চোখ নিয়ে এসে দ্যাখো সে আসেনি,
তখন তোমার সত্তাময় কী শীতল দীর্ঘশ্বাস বয়।

স্বপ্নের খোয়ারি

এভাবে ফিরিয়ে দেবে যদি তবে কেন ডেকেছিলে
সবুজ পাতার কাছে, লাল পথে, ধু-ধু মাঠে, ঝিলে?
মোহন ইঙ্গিতে নৈসর্গিক রেস্তোরাঁয়, নদীতীরে
কেন নিয়ে গেলে বাসস্টপে, পশু-পাখিদের ভিড়ে?
হাতে তুলে দিয়ে পাত্র পানীয় ধুলায় দিলে ফেলে,
বলো এ কেমন আতিথেয়তা তোমার চিরকেলে?

দিয়েছ আসন পেতে মেঘে মেঘে বারংবার,
ঘুরেছি দু'জন একসঙ্গে নিরিবিলি বনে আর
মধ্যাহ্নে গাছের নিচে তোমার দু'চোখে নিমজ্জিত
খেলেছি স্বপ্নের ঘরে এক্কাদোক্কা। ঝিল গেছে বেঁকে
বহু দূরে, বুঝি বনস্থলীর সহিত আছে তার
কিছু কথা; স্বপ্নস্থিত কারুকাজে এ বন-বাদাড়

জলের নিচের পুরী, শ্বেত প্রজাপতি, পাখিগুলি
ধাতুর সামগ্রী হয়। অবচেতনার ঘুলঘুলি
চোখ মেলে, পুষ্প গর্ভে অকস্মাৎ অত্যন্ত শানদার
দৃশ্যাবলি, পরক্ষণে সব কিছু কেমন আন্ধার
এবং নিজেকে একা ভীষণ বুরবক লাগে, ভাবি–
এই অবেলায় আমি কোথায় জানাব কোন দাবি?

তাহলে ফিরেই যাব? নাকি এই অদ্ভুত শহরে
কেবলি তোমার খোঁজে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হবো, ঘরে
ফিরব না যথারীতি। যত্রতত্র চালচুলোহীন
থাকব একাকী খুব আর রৌদ্রবিহারের দিন
কোথায় লুকাল মুখ বলে মধ্যরাতে মাঝে-মাঝে
জীর্ণ জব্দ গাড়ি করব মেরামত স্বপ্নের গ্যারাজে।

এই তো ঘুরছে চাকা, কত পাখপাখালি সমেত,
ঘুরছে আমার হাত, ফসল নিবিড় শস্যক্ষেত,
পথের গায়ক আর ফুটপাত। মেট্রোপলিটন
শহরের চৌরাস্তায় একটি অসুস্থ ঘোড়া কোন
স্বপ্নের খোয়ারি নিয়ে থমকে দাঁড়ায় অকস্মাৎ?
স্টেডিয়াম, পার্ক, পথ, সবই তোমার সোনালি হাত।

কমলা রঙের ঘোড়া

আমি তো তুখোড় কোনো জকি নই, অথবা সহিসও নই, তবু
কমলা রঙের ঘোড়া কেশরের গৌরব দুলিয়ে
আমার চান্দিকে ঘোরে দুলকি চালে, কখনো হঠাৎ
কোথায় যে চলে যায়, বোঝা দায়। পুনরায় আমার নিকটে
ছুটে আসে স্বেদসিক্ত শরীরের এবং গ্রীবা কবিতার পঙ্ক্তির মতন
সমুখে বাড়িয়ে দেয় আদর কুড়াতে।

সে কবে কোত্থেকে এই কলা রঙের দীপ্র ঘোড়া এসেছিল
আমার নিকটে, বলা মুশকিল। এসেছিল, বলা যেতে পারে,
পথ ভুলে গোধূলিতে দুলে দুলে, যেন মেঘ। তারপর আস্তাবলহীন
কাটিয়েছে বহু দিনরাত্রি খোলা আকাশের নিচে, নক্ষত্রের
স্পন্দন করেছে অনুভব চোখে, পেশির ভেতরে, স্তরে স্তরে।
আমাকে যায়নি ছেড়ে কোনো দিন কমলা রঙের এই ঘোড়া।

রৌদ্রে তাকে নিয়ে যাই প্রতিদিন, কখনো নিজেই যায় আর
গড়ায় দবিজ ঘাসে, খুশি ঝরে সত্তা থেকে, বুঝি
সবুজের স্পর্শে তার ঘরে রূপান্তর– তখন সে ঘোড়া নয়,
নিঃসঙ্গ দেবতা কোনো, স্বর্গচ্যুত ক্রীড়াপরায়ণ।
রাত্তিরে বাজিয়ে ব্যাঞ্জো কাছে ডাকি তাকে, নিরিবিলি
সে আসে, ঘুমায়, স্বপ্ন দ্যাখে অভ্রময় গূঢ় শিল্পিত ক্ষেতের।

কমলা রঙের ঘোড়া নর্তকের মতো ভঙ্গিতে কখনো ঘোরে
আশেপাশে, অকস্মাৎ দেয় লাফ, কম্পমান প্রোজ্জ্বল কেশর
অমরত্ব চায়, তার গ্রীবা চায় শারদ ভোরের
নীলিমার মতো শান্তি, চক্ষুদ্বয় বহুদূরে ফেলে-আসা কোনো
উপত্যকা, ঝকঝকে, সঙ্গীত-স্পন্দিত। তার খুর মানবিক
সাঁকো চায়, চায় সাম্য-ঘেরা পূর্ণ গোলাপ বাগান আর স্বপ্নের প্রান্তর।

আমার আপন ঘোড়া– এতদিনে আমারই তো বলা যায়, নাকি
এমন একটি ঘোড়া কারো কখনো হওয়ার নয়?
কমলা রঙের ঘোড়া মাঝে-মধ্যে কবিতার পায়ের কাছেই
মাথা রাখে, যেন মৃত্যুহীন স্বপ্নে মগ্ন। অকস্মাৎ
কখনো ভীতির ফণা দেখে প্রশ্ন করি নিজেকেই–
কমলা রঙের ঘোড়া আমার নিকট থাকবে কি চিরদিন?

কী যেন হাওয়ার মধ্যে আছে

কী যেন হাওয়ার মধ্যে আছে, কী যেন একটা খুব
জীবন্ত, রহস্যময়, প্রাণীর ঘ্রাণের মতো প্রায়।
ভাষা নেই, তবু কিছু বলার আশায় ঘাই মারে
সহসা হাওয়ায় ফের কোথায় হারায় অকস্মাৎ।

যখন নিজেকে মেলে দিই টেলিফোনের ভিতরে,
যখন টেবিলে ঝুঁকে লিখি, বই পড়ি, বিছানায়

শুয়ে-শুয়ে কী তন্ময় অতীত আবৃত্তি করি কিংবা
যখন নিঃসঙ্গ হাঁটি ফুটপাতে, রেস্তোরাঁয় বসি,
হঠাৎ হাওয়ার মধ্যে কী যেন সুতীব্র জেগে ওঠে।
মনে হয়, কারো জিভ চাটছে আমাকে নিরিবিলি,
আমাকে দেখছে কেউ নিকট আড়াল থেকে, যেন
বলবে গোপনে কিছু আমাকেই। আমি উৎকর্ণ,
সে-কথা আকণ্ঠ পান করবে বলে প্রহরে প্রহরে
চকিতে চাতক হয় আমার প্রতিটি রোমকূপ।

কী যেন হাওয়ার মধ্যে আছে, কী যেন একটা গূঢ়
সংকেতের মতো বেজে ওঠে শব্দহীন। দৃশ্যাবলি
সচকিত, নাগরিক নিসর্গবাসরে একজন
নগর পুলিশ হুইসিল তীব্র বাজাতে বাজাতে
ক্লান্ত হয়, স্বপ্নাবেশে দ্যাখে শহরের এ্যানাটমি
গলে গলে পড়ে তার চোখের পাতায়, দ্যাখে দূরে
মৃতের কুচকাওয়াজ, তারপর চক্ষুদ্বয় দ্রুত
কচলাতে কচলাতে জ্যোৎস্নায় নিজের বুট জোড়া
কিঞ্চিৎ পরখ করে। কী যেন হাওয়ার মধ্যে আছে,-
স্পন্দমান ভাষাহীন এক অলীক টেলিপ্রিন্টার!

কী যেন হাওয়ার মধ্যে আছে। পাখিগুলি চিহ্ন হয়ে
জরুরি একটা কিছু আমাকে বোঝাতে চায় বুঝি-
নইলে কেন অবেলায় ওরা উড়ে যায় বারবার?
কেন বৈদ্যুতিক তারে বুক পেতে শীর্ণতা পোহায়?
কী যেন হাওয়ার মধ্যে আছে বলে যত দ্রুত আমি
লোকালয়ে হেঁকে যাই তত কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

নিঃসঙ্গ শেরপা

পর্বতে উঠেই আমি পতাকা উড়িয়ে দেব ঠিক।
আরোহণে কী রকম কৃতী কিংবা আনাড়ি সে-কথা
অবান্তর, আরোহণই মুখ্য শুধু। চূড়ার সন্ধানে
উঠছি পর্বত বেয়ে ক্রামগত। দৃষ্টিতে এখন
বনশোভা নয়, নয় সমতলভূমির নিরালা
সৌন্দর্য অথবা ঘর গেরস্থালি। চক্ষুদ্বয়ে ভাসে
একটি শিখর শুধু দুর্গম শিখর সর্বক্ষণ।

কোনো প্রলোভন আর পারবে না ফেরাতে আমাকে।

মাঝে মাঝে ক্লান্ত লাগে, বড় অসহায়; পদযুগ
ক্ষতময়, তবু পাথরের বুকে লোহা ঠুকে ঠুকে
দড়ি বেয়ে উঠতেই হবে আরও বহুদূরে একা
অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে। অকস্মাৎ কখন যে
নামবে বিরূপ ধস, ভাবি প্রাণক্ষয়ী অবসাদে,
কখনো অকালমৃত শেরপাদের মনে পড়ে যায়।

যদি তুমি আসো

খুব ভোরবেলা উন্মুখ দুটি চোখ মেলে রাখি,
যদি তুমি আসো।
চৈত্র দুপুরে চোখ পুড়ে যায়, তবু চেয়ে থাকি,
যদি তুমি আসো।
কখনো গাছের পাশে গাছ হয়ে দাঁড়াই একাকী,
যদি তুমি আসো।
সন্ধ্যার বুকে হৃদয় আমার ছটফটে পাখি,
যদি তুমি আসো।
অন্ধকারের কেমন আবীর দুটি চোখে মাখি,
যদি তুমি আসো।
মধ্যরাত্রে স্বপ্নের স্বরে বারবার ডাকি,
যদি তুমি আসো।
বস্তুত আমি প্রহরে প্রহরে অনিদ্রা চাখি,
যদি তুমি আসো।
সে কোন গোপন জ্যোৎস্না-ঝালরে নৈরাশ ঢাকি,
যদি তুমি আসো।

যতবার আমি

যতবার আমি আকাশ শব্দটা উচ্চারণ করতে চাই,
কিংবা বৃক্ষ বলে ডাক দিই,
ততবার তোমারই নাম বলে ফেলি।
জানালার বাইরে তাকিয়ে যখন বলতে যাই, হে শহর–
তখনও তোমার নাম বেজে ওঠে আমার কণ্ঠস্বরে।

কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি আউড়ে শান্তি পেতে চাইলে
আমি কেবলি তোমার নাম আবৃত্তি করতে থাকি।
স্বপ্ন, তুমি অকস্মাৎ ফুরিয়ে যাও কেন– এই প্রশ্ন করতে গিয়ে
এই নির্ঘুম রাত্তিরে স্বপ্নে কথা বলার মতো
বারবার জিগ্যেস করি, তুমি কেমন আছ?

আমার ভেতরে এক বাঁশিঅলা

আমার ভেতরে এক বাঁশিঅলা বানিয়েছে তার
আপন নিবাস; সেখানে সে প্রতিদিন কী একাকী
তন্ময় বাজায় বাঁশি যখন তখন। রৌদ্রময়
দারুণ খরায় কিংবা গহন বর্ষায় তোলে সুর–
খুলে যায় অন্তহীন পথ, একাকী কে হাঁটে আর
ইচ্ছে হ'লে পথপ্রান্তে ছায়াকে খোঁচায় বাঁশি দিয়ে।
একজন সঙ্গী আছে তার, স্থূলোদর; মর্চেপড়া
পেরেকের মতো থাকে প'ড়ে এক কোণে কী নিঃসাড়।
যখন সে জেগে ওঠে, হৈ-হুল্লোড় করে বড় বেশি,
খাদ্য পেলে চক্ষুদ্বয় অতিশয় জ্বলজ্বলে হয়
তার, মাঝে-মধ্যে বলে, 'অসীম তৃষ্ণায় বুক ফেটে
যাচ্ছে, দেখছ না।' তার নখ বেড়ে যায় ক্রমাগত;
ঘুমোলে ভীষণ ডাকে নাক। বাঁশিঅলা সঙ্গীটিকে
নিয়ে সর্বক্ষণ খুব বিব্রত বলেই একা একা

পথ হাঁটে। কাক ডাকে, ঝরা পাতা দু'পায়ে মাড়িয়ে
যায় দূরে, যেন তার কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই, যেন
হারাতে হয়নি কিছু কস্মিনকালেও। কানাকড়ি
পাবে না জেনেও স্তব্ধতার গালে গাল রেখে সুর
তোলে, মাঝে-মাঝে মনে পড়ে তার– সঙ্গীটির তীক্ষ্ণ
ক্ষুধা আছে, আছে তৃষ্ণা, আছে নিঃসঙ্গতা অন্তহীন।

অভিযুক্ত আমি

আমার নিজের কাছে কী নগ্ন জবাবদিহি করি
প্রায়শই, যেন আমি কনফেশনপ্রবণ খুব
এবং নিজেই ধর্মযাজক, যেজন অন্তরালে

পাপী-তাপী সকলের গোপন বক্তব্য শুনে ফের
প্রার্থনায় নতজানু। কখনো কখনো মনে হয়,
হত্যাপরায়ণ আমি। কাকে হত্যা করে আশেপাশে
চোখ রেখে ঘুরি একা একা? আমার তো অস্ত্র নেই,
তবু কেন মধ্যরাতে ক্রূর অন্ধকারে শূন্যতায়
বঙ্কিম চাঁদের মতো ছোরা দুলে ওঠে দৃষ্টিপথে
বারংবার? কেন নিদ্রাহীন প'ড়ে থাকি বিছানায়?
কখনোবা আতঙ্কিত পালিয়ে বেড়াই, এমনকি
কুকুর দেখেও ভয়ে লুকাই আড়ালে। আমি কার
হত্যাকারী? দেখেছি কি তাকে কোনো দিন? বলা দায়,
তবু নিজেকেই অভিযুক্ত করে যাই বারবার।

চতুর্দশপদী

একটি পাখির সঙ্গে তার খুব ভাব আছে আর
সে পাখি সর্বদা তাকে কিছু আলো কিছু অন্ধকার
মিশিয়ে শোনায় গান। গানের ভেতরে বসবাস
করে তার দিনরাত্রি বয়ে যায়। কিসের আভাস
সকালবেলার মতো দৃষ্টিপথে; সাপ কি নেউল
কিংবা গিরগিটি অস্তিত্বের কিছু চমক উসুল
করে নেয় তার কাছ থেকে, সে অনেক নিচে থেকে
ওপরে তাকায় বারবার, কখনো বা যায় হেঁকে
শব্দ কতিপয়, বলে– শহরের বুকের ভেতরে
অহর্নিশ জ্বলে প্রেম নিয়ন বাতির মতো, থরে,
থরে কী সাজানো শ্বেতপাথরের শীতল টেবিলে,
বলা মুশকিল; হয়তোবা আকাশের দীপ্র নীলে
অনেক কবর আছে, কবরের পাশে শোকসভা
এবং করোটি ফুঁড়ে প্রবল গায়ক রক্তজবা।

হাহাকারে বন্দি

একটা কেমন সুনীল পাত্র উড়ছে শুধু উড়ছে।
দূরের মেঘে বাস চলে যায়,

অন্তরাগে যাত্রী মেশে।
মেঘে মেঘে কিংবদন্তি, ঢেউয়ের মাথায়
বোতলবন্দি গল্প কিছু বেড়ায় নেচে,
রাজার মতো পা ঝুলিয়ে বসব আমি শূন্যে।

হাত রেখো না আমার বুকে, ক্ষত আবার জ্বলবে।
ঘোর অবেলায় দেখা হলো,
হৃদয় জুড়ে ঝরা পাতা।
চোখে চোখে নিমেষ ফুরোয়, হঠাৎ শুনি
কণ্ঠে ছেড়ে ঝরনাধারা বললে তুমি–
'এই যে শোনো, ভালো লাগে তোমার কিছু পদ্য।'

মুখচোরা তুই পদ্য আমার যারে উড়ে শীঘ্র,
তার বাগানে যারে উড়ে,
আস্তেসুস্থে করগে ভ্রমণ
তার সে ভীরু চোখের পাতায়, স্তনের ছায়ায়,
অনিদ্র হে পদ্য আমার আয় না তাকে
ঘুম পাড়িয়ে, চুমো খাগে তার ঘুমন্ত ওষ্ঠে।

আবার কেন তৃষ্ণা আমার গ্রাস করেছে সদ্য।
জলের কাছে গেলে ত্বরিত
জল সরে যায় অনেক দূরে
তীরের দিকে হাত বাড়ালে তীর থাকে না,
তাকে দেয়া চুমু আমার শূন্যে মিলায়,
আমি ঊষর হাহাকারে একলা থাকি বন্দি।

রেস্তোরাঁর একটি টেবিলে

ওরা ক'জন যে ছিল রেস্তোরাঁর একটি টেবিলে
সেদিন, পড়ে না মনে। কেউ লম্বা, খর্বকায় কেউ,
মসৃণ কামানো কারো গাল, কারো মুখ যেন ঝোপ,
এক্ষুণি বেরিয়ে এলো বলে খরগোশ কিংবা পাখি।
একজন অনর্গল কথা বলে, অন্যজন বড়
বেশি চুপচাপ, কেউ মাথা নাড়ে ঘন ঘন, যার
পরনে পাঞ্জাবি তার বুঝি নস্যি নেয়ার অভ্যাস।

কেউ দ্রুত কী যে লেখে খুব ঝুঁকে, কেউবা টেবিলে

নিপুণ বাজায় তাল, কেউ শূন্য চায়ের বাটিতে
প্রাচীন রাজার বাড়ি দ্যাখে, রেস্তোরাঁয় অন্ধকার
ফুঁড়ে আফ্রোদিতি এলো ভেবে কেউ বারবার ওঠে
কাঠের চেয়ার ছেড়ে, কেউবা ভীষণ খিস্তি করে।
কারো দুঃখী মুখে ওড়ে এলোমেলো স্বপ্নভস্ম কত।

সময়ের হাতে সমর্পিত, বিচ্ছিন্নতা বোধে ক্ষিপ্ত
ওরা কী-যে বলাবলি করেছিল সেদিন সন্ধ্যায়
রেস্তোরাঁয়, মনে নেই : শুধু মনে পড়ে প্রত্যেকেই
বলেছিল– সবাইকে যেতে হবে, কেন যেতে হবে?

নাছোড় অতিথি

বেশ কিছুদিন থেকে প্রত্যহ দেখছি পষ্ট তাকে।
আমার শোবার ঘরে শায়িত সে, স্পন্দনরহিত,
পতিত জমির মতো, যেখানে কখনো ফসলের
স্বর্ণশীষ গীতিকবিতার মতো করবে না গুঞ্জন।
কী করে এলো সে এই বেডরুমে, বলা মুশকিল।
আমার অস্বস্তি হয়ে সর্বক্ষণ আছে সে এখানে–
বড় বেশি নীল তার ঠোঁট, নাক, নখাগ্র বেবাক;
শরীরে কুঠার হানলেও নড়বে না এতটুকু।

সমস্ত শরীরে তার রাশি রাশি মাছির মতন
হিজিবিজি অক্ষরের ব্যান্ডেজ এবং হলদে কিছু
পাণ্ডুলিপি চুমু খাচ্ছে তাকে বারংবার, বুঝি তার
এমন চরম ঘুম ভাঙাতে ব্যাকুল। ঘরময়

মৃত্যুগন্ধ কর্পূরের মতো তীব্র। টেবিলে ডালিয়া,
ভাস-এ গোলাপের তোড়া; আমি ব্যাঞ্জো বাজিয়ে বাজিয়ে
নিদ্রিত মানুষটিকে বিস্মৃতির কন্দরে পাঠাতে
চাই প্রতিদিন, হায়, ব্যাঞ্জোধ্বনি, গোলাপ, ডালিয়া

থেকে মৃত্যুগন্ধ উঠে আসে। চেয়ে থাকি তার দিকে,
এই চেয়ে-থাকা যেন নিয়তি আমার। এতকাল
বলিনি কাউকে তার কথা। অতিশয় কৌতূহলী
প্রতিবেশীরাও আজও কিছুই পায়নি টের, শুধু

প্রত্যহ আমাকে দ্যাখে দূর থেকে আর কেউ কেউ
কখনো তাকায় আড়চোখে, পরস্পর কত কিছু
বলাবলি করে, চলে হাসাহাসি। আমার বিশ্বাস
সন্দেহ করে না ওরা কিছু। হয়তো ভাবে, ইদানীং

লোকটা বেজায় খাপছাড়া বটে, তা'ছাড়া মাথায়
কিছু ছিট ছিলই তো বরাবর। এটাই বাঁচোয়া।
এদিকে আমার বেডরুমে নিদ্রিত মানুষটির
পায়ে লতাগুল্ম জন্মে, শামুক বুকের শুষ্ক তটে।

কতদিন গেল কেটে, পুলিশকে দিইনি খবর–
যেন সে গোপন ব্যাধি, ভয়াবহ, কস্মিনকালেও
কাউকে যায় না বলা তার কথা। অথচ পাচ্ছি না
ভেবে কিছুতেই আজও কী করে লুকোব তাকে, কোন
পাতালে আসব রেখে। কখনো মাথার ঘাম পায়ে
ফেলে কংক্রিটের পুরু দেয়ালের অভ্যন্তরে তাকে
দুরু দুরু পুরে রাখি; যেমন এ্যালেন পো-র গল্পে
আছে, কখনোবা ব্লিচ করে হাওয়ায় মিলিয়ে দিই।

তবু সে আমার ঘরে শুয়ে থাকে সমস্ত শরীরে
ঘোর কালো নক্ষত্রের মতো অক্ষরের ভিড় নিয়ে।
তার পাশে ঠায় ব'সে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে
কোনো কোনো স্তব্ধ মধ্যরাতে শাবল গাঁইতি হাতে

মেঝেতে সুড়ঙ্গ কেটে তাকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাই
সবার অলক্ষে বহুদূর একা-একা, পুঁতে আসি
মাটির অনেক নিচে। শিস্ দিতে দিতে ঘরে ফিরে
দেখি ঠাণ্ডা বিছানায় শায়িত সে নাছোড় অতিথি।

হিসেবনবিশ

হিসেবী সে নয় তবু নিয়ত হিসেব করে কাটে তার বেলা।
নিজের বিবর্ণ ঘরে কী কী আসবাব আছে, ক'টি ফটোগ্রাফ,
মানচিত্র কিংবা কত বই, দেয়ালে কখন ক'টি পোকা থাকে,
যায় বালিরঙ টিকটিকির জঠরে– সে হিসেব করে।
কখনোবা সিগারেট ধরিয়ে সন্ধ্যাকে আস্তেসুস্থে
পোড়ায় চিতার মতো, তৃষ্ণায় কাতর হ'লে গলা

নিমেষে ভিজিয়ে দেয় স্বপ্নের শিশিরে। অন্তরালে
সংখ্যা লেখে, সংখ্যা কাটে, স্বপ্ন লেখে স্বপ্ন কাটে হিসেবনবিশ।

হিসেবে কোথাও কোনো গরমিল থাকা ভালো নয়
ভেবে সে খাতার প্রতি আনুগত্যে ফেরেশতার পাখার মতন
জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে। আঙুলের ডগায় নাচিয়ে কী নির্মল
গণিতের গুঁড়ো, পায়ে পায়ে বাজিয়ে করোটি হরিণের কত
মহামারী ভুলে থাকে, চলে যায় পার্কে; কতিপয় এলোমেলো
নষ্ট মানুষের হর্ষধ্বনি, হৈ হৈ অশ্লীলতা শুনে কাটে ঘোর।
ফিরে আসে, ঘরে ব'সে আশা লেখে, আশা কাটে হিসেবনবিশ।
সতেজ আকাঙ্ক্ষাগুলি নিঃশব্দে জীবনপাত করে আর্ত ঘরে!
এ শহরে শতকরা কত লোক সমকামী আর প্লেটনিক
প্রেমিক ক'জন,
পৌরসভা কত ট্রাক পেলে এ শহর হবে স্বপ্নের শহর,
জীবনানন্দীয় ঘাস কতটুকু জমি কার করেছে দখল
এ শহরে, ছায়াচ্ছন্ন শহরতলিতে,
একটি সপ্রাণ বসন্তের জন্যে ক'ডজন কোকিল দরকার,
গোর খোদকের কাছে কত লাশ জমা দিলে
সড়কের মুখ রক্ষা হবে,
টি এস এলিয়টের ধূসর ওয়েস্টকোট, ভালেরির নিরঞ্জন প্রশান্ত দস্তানা,
নেরুদার চিলিময় ইতিহাসরঞ্জিত জ্যাকেট ক'হাজার
সুপার মার্কেটে লভ্য, এ হিসেব মেলাতে ব্যস্ত হিসেবনবিশ।

রাত্রিদিন একা-একা সে হিসেব করে তেরো বর্গমাইল জায়গায়
ক'জন সৈনিক কুচকাওয়াজ করতে পারে সকালের রোদে,
পঁচিশ মিনিটে ঠিক ক'টি ট্রেঞ্চ খোঁড়া যায়, বঙ্গোপসাগর
ঢেকে দিতে ক'হাজার রণতরী লাগবে এবং অকস্মাৎ
আণবিক আক্রমণ শুরু হলে তেজস্ক্রিয় ভস্ম থেকে মানব শিশুকে
বাঁচাতে প্রত্যেক দেশে কত ভূগর্ভস্থ আশ্রয় শিবির চাই,
ক'কোটি রেডিও আর্তস্বরে কেবলি রটাবে সেই
আত্মা-শুষে-নেয়া দুঃসংবাদ বিস্ময়?

পূর্ব পুরুষের হলদে জাবেদা খাতার ভাঁজে ভাঁজে
হিসেবের ঘনারণ্যে বিস্তর প্রমাদ
প্রাগৈতিহাসিক কিছু প্রাণীর মতন প্রকাশিত।
হিসেবের ফাঁকে ফাঁকে কেমন বেরিয়ে পড়ে তাদের ভণ্ডামি,

লোলুপতা, প্রতারণা, শঠতা ইত্যাদি,
যেমন খুনির ফেলে-আসা হত্যাচিহ্ন অকুস্থলে। পূর্ব পুরুষের সব
দলিল, জাবেদা খাতা বড় গোলমেলে। ক্লান্ত হিসেবনবিশ
এতদিনে জেনে গেছে, উল্টা-পাল্টা দলিলের শুদ্ধ পাঠোদ্ধারে
প্রকৃত আগ্রহী হ'লে পুনরায় পুরোপুরি হিসেব-নিকেশ করা চাই।
নইলে পদে পদে
প্রাক্তন ভ্রান্তির জের টেনে যেতে হবে
ক্ষেতের আইলে, এ্যাভেন্যুতে মগজের কোষে পুরুষানুক্রমে।

নড়বড়ে ঘরে ব'সে একাকী সে সংখ্যা লেখে, সংখ্যা কাটে আর
হাতির মতন স্মৃতি নিয়ে, নিপুণ দর্জির মতো
সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দ্যাখে কোন ঘরে কত হয় জমা;
তবুও হিসেব তার খুব হিজিবিজি হয়ে যায় বারংবার।
একক দশক আর শতক সহস্র, সব কিছু মাতলামি করে করে
মুছে যায়, জাবেদা খাতায়
চোখের জলের মতো কিছু দাগ লেগে থাকে শুধু।
না, তোমাকে দিয়ে এ হিসেব মেলানো সম্ভব নয়।
কখনো, বলে সে মনে-মনে। অথচ আবার একা-একা হাতে
স্বপ্ন গুঁজে বেশ ঝুঁকে সংখ্যা লেখে, সংখ্যা কাটে। তার চতুষ্পার্শ্বে
পূর্ণিমার উজ্জ্বলতা ছাড়া কিছু নেই, চলে স্বচ্ছতা ছাড়া
কিছু নেই; দেয়ালের গর্ত এবং চৌকাঠ থেকে
ব্যর্থতা কুড়িয়ে জেনে নেয় সত্য মানে যেশাসের গাধা আর
গণিতের গুঁড়ো তার পায়ে চুমু খেয়ে খেয়ে গভীর সংগীতময় হয়।

ইকারুসের আকাশ

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮২
প্রকাশক সব্যসাচী, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী সৈয়দ হক
উৎসর্গ-পত্র সৈয়দ শামসুল হক
বন্ধুবরেষু

ইকারুসের আকাশ

গোড়াতেই নিষেধের তর্জনী উদ্যত ছিল, ছিল
সুপ্রাচীন শকুনের কর্কশ আওয়াজে
নিশ্চিত মুদ্রিত
আমার নিজস্ব পরিণাম। যেন ধু-ধু মরুভূমি
কিংবা কোনো পানা পুকুরে কি জন্মান্ধ ডোবায়
অস্তিত্ব বিলীন হবে কিংবা হবো সেই জলমগ্ন ভুল প্রত্ন
পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল, উদ্যমপ্রবণ ধীবরের জাল যাকে
ব্যাকুল আনবে টেনে নৌকোর গলুইয়ে–
এইমতো ভয়ংকর সংকেত চকিতে
উঠেছিল কেঁপে রুদ্ধ গোলকধাঁধায়।

আমি তো বারণ মেনে বিশ্রুত স্থপতি
ধীমান পিতার
পারতাম জলপাই আর বৃষমাংস খেয়ে,
পান করে চামড়ার থলে থেকে উজ্জ্বল মদিরা
এবং নিভৃত কুঞ্জে তরুণীকে আলিঙ্গনে মোহাবিষ্ট করে,
ধারালো ক্ষুরের স্পর্শসুখ নিয়ে প্রত্যহ সকালে
সাধারণ মানুষের মতো গোচারণ, শস্যক্ষেত আর
সন্তান লালন করে কাটাতে সময়।
পারতাম সুহৃদের সঙ্গে প্রীতি বিনিময়ে
খুশি হতে, তৃপ্তি পেতে পাতার মর্মরে,
বনদোয়েলের গানে, তামাটে দুপুরে
পদরেখা লাঞ্ছিত জঙ্গলে
নিজেকে নিযুক্ত করে মধু আহরণে।
কী-যে হল, অকস্মাৎ পেরিয়ে গোলকধাঁধা পিতৃদত্ত ডানা
ভর করে কিছুক্ষণ ওড়ার পরেই
রৌদ্রের সোনালি মদ আমার শিরায়
ধরাল স্পর্ধার নেশা। শৈশবে কৈশোরে কতদিন
দেখেছি পাখির ওড়া উদার আকাশে। ঈগলের
দুর্নিবার ঊর্ধ্বচারী ডানার চাঞ্চল্যে ছিল সায়
সর্বদা আমার, তাই কামোদ্দীপ্তা যুবতীর মতো
প্রবল অপ্রতিরোধ্য আমার উচ্চাভিলাষ আমাকে অনেক
উঁচুতে মেঘের স্তরে স্তরে
রৌদ্রের সমুদ্রে নিয়ে গেল। দ্বিধাহীন আমি উড়ে

গেলাম সূর্যের ঠোঁটে কোনো রক্ষাকবচবিহীন
প্রার্থনার মতো।

কখনো মৃত্যুর আগে মানুষ জানে না
নিজের সঠিক পরিণতি। পালকের ভাঁজে ভাঁজে
সর্বনাশ নিতেছে নিঃশ্বাস
জেনেও নিয়েছি বেছে অসম্ভব উত্তপ্ত বলয়
পাখা মেলবার, যদি আমি এড়িয়ে ঝুঁকির আঁচ
নিরাপদ নিচে উড়ে উড়ে গন্তব্যে যেতাম পৌঁছে
তবে কি পেতাম এই অমরত্বময় শিহরণ?
তবে কি আমার নাম স্মৃতির মতন
কখনো উঠত বেজে রৌদ্রময় পথে জ্যোৎস্নালোকে
চারণের নৈসর্গিক, স্বপ্নজীবী সান্দ্র উচ্চারণে?
সমগ্র জাতির কোনো কাজে লাগবে না
এই বলিদান, শুধু অভীপ্সার ক্ষণিকের গান
গেলাম নিভৃতে রেখে ঝাঁ ঝাঁ শূন্যতায়।
অর্জন করেছি আমি অকাল লুপ্তির বিনিময়ে
সবার কীর্তনযোগ্য গাথা,
যেহেতু স্বেচ্ছায়
করেছি অমোঘ নির্বাচন
ব্যাপ্ত জ্বলজ্বলে, ক্ষমাহীন, রুদ্র নিজস্ব আকাশ।

কথার জেরুজালেম

এখন বলার কিছু নেই আর তাই থাকি আপাতত
চুপচাপ, প্রায় বোবা, বলা যায়। তুমিও আগের
মতো কথা পুষ্পসারে দাও না ভরিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আমার প্রহর আজ। যদিও কথক নই নিপুণ, তুখোড়,
তবু ছিল দীর্ঘস্থায়ী কথোপকথন
আমাদের; ছিল, মনে পড়ে, প্রহরে প্রহরে।

এখন আমার চোখ কথা বলে, প্রতিটি আঙুল
সযত্নে সাজায় শূন্যে কথামালা, আমার বুকের
রোমরাজি কথা হয়ে ফোটে থরে থরে,
পাঁজরে পাঁজরে সর্বক্ষণ

কথার পিদিম জ্বলে,
হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার
অন্য মানে পায়, তাই সহজে খুলি না মুখ আর।

এখনও বাসিন্দা আমি স্বপ্নময় জেরুজালেমের।
সেখানে নিঃশব্দে পথ চলি, কত যে গলির মোড়
ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকে, দীঘল চুলের
ছায়া নামে মুখের ওপর
জোয়ারি জ্যোৎস্নায়।
রাস্তায় কি ঘরে কেউ বলে না কখনো কথা, শুধু
সুরে সুরে জেগে থাকে আদিগন্ত বাখের উৎসব।
স্বপ্ন-নগরীতে, বলো, কথার কি দরকার? বরং
যুগ যুগ চেয়ে থাকা যায়
কারো চোখে চোখ রেখে কথার চেয়েও খুব গভীর ভাষায়,
হৃদয় জেরুজালেম জেনে
হাঁটা যায় নানান শতকে,
কারো হাত ধরে স্বপ্নময়
জেরুজালেমের পথে। শত ভুল শুধরে নেয়া যায়
একটি চুম্বনে,
যে চুম্বনে পড়বে ছায়া দীর্ঘ মিনারের জলপাই পল্লবের।

এখন তো মেঘমালা, গাছের সতেজ পাতা, বৈশাখী রোদ্দুরে,
শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, পাখির অমর্ত্য গান আমাদের হয়ে
প্রহরে প্রহরে
আমাদের দুজনের হয়ে
করবে রচনা নয়া কথার জেরুজালেম। কে বলেছে?
একজন কেউ, আছে যার খুব স্বপ্নবিলাসী উদাত্ত পাখা।

নিজের কবিতা বিষয়ে কবিতা

আমার কবিতা নিয়ে রটনাকারীরা আশেপাশে
নানা গালগল্প করে। কেউ বলে আমার কাব্যের
গোপনাঙ্গে কতিপয় বেঢপ জড়ুল জাগরূক,
ওঠেনি আক্কেল দাঁত আজও তার, বলে কেউ কেউ।

আমার কবিতা নাকি বাউণ্ডুলে বড়, ফুটপাথে

ঘোরে একা একা কিংবা পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকে,
ইন্দ্রিয়বিলাসে মজে বন্ধ কুঠুরিতে, মাঝে-মাঝে
শিস দেয়; আমার কবিতা খুব বেহুদা শহুরে!

একরত্তি কাণ্ডজ্ঞান নেই তার, সবার অমতে
সোৎসাহে চাপিয়ে গায়ে আজব জ্যাকেট, কেয়াবাৎ,
সুনীল লণ্ঠন হাতে দিনদুপুরেই পর্যটক
এবং অভ্যাসবশে ঢোকে সান্ধ্য মদের আড্ডায়।

মদের বোতল রুক্ষ গালে চেপে অথবা সরোদে
চুমু খেয়ে অস্তিত্বহীনতা বিষয়ক গান গায়,
এবং মগজে তার নিষিদ্ধ কথার ঝাঁক ওড়ে
মধুমক্ষিকার মতো সকালে কি রাত বারোটায়।

আমার কবিতা অকস্মাৎ হাজার মশাল জ্বেলে
নিজেই নিজের ঘর ভীষণ পুড়িয়ে দেখে নেয়
অগ্ন্যুৎসব; কপোতীর চোখে শোক; এদিকে নিমেষে
উদ্বাস্তু গৃহ দেবতা, কোথাও করবে যাত্রা ফের।

বিদ্যের জাহাজ দ্রুত চৌদিকে রটিয়ে দেয়, 'ওর
পদ্যটদ্য এমনকি ইকেবানা নয়, এইসব
আত্মছলনার অতি ঠুনকো পুতুল–টিকবে না,
ভীষণ গুঁড়িয়ে যাবে কালের কুড়ুলে শেষমেশ।'

যখন পাড়ায় লাগে হঠাৎ আগুন ভয়াবহ,
আমার কবিতা নাকি ঘুমোয় তখনও অবিকল
গাছের গুঁড়ির মতো ভাবলেশহীন। আর ঘুম
ভাঙলেও আত্মমগ্ন বেহালায় দ্রুত টানে ছড়!

আমার কবিতা করে বসবাস বস্তি ও শ্মশানে,
চাড়ালের পাতে খায় সূর্যাস্তের রঙলাগা ভাত,
কখনো পাপিষ্ঠ কোনো মুমূর্ষু রোগীকে কাঁদে বয়ে
দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যায় আরোগ্যশালায়।

আমার কবিতা পথপ্রান্তে দুঃখীর চোখের মতো
চোখ মেলে চেয়ে থাকে কার পায়ের ছাপের দিকে,
গা ধোয় ঝরনার জলে। স্বপ্ন দ্যাখে, বনদেবী তার
ওষ্ঠে ঠোঁট রেখে হু হু জ্বলছেন সঙ্গম-লিপ্সায়!

একটি গাধাকে দেখি

একটি গাধাকে আমি প্রতিদিন দেখি আশেপাশে,
শহরে নিঃসঙ্গ ভিড়ে,
আমার সান্নিধ্যে দেখি রোজ
আওলাদ হোসেন লেনের মোড়ে, বাবুর বাজারে,
ইসলামপুরে, বঙ্গবন্ধু এ্যাভেন্যুর ফুটপাথে,
সাত রওজায়, সিদ্ধেশ্বরী,
পলাশী বেইলি রোডে, বুড়িগঙ্গা নদীটির তীরে
মিটফোর্ড হাসপাতালের কাছে, ধানমন্ডি লেকের ওপারে।
হঠাৎ কখনো রমনা পার্কে তার দেখা পাওয়া যায়,
একটি গাধার সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখা হয় প্রত্যহ আমার।

তাকে দেখে মনে হয়, যেন দার্শনিক,
অস্তিত্ব কি অনস্তিত্ব নিয়ে
চিন্তাবিষ্ট অতিশয়, চলেছেন একা, তাবৎ বস্তুর প্রতি
বড় উদাসীন;
এবং কর্তব্যক্লান্ত ট্রাফিক পুলিশ, ক্রুশচিহ্ন আইল্যান্ডে,
বেলা-অবেলায় তাকে
ঈষৎ মুচকি হেসে পথ ছেড়ে দ্যায় বারে বারে।

গাধাটির কথা বলিহারি, কিছুই দেখে না যেন
চোখ মেলে, পথ হাঁটে একা-একা, বিস্তর ধুলায়
আরবি রেখার মতো নকশা
তৈরি করে অচেতনভাবে। কাকে বলে আয়কর ফাঁকি দেয়া,
সুরক্ষিত বাক্সের ভেতর থেকে ব্যালট পেপার চুরি আর
টিকিটবিহীন রেল ভ্রমণের সাধ মেটানো, বস্তুত জানে না সে।
কখনো ঘেসেড়া ডাকে তাকে,
খচ্চরের ভিড় লুব্ধতায়
তার খুব অন্তরঙ্গ হতে চায়। মনে পড়ে রজকের
পৃষ্ঠপোষকতা
ছিল বহুদিন, আজ রজকের ঘাট থেকে দূরে,
বহুদূরে চলে এসেছে সে, ভারবাহী স্মৃতি ছেঁড়া
দুব্বার মতন ওড়ে,
মাঝে মাঝে অপরাহ্নে ঘাসের সৌন্দর্য দেখে ভাব লাগে তার।

কৃপাপ্রার্থী নয় কারো, তবু বিশ্বাসঘাতকতার চুমো নিয়ে
গালে গূঢ় ডুমুরের ফুলের নিকট
কামগন্ধহীন রজকিনী প্রেম চায়।

তার চক্ষুদ্বয়ে দ্বিপ্রহরে চিলডাকা আকাশের
প্রতিধ্বনি, কবিতার পঙ্ক্তির মতন অনুকরণকাতর
অবরুদ্ধ নগরীর শব্দালীর, সুদূর অনার্য নিশীথের
জ্যোৎস্না-বিহ্বলতা,
মায়া কাননের ফুল, অতি দূর পরীর দেশের
রহস্যময়তা আর নিগৃহীত কোবিদের মেধার রোদ্দুর
মাথার ভেতরে তার এজমালি তত্ত্বের তথ্যের দীপাবলি,
ফরিদউদ্দীন আত্তারের সহজিয়া গল্প ছলে
সুসমাচারের স্নিগ্ধ কোমল গান্ধার।

আসিসির সন্ত ফ্রান্সিসের মতো নিজেকে অভুক্ত রেখে কৃশ
হয়, হাঁটে চরাচরব্যাপী ঝড়ে, বৃষ্টিপাতে আর
তুষারমৌলির দিকে দৃষ্টি রেখে কষ্টকর পর্বতারোহণে
মাতে, সঙ্গীহীনতায়
নিজের সঙ্গেই কথা বলে বারংবার। মুখমণ্ডলের
রুক্ষতা ক্রমশ বাড়ে, দাঁতে ক্ষয়, পায়ে মস্ত ক্ষত,
শুধু চক্ষুদ্বয় তার সন্তের চোখের মতো বড় জ্বলজ্বলে—
যা উপোসে, কায়ক্লেশে, ক্রমাগত ঊর্ধ্বারোহণে এমত হয়।

কুষ্ঠরোগীদের ক্ষতে হাত রাখে, চুমো খায় গলিত ললাটে
দ্বিধাহীন বারংবার, যাত্রা করে দুর্ভিক্ষের প্রতি,
যাত্রা করে মড়কের প্রতি, নানা দেশী
উদ্বাস্তুর প্রতি,
বিকলাঙ্গ শিশুদের প্রতি, অন্ধের শিবিরে আর
মৃত্যুপথযাত্রী জীর্ণ পতিতার প্রতি,
যোজন যোজনব্যাপী কাঁটাতার আর নির্যাতিত
অথচ অজেয় রাজবন্দিদের প্রতি,
যাত্রা করে বধ্যভূমি আর ফাঁসির মঞ্চের প্রতি।
এবং প্রকৃত পরী তার পদ্মপাতা-কানে চুমো খায়।
কোজাগরী পূর্ণিমায়, ব্যাকুল সে খোঁজে সেই চুম্বনের মানে।

বসতিতে, মনীষায়

আজকাল বিছানায় বড় বেশি শুয়ে থাকে একা,
বালিশে অনেকক্ষণ মুখ গুঁজে সময় যাপন
করে, কড়িকাঠ গোনে কখনো-সখনো!
বাড়িটা পুরনো, নড়বড়ে;
বুড়ো কাকাতুয়ার বিবর্ণ
পালকের মতো রঙ দেয়ালে অস্পষ্ট। পলেস্তরা
খসে পড়ে মাঝে-মধ্যে; প্রাচীন পদ্যের অভিজাত
পঙ্‌ক্তির মতন
কী যেন গুমরে ওঠে ঘরের ভেতর। ক্ষয়ে-যাওয়া বাঘছালে
ইঁদুরের দৌড়,
কাঠের চেয়ারে সাদা বেড়ালের স্বপ্নাশ্রিত মাথা,
খবর কাগজ ঘোর উন্মাদের স্মৃতির মতন
লুটোয় মেঝেতে আর দিন যায়, দীর্ঘ বেলা যায়।

রোদের জঙ্গলে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে
এখন সে গা-গতর এলিয়ে দিয়েছে বিছানায়
রৌদ্রদগ্ধ শ্রমিকের মতো।
সে কি একবুক অভিমান নিয়ে শুয়ে থাকে, নাকি
সত্তাময় অপমান নিয়ে হতে চায় আত্মঘাতী।
নানান ফলের প্রতি তার
গাঢ় দুর্বলতা আছে বলে
শিয়রে সাজিয়ে রাখে সযত্নে অলীক ফলমূল। আলস্যের
ভায়োলেট মখমলে গুটিসুটি পড়ে থাকে; চোখের পাতায়
ঘুম নয়, কিছু তন্দ্রা লেগে থাকে মোহের মতন।
কখনো বিজন
স্বপ্নের টানেলে ঘোরে নিরুদ্দেশে, নিজেকে সংশয়মুক্ত রেখে
তারই করতলে রাখে মাথা
কেমন নিটোল ভরসায়
যে তার অকুণ্ঠ পিঠে আমূল বসিয়ে দেবে ছোরা সুনিশ্চিত।

কখনো হঠাৎ
তন্দ্রার ঝালর তার কেঁপে ওঠে; অলিতে-গলিতে
রাত্রিদিন নানা কলরব, ছদ্মবেশী সজারুর ভিড় বাড়ে
ক্রমাগত আশেপাশে। প্রকৃত ধর্মের চেয়ে ধর্ম কোলাহলে

অত্যন্ত মুখর আজ শহর ও গ্রাম। বিশ্বযুদ্ধের বর্তমানে
নেই কারো সায়,
তবু অতিকায় কালো রাজহাঁসের মতন ছায়া ফেলছে সমর
বসতিতে, মনীষায়, সভ্যতার মিনারে-মিনারে।

আবাসিক

কোনো ঘুমন্ত রূপসীর স্মিত হাসির মতো
এই বিকেল। হাওয়া এক পাল
হরিণের চাঞ্চল্য। সুসজ্জিত মঞ্চে
শোভা পাচ্ছে সেমিনারের সুলেখা শিরোনামা
'নগরের আবাসিক সমস্যা'। সভাকক্ষ
আস্তে-আস্তে ভরে উঠল শ্রোতায়,
যেমন উৎসবের দিনে কোনো কোনো বিরাট ঘর
ছেয়ে যায় ফুলের স্তবকে। মঞ্চে
সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি
এবং বক্তাবৃন্দ; কেউ-কেউ প্রৌঢ়, কেউবা যুবা।

মঞ্চস্থিত টেবিলে যুগল শৌখিন ফুলদানি আর এক গ্লাস
টলটলে পানি। মঞ্চে উপবিষ্ট যাঁরা,
তাঁদের অধিকাংশের নিজস্ব ঘরবাড়ি আছে,
কারো-কারো একাধিক; একজন কি দু'জনের কোনো
বাড়ি নেই। শ্রোতাদের কারো-কারো নিজস্ব
বাড়ি আছে, অধিকাংশই ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা;
কেউ কেউ থাকেন মেসবাড়িতে।

নগরের আবাসিক সমস্যা বিষয়ে
বক্তারা একে-একে বক্তৃতা দিলেন সকলেই। বক্তব্য তাঁদের
শাসালো, যুক্তিশাণিত। মঞ্চে ক্ষণে ক্ষণে
টিভি ক্যামেরার চমক আর ঠমক। ক্যামেরাম্যান আর
স্টাফ ফটোগ্রাফারদের
হঠাৎ আলোর ঝলকানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সভাকক্ষ বারংবার
ঝলমলিয়ে উঠল অজস্র কথার ফুলকিতে। কেউ-কেউ
পাঠ করলেন দীর্ঘ প্রবন্ধ, তত্ত্বে তথ্যে ভুরভুরে।
প্রবন্ধ-পাঠকালীন কোনো-কোনো মুহূর্তে কেউ আড়চোখে

দেখে নিলেন শ্রোতাদের মুখমণ্ডলে
ভাষণের প্রতিক্রিয়া; কেউবা হাততালির স্থায়িত্বের মাপকাঠিতে
নিজের জনপ্রিয়তা করলেন পরখ। তাদের
সুভাষিতবলির মুখে পড়ল ফুলচন্দন।

প্রধান অতিথি যখন ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে
আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন,
এগিয়ে গেলেন মাইক্রোফোনের দিকে, তখনই
বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ একজন বালক
সবার অলক্ষ্যে শূন্য একটি চেয়ারে এসে
ব'সে পড়ল অনাহূত বিশেষ অতিথির মতো।

তার পরনে ছেঁড়া শার্ট, জন্মের পর যতগুলো বছর
সে পাড়ি দিয়ে এসেছে, তত বিচিত্র তালি তার
ময়লা হাফপ্যান্টে, চুল উষ্কখুষ্ক। রাস্তার ধারে
ধুলোবালির ঘর বানাচ্ছিল। সে রাস্তাই
নিবাস তার; দিনে ঘুরে বেড়ায় এক রাস্তা থেকে
অন্য রাস্তায় নির্বাসিত নাবালক রাজার মতো,
কুড়ায় বাতিল কাগজ। কারো
বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে তোলে না গোলাপ
বাজখাঁই গলার ভয়ে। রাতে ঘুমায়
ফুটপাথে, দোকানের বন্ধ দরজার কাছে, কিংবা
টিনশেডের আশেপাশে। কখনো-কখনো স্বপ্নে
সে প্রবেশ করে অভ্রের তৈরি গীতময় এক অট্টালিকায়।

এখন সে আচমকা ঢুকে পড়েছে কৌতূহলবশে
এই সভাকক্ষে, প্রবেশাধিকারের
প্রশ্নটিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে। নাকি সে
নগরের আবাসিক সমস্যা বিষয়ক সেমিনারে
যাচাই করতে এসেছে, এই যে সাত বছর আগে
ঘুঁটেকুড়ানী এক নারীর অন্তর্গত লতাগুল্ম ছিঁড়ে
সভ্যতার উগরে-দেয়া উচ্ছিষ্ট হিসেবে
সে চলে এসেছে পৃথিবীতে, এ-ঘটনা কতটা যুক্তিসঙ্গত
এবং সমীচীন!

ইলেকট্রার গান

শ্রাবণের মেঘ আকাশে আকাশে জটলা পাকায়
মেঘময়তায় ঘনঘন আজ একি বিদ্যুৎ জ্বলে।

মিত্র কোথাও আশেপাশে নেই, শান্তি উধাও;
নির্দয় স্মৃতি মিতালী পাতায় শত করোটির সাথে।

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

সে কবে আমিও স্বপ্নের বনে তুলেছি গোলাপ,
শুনেছি কত যে প্রহরে প্রহরে বনদোয়েলের ডাক।
অবুঝ সে মেয়ে ক্রাইসোথেমিস্ আমার সঙ্গে।
মেতেছে খেলায়, কখনো আমার বেণীতে দিয়েছে টান।

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

পিতৃভবনে শুনেছি অনেক চারণের গাথা,
লায়ারের তারে হৃদয় বেজেছে সুদূর মদির সুরে।
একদা এখানে কত বিদূষক প্রসাদ কুড়িয়ে
হয়েছে ধন্য, প্রধান কক্ষ ফুলে ফুলে গেছে ছেয়ে।
নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

প্রজাপতি-খুশি ফেরারি এখন, বিষাদ আমাকে
করেছে দখল; কেমন বিরূপ কুয়াশা রেখেছে ঘিরে।
রক্তের ডাকে দিশেহারা আমি ঘুরি এলোমেলো,
আমার রাতের শয্যায় শুধু কান্নার স্বাক্ষর।

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

সেই দিন আজও জ্বলজ্বলে স্মৃতি, যেদিন মহান
বিজয়ী সে বীর দূর দেশ থেকে স্বদেশে এলেন ফিরে।
শুনেছি সেদিন জয়ঢাক আর জন-উল্লাস;
পথে-প্রান্তেরে তাঁরই কীর্তন, তিনিই মুক্তি দূত।

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

নন্দিত সেই নায়ক অমোঘ নিয়তির টানে
গরীয়ান এক প্রাসাদের মতো বিপুল গেলেন ধসে।
বিদেশী মাটিতে ঝরেনি রক্ত; নিজ বাসভূমে,
নিজ বাসগৃহে নিরস্ত্র তাঁকে সহসা হেনেছে ওরা।

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

আড়ালে বিলাপ করি একা-একা, ক্ষতার্ত পিতা
তোমার জন্যে প্রকাশ্যে শোক করাটাও অপরাধ।

এমনকি, হায়, আমার সকল স্বপ্নেও তুমি
নিষিদ্ধ আজ; তোমার দুহিতা একি গুরুভার বয়!

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

মাথার ভেতরে ঝোড়ো মেঘ ওড়ে, আমি একাকিনী
পিতৃভবনে, আমার কেবলি শোক পালনের পালা।
পিতৃহন্তা চারপাশে ঘোরে, গুপ্তচরের
চোখ সেঁটে থাকে আমার ওপর, আমি নিরুপায় ঘুরি।
নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

কখনো কখনো মাঝরাতে আমি জেগে উঠে শুনি
পায়ের শব্দ, আস্তাবলের ঘোড়ার আর্তনাদ।
শিকারি কুকুর ঘরের কপাট ঠ্যালে অবিরত,
আমার রক্তে দাঁত-নখ তার সিক্ত করতে চায়

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

যতদিন আমি এই পৃথিবীতে প্রত্যহ ভোরে
মেলব দু'চোখ, দেখব নিয়ত রৌদ্র-ছায়ার খেলা,
যতদিন পাব বাতাসের চুমো, দেখব তরুণ
হরিণের লাফ, ততদিন আমি লালন করব শোক।

অন্ধের দেশে কে দেবে অভয়? ভাই পরবাসে;
যে নেবে আমার মহাদায়ভাগ, তেমন জীবনসঙ্গী কই?
কেমন ছাদের নিচে সহোদর ছেঁড়ে তার রুটি?
কোন প্রান্তরে ওড়াচ্ছে ধুলি ওরেস্টেসের ঘোড়া?

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

কান পেতে থাকি দীপ্র কণ্ঠ শোনার আশায়,
কাকের বাসায় ঈগলের গান কখনো যায় কি শোনা?
ক্রাইসোথেমিস, অবুঝ তন্বী, দূরে সরে থাকে,
বিকচোন্মুখ শরীরে এখন লায়ারের ঝংকার।

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

আমার উপমা দাবানলে-পোড়া আর্ত হরিণী;
মৃতের মিছিল খুঁজি দিনরাত, আঁধারে লুকাই মুখ।
করতলে কত গোলাপ শুকায়, ঝরে জুঁই, বেলী;

আমার হৃদয়ে প্রতিশোধ জ্বলে রক্তজবার মতো।

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।
পারব না আমি হানতে কখনো ক্রূর তরবারি,
যদিও ক্ষুব্ধ হৃদয় আমার, প্রতিশোধ জপমালা।
আত্মশুদ্ধি ঘটে যায় যদি দেখি সন্ধ্যায়
উড়ন্ত দুটি সারস কী সুখে নদীটি পেরিয়ে যায়।

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

যে যেমন খুশি যখন তখন বাজারে আমাকে
নানা ঘটনায় ষড়জে নিখাদে, আমি কি তেমন বাঁশি?
কন্টকময় রক্তপিপাসু পথে হাঁটি একা;
আমার গ্রীবায় এবং কণ্ঠে আগামীর নিঃশ্বাস।

নিহত জনক, অ্যাগামেমনন, কবরে শায়িত আজ।

অত্যন্ত অস্পষ্ট থেকে যায়

অক্ষর সাজিয়ে আমি অক্ষরের রূপে মজে আছি
সারা দিনমান আজও, কত নিদ্রাহীন রাত কাটে
প্রতিমা বানিয়ে অক্ষরের। ক্যালেন্ডারময় সাদা
দেয়ালের মুখোমুখি বসে থাকি প্রহরে প্রহরে।
কখনো হঠাৎ, যেন বিদ্যুতের স্পর্শে বিচলিত,
দাঁড়াই সটান ঘুরে। দেখেছি কি হরিণের লাফ,
অথবা চিতার দৌড় নাকি বলেভিয়ার জঙ্গলে
চেগুয়েভারার কাদামাখা হাত, অস্ত্রহীন, একা,
চির অস্তাচলে! বুঝি তাই বহু দেশে এখনও তো
হয়নি প্রকৃত সূর্যোদয়; স্বাধীনতা ফাঁসিকাঠে
ঝোলে দিকে দিকে, পিঠে চাবুকের কালশিটে
দাগ নিয়ে কুঁজো হয়ে পথ হাঁটে আহত বিবেক।

অক্ষর সাজিয়ে আমি, মনে হয়, রৌদ্রজ্যোৎস্নাময়
স্বাস্থ্যনিবাসের মতো কি একটা স্থাপন করেছি
আমার নিজের বাম পাশে। যে যাই বলুক আজ
এমন কণ্টকময় পথে সোজা শিরদাঁড়া আর
যিশুর চোখের মতো গৌরবের আভাই সম্বল

আমার এবং দ্রুত শ্মশানের আগুন নেভাই।

অনেক সুন্দর নৌকো গহিন নদীর চোরা টানে
দূর নিরুদ্দেশে ভেসে যায়, দেখেছি কি দেয়ালের
শূন্য বুকে? মাঝে-মধ্যে নাগলতা আমাকে জড়িয়ে
ধরে আর অন্ধকারে স্বপ্নের মতন নিরিবিলি
আলখাল্লা কম্পমান। 'আয় তুই আমার হৃদয়ে'
বলে গাঢ় কণ্ঠস্বরে আমাকে স্বপ্নের শুভ্রতায়
ডাকেন মৌলানা রুমি নাকি হো চি মিন, বোঝা দায়;
স্বপ্নের কিছু স্পষ্ট কিছু অত্যন্ত অস্পষ্ট থেকে যায়।

বহুদিন পর একটি কবিতা

বহুদিন পর একটি কবিতা লেখার জন্যে কদম ফুলের মতো
শিহরিত আমার স্নায়ুপুঞ্জ অর্থাৎ
অর্থাৎ আমি পুনরায় সরু দড়ির পথিক,
আমার দিকে নিবদ্ধ হাজার হাজার উৎসুক চোখ।
যতক্ষণ দড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছি চমৎকার,
খেলা দেখাতে পারছি হরেক রকম,
ততক্ষণ দশদিক-কাঁপানো করতালি
আর পা হড়কে পড়লেই থমথমে নিস্তব্ধতা, পরমুহূর্তেই
ছি ছি ধিক্কার।

বেশ কিছুকাল হাঁটেনি শয্যাবন্দি যে মানুষ, সে যেমন একটু পা
চালিয়ে
পরখ করে নেয় নিজের চলৎশক্তি,
তেমনি হড়বড়িয়ে এই লিখে ফেলছি পঙ্‌ক্তিমালা; অথচ
এতদিন পর বাস্তবিকই বাক্যগুলি খুব
যত্নে সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়া দরকার।

কে না জানে কবিতার একটি প্রকৃত পঙ্‌ক্তি রচিত হবার আগে
বহু বাক্য অস্ত যায়, ঝরে যায় অনেকানেক
উপমার কুঁড়ি আর দুটি বাক্যের ব্যবধানে
দীর্ঘস্থায়ী হয় ঈগল আর পাহাড়ি গিরগিটির বিবাদ,
ঝিলের ধারে পড়ে থাকে
বাঘ-তাড়িত ত্রস্ত হরিণের খাবলা খাবলা মাংস,

থাকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে
কম্পমান খরগোশ; কখনো সখনো
কবরের স্তব্ধতাও, কখনোবা নবজাতকের জন্মধ্বনি।

এখন আমি হাতে কলম তুলে নিয়েছি
এমন একটি কবিতা লেখার জন্যে, যার ডান গালে
টোল পড়ে সুন্দর,
যার চোখ নীলিমায় সন্তরণশীল,
যার পরনে নীল শাড়ি, মেঘলা খোঁপায় রক্তজবা,
যার নখ সূর্যোদয়ের রঙে সজীব,
যার কণ্ঠস্বরে রাত্রির মমতা, যুগল পাখির
শব্দহীন ভালোবাসা আর গহিন অরণ্যের বুকচেরা জ্যোৎস্না।
সত্যের মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে জানালার ধারে
বৃষ্টির দুপুরে,
ফুল ছাড়া কোনো অলঙ্কার তার নেই,
সত্যের কোনো অলঙ্কারের দরকার হয় না।

এই মধ্যরাতে একটি কবিতা হৃৎপিণ্ডের মতো স্পন্দিত
হচ্ছে, বেড়ে উঠছে, যেন নানা অলিগলি,
লতাগুল্মময় পথ আর কোনো একটি বাড়ির
নিদ্রাতুর ঘরের জানালা-ছুঁয়ে-আসা স্মৃতি।

আমার ভেতরে যখন কবিতা বেড়ে ওঠে মুহূর্তে মুহূর্তে,
আমি দেখি বরহীন বরযাত্রীগণ আর্তনাদ করতে করতে
গড়িয়ে পড়ে যান খাদে,–
সে আর্তনাদে গুলিবিদ্ধ রাজহাঁসের ক্রন্দন,
সতীদাহের চোখে-জ্বালা-ধরানো ধোঁয়ার ভয়ঙ্কর উদ্‌গীরণ–
দেখি একজন ক্ষ্যাপাটে বাঁশি-অলা ফুটপাথে গেরস্থালি
করতে এসে পরিবারসহ ফৌত হয়ে যায় ব্যাপক মড়কে;
নরকের গনগনে ধূম্রজাল ছিঁড়ে
বাতিল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আসে
এক অচিন বালক, তার কাঁধে ত্রিকালজ্ঞ পাখি,
মাথায় বর্ণিল পালকের মুকুট।
এখনও মানুষ বালিশে মুখ চেপে ডুকরে ওঠে বলেই,
এখনও মানুষ বড় একা একা থাকে বলেই,
রাতের তৃতীয় প্রহরে কারো আঙুলের ফাঁকে

সিগারেট পুড়ে যায় বলেই,
দিনান্তে কিংবা মধ্যরাতে অন্ধকারে ঘরে ফিরে কেউ বাতি জ্বালে বলেই,
অতিশয় ক্লান্ত পথিক বনবাদাড়ে দিক ভুল করে বলেই,
মাঝে-মধ্যে টেলিফোন সবচেয়ে সুকণ্ঠ পাখির মতো
গান গেয়ে ওঠে বলেই,
গেরস্তের সংসার থেকে কখনো কখনো নিরুদ্দেশযাত্রা আছে বলেই,
প্রতিশ্রুতিময় হাতের কাছে আজও হাত এসে যায় বলেই,
ম্লান জ্যোৎস্নায় শেষরাতে নৌকো ঘাট ছেড়ে যাত্রা করে বলেই,
মনের পর্দায় রোমান পলনেস্কির ছবির মতো ভয়াবহতা
কম্পমান বলেই,
অসুখী বিবাহের মতো নক্ষত্র, ভিখিরির ন্যাকড়া, ঈগল
আর গুবরে পোকার সম্মিলন আছে বলেই,
প্রাচীন মিসরীয় সমাধির অন্তর্গত চিত্ররাজির মতো স্মৃতি খেলা
করে বলেই,
এক-গা ভস্ম ঝেড়েঝুড়ে কবিতা জেগে উঠে
মাটির ঠোঁটে চুমো খায় আর বিখ্যাত উড়াল দ্যায় মেঘের মহালে।

আমার অন্তর্গত সরোবরে চঞ্চু ডুবিয়ে ডুবিয়ে
প্রাণ সঞ্চয় করছে যে-কবিতা
তা অপলক তাকিয়ে থাকে আরেক কবিতার দিকে
এবং সেতুবন্ধের গান গাইতে গাইতে চুম্বন হয়ে চলে যায়
তার দিকে, যার পায়ের কাছে শায়িত শীয়ামিজ বেড়াল,
যার দোরগোড়ায় এক তরুণ তেজী ঘোড়া
রহস্যের ছন্দে গ্রীবা দুলিয়ে দুলিয়ে
কেবলি স্বপ্ন ছড়াচ্ছে সেই কবে থেকে, প্রহরে প্রহরে।

বিপর্যস্ত গোলাপ বাগান

গোলাপ আমাকে দিয়েছে গোলাপ
বৃষ্টিসিক্ত তামস রাত্রিশেষে।
অথচ বিশ্ব বিষকালো আজ
হিংস্র ছোবলে, ভীষণ ব্যাপক দ্বেষে।

কাল রাত্তিরে যার পদরেখা
পড়েছে আমার নিঝুম স্বপ্নপথে,
সেকি সক্ষম প্রলেপ বুলোতে

স্মৃতি সংকুল আমার পুরোনো ক্ষতে?

কাজের গুহায় আমি ইদানীং
শুনি মাঝে মাঝে টেলিফোনে যার গলা,
মধ্য বয়সে ম্লান গোধূলিতে
তাকে প্রিয়তমা কখনো যাবে কি বলা?

স্বরচুম্বনে শিহরণ জাগে
অভিজ্ঞ হাড়ে, শিরায় জোনাকি জ্বলে।
সভ্যতা দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু হয়,
মানবতা ক্রমে চলেছে অস্তাচলে।

গণবিভ্রমে ভ্রষ্ট জনতা
নতজানু কত মেকি দেবতার কাছে।
ঘোর মরীচিকা, কাঁপে দশদিক
নাৎসি-প্রেতের বিকট ঘূর্ণি নাচে।

ধর্মপসারী বুড়ো শকুনের
পাখসাটে আজ ইরানে বধ্যভূমি।
ডাগর বর্ষা ডাকে নিরালায়-
স্মৃতির প্রতিমা, এখন কোথায় তুমি?

বিপর্যস্ত গোলাপ বাগান,
শুষ্ক ডালে বুলবুল বীতগান।
ভুল লক্ষ্যের দিকে সংকেত
দেখায় দিশারী, ডেকে আনে পিছুটান।

তেহরানে নামে দুপুরে সন্ধ্যা,
যখন তখন ঘাতকের গুলি ছোটে;
হাফিজের আর সাদীর গোলাপ
কবি সুলতানপুরের হৃদয়ে ফোটে।

এবং নাজিম হিকমত পচে
কারাকুঠুরিতে পুনরায় দিনরাত,
ফুচিক ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ায়,
তোলে গৌরবে মুষ্টিবদ্ধ হাত।

নেরুদা আবার শিউরে ওঠেন,
এখনই পঙ্গু, ঈগল সাম্যবাদ?

মাদ্রিদ আর চরাচর জুড়ে
লোরকা করেন কৃষ্ণ আর্তনাদ।

শিকারি কুকুর তাড়িত একাকী
রুশ কবি মৃত তুষার-ধবল ত্রাসে;
নিরুদ্দিষ্ট তার ছায়া আজও
মৌন স্মৃতিতে বার বার ফিরে আসে।

প্রতারিত চোখে দেখি অবিরাম
পথে-প্রান্তরে ছিন্ন মুণ্ড দোলে।
নিষ্ফল আমি, কী ফল ফলবে
অকালেই গাছ বজ্রদগ্ধ হ'লে?

ঋতু না ফুরাতে গোলাপ ফুরায়,
মৃত্যু নিয়ত জীবনের প্রতিবেশী।
প্রেত-সৈকতে অদীন ভেলায়
আসবে কি তুমি কান্ত মুক্তকেশী?

কবির অশ্রুর চেয়ে দামি

আমি কি অজ্ঞাতবাসে আছি? এ-রকম থেকে যাব
গোপনীয় মনোকষ্টে ডুবে বহুদিন দলছাড়া?
কীট-পতঙ্গের সঙ্গে উচ্চারণহীন মেলামেশা,
বিষণ্ন বিকেলে হ্রদে ভাসমান প্রেমিকের জামা,
আর ঊর্ণাজালের মতন ঝোপঝাড়ে তেজী আলো,
মাথার ওপর উড্ডয়নপরায়ণ একা দীর্ঘপদী পাখি—
ভাবি আজও নিসর্গের পৃষ্ঠপোষতা
রয়েছে অটুট। গোধূলিতে খোলামেলা
ঢিবির ওপরে ব'সে দেখি জীবনের ঢ্যাঙা ছিরি!

জীবন আমার হাতে কোন সে ঠিকানা গুঁজে দিয়ে
দেখিয়েছে খোলা পথ; পথে
তৃণ ছিল, কাঁটাঝোপ ছিল, ছিল সাঁকো,
হরিণের লাফ ছিল, উজ্জ্বল সাপের
হিসহিস ছিল, কিছু কাটাকুটি, কিছু ভুল ছিল—
ভাবতে-ভাবতে হাঁটি, কায়ক্লেশে হাঁটি,

কখনো নিঝুম ব'সে থাকি পথপ্রান্তে, ক্ষ'য়ে-যাওয়া
দাঁতে ছায়া চিবোতে-চিবোতে দিন যায়।

দিন যায়,
কখনো-কখনো খুব সহজে যায় না।
কোনো-কোনো ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই কষ্ট পাই,
বিষণ্নতা ব্যেপে আসে শ্রাবণের মেঘের মতন,
উদ্যানের পাশে,
কী এক সৌন্দর্য ফৌত হয়ে প'ড়ে থাকে, মনে হয়
পুরোনো কবর থেকে কোনো পূর্বপুরুষ আমার
বেরিয়ে এলেন পৌরপথে, প্রতিকার চেয়ে-চেয়ে
পুনরায় ত্বক-মাংস তাঁর খ'সে যায়, খ'সে যায়,
বুজে আসে কবরের চোখ। দিন খুব
দীর্ঘ লাগে, দীর্ঘশ্বাসে-দীর্ঘশ্বাসে প্রহর উদাস।

মাঝরাতে যখন ভীষণ একা আমি,
যখন আমার চোখে ঘুম নেই একরত্তি, আমি
বিপর্যস্ত বিছানায় প'ড়ে আছি ক্রসের মতন,
তখন অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে
কে এক নৃমুণ্ডধারী অশ্ব এসে বলে :
শোনো হে তোমার
নিজের শহরে আজ আমাদের রাজ
পাকাপোক্ত হ'ল;
দ্যাখো শহরে আমাদের সংকেতবহুল
পোস্টারে-পোস্টারে
ছেয়ে গ্যাছে শহরের প্রতিটি দেয়াল আর ছায়া-কেবিনেটে
জ্যোতিশ্চক্রগুলি নৃত্যপর, কবিসংঘ এই অশ্ব সমাজের,
মানে আমাদের সমর্থনে দিনরাত্রি
বেহাল কাটায় দীর্ঘ স্তোত্র রচনায়।

তোমার শহরে, শোনো, একটিও ভিক্ষুক নেই আর।
হাসপাতালের সব বেড খালি, কেননা এখন
আর রোগী নেই কেউ। পাগলাগারদও আজ বাসিন্দাবিহীন,
অতিশয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকগুলো কুচকাওয়াজের ঢঙে
দিব্যি হেঁটে যায়
নতুন মুদ্রার মতো চকচকে রাস্তায়-রাস্তায়!

বাছা-বাছা যুক্তিবাদী রাজনীতিবিদ
পরিবর্তনের গূঢ় পতাকা পকেটে পুরে নব্য খোয়ারিতে
ছায়াস্নিগ্ধ বনভোজনের চমৎকার
মাংসরুটি খেয়ে
দাঁত খুঁটছেন ঘন-ঘন আর মাঝে-মাঝে
দরাজ গলায় গান ধরেন পার্টিতে ফের অকস্মাৎ ঘুমিয়ে পড়েন
প্রতারক জ্যোৎস্নার কার্পেটে।

ফলস অ্যালার্ম শুনে ভয় পেও না বেহুদা, ছুটে
যেও না বাইরে, চোখ-কান বুজে প'ড়ে থেকো নিজস্ব শয্যায়
বিপদকে গ্রেপ্তার করেছি আমরা, বিপুল ধ্বংসকে
পাঠিয়েছি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, তোমার নিজের
শহরকে খলখলে রক্ষিতার মতো সাজিয়ে দিয়েছি
আপাদমস্তক অহংকারী অলংকারে।

আমার ব্যর্থতা
কবরখানার হলদে ঘাসে নাঙা সন্ন্যাসীর মতো
শুয়ে তাকে সাবলীল,
আমার ব্যর্থতা ফণিমনসার মতো তীক্ষ্ণ অহংকারে
রৌদ্রজ্যোৎস্না পোহায় নিয়ত,
আমার ব্যর্থতা টাওয়ারের প্রতি বাড়িয়ে দু'হাত
ধুলোয় গড়াতে থাকে কখনো-বা শিস দিতে-দিতে
চলে যায় নিরুদ্দেশে, বেকার যুবার মতো ছেঁড়া জুতো পায়ে
পথে-পথে ঘোরে,
সর্বস্বান্ত নবাবের মতো চেয়ে থাকে সূর্যাস্তের দিকে বড়
উদাসীন, গলির দোকান থেকে সিগারেট কেনে ধারে আর
আমার ব্যর্থতা ব্যর্থ কবির মতন
খুব হিজিবিজি কাটাকুটির অরণ্যময় কালো খাতা খুলে
ব'সে থাকে, সিগারেট ঠোঁটে, ছাই ঝরে যায়, শুধু
ছাই ঝরে যায়।

এইসব কথা লিখে অধিক রাত্তিরে কবি ধূসর বালিশে
মুখ চেপে কাঁদে, রক্তে মাংসে হাড়ে ও মজ্জায় ঝরে
কান্না ঝরে অবিরল।
কবির অশ্রুর চেয়ে দামি মায়াময় অন্য কিছু আছে কি জগতে?

৩১৩, তুমি ফিরে এসো

স্বপ্নের ভেতরে পেয়েছি একটি সংখ্যা, তিনশো তের,
৩১৩ হীরের লকেটের মতো দোলে
সারাক্ষণ দৃষ্টিপথে, মায়াবী।
এই সংখ্যা দুলে উঠলেই অজস্র ময়ূর পেখম মেলে
আমার একলা ঘরে, অবিস্মরণীয়ভাবে
গোলাপ বাগান উন্মীলিত হয় মেঝে ফুঁড়ে হঠাৎ,
দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসে সিংহাসন।
এই সংখ্যা দুলে উঠলেই
একজন তৃষ্ণার্ত পথিককে দেখি আঁজলা ভরে ঝরনা তুলে নিতে,

প্রাচীন গীতে গুঞ্জরিত হয় সত্তা,
নাবিকের নিরাপত্তাময় জলপথে নামে গোধূলি বেলা,
প্রেমিকের ওষ্ঠে ঝরে শত চুম্বন, মধুর, মদির,
বারবার ফিরে আসে বিয়ে বাড়ির চিত্রিত কুলো
আর রঙিন মাটির প্রদীপ।

এই স্বপ্নাদ্য সংখ্যা
কিসের যোগফল কিংবা গুণফল, জানি না,
অবশ্যই পুণ্যফল মানি।

যখন ৩১৩ রবারের মতো বাজে
এই শহরের সকল মূকের কণ্ঠ থেকে ঝরে দিব্য সংগীত,
যখন ৩১৩ একটি বাক্যশোভা,
এই শহরের ব্যর্থতম কবির লেখনী হয় সফল কবিতার উৎস,
যখন ৩১৩ নীল নক্ষত্রের মতো জ্বলে,
প্রতিটি পথভ্রষ্ট পান্থজন তার গন্তব্যে পৌঁছে যায়,
যখন ৩১৩ হাতের মতো প্রসারিত হয়,
হতচ্ছাড়া তীরভূমি হয়ে যায় সবচেয়ে সম্পন্ন বন্দর,
নাবিকের গানে আর সুন্দরীদের গুঞ্জনে মুখর,
যখন ৩১৩ মসলিনের রুমালের মতো ওড়ে,
বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক সংঘর্ষসমূহ যায় থেমে,
যখন ৩১৩ চোখের তারার মতো কাঁপে,
এই শহরের অন্ধ সম্প্রদায় একসঙ্গে ফিরে পায় দৃষ্টি,
এই শহরের সকল নৈরাশ্যবাদীর বুকের ভেতর
গান গায় জলকন্যা,

৩১৩ যখন দরবেশের তসবিহ,
ধাবমান ক্ষুধার্ত বাঘ হরিণকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দেয়
সীমাহীন নিস্পৃহতায়,
নিষ্ঠুরতম জল্লাদের হাত বেহালা হয়ে বাজে,
সবচেয়ে বিপজ্জনক চোরাবালি বদলে যায় পার্কে,
ভয়াল ময়াল রঙধনুর বর্ণচ্ছটায়।

এই যে আমি স্বপ্নাদ্য একটি সংখ্যা নিয়ে মেতে আছি,
এই আমাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে
অনেক খানাখন্দে পড়েছি কাঁটাতারে আটকে আমার
হাত-পা হয়েছে জখম, তবু কোনো
কূলকিনারা হয়নি, শুধু রূপসীর হাসির মতো
একটা মরীচিকা আমাকে ডেকে নিয়ে গেছে বারংবার।

কে আমি? কী-ইবা আমি? সেই
চিরকেলে প্রশ্ন করি নিরন্তর নিজেকেই। এখানে
এসেছি কেন? কী কর্তব্য আমার?
আখেরে কোথায় যাব? এই যে ব'সে থাকি নিশ্চুপ,
চোখ রাখি গাছের মগডালে, শুনি টিকটিকির ধ্বনি।
মাঝে-মধ্যে ভাবি ঐ গাছের বাকল এসে লাগবে আমার শরীরে,
হয়তো আমাকে দেয়াল ভেবে জন্মান্ধজন
উন্নয়নশীল দেখে ঘনিয়ে-আসা দুর্নীতির মতো অন্ধকারে
পথ চলবে। স্বরূপ অন্বেষায় ক্লান্ত আমি

পথের নকশা হারিয়ে ফেলেছি—
কেউ কি আমাকে বলে দেবে অনেক আমির ভিড়ে
কোন আমি বাস্তবিকই আমি?
বলে দেবেন কি কোনো যিশু কিংবা শাক্যমুণি?

একপাল ডালকুত্তা-তাড়িত কয়েদি যেমন
ভূলুণ্ঠিত হয়ে খিমচে ধরে মাটি কিংবা শেকড়বাকড়
তেমনি আমি হাত বাড়িয়েছি সেই আমার
স্বপ্নাদ্য সংখ্যাটির দিকে স্বপ্নাদিষ্ট পুরুষের মতো।

৩১৩ যখন কোনো গুণীর সর্বদা-তরুণ কণ্ঠের তান,
রাজবন্দিগণ দেবদূতের মতো উড়ে যান নীলিমায়
জন্মান্ধ সেল ছেড়ে,

লাঞ্ছিত, নির্যাতিত জননেতা ভূষিত হন জয়মাল্যে,
স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রপুঞ্জে জনগণ বাক-স্বাধীনতা ফিরে পান
অবলীলায়।

৩১৩, তুমি ফিরে এসো আমার চোখের পাতায়,
ফিরে এসো করতলে, ফিরে এসো আমার
স্বপ্নে, জাগরণে, যেমন শস্য ফিরে আসে
ভাগ চাষীর ভাবনায়, দুঃসহ জীবন যাপনে, বুকের ভেতরে,
৩১৩, তুমি ফিরে এসো।

সক্রেটিস-১

এ-কথা সবাই জানে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস
ব্যতিক্রমী মত প্রকাশের দায়ে নিজহাতে বিষ
করেছেন পান কারাগারে। মৃত্যু উঠেছিল নেচে
যখন সে প্রাজ্ঞ ওষ্ঠে কালো মোরগের মতো, বেঁচে
ছিলেন গৃহিণী তাঁর, ছিল ছেঁড়াখোঁড়া সংসারের
স্মৃতিচিত্র, হাট-বাজারের সংলাপ, তরুণদের
নিয়ত সত্যাভিসারী দৃষ্টিপাত। তখন কি তাঁর
পড়েছিল মনে এইসব খুঁটিনাটি? নাকি জগৎ সংসার
কুটোর মতোই ভেসে গিয়েছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন স্রোতে।
অথচ সহজ ছিল আত্মরক্ষা; যদি সত্য হতে
ফিরিয়ে দিতেন মুখ, তাহলে নিঃশ্বাস নির্বাসনে
যেতনা তখনই, আরো কিছুকাল নিকানো উঠোনে
পড়ত পদচ্ছাপ। সবই অধিবাস্তবের প্রহেলিকা
জেনেও নিলেন বেছে হেমলকী স্বাদ অকম্পিত শিখা।

সক্রেটিস-২

এবং সত্যের মুখ দেখেছিলেন বলেই তিনি,
সক্রেটিস, সয়েছেন নির্যাতন, অকাতরে পান
করেছেন হেমলক– এই আত্মাহুতির পুরাণ
চিরঞ্জীব; বিশ্বচরাচরে এভাবেই ছিনিমিনি
খেলা খেলে যুগে যুগে পরাক্রান্ত কবন্ধ সমাজ

চক্ষুষ্মানদের নিয়ে। আপোষের ক্লিন্ন যষ্ঠি হাতে
এখানে সেখানে ঘোরা কখনো ছিল না তাঁর ধাতে,
তাই আজও আমাদের ভাবলোকে তিনি মহারাজ।

তবে কি একাই তিনি নির্যাতিত নিগৃহীত
খ্রিস্টপূর্বকালে? তাঁর সমকালে হয়নি শিকার
অন্য কেউ দাঁতাল অমানবিক হিংস্র অন্ধতার?
অবশ্যই আরও কেউ কেউ হয়েছেন বলি নিজ
নিজ মত প্রকাশের দায়ে; ইতিহাস আড়ালেই
রেখেছে তাঁদের, তবু তাঁরা সত্যেরই অচিন বীজ।

স্থানীয় সংবাদ

আমার জানালা থেকে দেখি লক্ষ লক্ষ মৃত পায়রা
স্তূপ হয়ে পড়ে আছে চৌদিকে। পাঁচ মিনিটে পাঁচ হাজার
ঝকঝকে মোটরকার গুঁড়িয়ে যায় সড়ক দুর্ঘটনায়।
একটা অগ্নিকুণ্ডের ভেতরে পুড়ছে
পলাশী, নবাব সিরাজদ্দৌলার মুকুটে
সূর্যাস্তের রক্তরশ্মি ঝলসে ওঠে বারংবার।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তাড়া তাড়া নোট
এক ঝাঁক ক্রুদ্ধ পাখি হয়ে ঠোকরাচ্ছে পথচারীদের;
হাজার হাজার কাঠমোল্লার আকাট হৈ হল্লায়
ডুবে যাচ্ছে প্রগাঢ় উচ্চারণ। শক্তিশালী কবিসংঘ
অষ্টপ্রহর মেতে রয়েছে বাথরুমের দরজা-জানালা, পাইপ,
বেসিন আর কমোড সারাবার কাজে এবং
কুকুরের পাল কবিতা উগরে দিচ্ছে মধ্যরাতে।
রাজনীতিকগণ কুসীদজীবীর কাছে সত্যকে বন্ধক রেখে
মজেছেন ফটকাবাজারের তেজিমন্দিতে।
স্বর্গতন্ত্রের দোহাই পেড়ে
মৃতেরা সোৎসাহে কবর দিচ্ছে জীবিতদের!
ডালের বাটিতে মরা মাছির মতো ভাসছে একদা-সুখী গ্রাম,
বিস্কুটে কামড় দিতে গিয়ে মনে হয় দুঃস্বপ্ন চিবুচ্ছি
আর আমার উদরে ঘুন্টি-অলা গলা ঢুকিয়ে দ্যায়
ইমরুল কয়েসের উট,
যে মেয়েকে চুমো খেতে যাই, তারই মুখে নিমেষে
গজিয়ে ওঠে ফণিমনসার বন,

বাহুমূলে পুরনো উই ঢিবি।
খুনখারাবির কাল এখনও হয়নি শেষ, এদিকে
আহত মুক্তিযোদ্ধার বিবর্ণ ক্রাচে ধরেছে ঘুণ।

এবং নবাব সিরাজদ্দৌলা করতলে,
নিজের কাটা মস্তক নিয়ে আর্তনাদ করতে করতে
হোঁচট খেতে খেতে চলেছেন বাংলাদেশের নতুন মানচিত্রে।

রুস্তমের স্বগতোক্তি

কেমন সূর্যাস্ত এলো ছেয়ে চরাচরে রক্তচ্ছটা
সর্বত্র ভীষণ জ্বলজ্বলে, ধরায় দারুণ জ্বালা
আমার দু'চোখে, আর যেদিকে তাকাই দেখি শুধু
একটি ফ্যাকাশে মুখ নিষ্প্রভ তরুণ ফল যেন,
ভূলুণ্ঠিত গোধূলিতে। ঝকঝকে বল্লমের মতো,
মনে পড়ে, উঠেছিল ঝলসে সে ক্রূর রণক্ষেত্রে
সুকান্ত তেজস্বী যুবা। যদিও দুরন্ত যোদ্ধা, তবু
ছিল না ঔদ্ধত্য কিংবা কর্কশতা কণ্ঠস্বরে তার।
যেমন সে অশ্বারোহণে কি অস্ত্রশিক্ষায় নিপুণ
তেমনি পারদর্শী বাক্য উচ্চারণে, সৌজন্যে ভাস্বর।
শত্রুসংহারের নেশা যে-বীরের শিরায় শিরায়
অত্যন্ত ফেনিল তার কণ্ঠস্বরে রবারের সুর
পাখির ওড়ার মতো, কখনো জানিনি আগে;

হায়,
যে অন্ধ কৃষক তীক্ষ্ণ কাস্তের আঘাতে স্বপ্নময়,
সাধের ফসল তার কেটে ফেলে অকালে, আমিও
তারই মতো বিভ্রমের মনহুশ ঊর্ণাজালে বন্দি
হয়ে নিজ হাতে ক্ষিপ্র করেছি বিরানা এই বুক,
আমার বয়েসী বুক। যে-মহল গড়েছি নিয়ত
স্বপ্নে, যখন তা কাছে এলো আসমানী ইশারায়
প্রকৃত নির্মাণ হয়ে, নিজেই করেছি তাকে ধু-ধু
ধ্বংসস্তূপ। কেন তাকে দেখামাত্র হৃদয় আমার
হয়নি উদ্বেল পিতৃস্নেহে? নিমেষেই কেন চোখ
হয়নি বিপুল বাষ্প কুল? তবে কি রক্তের টান
দুর্মর সংস্কার কোনো? শুধু জনশ্রুতি, যুগ যুগ

ধরে যা লালিত আমাদের যৌথ সরল স্মৃতিতে?
কেন তাকে দেখামাত্র বর্ম খুলে ফেলে, অস্ত্র রেখে
জড়িয়ে ধরিনি বুকে, নিইনি মাথার ঘ্রাণ তার?
তাহলে পাঁজরে তার বর্শা-চালনার আগে কেন
কাঁপেনি আমার বুক একরত্তি? কেন এই হাত
মুহূর্তে হয়নি শিলীভূত? জয়মত্ত বীর আমি,
হইনি স্থবির কেন ক্ষণকাল? কেন অহমিকা
রৌদ্রঝলসিত শিরস্ত্রাণ হয়ে রইল সর্বক্ষণ?
ধিক তোকে হে মূঢ় অহমিকা, ধিক।

তাহমিনা,
মিথ্যার অক্ষরে কেন লিখেছিলে বিভ্রান্ত খেয়ালে
প্রতারক পত্র তুমি আঠারো বছর আগে? কেন
পুত্রের পিতাকে রেখেছিলে পুত্রহীন করে, কেন?
তুমি তো জানো না এই হতভাগ্য পিতা পুত্রহীন
হয়েছে দ্বিতীয়বার। তুমি তো জানো না তাহমিনা
তোমার দুলাল আজ এই বিয়াবানে কী নিষ্প্রাণ
কী নিস্পন্দ পড়ে আছে অশ্রুময় ঘাতক পিতার
ফজুল স্নেহের খিমাতলে!

কেন আমি আজ তাকে
মিছেমিছি করি দায়ী? রাখশারোহী রুস্তম কি ছুটে
পারতো না যেতে ভুল আত্মজার জন্মের সংবাদ
পেয়ে? কেন সে যায়নি পাঁচ দশ মাস পরে কিংবা
দু'চার বছর পরে? কেন তার রক্তে জাগেনি কল্লোল
সন্তানের আকর্ষণে? কন্যা কি সন্তান নয় তবে?
কন্যার ওষ্ঠে কি হাসি ফোটে না কখনো কিংবা তার
মাথায় থাকে না ঘ্রাণ? কন্যা কি পিতাকে দুই হাতে
ধরে না জড়িয়ে? পুতুলের জন্যে করে না আবদার
কোনো দিন? থাকে না প্রবাসী জনকের প্রতীক্ষায়?
কন্যার শিরায় প্রবাহিত হয় না কি জনকের
সতেজ শোণিত ধারা? অনবোলা পরিন্দা সে-ও তো
যোজন যোজন দূর থেকে উড়ে আসে নীড়ে তার
শাবকের কাছে স্নেহবশে, সন্তান পুত্র কি কন্যা
করে না বিচার। হায়, কোন অভিশাপে হে রুস্তম
রণমত্ত অবিচল স্নেহহীন প্রবাদ প্রতিম বীর, তুমি

রেখেছ নিজেকে দূরে এতকাল দয়িতা এবং
সন্তানের কাছ থেকে? কী এমন ক্ষতি হতো কার

যদি এ যুদ্ধের ডঙ্কা স্তব্ধ হতো অনেক আগেই,
যদি দৈববলে আফ্রাসিয়াবের রণমত্ততার
হতো অবসান এই সর্বনাশা দ্বৈরথের আগে,
যদি কায়কাউসের জলপাই পাতা উঠত নেচে
আমার পুত্রের সাথে রুস্তমের মনহুশ বর্শা
উদ্যত হওয়ার আগে? কিন্তু, হায়, তা হওয়ার নয়।
আমরা ধনুক যাঁর হাতে তিনি নিজস্ব ইচ্ছায়
বাঁকান যতটা আমাদের, ততটাই বেঁকে যাই,
কেউ কেউ মচকাই, কেউবা ভীষণ খান খান
লাশ নিয়ে বসে আছি,

এখন ভীষণ ক্লান্ত আমি;
ওষ্ঠময় মরুবালি, সারামুখে খুনেলা রেখার
হিজিবিজি, মনে হয় হৃতজ্যোতি প্রবীণ ঈগল
সত্তায় নিয়েছে ঠাঁই। শুধু মাঝে-মাঝে পামীরের
উদাত্ত প্রান্তরে আর আলবুরুজের চূড়া থেকে
ভেসে-আসা সোহরাব সোহরাব ধ্বনি, যা আমারই
শূন্য পাঁজরের আর্তনাদ, শুনে কেঁপে উঠি, যেন
মরুর শীতার্ত রাতে আহত নিঃসঙ্গ পশুরাজ।

এই আমি কতদিন ছাগলের চামড়ার মশক
থেকে ঢেলে আকণ্ঠ করেছি পান ঝাঁঝালো শারাব
ইয়ারের মজলিশে রাত্রির তাঁবুতে। আকৈশোর
মৃগয়াবিলাসী আমি, ছুটেছি অরণ্যে, দীর্ঘশ্বাস-
ময় প্রান্তরের বুকে, কী এক নেশায় বুঁদ হয়ে
করেছি শিকার বাঘ, সংখ্যাহীন পাহাড়ি হরিণ।
মাজেন্দারানের পথে লড়েছি সিংহের সঙ্গে আর
হয়েছে নিমেষে দীর্ণ আমার নেজায় ভয়ানক
আতশবমনকারী অজগর; পাথুরে জমিনে,

রেগিস্তানে কত যে মড়ায় খুলি প্রত্যহ উঠেছে
বেজে দ্রুত হাওয়া-চেরা রাখশ-এর প্রখর খুরাঘাতে,
সফেদ দৈত্যের প্রাণ করেছি সংহার, গুহাবন্দি
কায়কাউসের আয়ু-রশ্মি দীপ্র দীর্ঘস্থায়ী
করার উদ্দেশ্যে শত শত গর্বিত বীরের
শিরশ্ছেদ করেছি হেলায় ধূলিগ্রস্ত রণক্ষেত্রে।
শুনিনি এমন যোদ্ধা আছে ত্রিভুবনে, রক্তে যার
জমে না তুষারকণা রুস্তমের রণহুংকারে হঠাৎ।

সোহরাব তোর এই বালিমাখা রক্তাক্ত শরীর,
সেই পরাক্রান্ত চিরজয়ী রুস্তমকে আজ স্তব্ধ
ইরান-তুরাণ ব্যাপী অন্তরাগে করেছে ভীষণ
ক্লান্ত, ওরে, পরাজিত। মিটেছে আগ্রাসী রণক্ষুধা,
আর নয় দুনিয়া-কাঁপানো দামামার অট্টহাসি,
এই তো রেখেছি বর্ম খুলে, পড়ে থাক তলোয়ার।
সোহরাব ফিরবে না আর;

জানি না মৃত্যুর পরে,
সে কেমন পটভূমি রয়েছে সাজানো, কোন মঞ্চ?
পুনরায় ভাঙবে কি ঘুম কোনো ভোরবেলা খুব
নিঝুম খিমায় স্নিগ্ধ হাওয়ার কম্পনে? শিরস্ত্রাণে
পরবে কি খসে দূরযাত্রী রাঙা পাখির পালক?
নতুন সামানগাঁয়ে যাব কি আবার গোধূলিতে
কোনো দিন পথশ্রান্ত? প্রাক্তন প্রিয়ার হাত নেব
তুলে হাতে, দেখব মেহেদি-নক্‌শা তার করতলে
অথবা রহস্যময় কোনো সুর শুনে মরূদ্যান
ছেড়ে চলে যাব দূর কুহকিন নারীর গুহায়?
তুলে নেব হাতে ফের ভল্ল, গদা, আত্মজ হননে
উঠব কি মেতে স্বপ্নাচ্ছন্ন? মৃত্যু শুধু নিরুত্তর
অন্ধকার নাকি আলো ভিন্নতর, জানি না কিছুই।
তবে আজ জোনাকির

আসা-যাওয়া অন্য মানে পায়
আমার নিকট; শোনো রাখ্‌শ, নিত্যসঙ্গী কালশ্রান্ত
হে অশ্ব আমার, নেই অবসর, রাত্রি ছেয়ে আসে,
এখন প্রস্তুত হও. তোমার কেশরগুচ্ছ থেকে
ঝেড়ে ফেল হাহাকার, আমাদের যেতে হবে দূর
আপন শেস্তানে, বইতে হবে প্রিয় সওদা শোকের।
তোমার সওয়ার দুই-একজন মৃত, অন্যজন
জীবন্মৃত; ছোটো, ছোটো নিরন্তর, হে অশ্ব আমার।
আবার দাঁড়াবে এক দুঃখী পুত্রহীন পিতা
নিজের পিতার সামনে, হবে নতজানু, তাঁর কাছে,
নাম যার বীর জাল এবং তুষারমৌলি তার
শির; ফিরে যাব নিজ বাসভূমে সেই সওদাগরের
মতো, যে সর্বস্ব তার হারিয়ে ফেলেছে মরুপথে
প্রবল লুণ্ঠনকারী তাতার দস্যুর ক্রূর হাতে।
কখনো পাব না দেখা তবু

নিরত খুঁজব তাকে,
বিদেহী যুবাকে, দিকে দিকে অন্তহীন বিরানায়.
মরীচিকাময় পথে অন্তর্লোকে, যে আমাকে খুঁজে
বেরিয়েছে এতকাল বালিয়াড়ি, দুর্গম প্রান্তর,
শত্রুর শিবির আর ভূবননন্দিত যোদ্ধাসংঘে।

এখন নামুক শান্তি দিগন্তে দিগন্তে, রেগিস্তানে,
এখন নামুক শান্তি আলবুরুজের জ্যোৎস্নাধোয়া
চূড়ায়, নামুক শান্তি ইতিহাস-তরঙ্গিত এই
আমুদরিয়ায় আর সামানগাঁয়ের গুলবাগে,
ফলের বাগানে, রৌদ্রঝলসিত নহরে নহরে,
দিনান্তে উটের কাফেলায়, হরিণের পিপাসায়,
এখন নামুক শান্তি কায়কাউসের ব্যাঘ্রচর্ম
খিমায় এই আফ্রাসিয়াবের সব অস্ত্রাগারে,
এখন নামুক শান্তি বেবাক তাতারী আস্তানায়,
এখন নামুক শান্তি রণলিপ্সু বিক্ষুব্ধ তুরাণে,
এখন নামুক শান্তি তিমিরান্ধ বিদীর্ণ ইরানে।

হে শহর, হে অন্তরঙ্গ আমার

হে শহর, হে প্রিয় শহর, হে অন্তরঙ্গ আমার,
তুমি কি আমাকে পাঠাতে চাও বনবাসে?
নইলে কেন এই উত্তেজনা তোমার সমগ্র সত্তা জুড়ে?
কেন এই আয়োজন, দাঁতে-দাঁত-ঘষা আয়োজন
প্রহরে প্রহরে? হে শহর, তুমি কি বাস্তবিকই
নির্বাসন বরাদ্দ করেছ আমার জন্যে?

হে শহর, হে প্রিয় শহর, হে মোহিনী আমার,
দেখি এখন তুমি আমার চোখে চোখ রেখে
তাকাতে পারো কি না।
এই তো আমি তোমাকে দেখছি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে,
তোমার চোখ কেন মাটিতে নিবদ্ধ?
কেন এই অস্বস্তির দ্বিধা তোমার চোখে?

তাহলে কি আমি বুঝে নেব যে তোমার চোখ
আমাকে আর চাইছে না?
তাহলে কি আমাকে একথা মেনে নিতে হবে যে,
যে-তুমি আমার শৈশবকে চেটে চেটে বয়স্ক করেছ,
যে-তুমি আমার যৌবনকে ঢেকে দিয়েছ রাশি

রাশি কৃষ্ণচূড়ায়,
যে-তুমি আমার চল্লিশোত্তর আমাকে শাণিত করেছ,
সেই তুমি আমার বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ মনে-মনে?

হে শহর, হে আমার আপন শহর,
তোমাকে ঘিরে আমার কিছু স্মৃতি কাননবালার মতো গান গায়।
তোমার কি মনে পড়ে না একদা কী দিন রাত্রি ছিল আমার?
আমি তোমার বুকে মাথা রেখে
গলা ছেড়ে গান গাইতাম নির্দ্বিধায় প্রহরে প্রহরে।
আমিই তো ছিলাম প্রথম আবিষ্কারক তোমার সৌন্দর্যের।
তোমার সৌন্দর্যের শপথ, আমার আগে অন্য কেউই
এমন মজেনি তোমার সৌন্দর্যে।
তুমি কি ভুলে গেছ সেসব উথাল-পাথাল মুহূর্ত,
যখন দু'পায়ে তুমি আমাকে আঁকড়ে ধরতে আর আমি
তোমার স্পন্দিত স্তনে মুখ রেখে একটা মদির স্বপ্ন হয়ে যেতাম?
আমার আঙুলের বাঁশি তোমার মাংসের স্তরে স্তরে
সুর জাগিয়ে তুলত, তুমি কি ভুলে গেছ?
তোমার কি মনে পড়ে না
তোমার জন্যে কী অক্লান্ত ছুটে বেড়াতাম সূর্যোদয় থেকে
সূর্যাস্তের দিকে,
যেমন প্রাচীন গ্রিক দেবগণ পশ্চাদ্ধাবন করতেন
সুন্দরীদের প্রান্তরে প্রান্তরে, বন-বনান্তরে?
আহ্‌ কী দিন রাত্রি ছিল একদা আমার।

তোমার কটিদেশে হিংস্রতার আস্ফালন দেখতে পাচ্ছি।
তোমার আস্তিনের অন্ধকারে কোনো বাঘনখ লুকিয়ে নেই তো?
তোমার ঝলমলে আংটির গহ্বরে ক'ফোঁটা কালো জহর
জমা করে রেখেছ আমার জন্যে?
তোমার মনের অলিগলিতে কোনো দুরভিসন্ধি নেই,
এ-কথা আজ আমি জোরাল কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারছি কই?

শহর, হে প্রিয় শহর আমার, হে বিশ্বাসঘাতিনী
ইদানীং তুমি আমাকে বড় বেশি সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছ।
তোমাকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করতে পারছি না আর,
চুম্বন এঁকে দিতে পারছি না তোমার রক্তিম ওষ্ঠে—
এ এক চরম শাস্তি যা আমাকে খাচ্ছে কেবলি।
এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি এই দারুণ আড়ালে,
কে জানে কেউ আড়ি-পেতে শুনছে কিনা আমাদের এই কথাবার্তা!
কে জানে ক'জন পঞ্চ ব্যঞ্জনপুষ্ট ঘাতক এখন তৈরি হচ্ছে গুপ্ত

আস্তানায়,

যেখানে মৃত্যু তার ভোগ নিতে আসে,
যেখানে দাঁড়কাকের মতো কী একটা পাখা ঝাপটায় সর্বক্ষণ
যেখানে হাজার হাজার মৃন্ময় বদনা নরমুন্ড হয়ে নাচে
জ্যোৎস্নায়?
ওরা কোনো যূপকাঠ নির্মাণ করছে কিনা ঘোর অমাবস্যায়,
কে আমাকে বলে দেবে?

বুকের রক্ত ঝরিয়ে
যে-বাগান গড়ে তুলেছি দিনের পর দিন,
তুমি তার প্রতিটি ইঞ্চি তছনছ করে দিয়েছ এক অন্ধ ক্রোধে।
একদা যেসব সুন্দর উপহার তুলে দিয়েছিলে আমার হাতে,
নিজের হাতেই তুমি আজ সেগুলি
ছিনিয়ে নিতে চাও আবার? আমার বুকের মধ্যে
যে রুপালি শহর জেগে থাকে তার আশ্চর্য কলরব নিয়ে,
সেখানে তুমি পাথুরে স্তব্ধতা ছড়িয়ে দিতে চাও
কিসের নেশায় হে শহর আমার, হে ভয়ংকর ভাস্কর?

তোমার কাছে গোলাপ প্রার্থনা করে আমি নতজানু,
তুমি কেন ক্যাকটাস ছুড়ে দাও?
তোমার চোখে দেখছি ফলের সম্ভার, পোকাকীর্ণ শব,
বিবাহবাসর, ঘাসঢাকা গোরস্থান, নবজাতকের তুলতুলে শরীর,
বৃদ্ধের তোবড়ানো গাল, যুবকের মসৃণ চিবুক, মরা মাছ,
উড়ন্ত মরাল, কংকালসার মহিষ, যুবতীর গ্রীবা, পোড়ো বাড়ি,
সতেজ ডালিয়া আর লুটেরার লোভী হাত আর সন্তের চোখ,
তোমার চোখে জলন্ত মরুভূমি আর নদী।

হে শহর, হে আমার আদরিণী বেড়াল,
এ তোমার কেমন ঢঙ বলো তো?
যেন তোমাকে আমরা খেতে দিইনি কোনো দিন
সকালবেলার আলোর মতো দুধ,

যেন তোমার নরম পশমে আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকিনি
ঘণ্টার পর ঘণ্টা,
যেন তোমার চোখে চোখ রেখে বলিনি মনে রেখো!

হে শহর, হে প্রিয় শহর, হে অন্তরঙ্গ আমার,
তুমি কি সেই ভীষণ দলিলে সই করে ফেলেছ,
যার প্রতাপে আমি কাঁদব দীর্ঘ পরবাসে?

আমার সঙ্গে কোনো ছলাকলার প্রয়োজন নেই,
তুমি অসংকোচে উচ্চারণ করতে পারো নিষ্ঠুরতম ঘোষণা—
আমি রৌদ্রমাখা ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে যাব
প্রতিবাদহীন, কোনো অভিমানকে প্রশ্রয় না দিয়েই।
তবে যাবার আগে
আমি তোমার সবচেয়ে ভয়ংকর রূপও দেখে নিতে চাই, হে
বিশ্বাসঘাতিনী।
আমি অপেক্ষা করব,
তোমার নীলচক্ষু বৎসদের সকল খেলা গোধূলিতে মিলিয়ে গেলে,
আমি তোমার ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে
সৌন্দর্যের ভিতরে মৃত্যু এবং মৃত্যুর ভিতরে সৌন্দর্য দেখে যাব,
আমি সন্তের মতো অপেক্ষা করব উপবাসে দীর্ঘকাল।

আরাগঁ তোমার কাছে

আরাগঁ তোমার কাছে কোনো দিন পরিণামহীন
এই পঙ্‌ক্তিমালা
জানি না পৌঁছবে কিনা, তবু
তোমারই উদ্দেশ্যে এই শব্দাবলি উড়ে যাক পেরিয়ে পাহাড়
অনেক পুরনো হ্রদ বনরাজি এবং প্রান্তর।
আমার এলসা আজ যৌবনের মধ্যদিনে একা
জীবনকে ফুলের একটি তোড়া ভেবে টেবে আর
গানের গুঞ্জনে ভরে কোথায় আয়নার সামনে চুল আঁচড়ায়,
দীর্ঘ কালো চুল, পা দোলায় কোন সে চত্বরে ব'সে অপরাহ্ণে
কিংবা পড়ে ম্লান মলাটের কবিতার বই কিংবা কোনো
পাখির বাসার দিকে চোখ রেখে কী-যে দ্যাখে, ভাবে
আমি তা জানি না, শুধু তার স্বপ্নের ফোঁটার মতো
গাঢ় দুটি চোখ আর সুরাইয়ের গ্রীবার মতন
গ্রীবা মনে পড়ে।

আরাগঁ আমার চোখে ইদানীং চালশে
এবং আমার নৌকো নোঙর বিহীন, তবু দেখি কম্পমান
একটি মাস্তুল দূরে, কেমন সোনালি।
অস্থিচর্মসার মাল্লা কবে ভুলে গেছে গান, কারো কারো
মাথায় অসুখ, ওরা বিড়বিড় করে আওড়ায়
একটি অদ্ভুত ভাষা, মাঝে-মধ্যে দূর হ দূর হ বলে ঘুমের ভেতরে
কাদের তাড়ায় যেন, আমি শুধু দেখি
একটি মাস্তুল দূরে, কেমন সোনালি।

তরমুজ ক্ষেতের রৌদ্রে নগ্ন পদ সে থাকে দাঁড়িয়ে–
আমার কবিতা।
কখনো আমাকে ডেকে নিয়ে যায় বনবাদাড়ে যেখানে
সাপের সংগম দ্যাখে স্তম্ভিত হুতোম প্যাঁচা, যেখানে অজস্র
স্বপ্নের রঙের মতো ঘোড়া খুরে খুরে ছিন্নভিন্ন করে ঘাস ফুল
কখনো আমাকে ডাকে শহরতলির বর্ষাগাঢ় বাসস্টপে

কখনোবা সিনেমার জনময়তায়,
আমার স্তিমিত জন্মস্থানে
এবং আমার ঘরে খেলাচ্ছলে আঙুলে ঘোরায়
একটি রুপালি চাবি, বাদামি টেবিল ক্লথ খোঁটে
চকচকে নখ দিয়ে– আমার কবিতা।
আবার কখনো তার সুপ্রাচীন তরবারি, মতন বাহুদ্বয়
অত্যন্ত বিষণ্ন মেঘ, তার দুটি চোখ
ভয়ংকর অগ্নিদগ্ধ তৃণভূমি হয়।
যে-বাড়ি আমার নয়, অথচ যেখানে আমি থাকি
তার দরোজায়
কে যেন লিখেছে নাম কৃষ্ণাক্ষরে– অসুস্থ ঈগল।
পাড়াপড়শিরা বলে, মাঝে-মধ্যে মধ্যরাতে জীর্ণ
বাড়িটার ছাদ আর প্রাচীন দেয়াল থেকে তীব্র ভেসে আসে
নিদ্রাছুট রোগা ঈগলের গান, কী বিষণ্ন-গর্বিত গান।

আরাগঁ তোমার মতো আমিও একদা
শত্রুপরিবৃত শহরের হৃদয়ে স্পন্দিত হয়ে
লিখেছি কবিতা রুদ্ধশ্বাস ঘরে মৃত্যুর ছায়ায়
আর স্বাধীনতার রক্তাক্ত পথে দিয়েছি বিছিয়ে কত রক্তিম গোলাপ।

আরাগঁ তোমার কাছে লিখছি সে দেশ থেকে, যেখানে সূর্যের
চুম্বনে ফসল পাকে রাঙা হয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল,
সজীব মুখের ত্বক রুটির মতোই ঝলসে যায়,
যেখানে বিশদ খরা, কখনোবা ভীষণ নির্দয় বানভাসি,
যেখানে শহুরে লোক, গ্রাম্যজন অনেকেই সাদাসিধে,
প্রায় বেচারাই; বলা যায়; আমাদের হালচাল
সাধারণ, চাল-চুলো অনেকের নেই।
আমাদের মাস ফুরোবার অনেক আগেই হাঁড়ি
মড়ার খুলির মতো ফাঁকা হয়ে যায়, দীর্ঘ দুরন্ত বর্ষায়
গর্তময় জুতো পায়ে পথ চলি, অনেকের জুতো নেই।

ধূর্তামি জানি না, মোটামুটি

সাদাসিধে লোকজন আশেপাশে চরকি ঘোরে
এবং দু'মুঠো মোটা চালের ডালের জন্যে ক্ষুধার্ত আমরা
ক্ষুধার্ত সত্তার পূর্ণ সূর্যোদয়, ভালোবাসা নাম্নী লাল
গোলাপের জন্যে
আরাগঁ তোমার কাছে লিখছি সে দেশ থেকে আজ,
যেখানে দানেশমন্দ ব'সে থাকে অন্ধকার গৃহকোণে বুরবক সেজে
জরাগ্রস্ত মনে, অবসাদ-কবলিত কখনো তাড়ায় আস্তে
অস্তিত্বের পচা মাংসে উপবিষ্ট মাছি।
আরাগঁ তবুও জ্বলে গ্রীষ্মে কি শীতে
আমাদের স্বপ্ন জ্বলে খনি-শ্রমিকের বাতির মতন আমাদের স্বপ্ন।

ডেডেলাস

না, আমি বিলাপ করব না তার জন্যে, যে আমার
নিজের একান্ত অংশ, স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ; যাকে আমি
দেখেছি উঠোনে হাঁটি-হাঁটি পা-পা হেঁটে যেতে
আনন্দের মতো বহুবার। যখন প্রথম তার
মুখে ফুটেছিল বুলি, কী যে আনন্দিত
হয়েছি সেদিন আমি; যখন জননী তার ওকে
বুকে নিয়ে চাঁদের কপালে চাঁদ আয় টিপ দিয়ে
যা বলে পাড়াত ঘুম, আমি
স্বর্গসুখ পেয়েছি তখন।
কতদিন ওকে
নিজেই দিয়েছি গ'ড়ে পুতুল এবং
বসেছে সে আমার আপনকার পিঠে, ক্ষুদে অশ্বারোহী।
আমার স্নেহের ঘরে সে উঠেছে বেড়ে
ক্রমান্বয়ে,
আজ সে শুধুই স্মৃতি, বেদনার মতো বয়ে যায়
আমার শিরায়।

কোনো কোনো দিন স্থাপত্যের গূঢ় সূত্র-বিষয়ক চিন্তার সময়
অকস্মাৎ দেখি যে দাঁড়িয়ে আছে আমার শয্যার পাশে
সুকান্ত তরুণ;
ইকারুস, ইকারুস বলে ডাকলেই উজ্জীবিত
দেবে সাড়া। কখনোবা মনে হয় আমার নিজের
হাতে গড়া ডানা নিয়ে দেবে সে উড়াল

দূর নীলিমায়
অসম্ভব উঁচুতে আবার।

না, আমি বিলাপ করব না তার জন্যে, স্মৃতি যার
মোমের মতন গলে আমার সত্তায়, চেতনায়।
সর্বদা সতর্ক আমি, বিপদের গন্ধে সিদ্ধ, তাই
বুঝিয়েছিলাম তাকে সাবধানী হতে,
যেন সে না যায় উড়ে পেরিয়ে বিপদসীমা কখনো আকাশে।
কিন্তু সে তরুণ, চটপটে, ঝকঝকে, ব্যগ্র, অস্থির উজ্জ্বল,
যখন মেলল পাখা আমার শিল্পের ভরসায়,
গেল উড়ে ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে, বহুদূরে,
সূর্যের অনেক কাছে প্রকৃত শিল্পীর মতো সব
বাধা, সতর্কতা
নিমেষে পেছনে ফেলে, আমি
শংকিত অথচ মুগ্ধ রইলাম চেয়ে
তার দিকে, দেখলাম তাকে
পরিণাম বিষয়ে কেমন
উদাসীন, ক্রূর রৌদ্রঝলসিত, সাহসী, স্বাধীন।

না, আমি বিলাপ করব না তার জন্যে, স্মৃতি যার
মোমের মতন গলে আমার সত্তায়, চেতনায়।

যেন আমি এখন উঠেছি জেগে অন্তহীন নির্জন সমুদ্রতীরে একা
আদিম বিস্ময় নিয়ে চোখে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে
নানা কথা, মনে পড়ে বাসগৃহ বহুদূরে ফেলে-আসা কত
স্থাপত্যের কথা, আর নারীর প্রণয়। মনে পড়ে,
আমার সন্তান যেত পাখির বাসার খোঁজে, কখনো কখনো
দেখত উৎসুক চেয়ে আমার নিজের
বাটালি ছেনির চঞ্চলতা। মনে পড়ে
দেবতার মতো স্তব্ধ আলোচ্ছ্বাস, তরুণের ওড়া
ভয়ংকর অপরূপ দীপ্তিময়তায়। তার পতন নিশ্চিত
বলেই হয়তো আমি তাকে আরও বেশি ভালোবেসেছি তখন।
পিতা আমি, তাই সন্তানের আসন্ন বিলয় জেনে
শোকবিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ পাখির মতন দিশাহারা;
শিল্পী আমি, তাই তরুণের সাহসের ভস্ম আজ
মৃত্যুঞ্জয় নান্দনিক সঞ্চয় আমার।

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৮৮ [ফেব্রুয়ারি ১৯৮২]
প্রকাশক সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী
উৎসর্গ-পত্র কায়সুল হক
বন্ধুবরেষু

চাঁদ সদাগর

আমি কি এখন সত্যি বেঁচে আছি? না কি জীবন্মৃত
পড়ে আছি বিড়ম্বিত মাস্তুলের মতো। বণিকের
খ্যাতি আছে কিছু টিকে, অথচ যাই না বাণিজ্যেতে
কতকাল, কতকাল সপ্তডিঙ্গা ভাসে না তরঙ্গে
সমুদ্রের জ্বলজ্বলে প্রাসাদের মতো হা আমার
মধুকর সেই কবে গেছে ডুবে কালীদহে। শুধু
আমি একা মাঝিমাল্লাহীন নির্বান্ধব খরস্রোতে
ভেসে ভেসে জলচর প্রাণীর লোভের বিভীষিকা
নিয়ত প্রত্যক্ষ করে পৌঁছে গেছি তীরে, কী বিহ্বল
ঠেকিয়ে মাটিতে মাথা ঘুরেছি শ্মশানের কানি পরে।
বিপথে, অচেনা লোকালয়ে সম্বলহীন পথে
একমুঠো তণ্ডুলের জন্যে কাঠুরের সঙ্গে কাঠ
কেটেছি গহন বনে ঝরিয়ে মাথার ঘাম পায়ে,
পথকে করেছি ঘর। কতবার চ্যাঙড়ামুড়ি কানি
নানা ছলে কেড়ে নিয়ে আমার ঘর্মাক্ত দিনান্তের
কষ্টার্জিত অন্ন খলখল ব্যাপক উঠেছে হেসে,
ভেবেছে অভুক্ত আমি ক্ষুধার করাতে চেরা, ভয়
পেয়ে হবো নতজানু, ঘটে তার ঠেকাব আমার
অবসন্ন মাথা দীন

ভিক্ষুকের মতো। তা হবার
নয় কোনো দিন; সত্য চাঁদ সদাগর যুবা নয়
আর, আগেকার উদ্দামতা শিরায় করে না খেলা
যখন তখন, এখন সে হৃতদীপ্তি, হীনবল,
সেই কবে অস্তমিত মহাজ্ঞান। একটি কি দুটি
নয়, ছয় ছ'টি ছেলে কালবিষে হয়ে গেছে নীল,
আমার সপ্তম পুত্র লখিন্দর, সে-ও সর্পাঘাতে
নেউল, ময়ূরময় সুরক্ষিত সাঁতালি পর্বতে
লোহার বাসর ঘরে কেমন মৃত্যুর মতো স্তব্ধ
হয়ে গেল, গাঙুড়ের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেলা অবেলায়
কলার মান্দাসে ভাসে লখিন্দর, বেহুলা বহুড়ী।
জীয়ন মন্ত্রের খোঁজে দয়িতের গলিত শরীর
আঁকড়ে তরঙ্গে নাচে সায়বেণে-নন্দিনী নাচুনি।
রাহুগ্রস্ত ঘর ছেড়ে

উঠোনে বেরিয়ে উন্মাদিনী
সনকা লুটিয়ে পড়ে পথের ধুলায় বারংবার।
'কোথায় আমার লখা' বলে নিজেরই পাঁজরে করে
নির্দয় আঘাত আর নিঃসন্তান হরিণীর মতো
ঘোরে কত জনহীন আদাড়ে বাদাড়ে। আমি নিজে
বিকৃত মস্তিষ্ক এক জেদী, একরোখা লোক বলে
চম্পক নগরে পরিচিত আজ। হায়, দীপ্র, প্রিয়
নগরী আমার, একি দশা দেখি আজকে তোমার।
কেমন আন্ধার এলো নিষ্করুণ দশদিক ব্যেপে
চম্পক নগরে। সূর্যাস্তের পরে গেরস্ত রাখে না

পা তার নিজস্ব গৃহকোণ ছাড়া অন্য কোনোখানে
আজ, আর পথে পথে বঙ্গদাড়া, বিড়ঙ্গিনী আর
তক্ষক, শঙ্কর আর মহিজঙ্গ সাপের বসতি।
ঘরে ঘরে, এমনকি প্রত্যেকের মগজের কোষে
কোষে দোলে ফণা, নিত্য দিন-দুপুরেই
পথিক লুণ্ঠিত হয় জনাকীর্ণ চৌরাস্তায় আর
প্রহরী নিশ্চল দিকচিহ্ন শুধু। এখন বাছে না
ঠগ কেউ, পাছে গাঁ উজাড় হয়ে যায়, উপরন্তু
নারীর শ্লীলতাহানি করে না অবাক কারুকেই।
সৎ অসতের ভেদাভেদ লুপ্ত, মিথ্যার কিরীট
বড় বেশি ঝলসিত দিকে দিকে, লাঞ্ছিত, উদভ্রান্ত
সত্য গেছে বনবাসে। বিদ্বানেরা ক্লিন্ন ভিক্ষাজীবী,
অতিশয় কৃপালোভী প্রতাপশালীর। নব্য কত
ক্রোড়পতি করে ক্রয় সাফল্যের অন্দর বাগান,
দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হবার ফাঁদে পড়ে
কাঁদে, করে করাঘাত দিনরাত সন্ত্রস্ত কপালে,
নীতির বালাই নেই, ঔদার্য, মহত্ত্ব ইত্যাদির
কানাকড়ি মূল্য নেই আর। আদর্শ বিনষ্ট ফল
যেন, নর্দমায় যাচ্ছে ভেসে; মতিভ্রম স্ফীতোদর
সফল বণিক, নগ্ন ক্ষমতার লড়াই চৌদিকে
উন্মুখের ভয়ংকর উৎসবের মতো আর দ্বৈত
শাসনের খাঁড়া ঝোলে দিনরাত মাথার ওপরে।
আন্ধার প্রথার কাছে আনুগত্য করেছে স্বীকার
স্বেচ্ছায় সবাই প্রায়, অদ্ভুত আচার, কুসংস্কার

মেলেছে অদৃশ্য ছাতা সুবিশাল, শিবিরে শিবিরে
ভীষণ বিভক্ত আজ বিপন্ন মানুষ।

মোদ্দা কথা,
চম্পক নগরে সর্বনাশ পরাক্রান্ত জোতদার
আর আমি ধূলিম্লান পরাস্ত, বিফল ছন্নছাড়া,
আন্ধার ভাঁটার টানে সে কোথায় উধাও আমার
সপ্তডিঙ্গা মধুকর, বুকের মানিক লখিন্দর।
আমি একা ডিঙির মতন ভাসি দুঃখের সাগরে,
এই আমি চন্দ্রধর বণিক আমারই রিক্ত ছায়া।
কোথায় নর্তকী আর কোথায় বিদ্যুৎ বাজিকর?
প্রকৃতই পরাভূত আমি? কপালে গ্লানির টিকা
বয়ে নিয়ে সারাক্ষণ কাটাব জীবন অচেতন
কীটপতঙ্গের মতো? যদিও ধ্বংসের পদচ্ছাপ
আমার জীবন জুড়ে রয়েছে করাল, তবু আমি
নিজেকে পরাস্ত বলে ভাবতে পারি না কিছুতেই।
মতিচ্ছন্নতায় অলৌকিক চালচিত্র দেখে ভাবি
জীবন সনকা তবু সনকাও নয়, দরিয়ায়
মধুকর, তবু মধুকরও নয়। তবে কি জীবন
শুধু ধু-ধু সমুদ্দুরে পাড়ি দেওয়া? কালবৈশাখীর
ঝড়ে কাষ্ঠখণ্ড ধরে ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে-যাওয়া?
বুঝি তাই আজও আমি সাঁতালি পর্বতে ঘুরে ঘুরে
মধ্যরাতে পাঁড় মাতালের মতো আরো এক ভাঁড়
মদিরার স্বাদ পেতে চাই খাদের কিনারে ব'সে।
জীবন জটিল এক

অরণ্যের মতো জায়মান,
কখনো ভাবিনি আগে। প্রৌঢ়ত্বের তামাটে প্রহরে
কত কথা মনে পড়ে। স্মৃতিও জটিল বড়, জানি
যা ঘটে এবং যা ঘটবে ভবিষ্যতে, সবকিছু
মানুষের চৈতন্যের অন্তর্গত, অবচেতনের
গোধূলিতে লীলায়িত ক্ষণে ক্ষণে। সেই যে প্রথম
গাঙুড়ের জলে আমি ভাসিয়েছিলাম সপ্তডিঙা,
সনকার আগে যার সঙ্গে গোপনে করেছি কেলি,
তার স্তনচূড়া ত্রিবলির মদির চমক আর
কারুকাজ-খচিত বাসর ঘরে সনকার কালো

চোখের প্রথম চাওয়া, আলিঙ্গন, সলজ্জ চুম্বন,
গৃহকোণে পড়ে থাকা সুবর্ণ চিরুনি, উষাকালে
ভোরের আলোর মতো নবজাতকের আগমনী
চিৎকার এবং কালীদহে সঙ্গীদের বিপন্নতা,
গহিনে তলিয়ে যাওয়া, বিষধর সাপের অব্যর্থ
ছোবলে অকালমৃত পুত্রের শরীর, অবেলায়
গাঙুড়ের জলে ভাসমান ভেলা এবং ভাঁড়ারে
খাদ্যান্বেষী মুষিকের নৈশ চঞ্চলতা, নিষ্ঠাবান,
সেবাপরায়ণ ন্যাড়া, দুঃখের দিনের সহচর,
তার পদ্ধতি, কিংবা বাণিজ্যেতে লভ্য চমৎকার
মুদ্রার ঝংকার, নরসুন্দরের গোঁফ, দূরাগত
ঝঞ্ঝাহত নাবিকের রহস্য-কাহিনী, মধ্যরাতে
শোনা কারো কণ্ঠস্বর– সবই তো আমাতে অন্তর্গূঢ়।
যা দেখি এবং যা দেখি না, হয়তোবা অন্তঃস্তলে
করি অনুভব, তার মিশেলে যা গড়ে ওঠে, তাকে,
হ্যাঁ, তাকেই তো স্মৃতি বলে জানি। স্মরণ নাছোড় বড়;
সে তবে কোমল কোনো স্পর্শ লেগেছিল ত্বকে, সেই
সুখ আজও সঞ্চারিত হয় অনিবার্য মাঝে মাঝে
অভিজ্ঞ শিরায়; আর যত স্বর শুনেছি একদা,
ওরা বেজে ওঠে শূন্য প্রহরের প্রহরে, সে গুঞ্জন
দেয় না আমাকে একা থাকতে কখনো। কিংবা যত
সুন্দর কুৎসিত দৃশ্য করেছি প্রত্যক্ষ, তার ছায়া
খুব ঘন হয়ে করে বসবাস আমার ভেতরে;
হঠাৎ ঢাকের শব্দ শুনি যেন, নাকি আমি
মদ্যপান-জনিত বিভ্রমে শুনি তীব্র বিস্ফোরণ-
মূলক আওয়াজ শুধু। এই তো সমুদ্র দিল ডাক
বাজিয়ে তরঙ্গশাঁখ; এ কোন নিপুণ জাদুকর
বানায় নতুন ডিঙা সারি সারি চোখের পলকে?
কী এক আক্রোশে আজ
আমার জীবন অকস্মাৎ
প্রচণ্ড চিৎকার হয়ে ফেটে পড়তে চায়, পুনরায়
কালীদহে যেতে চায় এ জীর্ণ শরীর ভয়াবহ
সর্পকুণ্ডলীর মতো ঘূর্ণিজলে লড়বার খর
আকাঙ্ক্ষায়; জরার তমসা ঘিরে ধরেছে আমাকে;
মাথায় কালোর চেয়ে রৌপ্যবর্ণ কেশই বেশি আর

চক্ষুদ্বয় ছানিগ্রস্ত দীপ যেন, সাগ্রহে তাকাই,
অথচ দেখি না স্পষ্ট কিছু, শুধু দেখি অমঙ্গল
এসেছে ঘনিয়ে চতুর্দিকে এই চম্পক নগরে।
যেন এ নগরী আজ সম্পূর্ণ অচেনা পরদেশ,
যেখানে বিলাপ ছাড়া অন্য কোনো ধ্বনি নেই আর,
যেখানে নাগিনী ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী নেই, আর,
যেখানে বরণযোগ্য বীর নেই, কবির অভীষ্ট
কোনো জয়গাথা নেই, কাকতাড়ুয়ার মূর্তি ছাড়া
অন্য কোনো মূর্তি নেই, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রেত ছাড়া
অন্য কোনো বাসিন্দার আনাগোনা নেই। তবু আমি
বাঁচার উপায় নেই জেনেও এখনও আছি বেঁচে
হিন্তাল কাঠের কারুকাজ-খচিত লাঠিতে ভর
দিয়ে আর সমুদ্দুরে পাড়ি দেবার দুর্মর স্বপ্নে
সর্বদা বিভোর হয়ে। আর এই শ্মশানের কালো
ভস্মময় মাটিতে উবুড়-হয়ে-থাকা কলসের
মতো থাকব না পড়ে এক কোণে, এই তো আবার
আমাতে প্রত্যক্ষ করি বলিয়ান নবীন উত্থান।
উধাও বাতের ব্যথা, স্বচ্ছ দৃষ্টি, রক্তের ভেতরে
কেমন চাঞ্চল্য জাগে, যেন এক সম্পন্ন তরুণ
সদাগার চকিতে আমার সঙ্গে করেছে বদল
আপন অস্তিত্ব তার। এভাবেই কখনো কখনো
অন্য কেউ, দূরবর্তী কেউ এসে এসে যায় আমাদের
মধ্যে আর আমরা তখন তার মতো আচরণে
কিছুটা অভ্যস্ত হই, তার উচ্চারণ জেগে ওঠে
আমার নিজস্ব কণ্ঠে, তার শক্তি, শৌর্য করে ভর
আমার ওপর পেয়ে যাই ভিন্ন দ্বিতীয় জীবন
বস্তুত অস্থায়ীভাবে। তারপর দক্ষ অভিনেতা
যেমন যাত্রার বেশভূষা ছেড়ে ফিরে আসে ফের
একান্ত আপন অবয়বে, তেমনি আমাদেরও ঘটে
করুণ প্রত্যাবর্তন; রাত্রির রুপালি স্বপ্ন মুছে
যায় অকস্মাৎ রূঢ় দিনে। অপার বিস্ময়, আজও
সাপের স্পর্শের মতো চমকিত অস্তিত্ব আমার।
যতদিন হিন্তাল কাঠের
লাঠি আছে হাতে, আছে
ধমনীতে পৌরুষের কিছু তেজ, যতদিন ঠোঁটে

আমার মুহূর্তগুলি ঈষৎ স্পন্দিত হবে, চোখে
নিমেষে উঠবে ভেসে কোনো শোভাযাত্রার মশাল,
করব না আন্ধারের বশ্যতা স্বীকার ততদিন,
যতই দেখাক ভয় একশীর্ষ, বহুশীর্ষ নাগ,
ভিটায় গজাক পরগাছা বারংবার, পুনরায়
ডিঙার বহর ডোবে ডুবুক ডহরে শতবার,
গাঙ্গুড়ের জলে ফের যাক ভেসে লক্ষ লখিন্দর।

উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ

(আবদুর রাজ্জাক খান বন্ধু বরেষু)

শেষ-হয়ে-আসা অক্টোবরে
শীতের দুপুরে নিউইয়র্কের অরচার্ড স্ট্রিটে ঘুরে ঘুরে
একটি দোকান দেখি মায়াপুরী, দোকানি ওয়াল্ট ডিজনির
আশ্চর্য ডবল, বলা যায়, দিলেন পরিয়ে গায়ে
স্মিত হেসে সহজ নৈপুণ্যে নীল একটি ব্লেজার। ব্লেজারের
বুকে জাগে অরণ্যের গহন শ্যামলপ্রসূ, সরোবর-উদ্ভূত অমর্ত্য
দূরায়নী তারা।
সুনীল ব্লেজার ঝুলে আছে
আলনায়, কাঠের হ্যাংগারে একা আমার পুরানো ম্লান ঘরে
মালার্মের কবিতার স্তবকের মতো নিরিবিলি,
অথচ সংগীতময় সর্বক্ষণ অস্তিত্বের পরতে পরতে।
নানান সামগ্রী ঘরে থরে থরে, কিছু এলোমেলো; সামগ্রীর ভিড়ে
সুনীল ব্লেজার যেন বহু গদ্য-লেখকের মাঝে
বড় একা একজন কবি।
ব্লেজারের দিকে চোখ যায়
যখন তখন, দেখি সে আছে নিভৃত অহংকারে,
থাকার আনন্দে আছে, নিজের মতন
আছে; বলে সান্দ্র স্বরে, 'এই যে এখানে আছি, এই
থাকা জানি নিজেই তাৎপর্যময় খুব।' এ মুহূর্তে
যদি ছুঁই তাকে, তবে মর্মরিত হবে সে এখন, উঠবে জেগে
স্বপ্ন-সুদূরতা থেকে।

কখনো ব্লেজার কৌতূহলে
দ্রুত জেনে নিতে চায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীকে কখনো

তীব্র চুমো খেয়েছেন কিনা জোড়াসাঁকোর ডাগর অভিজাত
পূর্ণিমায়,
নব্য কবিসংঘ কী পুরাণ নিয়ত নির্মাণ করে মেধার কিরণে আর
শীতার্ত পোল্যান্ড আজ ধর্মঘটে রুদ্ধ কিনা কিংবা কোন
জলাভূমিতে গর্জায়
গেরিলার স্টেনগান, হৃদয়ের মগ্নশিলা, আর্ত চাঁদ
ইত্যাদিও জানা চাই তার।

ভোরবেলা ঘন
কুয়াশার তাঁবুতে আচ্ছন্ন চোখ কিছুটা আটকে গেলে তার
মনে হয় যেন সে উঠেছে জেগে সুদূর বিদেশে
যেখানে এখন কেউ কারো চেনা নয়, কেউ কারো
ভাষা ব্যবহার আদৌ বোঝে না; দেখে সে
উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ বিরানায়; মুক্তিযুদ্ধ,
হায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়, বৃথা যায়।

কোথায় পাগলাঘণ্টি বাজে
ক্রমাগত, এলোমেলো পদধ্বনি সবখানে। হামলাকারীরা
ট্রাম্পেট বাজিয়ে ঘোরে শহরে ও গ্রামে
এবং ক্রন্দনরত পুলিশের গলায় শুকায় বেল ফুল।
দশদিকে কত একাডেমিতে নিশীথে
গোর-খোদকেরা গর্ত খোঁড়ে অবিরত, মানুষের মুখগুলি
অতি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে শিম্পাঞ্জির মুখ।

গালিবের জোব্বা,
দিল্লির সূর্যাস্ত যেন, রবীন্দ্রনাথের আলখাল্লা অনুপম,
মৌলানা রুমির খিরকা, বোদলেয়ারের মখমলি
কালো কোট দুলে ওঠে আমার সুনীল ব্লেজারের কাছাকাছি।
কিছু অসন্তোষ গাঁথা সুতোয়, বিশদ কারুকাজে;
ইতিহাসবিদ্বেষী ব্লেজার পুণ্য নীল পদ্ম অকস্মাৎ,
অবাধ স্বাতন্ত্র্য চায় ব্যাপক নির্মুখতায় আজ।

নষ্ট হয়ে যাবে
ভেবে মাঝে মাঝে আঁৎকে ওঠে, টুপির মতন ফাঁকা
ভবিষ্যৎ কল্পনায় মূর্ত হয়ে কখনো কখনো,
কবরের অবরুদ্ধ গুহা তাকে চেটেপুটে খাবে
কোনো দিন, ভাবে সে এবং নীল পাখি হয়ে দূর

সিমেট্রির মিশকালো সাইপ্রেস ছেড়ে পলাশের রক্তাভায়
ব'সে গান গায়।

রাত্রির তৃতীয় যামে

রাত্রির তৃতীয় যামে জ্যোৎস্নাধোয়া মসজিদে মৌলবী ঘুমায়।
এখন সে জলচর পাখির মতন
ঘুমের ডহরে ভাসে একা, অচেতন। হাত দুটি
যেনবা নিস্পন্দ মাছ নদীতীরে; মাঝে মাঝে নড়ে
ওঠে ঠোঁট হয়তোবা ঘোর
নিদ্রাতুর বিরানায় করছে আবৃত্তি
অমল আয়াত।
রাত্রির তৃতীয় যামে জ্যোৎস্নাধোয়া মসজিদে মৌলবী ঘুমায়।

রাত্রির তৃতীয় যামে স্বপ্নের ভেতরে
দেখে সে নির্জন স্থানে দাঁড়ানো। অনেক
দূরে খুব উঁচু মিনারের মতো কিছু ঘন নীল
কুয়াশায় মোড়া।
হঠাৎ একটি ঘোড়া তাকে ঘিরে খায় তিন পাক, অনন্তর
চোরাবালি বাদামি ঘোড়াকে করে গ্রাস।
স্বপ্নের ভেতরে
দেয় সে কাটিয়ে নিরিবিলি কিছুক্ষণ
সিঁড়ির ওপরে ব'সে শুনে
ঘাসের নিবিড় গাথা। কণ্ঠে তার যুগ-যুগান্তের
তিমির আছে কি মজা? নইলে কেন এত
শুকনো গলা আজ? তবে কি সে দীর্ঘকাল ঝরনা,
পুকুর, ইঁদারা কিংবা সরোবর থেকে
করেনি ব্যাকুল পান আঁজলায় নিয়ে
এক ফোঁটা পানি?
রাত্রির তৃতীয় যামে জ্যোৎস্নাধোয়া মসজিদে মৌলবী ঘুমায়।

স্বপ্নের ভেতরে তার দেখে না সে কোনো
লম্বাটে রঙিন কাচে ফোভ ছবি, গম্ভীর দেয়ালে
কখনো করে না পাঠ স্বীকারোক্তি। তার
স্বপ্নের জমিনে ভ্যানগঘী সাইপ্রেস

কখনো ফেলে না ছায়া কিংবা তাহিতির
অজর রমণী কোনো ফলময় থালা হাতে দাঁড়ায় না এসে
ক্ষণকাল। মাঝে-মাঝে ধু-ধু
বিবাহ, মরণময় কতিপয় ছবি দুলে ওঠে
রাত্রির তৃতীয় যামে। স্বপ্নের ভেতরে তার, স্নিগ্ধ মৌলবীর,
মনে হয়, কথা ছিল পুণ্য সুরে দশদিকে যে-ডাক দেবার
বারংবার প্রকৃত সে-ডাক মানবিক

এখনও হয়নি মূর্ত কণ্ঠে তার। দিকভ্রষ্ট কোনো
করুণ পাখির মতো যেন সে নিয়ত
ডেকে যায়, অথচ ঘুমের
ভেতরে গোঙানি শুধু, কণ্ঠস্বর রুক্ষ মরুভূমিতে হারায়।
রাত্রির তৃতীয় যামে জ্যোৎস্নাধোয়া মসজিদে মৌলবী ঘুমায়।
আলখাল্লা ফুটফুটে স্বপ্নের মতোই
লেপ্টে আছে গায়ে, খোলা মুখ যেন গায়েবী জানালা,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
রাত্রির শূন্যতা নিচ্ছে টেনে
নিজের ভেতরে অস্তিত্বের গ্রন্থিমূলে এক নিঝুম মৌলবী।

ভ্রাতৃসংঘ
(অগ্রজ জনাব আজিজুর রাহমান চৌধুরীকে)

আমার প্রথম ভাই কান্তিমান, স্কুল-ছুট, সতত বালক
(এমনকি মধ্যবয়সেও)
নবাববাড়ীর নওশা, আলাভোলা, প্রখর, যৌবনে
ছিলেন উড়নচণ্ডী। পরিণীতা, পুত্র রইল পড়ে
এবং হলেন তিনি দেশান্তরী, ঘুরে বেড়ালেন
সার্কাস পার্টির সঙ্গে। সাত ঘাটে আঁজলা ভরিয়ে,
ভিজিয়ে পায়ের পাতা একদিন শেষে
ঘরের উধাও ছেলে ফিরে এলো ঘরে। তারপর
কাটে তাঁর অনুজ্জ্বল বৈচিত্র্যরহিত দিনগুলি
সংসারের ভাঙ্গা
খাঁচায় এবং অকস্মাৎ
কোনো মধ্যরাতে খাঁচার ভিতর থেকে
অস্থির অচিন পাখি উড়ে গেল অনন্তের দিকে।

আমার দ্বিতীয় ভাই, আবাল্যে তুখোড় ডানপিটে,
দীর্ঘকায়, সুদর্শন, পৌরুষে ভাস্বর।
ভ্রমণবিলাসী তিনি কলেজ পালিয়ে মেহগনি বাক্স ভেঙে
ঘুরেছেন দাক্ষিণাত্যে মন্দিরে মন্দিরে, অজন্তার
বিখ্যাত গুহায় আর দিলেন কাটিয়ে
দিল্লিতে ভক্তিতে মজে হজরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মাজারে
দু'তিন বছর। গত বিশ্বযুদ্ধে পাঠাতেন তারবার্তা
ব্রিটিশ জাহাজ থেকে, মনে পড়ে। হঠাৎ খেয়ালে
জাহাজের খোল ছেড়ে সেই যে এলেন
নিজের ডাঙায় ফিরে, তাকে আর ভোলাতে পারেনি
সমুদ্রের গান; এমনকি যে ইহুদি রমণী বিদেশে
ছিলেন দয়িতা, তার ঘাগড়ার রেশমি টান, চোখের কুহক
ফেরাতে পারেনি তাঁকে ভবঘুরে জীবনের বাঁকে
বাঁকে, অনন্তর সমুদ্রের ঢেউ নয়, কোনো রমণীয় শরীরের
চড়াই-উতরাই নয়, তরুণ ঘোড়ার
পেশি-তরঙ্গের প্রতি
কী দুর্মর আকর্ষণ তাঁর। রেসের মরীচিকায়, তাসের আড্ডায়
রেখেছেন জীবন বন্ধক।
এখন যখন তিনি আরমানীটোলার পথ দিয়ে
হেঁটে যান ক্লান্ত, রুগ্ন, ভীষণ একাকী,
যুদ্ধাহত সৈনিকের মতো,
তখন মুখাবয়বে তাঁর ছয় দশকের আর্তি,
বহ্ন্যুৎসব, হাহাকার,
প্রমাদ, চিৎকার জেগে থাকে অবেলায়।

আমার তৃতীয় ভাই ছিলেন মাঝারি গড়নের,
ইস্পাতি শরীর তার ঝলসাত মাঠের রোদ্দুরে গোল্লাছুট
কাবাডি খেলায়,
ক্রোধের ভিমরুল তাঁকে কামড়ালে, কালো কপালের
কাটা দাগ আরও চিকচিকে আর গাঢ় হয়ে যেত।
কখনো কখনো তিনি নাকীসুরে খুব দুলে দুলে
গাইতেন ফিল্মি গান এবং বন-বাদাড়ে একা-একা
কাটত সময় আর বলতেন তাঁর
চোখ ভেসে ওঠে কত

সুন্দর আজীব গাছপালা, জীব-জানোয়ার কিমাকার আর
অতল পাতাল।
যখন এ. আর. পি.-তে লেখালেন নাম,
উর্দি-পরা তাঁকে
দিব্যি বীর-বীর লেগেছিল। ছিলেন অকৃতদার আর
অকস্মাৎ এ কি বজ্রপাত
আমাদের ঘরে–
আমার তৃতীয় ভাই ক্রূর পিত্তশূলে হলেন অকালমৃত
প্রেমিকার চুম্বনবিহীন,
সন্তানের আলিঙ্গনহীন।

আমার চতুর্থ ভাই পিতার মিনিয়েচর, তেজী
একরোখা, স্পষ্টভাষী! ন্যায়-অন্যায়ের তুলাদণ্ডে
সর্বদা নিবদ্ধ দৃষ্টি তার, উপার্জনে নিয়ত সংগ্রামশীল,
সামাজিক নিমন্ত্রণে অকুণ্ঠ, উদার;
ভোজনবিলাসী, নীড়প্রিয়,
বাবুই পাখির মতো গোছায় সংসার প্রতিদিন।
পুরানো প্রথার প্রতি নতজানু; এই শতকের
রোদে পিঠ দিয়ে ভালোবাসে মধ্যযুগী মায়াবী আঁধার।
নিত্য সুবে-সাদেকের আলো-আঁধারিতে
করে পাঠ কলমা দরুদ।

আমার পঞ্চম ভাই সুকান্ত, সৌজন্যময় আর
রুচিবান এবং সবার প্রীতিসাধনে তৎপর
সর্বক্ষণ, পরমতসহিষ্ণু অথচ সুতার্কিক।
গোঁড়ামির প্রতি সায় নেই তার, গ্রন্থপ্রিয় মন
করে বিচরণ মুক্তবুদ্ধির মিনারে, উপরন্তু,
সংগীত-নির্ঝরে স্নাত নিয়মিত, আদালতে
সাজিয়ে কথার পিঠে চোস্ত কথা কুড়ায় বাহবা,
দীপ্ত অধ্যাপকও বটে। বস্তুত সে স্নিগ্ধ বুদ্ধিজীবী।

আমার কনিষ্ঠ ভাই চটপটে, বেপরোয়া, বড় ঝলমলে;
নিখুঁত টাইয়ের নট, গায়ে হাল-ফ্যাশনের নানা
পোশাক-আশাক।
আকৈশোর অভিযানে মাতাল। তাই সে
প্রায়শ জমায় পাড়ি দূর দেশে, যেন

কোনো নামহীন দ্বীপ থেকে
আনবে নির্যাস ছেঁকে রহস্যের কিংবা অতল পাতাল থেকে
মণিরত্ন, যেন নিমেষেই নেমে যাবে তুড়ি মেরে
দুর্গম খনিতে একা। নৈরাশ্যের থুতনি নাড়িয়ে দিয়ে জোরে
'যে যাই বলুক আমি বাণিজ্যেতে যাবোই' বলে সে
আমার কনিষ্ঠ ভাই ভাসিয়েছে সমুদ্রে জাহাজ।

কখনো-কখনো ভাবি আমার ভ্রাতৃ-সংঘের কতটুকু আছে
নিহিত আমার মধ্যে? কার চোখ, কার মুখভঙ্গি
হুবহু প্রতিফলিত আমার সত্তায়?
কার কোন আচরণ করি ব্যবহার মুদ্রাদোষের মতন
আমিও অজান্তে মাঝে মাঝে?
আর মাঝে-মধ্যে আমাদের
বংশের প্রাচীন
নামহীন কত পুরুষের অজ্ঞাত জীবনী
মন্ত্রের মতন গুঞ্জরিত হতে চায়
আমার নিজস্ব অবচেতনের রহস্য-শোষক তন্দ্রাচ্ছন্ন স্তরে স্তরে।

পতাকার্বই মতো গহন সৌন্দর্যে একা

কাউকে কিছু না বলে কখন যে ফাল্গুন হঠাৎ
সটকে পড়েছে। এখন তো বাংলাদেশে
চৈত্রের চিৎকার
পাতার আড়ালে, শ্রমিকের
পাতের গরম ভাতে, নিউজপ্রিন্টের ভাঁজে ভাঁজে
পঙ্গু প্রেমিকের হাহাকারে,
নিশাচর কুকুরের চোখে,
চন্দ্রাহত হা ভাতে বস্তির
অরক্ষিতা তরুণীর যৌবনের উদগ্র চিতায়।

মুংকের চিত্রের চিৎকারের মতো একটি চিৎকার,
চরাচরব্যাপী,
ইদানীং এ শহরে কী ব্যাপক ছড়িয়ে পড়েছে, মনে হয়,
মূক বিপর্যয়বোধ নিয়ে।

বিপর্যয়ে অনেকেই ভীষণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বারংবার

নানান উদ্ভট চিত্রকল্প ঘিরে ধরে
তাদের এবং ওরা ভয় পায়, বড় ভয় পায় এমনকি নিজেদের
ছায়া দেখলেও।

কেউ কেউ উন্মাদের মতো আচরণে
পাড়া-পড়শিকে আরও বেশি
করুণ ভয়ার্ত করে তোলে। বিপর্যয়ে কেউ কেউ
মাথা ঠাণ্ডা রাখে, থাকে স্থির,
যেনবা নক্ষত্র এক, দিগ্‌দর্শনের আলো আছে,
স্বতন্ত্র স্বভাবে
এক কর্তব্যরত প্রহরীর মতো কেউ কেউ সুষ্ঠুভাবে
শিবিরের তদারক করে। অকস্মাৎ
রসদ ফুরিয়ে গেলে, শিরায় শিরায়
কুয়াশার হিম
ছড়িয়ে পড়লে দাঁতে দাঁত চেপে, কষে ধরে মুঠোয় পতাকা
সটান দাঁড়িয়ে থাকে পতাকারই মতো গহন সৌন্দর্যে একা।
বিপুল ধ্বংসের তাণ্ডবেও কবিতার ডানা লীলায়িত হয়,
বিধ্বস্ত ছাদের নিচে, ভাঙা দেয়ালের
আড়ালে জ্যোৎস্নায় তীব্র চুমো খায় যুবক-যুবতী।
বসন্ত বরের মতো আসে ভাঙাচোরা পথে অভ্যর্থনাহীন,
বৃদ্ধেরও সংগমস্পৃহা খুব বেড়ে যায় রাতারাতি।
ধ্বংসস্তূপ থেকে কেউ তুলে নেয়
পিতলের বাঁশি,
কেউবা নিঃসীম প্রেতায়িত পূর্ণিমায় কী ব্যাকুল
কণ্ঠস্বরে পাষাণপুরীর
পাথুরে বাসিন্দাদের স্তব্ধ ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করে প্রহরে প্রহরে।

প্রকৃত প্রস্তাবে

ভালোই আছি আজ, জ্বরের নেই তাপ;
সময় ভালো বটে শীতের কিছু পরে।
হঠাৎ চেয়ে দেখি এসেছে কোত্থেকে
চড়ুই পাখি দুটি এসেছে এই ঘরে।

এ ঘরে বসবাস আমার বহুকাল।
স্মৃতির মেঘমালা বেড়ায় ভেসে মনে :

কেটেছে ক'দিন নানান বই পড়ে,
কখনো গান শুনে, কখনো চুম্বনে।

এ ঘরে কত রাত ভালেরি এসেছেন,
কখনো কালিদাস, বোদলেয়ার, রুমি।
পেরিয়ে স্বপ্নের সুনীল সেতু আর
টানেল কুহকের কখনো আসো তুমি।

এখানে এই ঘরে সকালে মাঝরাতে
টেবিলে ঝুঁকে লিখি; হারিয়ে ফেলি পথ
কখনো শব্দের গহিন জঙ্গলে।
কখনো পাই কত পঙ্‌ক্তি মৃগবৎ।

চড়ুই নীড় বেঁধে এখানে এই ঘরে
রাখতে চায় তার প্রেমের স্বাক্ষর।
অথচ জানে না সে বিপুল চরাচরে
প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই নেই ঘর।

খাঁচা

এ কোন খাঁচায় আছি? চাবি দেয়া পুতুলের মতো
ঘুরি ফিরি, মাথা নাড়ি; ক্লান্ত হ'লে শিক গুনে গুনে
ঘুমের খাঁচায় ঢুকি। বস্তুত এমন খাঁচাব্রত
একনিষ্ঠ সাধকেরও সাধ্যাতীত। যতদূর শুনে
কিংবা গ্রন্থপাঠে জানি দীপঙ্কর অথবা মেধাবী
শ্রীজ্ঞান, ইবনে সিনা ছিলেন না এমন খাঁচায়
কোনো দিন, সত্যসন্ধ ইতিহাস করবে না দাবি
ওরা খুঁটেছেন করুণার ছোলা দৈনিক বাঁচায়।

আমি তো ভালোই আছি, কী বিমূঢ়; যা খুশি রটাক
নিন্দুকে, পাতি না কান কিছুতেই। যদি তর্ক ওঠে
বলব বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে, 'বুঝেছ হে, এই
দুনিয়ায় সকলেই নিজস্ব খাঁচায় বন্দি'; যাক,
দিন মন্ত্রেতন্ত্রে কেটে যাক, স্বপ্ন শিকে মাথা কোটে
কুটুক, এখন দ্বার খুললেও থাকব খাঁচাতেই।

কোনো কোনো কবিতা

আঙুল বুলিয়ে শূন্যে নিদ্রাহীন রাতে শুদ্ধ সাঙ্গীতিক ধ্যানে
কবিতার কথা ভাবি। কে যেন সোনালি জলধারা
কেবলি গড়িয়ে দিচ্ছে অদৃশ্য সুরাই থেকে; আঁজলা পেতেছি
ঝাঁক ঝাঁক সজারুর বিরোধিতা করে।

কবিতা দেখাতে পারে মাঝে মাঝে ক্লাউনের খেলা
হলঘরে ঝাড় লণ্ঠনের নিচে, আবার কখনো
কবিতা চটিয়ে দিতে পারে ময়-মুরুব্বিকে রকবাজ যুবার ধরনে;
কোনো কোনো কবিতার প্রকৃতি বিষাদে ছায়াচ্ছন্ন অতিশয়।
কখনো কবিতা। সুরামত্ত নাবিকের মতো গান
গেয়ে ওঠে রাঙা গণিকার গলা জড়িয়ে। আবার
কখনো উদাস দরবেশ যেন ঘূর্ণি নাচে এবং মস্তিতে
ভরপুর; কোনো কোনো কবিতার এমনই স্বভাব,
শিশুর সারল্যে প্রজাপতিদের রঙিন পেছনে ছোটে, ভাঙে
বাবুই পাখির বাসা। কোনো কোনো কবিতার বুকে
বিলের হাঁসের উষ্ণ বুকের স্পন্দন শোনা যায়।
কখনো কবিতাবলি সংবাদপত্রের দিকে পিঠ দিয়ে বেড়ালের চোখে
বিশ্বরূপ দ্যাখে, খরগোশের মতো লাফিয়ে বেড়ায়
ঘাসে ঘাসে, কখনোবা কমলালেবুর রস হয়ে
রোগীর তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠে ঝরে যায়, ইবনে সিনার
মনীষার মতো জ্বলজ্বলে, সদ্য তন্বী, গানে-পাওয়া।

কোনো কোনো কবিতা রহস্যময় বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে
জ্যোৎস্না রাতে কোনো কোনো কবিতাকে মনে হয় একান্ত পথিক
ধুলোময় পায়ে দূর তীর্থে চলেছেন একা। কোনো কোনো
কবিতা প্রকৃত
বিপ্লবীর মতো তার প্রিয়তমা রমণীর স্তনচূড়া, নাভিমূল থেকে
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বয়ম্ভর দুর্গম টানেলে সরে যায়।
কোনো কোনো কবিতা কী সুখে ঘর-গেরস্থালি করে,
কখনো কবিতা এক মুখ ব্যান্ডেজের ফাঁকে দুই ফোঁটা চোখ,
কোনো কোনো কবিতা কখনো উপদ্রুত এলাকায়
ত্রাণ সামগ্রীর মতো সেবাপরায়ণ।

অনিবার্য ঘরে ফেরা

এইমতো স্থিতি তার, স্পন্দনরহিত সর্বক্ষণ,
পতিত ফলের মতো ম্লান।
এভাবেই থাকে সে প্রায়শ
রাত্রিদিন এমন নিঃসাড়
পারিপার্শ্বিকের
প্রতি উদাসীন।

টেলিফোন বাজে,
বেজে চলে ক্রমাগত বেলা অবেলায়;
পোস্টম্যান, বালকের রঙিন মার্বেল
অথবা উড়ন্ত ঘুড়ি, উদ্ভিন্ন মল্লিকা,
সোমত্ত গাছের
বাকলের ঘ্রাণ,
অকাল বৃষ্টির জুঁই–
কিছুই পারে না তার শিরায় জাগাতে কোনো গান।

এভাবেই থাকে; রৌদ্র লাগে গালে, স্বেচ্ছাচারী জ্যোৎস্না
ধুয়ে দ্যায় মুখ, অথচ সে আপাতত
একটি খোলস শুধু।
সাংকেতিক ভাষার মতন
আছে স্থির সারাক্ষণ কণ্ঠস্বরহীন
এবং এখন কে বলবে করেছে সে
রোপণ বিস্তর
স্বপ্নবীজ ছন্নছাড়া মাঠে পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া?
কে বলবে তার আঙুলের চকিত ছোঁয়ায় নারী
হয়ে যায় স্মরণীয় নিবিড় লিরিক?

কোন ইন্দ্রজালে
সহসা খোলস ছিঁড়ে জেগে ওঠে অন্য একজন
কেমন সহজ ভঙ্গিমায়,
যেনবা বিপথগামী পথিকের ভালোয় ভালোয়
বেলাশেষে একা অনিবার্য ঘরে ফেরা।

ফাঁসি

কাল তার ফাঁসি হবে। কেন হবে, তা সে জানে না এবং
জানে না বলেই অস্বস্তির পোকা তার
মগজের কোষে কোষে ঘোরে। পাঁজরে কী যেন পোড়ে,
ঘন ঘন বৃক্ক স্ফীত হয় আর
কখনো নিজেকে তার আনাজের বাকলার মতো মনে হয়
দেয়ালে ঠেকলে পিঠ।
এখন সে স্মৃতির ব্যাপক বেড়াজালে
আটকা পড়েছে। পেতলের বাসনের মতো ঝন্ ঝন
বেজে ওঠে তৃতীয় এবং মনে পড়ে তার একদা দেয়ালে
লিখেছিল সে আবেগে কম্পমান; 'ভুলব না কখনো তোমাকে'।
কাকে ভুলবে না?
অন্ধ সেলে দ্যাখে কবেকার বইয়ের পাতার
ফটোগ্রাফ থেকে
আসেন কী রাজসিক উঠে ক্ষুদিরাম; ফুচিকের
কাঁটাতারে বিদ্ধ টকটকে
গোলাপ– হৃদয় জ্বলে ওঠে অন্ধকারে। আর কিছু
পারম্পর্যহীন ছবি খেলা করে নির্ঘুম প্রহরে।

মৃত্যু আর মাথার ওপর
অচিন পাখির মতো চক্রাকারে ওড়ে বারে বারে;
তুড়ি মেরে উড়িয়ে সে দিতে চায় ওকে,
অথচ নাছোড় পাখি নেয় না গুটিয়ে তার ছায়া
কিছুতেই সেল থেকে। হঠাৎ সে দ্যাখে
ধূসর পাজামা তার কখন যে ভিজে গেছে উদাস পেশাবে।
দেয়ালে ঠেকিয়ে মাথা বলে নিজেকেই,
তোমার অস্তিত্ব আজ, বুঝেছ, হে, তুমুল নিঃশব্দ অট্টহাসি।

আজ তার মনে হল– দরজায় মাধবীলতার
স্পন্দন, পাখির নাচ, পূর্ণিমার উচ্ছল চন্দন,
বিড়ালের চোখ, পাথরের মূর্তি,
রেকাবি, কাচের গ্লাস, একটি মুখের রেখা, টুকরো
কথার এমন আকর্ষণ
কখনো জানেনি আগে। আজ অকারণ
বুকের ভেতরে তার যে কাঁদে একাকী,

তার প্রতি এত ভালোবাসা এতকাল
কোথায় লুকিয়ে ছিল?

কাল তার ফাঁসি হবে।
শেষ ইচ্ছা পূরণের ছলে কারুকে সে
দেখতে চায়নি, এমনকি
একটি অন্তিম সিগারেটও করেনি প্রার্থনা। শুধু
মনে-মনে চেয়েছিল দেখে নিতে পৃথিবীর রূপ
পুনর্বার। এখন সে কয়েদখানার
ঘুলঘুলি থেকে চুয়ে-পড়া
বখিল আলোয় রাখে ওষ্ঠ থরথর, যেন
চুমু খেল দয়িতার ঠোঁটে।

কাদামাখা অবেলায়

এখনও এখানে অশেষ পুঞ্জীভূত
গ্রাম ও শহরে কুটির অট্টালিকায়,
রাজপথে আর অলিতে গলিতে আর
শহরতলিতে টিনশেড কলোনিতে
মধ্যযুগের ঘোর অন্ধকার।

জংধরা এক টিনের তোরঙে ওরা
পুরুষানুক্রমে রেখেছে ঊর্ধ্ব তুলে
পোকা দংশিত আদ্যিকালের পুঁথি।
কখনো সখনো অতি ভক্তিতে মজে
জীর্ণ কেতাব মাথায় ঠেকায় শুধু।

ছেঁড়া কাঁথা আর মলিন বালিশ পেতে
ঘুমায় নোংরা ভাড়াটে বাড়িতে ওরা।
সেই কবেকার তুরানী স্বপ্ন আজও
কেরানি মনের তল্লাটে দ্যায় উঁকি।
সাতপুরুষের ভিটায় ময়াল সাপ।

আয়েশী স্বভাবে এখনও অটুট কিছু;
অথচ অভাব পোষা বেড়ালের মতো
পায়ে পায়ে ঘোরে। সোনাদানা, ঘটি-বাটি
বন্ধক রেখে জুড়ায় জঠরজ্বালা,

বসন্ত দিনে দেনায় ডুবেছে মাথা।

শিরায় শিরায় জুয়োর বনেদী নেশা,
বোঝে না নিজেই দাবার নিরঙ ঘুঁটি।
আত্মায় জমে ইট-সুরকির কণা,
হঠাৎ কখনো গহন সন্ধেবেলা
মনে পড়ে যায় বনতুলসীর ঘ্রাণ।

যুক্তিকে ওরা পাঠিয়েছে বনবাসে,
এখানে চিরায়ু ভাববিলাসের যুগ।

জ্ঞানীর বাণীতে কখনো পাতে না কান,
শুধু চুমো খায় আলখাল্লায় তাঁর।
নানা মরীচিকা দেখে দেখে কাটে বেলা।

অতীতের পানা পুকুরে প্রেতের মতো
সকাল-সন্ধ্যা বুড়বুড়ি কাটে মন।
শ্যাওলা-বিছানো বদ্ধ পানিতে ভাসে
রঙ-বেরঙের কিংবদন্তি কত,
কিংবদন্তি লেহনে ধন্য ওরা।

পঞ্জিকা আর পঞ্জিকা সম্বল
করে ওরা ধরে গায়েবী ঘোড়ায় বাজি।
চারপাশে জ্বেলে লোবান, আগরবাতি
পুরানো ক্ষতের গন্ধ মুছতে চায়,
হৃদয় ওদের উদ্ভট হানাবাড়ি।

সম্মুখে খোলা রাস্তার সংকেত,
ওরা পড়ে যায় বিচ্ছিরিভাবে পথে,
হাঁটুভাঙা ভীরু হরিণের মতো ধু-ধু
ডানে বাঁয়ে দ্যাখে নেকড়ের শত চোখ।
কে তুলবে টেনে কাদামাখা অবেলায়?

বন্ধুকে প্রস্তাব

এই যে ইয়ার খানিক দাঁড়াও। এমন হনহনিয়ে
কোথায় যাচ্ছ? এত তাড়া
কিসের মানিক? আখেরে কোথায় পৌঁছতে চাও?

এতকাল পরে
এ-শহরে হঠাৎ তোমার সঙ্গে মোলাকাত;
দু-দণ্ড বাতচিত করা যাক কোথাও আরামসে ব'সে
যৎকিঞ্চিৎ ভেজানো যাক গলা। নাকি
এভাবেই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে
কিস্‌সা খতম করে দেবে, ভেবেছ।

চলো না যাই, চা খাই ব'সে আমাদের সেই
চেনা চা-খানায়! বিলকুল আগের মতোই আছে বেবাক;
শুধু চেয়ার আর টুলগুলো আরও নড়বড়ে
হয়েছে, টেবিলগুলো রোঁয়া-ওঠা
কুকুরের মতো আরও বয়স্ক। সেই কোঁকড়া-চুল
বেয়ারাটা– মনে পড়ে ওর কথা– গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে
তিন বছর আগে। আজ থেকে-থেকে কত স্মৃতিই না জাগে
তোমার দিকে তাকিয়ে,
তোমার ছাই ঝাড়ার ভঙ্গি দেখে।

তো, মাই ডিয়ার ফেলো, আজকাল
কী হাল-হকিকত তোমার, মঞ্চে-টঞ্চে কেমন
বোলচাল দিচ্ছ, বলো। লেখা-টেখার ময়ূরপঙ্খী নাও
বাইছ কোন খালে? এখনও কি হর-হামেশা
পুরোনো নেশায় মজে মেতে হুজুগে
তেমন মালই চালাচ্ছ যা চার যুগ আগেই
বস্তাপচা বলে বাতিল করেছে ইউরোপ। দাদাবাদের ভূত
আজও কি নামেনি ঘাড় থেকে?
উড়ো কথা কানে আসে, তুমি নাকি
কবিতা লেখার ফাঁকে-ফাঁকে সস্তা চিটচিটে
উপন্যাসের ঊর্ণাজালে পাঠক আটকে
কেল্লাফতে করছো। তাহলে কী হিল্লে হবে
আমাদের অহল্যা কাব্যের

সত্যি দোস্ত, তোমার রকম-সকম
ভালো ঠেকছে না। খাতায় খাতায় আদুরে পায়রার
চোস্ত বকবকম বুলি ছিটিয়ে
চালাবে আর কতকাল? একদিন যারা
তোমার এই কানামাছি খেলা হাতে-নাতে ধরে ফেলবে,

তারা বাড়ছে ঘরে-ঘরে। আচ্ছা,
তোমার এত কেমন খেয়াল বলো তো, প্রহরে-প্রহরে
মিথ্যের সাজি ভরে তুলে কী আনন্দ পাও তুমি? বরং
যা কিছু সাচ্চা তার জন্যে
উঠোন নিকিয়ে রাখো, মাধুর্যের রঙ ছড়িয়ে আলপনা আঁকো,
খুলে রাখো দরজা।

এবার তোমার ক্রীতদাস লেখনীকে
স্পার্টাকাসের মতো ঘাড় ঝাঁকিয়ে, শক্ত, ঠাণ্ডা শেকল ছিঁড়ে
আয়ামে জাহেলিয়াতের দম-বন্ধ করা অন্ধকারে
নতুন কথার স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে বলো।

সে কোন সুদূরে

কোনো কোনো ভোর কীভাবে যে শুরু হয়!
লগ কেবিনের বাইরে এলেই পর্বতমালা,
শুভ্র পাগড়ি-পরা কতিপয় সান্ত্রীর মতো
নিথর দাঁড়ানো। তুষারবন্দি হ্রদের সীমানা
পেরিয়ে সহসা ভেসে আসে দূর পর্বতী নিঃশ্বাস।
আমাকে জড়ায় সে কোন সুদূর মরুবাসিনী ছায়া!

কাঠবিড়ালিটা কেবিনের দোরে মৃদু ছুটে আসে,
ভিনদেশী এক মানুষের দিকে কেমন তাকায়
আবার পালায়। মনে পড়ে দূরে ফেলে-আসা পথ,
মুখের ওপর চুলের প্লাবন, কালো-রাত্তির-আলো করা হাসি।
আমার হৃদয়ে সে কোন সুদূর মরুবাসিনীর ছায়া!

জায়গাটা গুণী কম্পোজারের সিম্ফনি যেন।
কফি শপে ভাসে নানা দেশী ভাষা। কারো কারো চোখে
চোখ পড়ে কারো। রুপালি চামচ প্লেটে বাজে আর
বাইরে এখন ঝলমলে দিন। মনে পড়ে সেই
বোস্টনে– দেখ কোন সে বিহানে ফুটপাতে একা
অন্ধ যুবার এ্যাকর্ডিয়ানে নিকেল-কুড়ানো সুর।
সত্তায় নামে সে কোন সুদূর মরুবাসিনীর ছায়া!
কোনো কোনো ভোর কীভাবে যে শুরু হয়!
সুকান্ত সেই কিশোরের মুখ করোটি আজকে

আমার টেবিলে করোটি কেবলি চেয়ে থাকে আর
বলে দ্যাখো ঐ কবরেও দ্যাখো পুষ্পের বিপ্লব।
যে যায় অমন উদাস একলা, সে কি একেবারে
একা একা যায়? যায় না কি তার সঙ্গে কিছুটা
আলোছায়া কিছু মনে-পড়া আর বিধুর বেহাগী রেশ?
আমাকে নাওয়ায় সে-কোন সুদূর মরুবাসিনীর ছায়া!

কখনো-সখনো ধূসর পূর্ব পুরুষের কালো গোরস্তানের
পাশ দিয়ে আমি শিস দিয়ে যাই, চমকে তাকাই
কখনো হঠাৎ। ছিলেন তো ওরা আটচালা ঘরে,
পুকুরে রোজানা
করতেন ওজু, মসজিদে ছিল যৌথ সেজদা।
পুকুরের দিকে
তাকাতেন আর দেখতেন কিছু মাছের রুপালি লাফ।
আমার ওপরে সে কোন সুদূর মরুবাসিনীর ছায়া!

উদাস পুকুর এমন হিংস্র আগে কে জানত?
আমার পায়েও খেয়েছে সে চুমো, নিয়েছে আমার
নানা বয়সে মাথাটার ঘ্রাণ শত শতবার।
হঠাৎ কেন সে আমার বুকের কিশোরকে নিল?
মেটাতে তার সে উনিশ শতকী রহস্যময় খলখলে ক্ষুধা
আমাকেই কেন দিতে হ'ল ভোগ, দিতে হল ভোগ আজ?
আমার দু'চোখে সে কোন সুদূর মরুবাসিনীর ছায়া!

ট্রেন থেকে মুখ বাড়িয়ে এবং গুডবাই হাত
নাড়তে নাড়তে চলে যাই আমি ছায়ার মতোই।
কোথায় যে যাই। আকাশের চাঁদ মাতালের চোখ,
আমার মগজে দাবানল আর সত্তার সব তন্তু ছিন্ন–
একটু শান্তি পাব কি কোথাও এমন দগ্ধ
পারিপার্শ্বিকে? সম্মুখে নেই ওয়েসিস কোনো, শুধু মরুভূমি
উগড়ে দিচ্ছে বিষধর সাপ আর নৃসিংহ দারুণ উগ্রতায়।
আমার নিয়তি সে কোন সুদূর মরুবাসিনীর ছায়া!

জাতিসংঘে অবিরল তুষার ঝরলে

জাতিসংঘে অবিরল তুষার ঝরলে
পৃথিবীতে বসন্তের ফুল

চাপা পড়বে না।
বাংলাদেশে ভূমিহীন চাষীর সংসার
ছারখার হলেও নিশ্চিত
জাতিসংঘে প্রার্থনার ঘরে নিমগ্নতা
থাকবে অটুট।

কে সুন্দরী ডলারের শূন্য মালা গাঁথে
স্বপ্নের গহনে?
নিউইয়র্কের পূর্ণ সুপার মার্কেটে ঝলমলে
দ্রব্যের জগতে
মনে পড়ে, তাকে মনে পড়ে, নিগ্রো ঘেটোর মতন।
হৃদয় আমার অকস্মাৎ আর্তনাদ করে ঘোর অবেলায়।

এখানে কী করে মনে পড়ে তাকে? কেমন নাছোড়
খাপছাড়া মন, তাই অবচেতনায়
চিত্রল হরিণ চিতাবাঘ, তার কী ফুল্ল শরীর
ভেসে ওঠে বারংবার। আমার দু'দিকে বাহরাইন, বাহামা
বার্বাডোস, পারমাণবিক ভস্মরাশি
কে ছড়াল
কোথায় কোন সে পাতালের
নির্জন অতলে,
নিঝুম সীমান্তে দিল হানা কারা উর্দি-পরা,
তা নিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি। এরই মাঝে
সহসা সে উঠে আসে আফ্রোদিতির মতন
শরীরে স্বপ্নের ফেনা নিয়ে।

মেশিন দলিল দস্তাবেজ সংঘ সংস্থা
ব্যক্তিকে নিয়ত টানে কী ধূসর নামহীনতায়।
জাতিসংঘ পরিণামহীন দেবতার মতো ডানা
ঝাপটায় শূন্যতায়। জাতিসংঘের ঠক বন্ধ
হলেও তৃতীয় বিশ্বে নবজাতকের নতুন চিৎকার বেজে
উঠবে নিয়ত, শীর্ণ হাত প্রসারিত হবে ক্রমে
সভ্যতার দিকে।

মধ্যবিত্তের পাঁচালি

এখানেও নেই, ওখানেও নেই–

মধ্যিখানেই বেঁধেছি ডেরা।
ধু-ধু পোড়ো মাঠে শরাহত ঘোড়া
জীবন নষ্ট স্বপ্নে ঘেরা।

সে কবে সুদূর বেঞ্চিতে ব'সে
বর্ণমালার জেলে দেয়ালি,
বিপর্যয়ের জের টেনে আজ
খেটে খেটে হাড় করছি কালি।

একদা মজেছি মায়া সরোবরে,
জলকন্যার কুহকী গানে;
মধ্যরাত্রে লিখেছি পত্র
নীল কাগজের মদির টানে।
জানলা-প্রেমের মধুর ঝিলিক
ছিল জাগরুক মনের কোণে,
শেষে অবশ্য সায় দিতে হ'ল
নাছোড় পিতার নির্বাচনে।

প্রাথমিক মোহ-মাধুর্য শেষে
বৎসরান্তে পুষ্যি বাড়ে,
দিনান্তে পাতে ভাত বাড়া হলে,
দুখিনী মায়ের অংশ কাড়ে।

ঊনসত্তরে দরাজ গলায়
দিয়েছি স্লোগান আমিও বটে ...
গণতরঙ্গে শহীদের লাশ, মেতেছি ব্যাপক ধর্মঘটে।
অনেকের মতো আড়ালেই থেকে
মুক্তিযুদ্ধে দিয়েছি সায়।
যে যাই বলুক, সারকথা এই–
বিশ্বে চলছে মাৎস্যন্যায়।

ঘোর সন্ত্রাস, ধর্ষিতা দেশ;
অগ্নিদগ্ধ একাত্তরে
প্রাণপক্ষীকে যুগিয়েছি ত্রাণ
যত্রতত্র কলমা পড়ে।

সকাল-সন্ধ্যা মুখে বিদ্রোহী,
বিপ্লবী বুলি আউড়ে চলি।

সম্মুখে দেখি মোক্ষ লাভের
চিরায়ত সেই অন্ধ গলি।

গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী আমি, তবু
হঠাৎ ব্যক্তিস্বরূপ জাগে;
আবার নিমেষে গড্ডলিকায়
মিশে যাই ম্লান অস্তরাগে।

সুবিধাবাদের ঝুঁটা খুঁটে খুঁটে
আমিও ঈষৎ মার্কসবাদী।
মধ্যে-মধ্যে দ্বিধা-খোয়ারিতে
সহজিয়া সুরে কণ্ঠ সাধি।

একি মরীচিকা বিলাসে মজেছি
যুগসন্ধ্যায় যৌথ ভ্রমে,
বিস্মৃত কিছু প্রাণীর মতোই
আমরা লুপ্ত হচ্ছি ক্রমে।

সে এক মাটির ঘর

আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম এই শহরের অখ্যাত গলির
এক মাটির ঘরে;
এতকাল পরেও হঠাৎ যখন আমার হাত
নিজের অজান্তেই নাকের কাছে এসে যায়,
একটা মন-কেমন করা সোঁদা গন্ধ পাই।
যে ঘরে প্রথম চোখ মেলেছিলাম
কার্তিকের রৌদ্রে, সে-ঘরে পড়ত একটা পেয়ারা
গাছের ছায়া,
সে ছায়া এখনও ঘন হয়ে আছে আমার চোখে।
এখনও পেয়ারা গাছের আনন্দিত সবুজ পাতাগুলি
মর্মরিত আমার শিরায় শিরায়।
গাছটার ডালে অনেক দূর থেকে-আসা পাখি
যে সুর ঝরিয়ে দিত ঋতুতে-ঋতুতে
তা' এখনও খুব গুঞ্জরণময় স্মৃতিতে আমার।
যে-ঘরে আমি জন্মেছিলাম তাকে
কিছুতেই বলা যাবে না গানের ঘর। সে ঘরে

সেতার কি সরোদ,
এস্রাজ কি সারেঙ্গি গুমরে ওঠেনি কোনো দিন।
কখনো বোল ফোটেনি তবলায় কিংবা কারো কণ্ঠে
জাগেনি চমকিলা কোনো তানকারি।
তবে ছেলেবেলায় আমাদের সরু গলিতে
সেই কবে কোন মধ্যরাতে কে পথিক আমার মনের ভেতর
সুদূর এক নদীতীরের ছবি জাগিয়ে
হেঁটে গিয়েছিল, আজও মনে পড়ে।
আজও কোনো-কোনো রাতে যখন আমার ঘুম আসে না
কিংবা মন ভালো থাকে না, হঠাৎ
আমি শুনতে পাই
রাতের গলায় দরবারি কানাড়া, পায়ে স্বপ্নের নূপুর।
এবং একজন মানুষের পুতুলনাচ
ঝলসে ওঠে বারংবার। হ্যাঁ, চিনতে পারছি একে;
এই লোকটাই কৈশোরে চুল ছেঁটে দিত আমার
সাবান, ফিটকিরি আর সস্তা পাউডারের
ঘ্রাণময় সেলুনে। ওর মাথায় পাগড়ি, যুগল ভোজালির মতো
উচ্চকিত গোঁফ, তার সালোয়ারের ভাঁজে ভাঁজে সুদূর
পাহাড়ি কোনো দেশের নানা চিত্রকল্প।

এখন আমার ঘর কাঁটা চুলের স্তূপে নিমজ্জিত; সেই স্তূপ
থেকে এই মাত্র উঠে এলো এক নারী, যার গ্রীবায়
মীরার ভজনের ছায়া, দু'চোখে যমজ গোলাপ,
ওষ্ঠে চন্দ্রভস্ম। সে এক মাটির ঘরে প্রবেশ করে
আস্তেসুস্থে আমার অভিলাষকে উসকে দিয়ে।
কখনো দেখি, সে মাটির ঘরের দিকে স্মৃতি ফিরিয়ে দেখি,
আমার আশার গুচ্ছ-গুচ্ছ মঞ্জরি
ইলেকট্রিকের তারে আটকে-থাকা ঘুড়ির মতো
ক্রমশ বিবর্ণ হচ্ছে, কখনোবা চাঁদকে বিশ্বাস করে দেখি
পূর্ণিমা চাঁদের মতো টেবিলের দু'দিকে দু'জন নাবিক
খেলছে রামি; একজনের চোখ থেকে ঝুলছে
অত্যন্ত পাথুরে স্বপ্ন, অন্যজনের ঠোঁট থেকে ঝুলছে
ঈগলের চঞ্চুর মতো পাইপ।

মেশকে আম্বরের অস্পষ্ট ঘ্রাণময় আতরদানি,
হুঁকোর দীঘল নল, পোষা পায়রা, তাকে-রাখা বিষাদসিন্ধু,

একটি চোখ
আমার নানার কণ্ঠনিঃসৃত সুবে-সাদেকের মতো আয়াত,
নানীর দীর্ঘশ্বাসসমেত
সেই মাটির ঘর এখন আমার উদরে।
সেই ঘরের কথা ভাবতে গিয়ে আমি সে ঘর আর দেখি না।

আমার সত্তা শ্লোক হয়ে

তোমার আমার মধ্যে ক্রমাগত রচিত হচ্ছে মাইল মাইলব্যাপী
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মতো গা ছমছম প্রান্তর। অদূরে
অনেক ক্ষুধার্ত শকুন
অপেক্ষমাণ, আর আমি ওদের দৃষ্টি থেকে,
শবগন্ধী চঞ্চু থেকে নিজেকে আড়াল করে হাঁটছি
ভারি পা টেনে টেনে।
কোথাও এমন কোনো পাখি নেই,
যার গানে দিকগুলি মাধুর্যের আভায় হবে রঙিন,
নেই কোনো ঝরনা, যার ছলছলে হাসি
আমার ক্লান্ত তৃষ্ণার অন্ধকারকে
মুছে ফেলবে নিমেষে।
এখন আমি তোমার দিকে মুখ রেখে এই বেয়াড়া প্রান্তর
পেরুনোর জন্যে বিশ্রামের কোটর
তছনছ করে ফেলেছি,
আমার স্বস্তি ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছে এক দুরন্ত ঈগল,
তার ডানার ঝাপটা আমার নিত্যসঙ্গী।
আমি কী করে না দেখে থাকব সেই তোমাকে
যার মধ্যে মেদুর অপরাহ্ণে
অলৌকিককে গ্রীবা বাড়াতে দেখেছি,
যার মধ্যে শুনেছি সুন্দর ভবিষ্যতের নিঃশ্বাস,
যার কণ্ঠে শুনেছি মৃত্যু-ভোলানো উচ্চারণ?'
আমি কী করে না দেখে থাকব সেই তোমাকে,
যার চোখ আমার প্রৌঢ়ত্বের অন্তরালে ধ্রুবতারা;
যার ওষ্ঠে সেই নদীর গান শুনি, যাকে আমি
দেখেছিলাম
অনেক আগে, সূর্যোদয় পেরিয়ে

গাছগাছালির ঘ্রাণ নিতে নিতে,
যার বুকের দ্যুতি কখনো আমাকে অন্ধ করে,
কখনোবা চক্ষুষ্মান, যার শরীরের প্রতিটি বাঁকে
সদ্য যুবার মতো মুখ রাখে আমার বাসনা?
এখন আমি আমার একাকিত্বের প্রবাসে
তলোয়ার মাছের মতো
নিয়ত সন্ধানী আর উদাস-নিষ্ঠুর।

মনে পড়ে
ঈষৎ উজ্জ্বল লাল বারান্দায় তুমি দাঁড়ানো–
আমি দেখছি তোমাকে, যেমন বয়স্ক বাজপাখি
চোখ তুলে চাঁদ। তুমি সেই মুহূর্তগুলিকে সাজালে
বিদেশী কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায়;
সেই শব্দগুচ্ছে ছিল না কোনো বিদায়ী শ্লোকের বিচ্ছুরণ,
অথচ আমি বিচ্ছেদকে ডানা মেলতে দেখলাম
ঈষৎ উজ্জ্বল দীর্ঘ বারান্দায়।
আমার অস্তিত্বে তোমার হাতের অন্তরঙ্গ তাপ সঞ্চয় করে
দৃষ্টিতে তুমিময় ছবি গেঁথে,
পথ চলি, ভালোবাসায় দেখি সত্যের মুখ।

দূর থেকে আমি হাত নাড়ি, তোমার স্মৃতির ভোরে বিভোর
এখন তোমার সান্নিধ্য থেকে নির্বাসিত আমি আর
অন্ধকার কুকুরের মতো
লেহন করছে আমাকে। মাঝে-মধ্যে এই রাত্রি
জন্মান্ধ গায়কের সুরে বেজে ওঠে
আমার শিরায় শিরায়, আশ্চর্য এক ফোয়ারা
আমার ভেতরে তরলিত মণিরত্ন ছড়াতে থাকে,
এবং তোমার অনেকানেক আসা-যাওয়া
স্মৃতির ঝোপঝাড়ে জোনাকি।
'কখনো নয়, বিলুপ্তি, মনে-না-পড়া, ফিরব না'
ঝরে আমার চোখের পাতায়, স্বপ্নে তোমার শরীর
লতাগুল্মময়, পাতালে ভাসে,
আমাকে ছোঁয় তোমার কণ্ঠস্বর,
আমার সমগ্র সত্তা শ্লোক হয়ে জড়িয়ে যায়
তোমার কণ্ঠস্বরে, আমার হৃদয়
মরীচিকার মতো কাঁপে শূন্যতায়, রুক্ষ শূন্যতায়।

আমার নিবাস

কখনো গিয়েছি আগে সেখানে, মানে সে বহুদূরে
মফস্বলী পুরানো মহলে?
দুপুর, নিবিড় হয় চোখের পাতায় আর উদাস পুকুরে;
সিঁড়িতে পা রাখতেই উষ্ণ করতলে
তার হাত চলে আসে। কার? আজ ছায়াচ্ছন্ন নিস্তব্ধ দুপুরে,
নিসর্গের অন্তঃপুরে
গাছগাছালির
মাঝে দৈববলে
সহসা পেয়েছি যাকে, তার? নাকি ভুলে-যাওয়া কোনো পাঁচালির
সুন্দরীতমার? সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাই, পাশে হাঁটে
আমার জাগর স্বপ্ন শাড়ির আঁচলে
নিয়ে অতীতের ঘ্রাণ। কে যেন রয়েছে বসে শ্যাওলাঢাকা পুকুরের ঘাটে
বড় একা, অস্তিত্বের ভাঁজে ভাঁজে তার
কিছু আলো, কিছু অন্ধকার।
পঞ্জিকার পাতা ওড়ে উল্টাপাল্টা, মাঝে-মধ্যে দোলে ঝাড়বাতি
প্রাচীন অট্টালিকার হঠাৎ হাওয়ায়, মেতে থাকি
কথপোকথনে, খোলা বারান্দায় পাখি তার সাথী
খুঁজতে খুঁজতে ফের কী মসৃণ সবুজে লুকায়,
সে আমাকে ডাকে মনে মনে, আমি তাকে ডাকি;
শিউলিতলার ছায়া স্মৃতি খুঁটে খায়।
ঘরের ভেতরে ইতিহাস অলৌকিক কলরবে
জেগে ওঠে বর্ষীয়ান কান্তিমান কথকের গাঢ় কণ্ঠস্বরে
পুরানো গানের মতো। দেয়ালে হরিণ শিং বাতিল গৌরবে
যেনবা কৌতুকপ্রদ, তাতে মায়া আছে; মায়া আছে সারা ঘরে।
বৃষ্টিগুঁড়ো দুপুরকে করে বুটিদার; মনে পড়ে
আরেক বর্ষার গান, অবিকল এই সিঁড়ি কবেকার, এমন চত্বরে,
মনে পড়ে, নিরিবিলি ঘরে কারো ওষ্ঠে ওষ্ঠ রেখে অমরতা
খুঁজেছি ব্যাকুল;
বুঝি তারও রাত্রিময় গহন খোঁপায় ছিল ফুল
এবং পরনে চাঁপারঙ শাড়ি, তাকেও দিয়েছি কথা,
টেনেছি বুকের কাছে, আমার ত্বকের গান বেজেছে সুদূর তার ত্বকে!
সে মুখ পড়লে মনে রক্তে লতাগুল্ম গান হয়, চোখ হয়
কণ্ঠস্বর, হস্তদ্বয় কালহীন স্পন্দিত হৃদয়,

আর মাঝে-মধ্যে মনে হয়, সব কিছু জাতিস্মর দীর্ঘশ্বাস,
মনে হয় আমার নিবাস,
ছিল সেখানেই, সেই প্রাচীন মহলে দূর বিস্মৃত শতকে।

রঞ্জিতাকে মনে রেখে

রঞ্জিতা তোমার নাম, এতকাল পরেও কেমন
নির্ভুল মসৃণ মনে পড়ে যায় বেলা-অবেলায়।
রঞ্জিতা তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কোনো কে
গ্রীষ্মের দুপুরে দীপ্র কবি সম্মেলনে
কলকাতায় ন'বছর আগে, মনে পড়ে?

সহজ সৌন্দর্যে তুমি এসে বসলে আমার পাশে।
কবি প্রসিদ্ধির
অমেয় ভাণ্ডার থেকে রত্নরাজি নিয়ে
আজ আর সাজাব না তোমাকে রঞ্জিতা। শুধু বলি,
তোমার চোখের মতো অমন সুন্দর চোখ কখনো দেখিনি। 'বিচ্ছিরি গরম'
বলেই সুনীল খাতা দুলিয়ে আমাকে তুমি হাওয়া
দিতে শুরু করেছিলে, সেই হাওয়া একরাশ নক্ষত্রের মতো
মমতা ছড়িয়ে দ্যায়। যদি আমি রামেন্দ্র সুন্দর
ত্রিবেদী হতাম, তবে বলতাম হে মেয়ে 'ইহাই বাঙালিত্ব।'

কিছুই বলেনি একালের কবি, শুধু মুগ্ধাবেশে
দেখেছে তোমার মধ্যে তন্বী গাছ, পালতোলা নৌকো,
পদ্মময় দীঘি আর শহরের নিবিড় উৎসব।
রঞ্জিতা সান্নিধ্য বড় বেশি মোহময় চিত্রকল্প তৈরি করে,
দেখায় স্বপ্নের গ্রীবা– বুঝি তাই আমিও ভেবেছি,
ক'দিনের সান্নিধ্যের সুরা পান করে,
একান্ত আমারই দিকে বয়েছিল তোমার গোলাপি হৃদয়ের
মদির নিঃশ্বাস আর সে বিশ্বাসে আমরা দু'জন
অপরাহ্নে পাশাপাশি হেঁটে গেছি কলেজ স্ট্রিটের
অলৌকিক ভিড়ে, ফুটপাথে ফুটেছিল মল্লিকা, টগর, জুঁই
তোমার হৃদয়ে উন্মীলিত
আমারই কবিতা আর চোখের পাতায় শতকের অস্তরাগ।
রঞ্জিতা আবার কবে দেখা হবে আমাদের কোন
বিকেল বেলার কনে-দেখা আলোর মায়ায়, কোন

সে কবি সভায় কিংবা ফুটপাতে?
রঞ্জিতা তোমাকে আমি ডেকেছি ব্যাকুল বারংবার

ডেকেছি আমার।
নিজস্ব বিবরে। এই চরাচরব্যাপী অসম্ভব হট্টরোলে
অসহায় আমার এ কণ্ঠস্বর কি যাবে না ডুবে?
কী করে আমরা ফের হবো মুখোমুখি
বিচ্ছিন্নতাবোধের পাতালে?
ছদ্মবেশী নানাদেশী ঘাতকের খড়্গের ছায়ায়
কী করে আমরা চুমো খাব?
কী করে হাঁটব আণবিক আবর্জনাময় পথে?
ভীষণ গোলকধাঁধা রাজনীতি, আমরা হারিয়ে ফেলি পথ
বার বার, পড়ি খানাখন্দে, মতবাদের সাঁড়াশি
হঠাৎ উপড়ে ফেলে আমাদের প্রত্যেকের এককেটি চোখ। যে ভূখণ্ডে
রঞ্জিতা তোমার আদিবাস, তার মাৎস্যন্যায় দু'চোখের বিষ
এবং আমার মধ্যে নেই কোনো বশংবদ ছায়া।

হয়তো কখনো আর কলকাতায় যাব না এবং
তুমিও ঢাকায় আসবে না। তাহলে কোথায় বলো
দেখা হবে আমাদের পুনরায় অচেনা পথের কোন মোড়ে?
মস্কো কি পিকিং-এ নয়, ওয়াশিংটনেও নয়, ব্যাঙ্কক জাকার্তা
জেদ্দা কি ইস্তামবুল, হামবুর্গ, কোনোখানে নয়।
আমরা দু'জন
হয়তো মিলিত হবো নামগোত্রহীন
উজ্জ্বল রাজধানীতে কোনো, যাকে ডাকব আমরা
মানবতা বলে,
যেমন আনন্দে নবজাতককে ডাকে তার জনক-জননী।

রেডক্রসের গাড়ি এবং তুমি

রেডক্রসের গাড়ি ভয়ার্ত রাজহাঁসের মতো
চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল
মধ্যাহ্নের প্রাখর্যকে কম্পমান পর্দা বানিয়ে।
সেই গাড়িটার ভেতরে আশ্রয় পেলে আপাতত
বেঁচে যেতাম। ভীষণ অসুস্থ আমি, শ্বাসরোধকারী
আমার ব্যাধির কথা জানে নীলিমা, পাখির ঝাঁক, নতজানু ...

রেডক্রসের গাড়ি আমাকে নিয়ে যাক
মেঘে মেঘে, দূর নীলিমায়।

রেডক্রসের গাড়ি এ মুহূর্তে আমার মন্ত্রোচ্চারণ,
অকস্মাৎ এই মরু-মধ্যাহ্নে মনে হল,
তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে
একটা চিকচিকে মরীচিকাকে মুছে ফেলে
হৃদয়ের মতো অন্তরঙ্গ হাতের তালুতে।

এই শহরের সবচেয়ে সুন্দর পাখি, ইদানীং
পাখি বড় একটা চোখে পড়ে না–
গান গেয়ে আমাকে বলেছিল ফিরে এসো।
একটি বেহালা করুণ সুরে আর্তনাদ করে উঠেছিল–
তোমার প্রতীক্ষায় আমি বাজব অষ্টপ্রহর,
পার্ক ডেকে বলেছিল, তোমার জন্যেই উন্মোচিত আমি,
ফিরে এসো।
আমি ওদের ডাকে সাড়া দিইনি।
তোমার ওষ্ঠ যদি বলে, তবে আমি
কোনো সেবাসদন কিংবা রেডক্রসের গাড়ির স্বপ্ন দেখব না,
ছুটে আসব আবার।

আমি লিখছি অন্ধকার নাত্রির হৃৎপিণ্ডের ভেতরে ব'সে।

কবেকার রাস্তায় দেখা ঘোড়ার জৈবিক গন্ধ, একলা ঘরে
একজন বামনের কড়িকাঠ-ছোঁয়া উল্লাস,
আর সেসব পাখি যারা বিল ছেড়ে উড়ে যায়
আমার স্বপ্নের ভেতরে,
ক'জন তাসুড়ের বর্মী টেবিল ঘিরে ঘণ্টা ঘণ্টাব্যাপী বসে-থাকা,
হাওয়ায় ফুলে-ওঠা জকির রঙিন জামা আর রাজপথে
বয়ে-যাওয়া তরুণ বীরের রক্তস্রোত
মেশে আমার পঙ্‌ক্তিমালায়, কখনো কখনো
কাগজ-কলম নিয়ে বসে থাকি সারারাত,
সাদা পাতার দিকে চেয়ে থাকি প্রহরের পর প্রহর
যেমন কৃষক তার শূন্য ক্ষেতের দিকে– কী করুণ আর ক্লান্ত।
একটা রেডক্রসের গাড়ি ভয়ার্ত রাজহাঁসের মতো
চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল রাত্রিকে
টুকরো টুকরো করে।

হঠাৎ আমার চোখে মুখে রাগে তোমার সুগন্ধি নিঃশ্বাস,
আমার কবিতার খাতায় ঠিকরে পড়ে
তোমার চোখের জ্যোতি, তোমার চোখের জ্যোতি,
তোমার চোখের জ্যোতি ।

একদা তোমাকে আমি

একদা, তোমাকে আমি অহংকারী বলে জানতাম । মনে পড়ে,
কোনো এক পঁচিশে বৈশাখে
তুমি আর আমি পাশাপাশি ছিলাম কী মুগ্ধ বসে ।
চিনতে পারনি তুমি পাশে-বসে-থাকা জবুথবু
তরুণকে যার
কবিতা তখন এ শহরে যত্রতত্র
বাচ্চা রাজহাঁসের মতন
পাখা ঝাপটাত, সেই পদাবলি পাঠক গোষ্ঠীকে দিয়েছিল
ভীষণ ভড়কে আর উদাসীন পণ্ডিতবর্গের
টেরিকাটা দামি মাথা চুলকোতে বাধ্য করেছিল ।
তুমি একবারও তার দিকে, এমনকি তাচ্ছিল্যভরেও, ফিরে
তাকাওনি; দৃষ্টি ছিল মঞ্চে, কখনোবা কিছু দর্শকের প্রতি ।
প্রকৃত রানীর মতো ছিল মঞ্চে, কখনোবা কিছু দর্শকের প্রতি ।
প্রকৃত রানীর মতো ছিলে তুমি সে আসরে
অমন সুন্দর গ্রীবা, চোখ, চুল নিয়ে অহংকারে
কেমন সুদূর একাকিনী । কী মদির তাপ গোলাপি নেশার মতো
তোমার নিজস্ব পারফিউমের মতো
আমার সত্তায় হল সঞ্চারিত; সকালের আকাশের মতো
কী সহজ আভিজাত্য ছিল তোমার অস্তিত্বে ব্যাপ্ত
এবং আমার ঠোঁট দুটি অদৃশ্য পাখির মতো
গান গাইছিল স্মিত তোমার শরীরে সারাক্ষণ ।
সে রাতে তরুণ কবি অর্জিত মোহন কাম তার
অন্য কারো নিবেদিত শরীরে উৎসর্গ করেছিল,
অথচ তুমিই ছিলে, শুধু তুমি তার
অস্তিত্বে অণুপরমাণুময় ।
তোমাকে দেখেছি আমি দূর থেকে ঊনসত্তরের
পদধ্বনিময় দিনে, করেছি আবৃত্তি

তোমার উজ্জ্বল মুখ, চকচকে চোখ, কালো চুলের গৌরব,
মধ্যরাতে বৈমাত্রের পরিবেশে কবিতা লেখার ফাঁকে ফাঁকে।
একাত্তরে গুলিবিদ্ধ ঈগলের মতো রক্তাপ্লুত
বিধ্বস্ত শহরে থেকে সবুজ গ্রামের অভ্যন্তরে
পলাতক হয়েছি যখন,
তখনও তোমার কথা হৃদয়কে বলেছি নিভৃতে
দীর্ঘশ্বাসসহ– যে উতল দীর্ঘশ্বাসে মিশ্র স্মৃতি,

পঁচিশে বৈশাখ, চৈত্রপাতা, বৃষ্টিপাত, ধু-ধু মাঠ,
প্রেতায়িত ঘোড়াদের লাফ,
ধ্বংসস্তূপ সেতারের ব্যাকুল বেহাগ, দেয়ালের
কী বিমূর্ত দাগ, ছত্রভংগ মিছিলের প্রজ্বলিত আর্তনাদ–
মাছরাঙা পাখি, মাছ, শাপলা শালুক দেখার সময়।
এখন কেমন আছ তুমি? এখন তো
আঁধার চিৎকার করে অগ্নিদগ্ধ ঘোড়ার মতন।
যখন আলিজিরিয়া যুদ্ধক্ষুব্ধ ছিল, জামিলাকে
নেকড়ের পাল ছিঁড়ে খুঁড়ে মেতেছিল খুব পৈশাচী উল্লাসে,
ফিলিস্তিনি লায়লাকে ঝাঁক ঝাঁক ডালকুত্তা তুমুল তাড়িয়ে
বেড়িয়েছে রাত্রিদিন, তখন কোথায় ছিলে তুমি?
তখন কেমন ছিলে তুমি?
যখন চেগুয়েভারা ছিলেন কাদায় পড়ে বলিভিয়ার জঙ্গলে তাঁর
নিঃসাড় তর্জনী রেখে মুক্তি ও সাম্যের দিকে, দীপ্র
সূর্যোদয়ের উদ্দেশে
তখন কোথায় ছিলে তুমি?
তখন কেমন ছিলে তুমি?

ও দৃষ্টি সরিয়ে নাও আমার অস্তিত্ব থেকে, আমি
পুড়ে যাচ্ছি, হে মহিলা, মদির অনলে।
এ দাহ অসহ্য তবু তোমার কাছেই যেতে চাই বারংবার,
তোমার নিঝুম ঘাটে তুলে নিতে চাই
আঁজলা আঁজলা জল অকূল তৃষ্ণায়।
কখনো ভাবিনি আগে এতকাল পরে দেখা হবে পুনরায়,
কখনো ভাবিনি আগে কোনো দিন বসব তোমার
মুখোমুখি, আমাদের সংলাপে মুখর হবে অনেক প্রহর,
কাফকা ডস্টয়ভস্কি এসে বসবেন অপরাহ্নে চায়ের সময়,
চায়ের পেয়ালা তুমি সুন্দর ভঙ্গিতে তুলে দেবে

আমার ব্যাকুল হাতে, অন্ধকার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
আমাকে ফেরত দেবে ভুলে ফেলে-আসা।
পকেট চিরুনি।
তোমার গ্রীবার ডালে প্রত্যহ রজনীগন্ধা ফোটে,
দেখি আমি দেখি।
চারদিকে নিদ্রামগ্ন ফেরেশতার মতো জ্যোৎস্না, তুমি
জ্যোৎস্নার অধিক স্নিগ্ধতায় স্বপ্ন হয়ে আছ, দেখি
আমি দেখি।

জ্যোৎস্নার নেকাব ছিঁড়ে মাঝে-মাঝে কাক উড়ে যায়।
কত কথা বলো তুমি, অথচ যে-কথা
শোনার আশায় আমি থাকি প্রতীক্ষায় প্রতিদিন,
কাটাই নির্ঘুম রাত্রি, সে-কথা সর্বদা ভার্জিনিয়া উলফের
দূর বাতিঘরের আড়ালে, স্যামুয়েল
বেকেটের নরকের অন্তরালে চাপা পড়ে যায়।
কয়েদির খুপরির ঘুলঘুলি-পেরুনো আলোর মতো
কার্পণ্য তোমার,
এবং আমিও যে গোপন উচ্চারণ চাই আমার আপনকার ঠোঁটে
তা-ও নিমেষেই
প্রস্তর যুগের স্তব্ধতার মতো অনুচ্চার থেকে যায়, জানি
অন্তর্গত বাসনার বসন্ত আমার
পুষ্পিত হবে না কোনো দিন।
জ্যোৎস্নার নেকাব ছিঁড়ে মাঝে মাঝে কাক উড়ে যায়।

তুমি কি আসবে ফের

ভোরের গোলাপ দ্যাখো মেলেছে কী পূর্ণ দৃষ্টি তাজা,
টেবিলে রোদের গাথা, হলতে পর্দা দোলে মাত্রাবৃত্তে;
উড়িয়ে-আঁচল, ঢেউ তুলে বায়ুস্তরে একাকিনী
তুমি কি আসবে ফের সান্নিধ্যে আমার?
বাগানে পাখির ঝাঁকে, পাতায়-পাতায় আনন্দের
গুঞ্জরণ, আলনায় শার্ট আর পাজামায় জাগে
শিহরণ অব্যক্ত স্বপ্নের মতো। সুগন্ধি নিঃশ্বাস নিয়ে
তুমি কি আসবে ফের সান্নিধ্যে আমার?
পুরোনো কবরে সাদা কবুতর ঝরিয়ে পালক

উড়ে যায় আসমানে, গোর-খোদকের শক্ত হাতে
হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে গন্ধরাজ, মাধুর্যে সুস্মিতা,
তুমি কি আসবে ফের সান্নিধ্যে আমার?
এই তো ডালিম গাছে কত যে স্বপ্নিল টেলিগ্রাম,
টেলিফোন যেন মেঘচর পাখি বিমুগ্ধ উড্ডীন,
তোমার চন্দ্রালোকিত কণ্ঠস্বর হওয়ায় ঝরিয়ে
তুমি কি আসবে ফের সান্নিধ্যে আমার?
বৃষ্টিতে পাখির কান্না, আমার হাতের নখ থেকে
ভুরু থেকে, ওষ্ঠতট থেকে নিঃসঙ্গতার মতন
বৃষ্টি ঝরে অবিরল, কালো বৃষ্টি-জাল ছিন্ন করে
তুমি কি আসবে ফের সান্নিধ্যে আমার?
যে-দরজা নেই তা খোলার জন্যে একটি সোনালি
চাবি পেয়ে গেছি গোধূলিতে, একজন আলুথালু
কিশোর সারস হাতে রয়েছে দাঁড়িয়ে– সেই পথে
তুমি কি আসবে ফের সান্নিধ্যে আমার?
রেশমি পতাকা হয়ে ওড়ে খবর কাগজ আর
কফির বাতিল কৌটো, পিলসুজ স্বপ্নে ভরপুর;
কবি শব্দহীনতার ছায়ায় ঘুমোয়, বাণী হয়ে
তুমি কি আসবে ফের সান্নিধ্যে আমার?

একটি দুপুরের উপকথা

সজীব সকালে চোখ মেলি, প্রতিদিনের পৃথিবী
আমাকে জানায় অভিবাদন। টাটকা রোদ,
পাখিদের ওড়াউড়ি, গাছের পাতার দুলুনি, বেলফুলের গন্ধ
ডেকে আনে আমার বালকবেলাকে।
রোদ আমার ভেতরে বাজতে থাকে মোহন বাদ্যযন্ত্রের মতো
আর আমি যেন নিভৃত আরোগ্যশালায়
একটু একটু করে স্বাস্থ্য ফিরে পাই। ভোর স্বপ্নের ভাষায়
অপরূপ কোলাহলময় আমার শিরায় শিরায়;
আমি সঙ্গমকালীন একাকিত্বের কথা ভুলে, ভুলে উঠোনের কথা
দিগন্ত আর ধাবমান অশ্বপালের কথা ভাবি।

তখন সেই জাগরণের মুহূর্তে
আমি কি জানতাম কী বিপুল আশ্চর্য অপেক্ষা করছে

আমার জন্যে? কয়েক ঘণ্টা পরেই ঝকঝকে দুপুরে
আমার অস্তিত্বকে উদ্ভাসিত করে একজন
সিঁড়ির ধাপ ছেড়ে
উঠে আসবে আমার বাঁ পাশে? তার দৃষ্টি আর হাসিতে
আমার পরমায়ু হবে গভীর সঞ্জীবিত?

তখন কি আমি জানতাম
দুপুর এমন বাঙ্ময় হতে পারে, হতে পারে কোনো পাখির দীর্ঘ ডাক?

হ্রদের ছলছলানি? এমন সম্মোহনময়?
পুলিশের বাঁশি, মাইল মাইলব্যাপী বুটের শব্দ,
বম্ব্যরের মৃত্যুবর্ষী গর্জন, বাতিল শাসনতন্ত্রের হাহাকার
আর পাঁচসালা পরিকল্পনার আর্তনাদ ছাপিয়ে
একটা দুপুর চাইকোভস্কির সুর হতে পারে, আগে জানিনি।
একজন, বহুদিন আগেকার রাত্রির গহন থেকে আফ্রোদিতির মতো
উঠে-আসা একজন, দুপুরকে অনন্য উপহারে রূপান্তরিত করে
আমার উদ্দেশে। সেই উপহার
হাত বাড়ায় আমার দিকে, আমি মুগ্ধাবেশে
পান করি সেই দৃশ্য। দুপুর, আকাশের দিকে বাহু-তোলা গাছ,
রৌদ্রাক্রান্ত পথ, ধাবমান যান আর আমরা দুজন
নববর্ষের প্রথম দিন হয়ে যাই।
কী সুন্দর তুমি, দুপুর উচ্চারণ করে তোমার কানে কানে;
তুমি হাসো দুপুরকে অবিশ্বাস করে,
সেই হাসি দুপুরকে করে তোলে আরো প্রগলভ।
এই শহুরে দুপুরে অকস্মাৎ ভাবি–
এ দুপুর জানে প্রতিবিপ্লবীর ভ্রান্তির মতো কিছু কথোপকথন
আমাদের আছে,
এ দুপুর জানে ভূমিহীন কৃষকের স্বপ্নের মতো কিছু স্বপ্ন
আমাদের বাস্তবে লতিয়ে ওঠে,
এ দুপুর জানে গুপ্তহত্যার মতো নিঃশব্দ ভয়ংকর কিছু
বারংবার ঘটতে থাকে আমাদের ভেতর,
এ দুপুর জানে ল্যাজারাস আড়মোড়া ভাঙে উদাস প্রান্তরে,
তোমার অনাবৃত বাহুর মতো যেন কোন স্মৃতি
ঝুলে রয় মনের ঝোপঝাড়ে,
এ দুপুর জানে খরগোশেরও ঘাড়ে কিছু কবিতার পঙ্‌ক্তি
মিশে থাকে,

কোথায় ব্যাপক জতুগৃহে অনেকানেক ঘোড়া পুড়ে যায়।
কী সুন্দর তুমি, মনে মনে বলি।
তখন আমার চতুষ্পার্শ্বে ট্রাফিকের মাতলামি,
রাস্তা উপচে-পড়া মানুষ, দোকানপাটের বিজ্ঞাপনী ইশারা,
চিত্রতারকার রঙচঙে ছবি, অথচ আমি
কিছুই দেখি না, শুনি না কিছুই। দুপুরে
আমার দু'চোখ জুড়ে তুমি শুধু তুমি।
কী সুন্দর তুমি, আবৃত্তি করি তোমার সৌন্দর্য
আর হঠাৎ মনে পড়ে, তোমাকে ধরে রাখতে পারব না কখনো।
হয়তো এমন দিন আসবে,
যখন আকাশে সূর্য হাসবে রাষ্ট্রদূতের মতো অথবা চাঁদ
আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক কর্মীর মতো
গা-ঢাকা দেবে মেঘের ভূতলে,
কিংবা হলদে পাতার মতো হেমন্ত ছোঁবে আমাকে,
ঝমঝমিয়ে আষাঢ় নামবে এ শহরে
আর আমি নির্বাসিত হবো তোমার সান্নিধ্যের অলকাপুরী থেকে।
চাই, তোমাকেই চাই বলে আমার অস্তিত্ব এক-দীর্ঘ চিৎকারে
রূপান্তরিত হবে, দিনযাপন মনে হবে
নিরন্ধ্র কারাবাসের মতো; আর তোমার উদ্দেশে আমার ডাক
প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসবে আমারই কাছে বারে বারে।
যখন কোনো কোনো দুঃস্বপ্নসংকুল
রাতে ঘুমের বড়ি সেবন করার পরও ঘুম আসবে না তোমার,
তখন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তুমি, চোখ মেলে দিও
ক্ষুধিত অন্ধকারে,
তখন দেখতে পারবে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন
তোমারই প্রতীক্ষায়; কোনো পাহারাদার তাকে 'দূর হট' বলে
তাড়াতে পারবে না,
এমনকি আজরাইলের অন্ধ, দুর্বিনীত ডানাও না।

কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৮৯ [ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩]
প্রকাশক সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী
উৎসর্গ-পত্র শহীদ কাদরী
বন্ধুবরেষু

টানেলে একাকী

একটি টানেলে,
কাটিয়ে দিলাম হিমযুগ এবং প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ,
লৌহযুগ খুব একা একা,
কাছাকাছি কেউ নেই এবং দূরেও ঘন কুয়াশায় কারো
অস্তিত্ব ফোটে না, শুধু ব্যর্থ যৌবনের মতো একটি কুকুর আজও
সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

কতকাল আমি সূর্যোদয়
দেখিনি, শুনিনি কোনো দোয়েলের শিস। কালেভদ্রে
যেন কোনো বাজিকর টানেলের দেয়ালে ফোটায়
আলোর গোলাপ, ঝিল্লিস্বর শুনে টের পাই রাত।
যদিও প্রায়শ শ্বাসকষ্ট হয়, তবু নিঃশ্বাস নেবার মতো
অবশ্য থেকেই যায় কিছু অক্সিজেন।

টানেলের ভেতরে হঠাৎ
কখনও চিৎকার শুনে আতঙ্কে শরীর সজারুর
কাঁটা হয় আর চোখ ফেটে যায় আনারের মতো। চতুর্দিকে
দৃষ্টি ছোটে, ঘুরি দুটি হাত প্রসারিত করে, অথচ আমার
নিজস্ব অস্পষ্ট ছায়া ছাড়া কাউকে পাই না খুঁজে
কোথাও এখন।

কখনও কখনও
মনে হয়, কী যেন কিসের ঘোরে চলে গেছি সুদূর কোথাও
স্বপ্নচর পাখির পাখায় ভর করে, কাছে আসে
বাহাদুর শাহ জাফরের গজলের মতো এক
বিরান বাগান আর মোগল মিনিয়েচার কিছু অস্তরাগে কান্নারুদ্ধ
রক্তাভ চোখের মতো পুরাণসম্ভব।

অপরাহ্ণে ডিভানে শায়িতা
মহিলা আমাকে ডেকে পিকাসোর ত্রিমুখী রমণী হয়ে যান
চোখের পলকে, আমি তার স্তনদ্বয়, অভিজাত নাভিমূল,
রমণীয়, উল্লসিত যোনি থেকে দূরে, ক্রমশ অনেক দূরে
চলে যেতে থাকি তিনি কবিতার পঙ্‌ক্তির মতন
কেবলি ওঠেন বেজে অস্তিত্বে আমার।
এ কোথায় এসে

দাঁড়ালাম অবশেষে? তবে কি প্রকৃত রোবটের

কাল শুরু হল আজ? সকলেই রোবট তাহলে ইদানীং?
কান্তিমান লাইনো টাইপগুলি করেছে নির্মাণ
অদ্ভুত জগৎ এক; রাশি রাশি টাইপ কি দ্রুত
বেলা-অবেলায়

অবলীলাক্রমে
মিথ্যাকে বানায় সত্য, সত্যকে ডাগর মিথ্যা আর
রমণ, বমন, বিস্ফোরণ, যূথবদ্ধ আত্মহনন ইত্যাদি
শব্দাবলি দশদিকে সহজে রটিয়ে দেয় এবং সাজায়
সুচারু যান্ত্রিকভাবে কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা মিল-
অমিলের উদ্ভট নকশায়।

অসম্ভবে হয়েছি সওয়ার
আকৈশোর; অতিকায়, মৎস্যপৃষ্ঠে করেছি ভ্রমণ
সমুদ্দুরে বহুকাল, জলপরীদের দিব্যলালিম স্তনাগ্র ছুঁয়ে-ছেনে
গেছে বেলা পাতালের জলজপ্রাসাদ আর খসিয়ে নিজের
বুকের পাঁজর থেকে হাড় বানিয়েছি দেবতারও
ঈর্ষণীয় বাঁশি।

অথচ উচ্চাভিলাষহীন
গৌরবের হেমবর্ণ চূড়া থেকে বহুদূরে আছি,
দেখি কয়লার গুঁড়ো, স্বপ্নবৎ ঊর্ণাজাল, কীটপতঙ্গের
ঘর-গেরস্থালি, দেখি জানু বেয়ে ওঠে নীল পোকা, মাঝে-মাঝে
বাদুড়ের ডানা কাঁপে, সিল্কের রুমাল যেন; থাকি দীর্ঘ কালো
টানেলে একাকী।

নূহের জনৈক প্রতিবেশী

লোকশ্রুত মহাপুরুষের অলৌকিক জেল্লা নেই
আমার সত্তায়, আমি আটপৌরে ছাপোষা মানুষ,
কোনোমতে সংসারের হাল ধরে, আছি দাঁতে দাঁত
চেপে সামান্যের ভরসায়, কিছু আয় করে আর
কিছুবা দেনার টানে। সন্ধেবেলা গৃহিণী ভাজেন
রুটি, আমি, কাজ-থেকে-ফেরা, পুরনো জোব্বাটা রেখে
এক কোণে ক্লান্ত গা এলিয়ে খাটে আমার নিজস্ব

অতীতের অভ্যন্তরে আস্তেসুস্থে আঙুল চালাই,
যেমন ধার্মিক ধর্মপুস্তকের পাতা ক্রমাগত
উল্টে যান ভাবাবেশে নিরিবিলি। এই মতো কাটে
দিন কায়ক্লেশে, থাকি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপ্রাণ
নূহের বাড়ির পাশে সন্তান-সন্ততিসহ আর

বৈয়মের তৈলসিক্ত জলপাইয়ের মতন আমি
শুষে নিই, যতদূর পারা যায়, উচ্ছল আরক
জীবনের; প্রায়শই বন্ধুর ডেরায় যাই, করি
গল্পগাছা, মাঝে-মধ্যে গুঞ্জরণময় বাজারের
আশপাশে শুনি সদ্যপ্রত্যাগত মাঝিমাল্লাদের
সরস কাহিনী কত। কখনও-কখনও মধ্যরাতে
অতীত সম্ভোগ করি গৃহিণীর সঙ্গে কিংবা ভাবি
যুগ্মতায় কীভাবে কতটা ব্যয়সঙ্কোচন করা
যায়, কেনা যায় কিছু শস্যদানা এবং একটি
পাহাড়ি দুধালো ছাগী। জালার শীতল পানি শেষ
হয়ে এলো কিনা, দেখি কখনও-সখনও। এভাবেই
দিন যায়, দিন আসে জন্মমৃত্যুময় এই নাটে।

অকস্মাৎ পথে পথে মজলিসে হট্টরোলে শুনি
নূহের জাহাজ নাকি জোড়া জোড়া নানা পশুপাখি,
হরেকরকম শস্যবীজসমেত ভেসেছে আজ
ভয়ানক ফুঁসে-ওঠা সমুদ্রে। কেননা গর্জমান
মহাপ্লাবনের ক্রূর তাণ্ডব হয়েছে শুরু আর
চতুর্দিকে দিশাহারা বিপন্ন মানুষ অগ্নিদগ্ধ
মৌমাছির মতো পলায়নপর। কে এক পায়রা
চকিতে আসবে বলে নূহের ব্যাকুল দৃষ্টি গাঁথা
পানি-ধোয়া দিগন্তের দিকে। জনসাধারণ থেকে
বহুদূরে নিরাপদে এই অবস্থান, একি নয়
পলায়নীমনোবৃত্তি ধীমান নূহের? আমি এক

সাধারণ নগণ্য মানুষ, আছি অতি উপদ্রুত
মানুষেরই মাঝে; কাদামাখা হাতে সকলের
সাথে মিলে নিয়তির বিরুদ্ধে নিয়ত অনলস
লড়ে বাঁধ গড়ে মহাপ্লাবনের এ ব্যাপক রোষ
আকুল থামাতে চাই। যদি যাই ভেসে, তবু নেই

কোনো খেদ; পাড়াপড়শীকে, হাজার-হাজার আর্ত-
মানুষকে বিপর্যয়ে ফেলে আমি সুদূরে হইনি
পলাতক– এই গৌরবের কিরীট জ্বলবে হিংস্র
ঢেউয়ের চূড়ায় নৃত্যপর প্রদীপের মতো দ্রুত
মজ্জমান আমার মাথায় আর এই হস্তদ্বয়,
তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষুব্ধ হস্তদ্বয়, ক্রোশ ক্রোশব্যাপী
নারী-পুরুষের আর্তনাদে, ভয়ংকর চোরাটানে
ব্যাকুল খুঁজবে শুধু বিপন্ন ডুবন্ত কোনো হাত।

কেউ কি পালিয়ে যায়

কেউ কি পালিয়ে যায় অকস্মাৎ নিজের বাড়ির
দোরগোড়া থেকে কোনো দিন? নিজের একান্ত প্রিয়
বই, যাবতীয়
খুঁটিনাটি বস্তুময় ঘরটাকে খুব ফাঁকা করে
কেউ কি স্বেচ্ছায় সাততাড়াতাড়ি চলে যায় নিজস্ব হাঁড়ির
ভাঁপ-ওঠা ভাত ফেলে? ঘোরে
এলোমেলো গন্তব্যবিহীন
অন্ধকারে মুখ ঢেকে ভয়ে ভয়ে থাকে রাত্রিদিন?

মাঝে-মাঝে এরকম হয়, হতে থাকে–
গেরস্থ সাজানো ঘরদোর ছেড়ে নিমেষে পালায় ঊর্ধ্বশ্বাসে
সেখানে, যেখানে রক্তখেকো বাঘ ডাকে,
পড়ে গণ্ডারের, বন্যবরাহের পদচ্ছাপ,
বিষধর সাপ
ফণা তোলে, দোলে হিসহিসে তাজা ঘাসে।

বলো তো এমন কেন হবে বলে কেউ
ছাগলের চামড়ার মতো স্তব্ধ আকাশের দিকে
চেয়ে কিছুক্ষণ হাসে ফিকে
হাসি, আড়চোখে দেখে আশপাশে কত ফেউ
এর ওর তার ছায়া চেটে খায়। যেহেতু হঠাৎ
এপাড়া-ওপাড়া
সব পাড়াতেই চলে প্রেতের পাহারা,
অকৃত্রিম সুহৃদের মুখের আদল

নিয়ে প্রত্যেকেই দ্রুত হয়ে ওঠে নির্দয় কিরাত।
বিশ্ব-চরাচরে রাসায়নিক বাদল
ব্যেপে আসে দেখি ক্রমান্বয়ে
খুব ঘন হয়ে।

নিজস্ব বিবর ছেড়ে যাই না কোথাও
দূরে স্বপ্ন সঞ্চরণে, দোরগোড়া থেকে
কখনও হঠাৎ সরে গেলে অভিমানে মুখ ঢেকে,
'ঘুমন্ত রাজার ঘরে দাও
হানা মধ্যরাতে' বলে দেয় প্ররোচনা চতুর্থ ডাকিনী।
তাকে দেখে মুখ আমি কখনও ঢাকিনি।
তবু আর্তবিবেকের নিঃসঙ্গ জোনাকি জ্বলে আর

নেভে, নেভে আর জ্বলে
আজও অবচেতনের গহিন জঙ্গলে।
ভয়ার্ত পাখির মতো ইদানীং কাঁপছে সময়,
হোক না যতই অন্ধকার
ঘর, সেখানেই ফিরে আসি, আসতেই হয়।

মাদল

কে ক্লান্ত পুরুষ তার ঘরের জঠরে বসে আছে
হাঁটুতে থুতনি রেখে। তার
অস্তিত্বের আনাচেকানাচে
গ্লানির পঙ্কের ছাপ, শরীরের সব ক'টি হাড়
খেয়েছে কামড়
সে কোন রহস্যময় নেকড়ের বারংবার। চোখ
মাঝে-মধ্যে যায় লাউমাচাটায়, ঘর
নিজের কাছেই জায়গা এবং জীবন
প্রায় সারাক্ষণ
শোকার্ত চোখের মতো করে ছলছল।
বার্ধক্য ঝুঁকেছে তার দিকে বড় বেশি,
বুঝি তাই গৃহকোণে পড়ে থাকে অলস মাদল,
হয় না চঞ্চল পেশি
আগেকার মতো আর। কিছু স্মৃতি শুধু

রৌদ্রদগ্ধ মাঠের মতন করে ধু-ধু।

কে রাগী পুরুষ তীব্র বাজায় মাদল অকস্মাৎ
নেচে নেচে নিজের উঠোনে–
দেখা যায় কিনা যায় তরঙ্গিত হাত।
আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে দশদিকে, আওয়াজের কী-যে
মানে, তা সে নিজে
বোঝে না, কেবলি শোনে
এবং পা ফেলে তালে তালে, আলোময়
হয়ে ওঠে তার অস্তিত্বের প্রতিটি স্পন্দিত ভাঁজ।
খসে যায় জরা বাকলের মতো আর মনে হয়
তাকে বন্দনীয় কারুকাজ
মহান শিল্পীর। আর সারা বাংলাদেশ যেন আজ
তার দীপ্র মাদলের গুরুগুরু অজর আওয়াজ।

এরকম হলে

এরকম হলে হাঁসের পঙ্‌ক্তি শিশুর আনাড়ি
হাতে আঁকা রেখা হয়ে যায় নির্ঘাৎ।
মানে, অতিশয় এঁকেবেঁকে যায়, আকাশের ভুল
সীমানায় ওড়ে যেনবা হংসদল।

এরকম হলে ঘনঘন কাঁপে এপাড়ার কালো
রজস্বলা সে মেয়েটির বাম চোখ।
এরকম হলে বাড়ি খুঁজে-খুঁজে কাটে সারাবেলা,
পা চলে না আর; ঠিকানা-চিহ্নহীন।

এরকম হলে উদাস দুপুরে নিশুত নিশীথে
বার-বার ছেঁড়ে মীর কাশিমের তার,
গ্রীষ্ম-দুপুরে মূর্ছিত স্বরে দিন দিন বলে
কৃষিঋণ চায় জয়নুলী শত কাক।

এরকম হলে পার্কে কি মাঠে পেনশনভোগী
বয়স্কজন চুষিকাঠি নেন হাতে,
বারোয়ারি কত পার্টি অফিসে দোতারা বাজিয়ে
অন্ধ বাউল গায় লালনের গান।

এরকম হলে চৌরাস্তায় সন্ধ্যাবেলায়
ওড়ে সুবিশাল কুশপুতুলের ছাই,
দূর শতকের কারুকাজময় পত্র চকিতে
রুক্ষ ধুলায় হয় সানকির নাচ।

এরকম হলে এ শহর ঢাকা বড় অভিমানী,
ভীষণ অসুখী; আঁধারে লুকায় মুখ।
এ শহর ঢাকা কখনও আবার এক নিমেষেই
দীপ্র তরুণ নজরুল ইসলাম।

এরকম হলে আহত বিবেকও লোকচক্ষুর
আড়ালে নিখুঁত পরে নেয় পরচুলা;
মনন, বিবাগী মরালের মতো
ডানা ঝাপটায় অকূল শূন্যতায়।

এরকম হলে বাক্যের ভীরু খরগোশ যেন,
এদিক-ওদিক তাকায় আর্তচোখে।
নিদাঘবেলায় দ্রুত উবে যায় আনন্দসুর,
কাব্যকলার রোদেলা অনুগ্রহে।

এ কেমন স্বভাবের তিলক

এ কেমন স্বভাবের তিলক বেড়াচ্ছ বয়ে তুমি আশৈশব?
নইলে কেন দিনদুপুরেই ঢ্যাঙা পাতাছুট গাছ
হঠাৎ তোমার চোখে পাতালবাসিনী কোনো মোহিনীর নাচ?
কেন বারংবার দ্যাখো তুমি
বেলা-অবেলায় চেনা চা-খানায় অন্তর্গত বিপুল বৈভব
নিয়ে ছারপোকা-ছাওয়া কাঠের চেয়ারে মৃদু ভিড়ে
তন্ময় আছেন বসে এক জালালউদ্দীন রুমী?
অস্তিত্ব কি অনস্তিত্ব বাজে তাঁর সত্তায় মরমী মীড়ে;
মাথার ভেতরে তাঁর ত্রিলোকী গুঞ্জন, যেন অন্য মসনভি
এ যুগ-সংকটে লিখবেন, তুমি ভাবো; নভশ্চারী প্রেরণায়
আঁকবেন জগচ্চিত্র মননে প্রোজ্জ্বল সে তাপস-কবি।

তোমার পাড়ায়
আশপাশে বসতিতে আছে যারা, যাকে সাঁকো
বলে, তুমি তার নাম রাখো

নির্দ্বিধায় ছায়াপথ,
বাগানের নানা ফুল চোখের পলকে
অসুস্থ অনাথ বালকের টলটলে
চোখ আর মেঘপুঞ্জ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শিবির
হয়ে যায় বারবার তোমার দৃষ্টিতে। আগামীর
নৈরাজ্যে সংকট স্বর্ণরথ
ভেবে যাকে দ্রুত ছুটে যাও তুমি প্রত্যহ, বলো কে
তা সহজে মেনে নেবে তর্কাতীত? আর জ্বলজ্বলে
এ শহর পম্পেয়াই-নগরীর ধ্বংসস্তূপ বদলে যদি
হঠাৎ চিৎকার করে দশদিক ভীষণ কাঁপিয়ে তোলে, তবে

'ওরা তোর কী হবে, কী হবে?
সেই যে আঁতুড় ঘরে ঢুকেছিল ক্ষ্যাপা জিন অলক্ষ্যে সবার,
এখন অবধি
সওয়ার হয়ে সে আছে তোর কাঁধে হে বাছা আমার',
বলে ফেলবেন এক নদী
ঝরঝর চোখের পানি জননী তোমার। তবু তুমি শেষ বাসে
ঘরে ফেরা প্রহরে হঠাৎ
দেখে ফেল খোলা রাস্তা এভিন্যু ছাপিয়ে হেঁটে আসে
বহুদূর-দূরান্তর থেকে মহাকাব্যের দীর্ঘাঙ্গ স্ফীতবক্ষ
নায়কের মতো
তৃতীয় বিশ্বের জনস্রোত। স্তব্ধ রাত

গানে গানে তরঙ্গিত সমুদ্রেরই সমকক্ষ।
কী বিশাল মানবিক স্থাপত্য চৌদিকে, অকস্মাৎ
ফুটপাথে ফুটপাথে বনরাজিনীলা আর আমাদের ভীষণ আহত
এ শতক মাথা নত
করে দেয় অগণিত পায়ের ধুলায়। কে কিরাত
কেউ-বা শিকার চরাচরব্যাপী মৃগয়ায় আজ
বলা মুশকিল আপাত। তোমার তৃতীয় চোখ
আছে, পাড়াপড়শিরা পরস্পর করে বলাবলি।
দৃশ্যাতীত নানা দৃশ্যাবলি দেখা তোমারই তো কাজ;
হে নবীন বন্ধু, দাও বলে দাও, এই জীবলোক
বিধ্বংসী ভয়াল নাট্যে কে হবে জল্লাদ, কে-বা বলি!

কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি

যখন আমি সাত আট বছরের বালক
তখন আমার মেজোভায়ের হাতে
প্রথম দেখেছিলাম
রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা। আমাদের বাড়ির চিলেকোঠায়
কাটত আমার অগ্রজের সিংহভাগ সময়।
অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল তাঁর,
যদিও মঞ্চে পাঠ মুখস্থ বলেননি কোনো দিন।
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
নানা ধরনের মুখভঙ্গি করার অভ্যাস ছিল তাঁর।
কখনও ভুরু জোড়া কুঁচকে যেত খুব
কখনও আবার চোখ হয়ে উঠত
শোকাহত বাল্মীকির চোখের মতো। মাঝে-মাঝে তিনি
চয়নিকা থেকে আবৃত্তি করতেন
পাকা অভিনেতার মতো হাত-পা নেড়ে,
বিদ্যি গলা খেলিয়ে। যখন দরাজগলায়
অগ্রজ উচ্চারণ করতেন, 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থ',
তখন কেন জানি না
আমি নিজেকে দেখতে পেতাম খুব উঁচুতে
কোনো পর্বতচূড়ায়। আর যখন 'মহামানবের সাগরতীরে'
বলে তিনি এক মুগ্ধ বালকের চোখে লাগত
যাত্রাদলের সুদর্শন রাজার মতো। সব কিছু ছাপিয়ে
মহামানবের সাগরতীরে– এই শব্দগুচ্ছ
আমার সত্তায় জলরাশির মতো গড়িয়ে পড়ত বারংবার।
চয়নিকার সঙ্গে আমার পরিচয় হবার আগেই
হলদে মলাটের সেই বইটি
কোথায় হারিয়ে গেল, তারপর
কখনও চোখে পড়েনি আর।
এখনও যখন আমি ফিরে যাই মাঝে-মধ্যে
ছেলেবেলার চিলেকোঠায়, তখন বিকেলের রঙের মতা
চয়নিকা কেমন অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

চয়নিকার সঙ্গে যখন আমার চক্ষু মিলন হয়েছিল,
তখন রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে
শুধু একটা নাম। সে নামের আড়ালে কী মহান বিস্ময়

দীপ্যমান, তা জানার জন্যে আমাকে পাড়ি দিতে হয়েছে
দীর্ঘপথ। আমার নিজস্ব রবীন্দ্রনাথকে

আমি আবিষ্কার করেছি ক্রমান্বয়ে
অভিযানের দুর্বার নেশায়।
চয়নিকার কাল থেকেই কি শুরু
কবিতার সঙ্গে আমার গেরস্থালি? নাকি
বাঁশবাগানের মাথার উপর যে-শাশ্বত চন্দ্রোদয়
আমি লক্ষ্য করেছিলাম, সেদিন থেকে?
হতে পারে অনেক অনেক বছর আগে
আমার নানি ভোরবেলা আঙিনায় বসে
যে-মুহূর্তে গৃহপালিত মোরগের ঝুঁটি
পরখ করতে করতে আমাকে বলেছিলেন, 'এটা ওর তাজ'
সেই মুহূর্তেই কবিতা উষা হয়ে জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে,
কিংবা এও তো সম্ভব,
দীর্ঘকাল আগে আমার নানি যে-স্বপ্নের
কথা বলেছিলেন, যে স্বপ্নে তিনি বহু আলিশান হাবেলি
মিসমার হতে দেখেছিলেন,
সেই স্বপ্নই আমাকে কবিতার স্বপ্ন দেখিয়েছিল,
অথবা হতে পারে বাল্যকালে কোনো এক মধ্যরাতে
বৃষ্টির শব্দ শুনে আমি জেগে উঠেছিলাম
যখন, ঠিক তখনই কবিতা আমাকে নিয়ে গেল
বিরামবিহীন শ্রাবণধারায়।

আমাদের চিলেকোঠা থেকে চয়নিকা লুপ্ত হবার পর
আমার অগ্রজ আর কখনও গলা খেলিয়ে
কবিতা আবৃত্তি করেছে কিনা, মনে পড়ে না।
তাঁর আবৃত্তি আর না শুনলেও,
সেই, যে মহামানবের সাগরতীরের ধ্বনি
তিনি মিশিয়ে দিয়েছিলেন আমার অন্তর্লীন প্রবাহে
তা আমাকে ছেড়ে যায়নি কখনও।
চল্লিশের দশকের গোধূলিতে কবিতার সঙ্গে, বলা যায়,
আমার ঘনিষ্ঠ জীবনযাপন হল শুরু।
তখনই সঞ্চয়িতা উপহার হয়ে
এসেছিল আমার হাতে। কিছুকাল আমি
মগ্ন হয়েছিলাম তাতে, যেমন কোনো দরবেশ

সমাধিস্থ হন অনন্ত কি অসীমের প্রেমে।
কিন্তু কী যে হল, পঞ্চাশের দশকের প্রত্যুষ
আমাকে ছুঁতেই, সেই ঘোর গেল কেটে–
তিরিশের কবিসংঘ দিলেন প্রবল ডাক, পোড়ো জমি থেকে
হাতছানি দিলেন এলিয়ট, জান পাতলাম
এলুয়ার এবং আরাগর যুগলবন্দিতে আর নিমেষে
তারুণ্যের তেজে হঠকারী অবহেলায়
সঞ্চয়িতাকে ধুলোয় মলিন হতে দিয়ে
স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে গেলাম
ভিন্ন স্বাতন্ত্র্যের আকুল সন্ধানে। বুঝি তাই
তখন আমাকে লিখতে হল–
'মধ্যপথে কেড়েছেন মন,
রবীন্দ্র ঠাকুর নন, সম্মিলিত তিরিশের কবি।'

কিন্তু সরে গেলেই কি যাওয়া যায়?
বয়স যতই বাড়ছে, ততই আমি সেই সমুদ্রের দিকে
যাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ যার নাম, যেমন যাচ্ছি
দান্তের বিপুল বিশ্বে, যেন ভীষণ রুক্ষ
নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করছি নিজ বাসভূমে।
জানি না আমার অগ্রজ-উচ্চারিত
মহামানবের সাগরতীরে সেই সুদূরে
কবিতার সঙ্গে প্রথম আমার জীবনযাপন
শুরু হয়েছিল কিনা,
তবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কোনো গৌরীর
মুখ মনে-পড়ার-মতন
একদা আমাদের চিলেকোঠায় হারিয়ে যাওয়া
হলদে মলাটের চয়নিকাকে আজও মনে পড়ে, মনে পড়ে, মনে পড়ে।

দেখা হলো না

কলকাতার সরকারি কলোনিতে দুপুর চমকাচ্ছিল
সোনালি চিলের মতো। এক দশক আগে,
যদ্দূর মনে পড়ে,
আমরা ক'জন গিয়েছিলাম সেখানে
তোমাকে এক ঝলক দেখার জন্যে, শুধু দেখার জন্যে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম আমরা, হঠাৎ কেন জানি না মনে হলো
এলসিনোরের পুরনো সিঁড়ির ধাপ।
অতিক্রম করে চলেছি।
যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম, তখন আবার
নতুন করে আমি একটি কিংবদন্তির দখলে।
তিরিশের দশক আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেল
জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের ঝাপটার মতো। খেলার মাঠের জয়ধ্বনি,
মজলিসের গুলজার ঐকতান, দূরাগত
হারমোনিয়ামের আওয়াজ আর
রাজবন্দির জবানবন্দি ছুঁয়ে গেল আমাকে। ফ্ল্যাটের জঠরে
তোমাকে দেখলাম এই প্রথম। বিস্ময়ের
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট আমি দেখলাম সেই ঈগলকে,
যে তার আকাশের নীলিমাকে ভুলে গেছে;
একদা তার উদ্দাম ডানা মেঘের স্তরে স্তরে
স্পন্দিত হতো বীণার মতো, তার ত্রিকালজ্ঞ চোখে
চরাচরের রূপান্তর হতো বারংবার,
এই স্মৃতিটুকু থেকেও যে বঞ্চিত।
গ্রীষ্মের ভরদুপুরে এ কাকে দেখতে এলাম আমি?
এই কি সেই ওষ্ঠ যার ক্ষণিক স্পর্শের জন্যে
কত বঙ্গীয় ললনার শরীর শিহরিত হতো
কদম ফুলের মতো? এই কি সেই স্বনামধন্য
বাবরি-শোভিত চির উন্নত শির, যা চৌরঙ্গির
সবগুলো দরদালান ছাপিয়ে, কার্জন হল আর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়া ছাড়িয়ে পৌঁছে যেত মেঘলোকে?
এই কি সেই হাত যার আন্দোলনে
কেঁপে উঠত কারার লৌহকপাট?
এই কি সেই আঙুল যার স্পর্শে হারমোনিয়াম চোখের পলকে
হয়ে যেত রাগমালা আর সেই অনিন্দ্য সুরে সারা
বঙ্গভূমি নিমেষে নজরুল ইসলাম।
আমি ফ্ল্যাটের জঠরে তন্ন-তন্ন করে
পুরাণের সেই পাখিকে খুঁজলাম, যে ভস্মস্তূপ থেকে
গা ঝাড়া দিয়ে মৃত্যু থেকে জীবনে প্রবেশ করে
বারবার। আমি ভস্মরাশি দেখলাম, অথচ
কোনো পাখির পুনরুত্থান আমার চোখে পড়ল না।

তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে, কী আশ্চর্য

আমার মনে পড়ল ডেনমার্কের যুবরাজের উক্তি–
‘এই করোটির ভেতরে ছিল জবান
এবং একদা সে গান গাইতে পারত।’
তোমার দিকে আমার চোখ আর তোমার চোখ
হীরের মতো জ্বলজ্বল করে যেন
খরদুপুরকে শাসন করছিল ক্ষমতারহিত
বুড়ো লিয়ারের মতো। সেই মুহূর্তে আমি
কান্তিমান এক ঘোড়াকে চোরাবালিতে ডুবে যেতে দেখলাম,
হাজার-হাজার বনকপোতকে দগ্ধ হতে দেখলাম
দাবানলে; একটি সোনার সিংহাসনকে দেখলাম
কুষ্ঠরোগীর মাংসের মতো গলে গলে পড়ত।

দিলদরিয়া যিনি, উদরে আতিথেয়তা ছিল যাঁর
প্রবাদ প্রতিম, তিনি কেন এত উদাসীন, এমন
অভ্যর্থনাকৃপণ? জীবনের ওষ্ঠে-ওষ্ঠে চেপে যিনি
টেনে নিয়েছেন জীবনরস, তাঁর কাছেই
সব কিছু হয়ে গ্যাছে কেমন অবান্তর।
‘খেয়ে যেও দুপুর বেলা’ বলবেন না
কাউকে তিনি। আর পেছন থেকে শুনব না তাঁর ডাক।

আচমকা কোত্থেকে এক পাপিয়া ভরদুপুরে
শুনিয়ে গেল গান। একটা প্রজাপতি কিছুক্ষণ
ঘরময় ওড়াউড়ি করে তোমার কাঁধ ছুঁয়ে
বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে। আর আমি
ভক্তি করতে এসে তোমার পায়ে রাখি ভালবাসার মঞ্জরি।

কলকাতার সরকারি ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে
নামতে নামতে ভাবি
যাকে দেখতে এলাম তাকেই দেখা হলো না আমার।

হে আমার বাজারের থলে

হে আমার বাজারের থলে আলাভোলা, হে আমার
সকালবেলার নিত্যসঙ্গী, উদাসীন,
তুমি পাখিদের কেউ নও;
মগডাল, সরোবর ছুঁয়ে নীলিমায় ওড়াওড়ি

আসে না তোমার।
অথচ বান্ধব, ভোরবেলা কিংবা বর্ষার সন্ধ্যায়
যখন ভাজেন রুটি গৃহিণী, তখন এই বিংশ শতাব্দীর
শেষার্ধে আন্ধার কোণে তুমি
পড়ে থাকো কী নিঃশব্দ খুব জব্দ ডানাকাটা পাখির মতন।
তখন তোমার প্রতি দৃষ্টি নেই 'কারো', তুমি কোনো
স্বপ্ন দেখ কিনা কিংবা স্বপ্নহীন কাটে বেলা
তা নিয়ে কারুর কোনো মাথাব্যথা নেই। মধ্যরাতে
ইঁদুরের পদচ্ছাপ নিয়ে বুকে জেগে থাকো ফকিরের মতো।

হে আমার বাজারের থলে আলাভোলা, হে আমার
সকালবেলার নিত্যসঙ্গী উদাসীন,
কখনো যাওনি তুমি আফ্রিকার গহন জঙ্গলে বেলাবেলি,
কেশর-দোলানো কোনো সিংহের গর্জন
কখনো শোনোনি।
প্রকৃত জিরাফ কিংবা ডোরাকাটা ঘোড়া, মানে, জেব্রা, শান্ত ঝিলে
হরিণের জলপান, সে-ও তো দেখনি কোনো দিন .
চিড়িয়াখানায় যাওয়া হয়নি তোমার;

ছা-পোষা করুণ মধ্যবিত্ত তুমি, নিঃস্ব, অভিমানী।
প্রত্যহ গ্রহণ করো কত কিছু– কমবেশি, অথচ আবার
নিজেকে উজাড় করে নিমেষেই সন্ন্যাসীর কৌপীনের মতো
কী নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিক হয়ে যাও তুমি,
শুয়ে থাকো চুপচাপ নৈমিত্তিক সকালবেলার প্রতীক্ষায়।

হে আমার বাজারের থলে আলাভোলা, হে আমার
সকালবেলার নিত্যসঙ্গী, উদাসীন,
মাছ তুমি ভালবাস না কি শাকসবজি, বোঝা দায়।
নিকিরি হাঁকলে চড়া দর,
তুমি মৃত মাছের মতোই নির্বিকার,
কেমন তাকিয়ে থাকো ভাবলেশহীন
গায়ে নিয়ে কাঁচালংকা, খলিশা মাছের গন্ধ আর
রুইয়ের ভাগার মরা রক্ত সুনসান।

হে আমার বাজারের থলে আলাভোলা
সুগন্ধি সাবান তুমি মেখেছ কখনো বাথরুমে
অস্তিবাদী তত্ত্বকথা ভাবতে ভাবতে

ছুটির দুপুরে?
শিল্পের আঙ্গিক নিয়ে তুমি
ভাব না কিছুই।
কবিতা তোমার প্রতি নিস্পৃহ অমনোযোগী, তুমি কবিতার প্রতি।
সার কথা, কস্মিনকালেও
তরঙ্গিত নও তুমি রূপবাদী চেতনায়, শুধু
সম্বলবিহীন
একা-একা শুয়ে থাকো অন্ধকারে অভাবের মতো।

হে আমার বাজারের থলে আলাভোলা, হে আমার
সকালের নিত্যসঙ্গী, উদাসীন,
তুমি কি কাম্পুচিয়ায় যাবে?
যাবে ফিলিস্তিনি গেরিলার দীপ্র বন্দুকের নলের নিকট?
করবে কি লুট পুঁজিপতিদের
সান্ধ্য ভাষাময় চেকবই, কালো বেবাক সিন্দুক?
হে আমার বাজারের থলে আলাভোলা, হে বান্ধব
শুনতে কি পাও তুমি
এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সিঁড়িতে
ফুটপাতে জনপথে নব্য সভ্যতার পদধ্বনি?
তুমি পারবে কি ঢেকে দিতে পারমাণবিক
ধ্বংসের ভয়াল মুখ? পারবে কি বিভ্রান্ত বিপন্ন মানুষের
অভীক নিশান হতে ব্যাপক তাণ্ডবে?

মে দিনের কবিতা

মাদুরে সে শুয়ে, হাত তার পায় মাটির আদর,
আড়মোড়া ভেঙে দ্যাখে—
তাকে ঘিরে জাগে চারা গাছ কিছু ফুল ঝুঁকে আছে
ওষ্ঠে ও গালে, স্তনের ওপর,
যেন চুমো খেতে চায়।

স্বপ্নে সে নয় বিভোর এখন; একটু আগেই
নিদ্রার হাত গুটিয়ে নিয়েছে জাল।
কী করে যে এই খেলার ঘরের মাটি ফুঁড়ে জাগে
পুষ্পল এক চকিত বাহার, ভাবে বিস্মিত—
এ কোন তেলেসমাত?

চোখ কচলিয়ে শাড়ি সামলায়; ঘর দুয়োরের
আনাচেকানাচে সূর্য বিলায় মুঠো থেকে তার
সোনালি অনুগ্রহ।

ছুটি বাজাচ্ছে বাঁশি আশেপাশে, বাঁশির আওয়াজ
খুপরিটা ছেড়ে, মহল্লা ছেড়ে
ছড়িয়ে পড়েছে তামাম শহরে আজ।

ছুটি, আজ ওর মরদের ছুটি। পাশ ফিরে দ্যাখে
কেমন অঘোরে ঘুমায় লোকটা,
স্বপ্নের মায়া লেগেছে শরীরে,
নিথর ঘুমায় গাছের গুঁড়ির মতো।
আজ মে দিবস। দুনিয়ার যত মজদুর আজ
পোহায় ছুটির ছায়া।
এদিনের মানে জানে না সে, তবে
আবছা কাহিনী মরদের কাছে শোনা।
মানে যাই হোক, এটুকু সে জানে
ঘরের মানুষ আজকে যাবে না কঠোর কারখানায়।

কিন্তু ঘরের মানুষের মন, আছে তার জানা,
সহজে টেকে না ঘরে।
বেলা না চড়তে মিশে যায় সেও দোস্তের ভিড়ে,
মদে চুর হয়ে টলতে টলতে ফেরে রাত্তিরে
আপন বিবরে, নামে অবশ্য গালিগালাজের ঢল।
এ ঝটকায় ঘরণীকে তার দ্যায় সে সরিয়ে
কখনো-বা ফের কোমর জড়িয়ে টেনে নেয় বুকে,
ভুরভুরে মুখ চেপে ধরে মুখে,
যেমন ভালুক মৌচাকে দেয় হানা
নারী সত্তায় লাগে আচমকা
জব্বর এক নেশার মদির দাগ।

ওর গায়ে নেই কাঁচা-সোনা রঙ, শ্যামলাই বলে
পাড়া-পড়শিরা, নাকও নয় বাঁশি,
কিন্তু ঘরের মানুষ বলে–
'কসম খোদার তোর চোখ জোড়া বড় গজবের,
নশিলা, জংলা বড়।'

ঘরের ভেতরে জোয়ান মরদ অঘোরে ঘুমায়,
হাত তার যেন কোণে পড়ে থাকা
মহররমের নিশান কোনো।
এই হাত তার সকাল-সন্ধ্যা মেশিন চালায়,
এই হাত তার মিছিলে মিছিলে আকশচুম্বী,
এই হাত তার বউয়ের পাছায় আদর ঝরায়,
কড়া এ হাতের সাহসী আঙুল
ভবিষ্যতের জাবদা খাতায় টিপসই দ্যায়,
দূরাগত কোনো রহস্যময় সুনীল পক্ষী
এই হাতে তার চঞ্চু ঘষে।
ঘরের ভেতরে জোয়ান মরদ অঘোরে ঘুমায়।
মজুরের বউ চুলে গুঁজে নেয়
অখ্যাত ফুল, জানা আছে আর
শত তালিমারা সাদামাটাভাবে
করে সাজগোঁজ, আলতা লাগায় পায়ে।
ভাঙা আয়নায় নিজস্ব মুখ? এ কোন সুদূর
হাবেলি বিবি এসছে গরিব-মরবার ঘরে।
কোথায় বেদাগ চকমকে টিপ?
কোথায় কাজললতা?

চাঁদের চমক, হাওয়ার ঝলক পাওয়ার জন্যে
বেরিয়ে সে আসে কৃপণ উঠোনে,
ভাসে জ্যোৎস্নার বানে।
মজুরের বউ করে অনুভব নিজের ভেতরে
জরায়ুর লতাগুল্মে কী যেন নড়ছে প্রাণের মতো।
মে দিন এখন জাগর জ্যোৎস্না,
মে দিন এখন তন্বী শরীর, সে নিজেই হয়
আগামী কোন প্রসূত-বিভোর মে দিনের গীতিকবিতা।

দাঁড়াব কোথায় আজ?

দাঁড়াব কোথায় আজ? সাতপুরুষের ভিটেমাটি
উঠেছে নিলামে প্রায়; উপরন্তু ঘুঘুর অভাব
নেই আশেপাশে আর, হা কপালে, আমিও স্বভাব
দোষেই উড়নচণ্ডী আকৈশোর, বলা যায় খাঁটি

জুয়াড়ি এবং পরিণামে উদাসীন। ঘটি-বাটি
সমস্ত বন্ধক রেখে মহাজনদের কাছে ঘুরি
সহায়-সম্বলহীন, গৃহিণী অকালে প্রায়-বুড়ি;
ক্ষুধার অনলে পুড়ে সন্তানেরা চোষে শুকনো আঁটি।

মাঝে-মধ্যে মসজিদে সাঁঝে মানতের বাতি জ্বেলে
কাবা শরিফের দিকে মুখ রেখে ক্লান্ত হাঁটু মুড়ে
বসে থাকি লোবানের ঘ্রাণে মগ্ন অতিশয়, ভাবি
আগামী বৈশাখে তোফা তকদিরের চাকা যাবে ঘুরে,
সন্তান থাকবে দুধে-ভাতে আর কড়াইয়ে ঘি ঢেলে
এবং গৃহিণী পরবেন স্বর্ণবালা, নাকছাবি।

মণিপুর লোকদুহিতা
(ওয়াহিদুল হক বন্ধু বরেষু)

তখনো আমার সুহৃদের মনে শহুরে
ক্লান্তি ছিল কি? অবশ্য তাঁর ভব্যতাটুকু
বজায় রেখেই, আন্দাজ করি, চায়ের পেয়ালা
হাতে তুলে নিয়েছিলেন সুচারু ধরনে।

মফস্বলের আলাভোলা ছায়া দু'চোখে
সাজিয়ে হলুদ বিকেল বেলায় তুমি আঙিনায়
পাতলে আসন, সিলেটি শ্যামল লাগে বিদগ্ধ
বন্ধুর প্রাণে, প্রাঙ্গণ যেন মিনতি।

শহুরে মনের নিসর্গপ্রীতি পেয়েছে
তৃপ্তি এবং তারই রেশ কিছু বাঙ্ময় হয়,
বৈকালী সেই স্নিগ্ধ স্মৃতির হার্দ্য লেখনে,
বর্ষ-শুরুতে হ্রস্ব ভ্রমণকাহিনী।

বস্তুত আমি দেখিনি কখনো তোমাকে।
বন্ধুর চোখে গাছপালাঘেরা একটি আঙিনা,
আনন্দসুরে মাতাল পক্ষী, লাজুক তন্বী
যেনবা স্বপ্নে উঠেছিল দুলে বিকেলে।

ক'জন অচেনা শহুরে শ্রোতার সমুখে
যখন দ্বিধায় ধরেছিলে গান, তখন হে মেয়ে

নয়নে জল, আঁচলের ফুল ঝরেছে ব্যাকুল;
গীতি ও গায়িকা একই বৃন্তের সুরভি।

যখন তোমার ছোঁয়ায় হারমোনিয়াম
হলো নজরুল করুণ রঙিন, তখন আঙিনা
হরিণমুখর বনরাজিনীলা, টলটলে দিঘি,
ময়াল-বাসর, দূর নীলিমার বসতি।
ঘনিষ্ঠ তানে তুমি চলে গেলে সুদূরে।
রইল আড়ালে অতিথি, উঠোন, হরিয়ালপাখি,
ঝোপঝাড় আর মলিন জীবিকা এবং অবাধ
তোমার যাত্রা চেনা বৃত্তের বাইরে।
যদিও দেখিনি, তবু বলা যায়, দেখেছি
আমিও তোমাকে হরফের বনে, বন্ধুর চোখে
প্রকৃত তোমাকে। আশাবরী রাগে তোমার শরীর
হোক লীলায়িত চিরায়ুষ্মতী ছায়ায়।

দেখিনি তোমাকে, তবু ভাবা যায় শরীরে
তোমার মোহন উষার সখ্য, জাগবে চকিতে
সুরমা নদীর কূল উপচানো তন্বী জোয়ার।
হৃদয়ে তোমার শারদ রাত্রি, মিনতি।

তোমার না-থাকা তোমাকেই আনে নিকটে।
সমাজদ্রোহিতা আমার মনের নেপথ্যে বাঁচে,–
কলুষমুক্ত স্বরচিত এই স্মৃতিতে আমার
তুমি বাঁচো সুরে মণিপুর লোকদুহিতা।

প্রতিমাসন্ধানী

মুমূর্ষু সূর্যের দিকে চোখ,
অস্তরাগে কারুকাজময় মঞ্চসহ কুশীলব
ডুবে যায়, পোকা-মাকড়ের ভিড় ধেয়ে আসে নানা দিক থেকে,
ঝাঁক ঝাঁক রাগী পাখি ভীষণ চক্কর কেটে কেটে
হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘর-বাড়ি তছনছ করে,
চঞ্চুর আঘাতে, হিচককি ছায়াছবিতে যেমন।

দূরের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ ঝানু
গোয়েন্দার মতো চোখে চোখে রাখছে আমাকে, আমি

তবু খুব প্রকাশ্য পাহারা, বলা যায়,
উপেক্ষা করেই ডুব দিই সেই ভরা সরোবরে, লোকে যাকে
নিদ্রা বলে, আমার দু'হাত স্বপ্ন দেখে, হাতল দাঁড়িয়ে আছে
দড়ির সাঁকোয়, যেন জমাট পাটল মেঘস্তূপ।

আহত যোদ্ধার মতো
কতকাল একা একা করব লালন ক্ষত, কতকাল আর?
ব্যান্ডেজে অচিন পাখি বসে, মাঝে মাঝে
স্মৃতিজাগানিয়া শিস দিয়ে আরও বেশি
স্মরণ করিয়ে দেয়– এখন কোথাও কেউ আমার উদ্দেশে
রাখেনি জ্বালিয়ে কল্যাণের ঝাড়বাতি।

তোমার ভেতরে তুমি কী জগৎ রেখেছ লুকিয়ে
রোধের অতীত? সেখানে কি গহন দুপুর বাজে বাউলের
মৃদু একতারার ঝংকারে? সেখানে কি মুকুলিত
হতে চায় অসুস্থ গায়কের নিভৃত আকাঙ্ক্ষা কিছু?
যখন আমাকে কেউ এইমতো প্রশ্ন করে, আমি নিরুত্তর
আমার ভেতরে খুঁজি সালভাদর দালির ছবি।

এখন পরাস্ত তুমি বলে
আমাকে খোঁচালে কেউ চিড়িয়াখানার বন্দি প্রাণীর মতন,
অপমানে বন্য ক্রোধে আমি কি উঠব ফুঁসে
গোক্ষুরোর ছোবলের ক্ষমাহীন ভঙ্গিতে এখন?
অস্তমিত হোক ব্যক্তিগত ক্রোধ, থাকুক সতত অনির্বাণ
আমার ভেতরে পুণ্যবানের সংযম নিমগ্নতা।

একদা একটি সভাঘরে, মনে পড়ে,
একজন প্রাজ্ঞ, সৌম্য পুরুষ উদাত্ত কণ্ঠস্বরে,
শুনিয়েছিলেন কিছু কথা, যেন বাগানের সকল ফুলের
উদ্দেশে তন্ময় গল্প বলে মালী, পাথরের তিন ধরনের
বাক্যের পবিত্র পুষ্পে সাজিয়ে দিলেন সভাঘর।

বললেন তিনি
পাথরে বানানো যায় কালের থাবায় দৃঢ় দরদালানের
সারি, গির্জা আর মূর্তি হরেক রকম
আমি তাঁর সংকেতের আলোয় তন্ময় ওজু করে
আজো এই ব্যাপক আঁধিতে
পাথরে পাথরে শুধু প্রতিমাসন্ধানী।

সুহৃদের প্রতি

যেও না ঘাসের কাছে, ইদানীং ঘাস খুব হিংসাপরায়ণ।
যেও না নদীর কাছে, নদী তার ভুলেছে মমতা;
তাণ্ডবের মোহে স্ফীত হয়, তেড়ে আসে
অজগর হয়ে বারংবার, গিলে খায়
ঘর-গেরস্থালি।

যেও না টিলার কাছে, অতিকায় করোটির মতো
টিলা আপনার অভ্যন্তরে নিয়ত লুকিয়ে রাখে ক্রোধে।
যেও না মরুর কাছে, রাশি রাশি বালি
কর্কশ চিৎকারে করে গ্রাস সভ্যতাকে।
অরণ্যের কাছে যাবে? জানো না কি অরণ্য কেমন ভয়ংকর?
এখন তোমার জন্য হাঁ-খোলা পাতাল
জেগে আছে সবখানে। ফুলবাগানের
লতাপাতা অপরূপ লাস্যে জ্বলে উঠে
কখন সাপের ফণা হয়ে যাবে, কিছুতে পাবে না টের তুমি।

থমকে দাঁড়াও কেন হে আমার নিঃসঙ্গ সুহৃদ?
কেন এত দ্বিধান্বিত নিজস্ব চৌকাঠ ছেড়ে দূরে
যেতে হে বিবাগী পর্যটক? বরং হে বন্ধু তুমি
যাও স্মিত যাও ট্রাউজারের পকেটে
হাত পুরে, শিস দিতে দিতে, যাও মানুষের কাছে।
কখনো বিকেলবেলা আলতো নাড়তে পারো কড়া
কারো দরজায়, কিংবা নিঃশব্দে চেয়ার টেনে নিয়ে
সহজে বসতে পারো চায়ের আসরে।

মানুষের কাছে যাও, নাও মানুষের হৃদয় গোলাপ ঘ্রাণ
কেননা মানুষ আর হিংস্রতা কখনো
কখনো হাসির খাপে পুরে পূর্ণিমায় চিতাবাঘের মতন
অত্যন্ত উজ্জ্বল হয় সাবলীলভাবে।

এমনকি খুব মন্দ লোকও রমণীকে ভালবেসে
রাত্তিরে ডুকরে কেঁদে ওঠে, রক্তজবা-পদ্য লেখে
নিষ্করুণ নিদ্রাহীনতায় কুকুরের মাথায় বুলায় হাত,
খেলা করে, শিশুদের খেলাঘরে, বিবর্ণ রোগীকে
সতেজ ফুলের তোড়া উপহার দেয়।

মৃত্যু-ঘেঁষা বিবাদে পরেও মানুষ
সব কিছু ভুলে করে শত্রুকে অম্লান আলিঙ্গন।

তবু কেন আজও
কালো অবিশ্বাসের কুণ্ডলী নড়ে ওঠে
বারংবার? কেন মনে হয় প্রত্যেক মানুষ তার
নিজস্ব প্রকৃত মুখ ছিমছাম মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে
পথ হাঁটে, আস্তিনের নিচে রাখে অস্ত্রের বাহার!

যে যাই বলুক, তুমি হে আমার নিঃসঙ্গ সুহৃদ,
মানুষের দিকে উষ্ণ হাত নিয়ত বাড়িয়ে দাও।
তোমার নিকট এলে যে-কোনো অতিথি
যে-কোনো প্রহরে,
'কেমন, ভালো তো' বলে তাকে ঘরের ভেতরে, মানে
হৃদয়ের কাছে ডেকে নাও।

অর্ফির বাঁশির মতো

কত কিছু খসে যায়, সরে যায়, ঝরে যায় ক্রমে
আমার জীবন থেকে। শৈশবের কাগজের নৌকো,
বাবুই পাখির বাসা, তালপাতার ভেঁপু, বৈশাখের
উন্মত্ত হাওয়ায় আমগাছের তলায় ছুটোছুটি
বালক-বালিকাসহ, খুব ভোরবেলা পাতে-দেয়া
নানির হাতের পিঠা ঝরে গেছে সুদূর আড়ালে।

স্কুলে সহপাঠী ছিল যারা, তারা কে কোথায়
সরে গেছে বহুদূরে; কারো কারো নাম, কারো মুখ
ভুলে গেছি আর বাবুবাজারের মোহন কাচের
দোকানের তীরবিদ্ধ দুলদুল পঙ্গপাল-ছাওয়া
সোনালি শস্যের মতো ঝরে গেছে স্মৃতির প্রান্তরে।
জনকের উঠোনে ঘুরত কান্তিমান দুটো হাঁস,
সুপ্ত ওরা; মাতামহ ঝাপসা পুরাণ, এমনকি
পিতৃস্মৃতি মাঝে-মধ্যে মেঘের আড়ালে বড় বেশি
ছায়াচ্ছন্ন হয় আর আজ কাছে আছে যারা, হায়,
তারাও কেমন দূরত্বের কুয়াশায় মুখ ঢাকে।
নিদ্রায় ভ্রমণকারী ওরা, নিশীথে হারিয়ে যায়।

কত কিছু খসে যায়, সরে যায়, ঝরে যায় ক্রমে
আমার জীবন থেকে। একদা বসন্তোৎসব দেখে
যার চোখে লক্ষ পদ্ম ফুটেছিল হৃদয়ে আমার,
যাকে ছুঁয়ে জেনে গেছি অমরত্ব বলে কাকে, সে-ও
আমার সকল আকাঙ্ক্ষার বহ্ন্যুৎসব করে যায়
দীর্ঘ পরবাসে। শুধু তুমি হে আমার বর্ণবোধ,
মাতৃভাষা ক্রমশ আমার আরো কাছে এসে যাও,
অস্তিত্বের গ্রন্থিমূলে অর্ফির বাঁশির মতো বাজো।

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে
রৌদ্র, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাংলা ভাষা
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে
উদার গৈরিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে; নদীও নর্তকী হয়। যখন সকালে
নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্যশিক্ষার অক্ষর,
কাননে কুসুমকলি ফোটে, গো-রাখালের বাঁশি
হাওয়াকে শোনায় মেঠো সুর, পুকুরে কলস ভাসে।

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত
চেনা ছবি; মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন
ঘুমপাড়ানিয়া ছড়া কোন সে সুদূরে; সত্তা তাঁর
আশাবরী। নানি বিষাদ সিন্ধুর স্পন্দে দুলে
দুলে রমজানি সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া আর
একুশের প্রথম প্রভাতফেরি, অলৌকিক ভোর।

আশি দশকের পদাবলি

একটি কেমন পাখি ছায়াকে স্বপ্নের মতো বাহার করে
ঘরের ভেতরে আসে। ডানা থেকে টেবিলে লাফিয়ে
পড়ল কবিতা লাল বলের মতন।
হুংকারের হাত থেকে খসে পড়ে ভোরবেলাকার
খবর-কাগজ, ঝকঝকে

লাইনো টাইপগুলি মনিপুরী নাচের ধরনে
ঘূর্ণমান কিছুক্ষণ, অনন্তর কবিতার মুখ।
শ্রাবণ ধারায় ভেজা ভাঙা জানালায়
রোদের ঝলক, জ্যোৎস্না রাতে
সরুগলি বোবা তরুণীর মতো স্তব্ধ; কলোনির
ফ্ল্যাট থেকে ঝুলে থাকে কবিতার হাত,
যেন ক্রুশকাঠে জেসাসের বিশীর্ণ সাধক হাত।

আমার দেরাজ খুলে দেখি
নিজস্ব কাগজপত্র, চিঠি, ক্যাশমেমো, লন্ড্রির রশিদ আর
স্মৃতির মতন গোলাপের পাপড়ি, কিছু ফটোগ্রাফ। অকস্মাৎ
একরাশ গন্ধরাজ কাঠ
দীর্ণ করে প্রস্ফুটিত দেরাজের ভেতরে। খরগোশ
কোমল তাকায় ক্যালেন্ডারের রঙিন
তরুণীর দিকে
আমার টেবিলে বসে। কবেকার লাল ঝরাপাতা
চমৎকার উড়ে আসে খাতার পাতায়,
মিশে যায় যুবতীর ডাগর স্তনের
কিশমিশ, বেলা-পড়ে-আসা সান্দ্র প্রহরে আহত
টিয়ের পালক আর আস্তিনের ঘ্রাণসহ নেভিব্লু কালিতে।

সোফায় অতীত হাই তোলে, বর্তমান জ্বলে
উৎসবের মতো, যেন বিবাহ বাসরে
দু'জন রমণে লিপ্ত, অজস্র নক্ষত্র স্পন্দমান
যুগল সত্তাকে ঘিরে। যখন রাত্রির কিশোরীর
মতো বয়সিনী,
তখনই রাত্রিকে খুব ঘনিষ্ঠ পাওয়ার জন্যে ওরা
তীব্র গুঞ্জরণময় শহরের হট্টরোল থেকে কিছু দূরে
দাঁড়ায় শহরে মাঠে বহুদিন পর। গোধূলিতে
কেবলি গুমরে ওঠে, টেলিফোনে বিদায়ের গহন বেহাগ–
আবার এয়ারপোর্ট, প্লেনের গর্জন, ফিরে-আসা, চলে-যাওয়া
সময়কে বুনে চলে স্বপ্নের রীতিতে।

অশেষ অভ্রের স্তরে স্তরে মাইল স্টোনের মতো
কী এক রহস্যময় সংকেত প্রোথিত, বিরানায় যোজন-যোজনব্যাপী
ফণিমনসায়

কবিতার ত্রিকালজ্ঞ চোখ জেগে থাকে।

একথা সবাই জানে, মানে না সে টাইম টেবল;
যখন যেখানে খুশি হরিণের মতো লাফ দেয়,
চিতার চোখের মতো ধকধক জ্বলে,
উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ফোয়ারার মতো। মধ্যরাতে
আশি দশকের পদ্যাবলি কী ব্যাকুল
ডেকে ওঠে ফুটপাতে, ধাবমান শেষ বাসে আর
অন্ধকার ফ্ল্যাটের ভেতরে বারংবার।

নিজস্ব উঠোনে

টেবিলে ছিলেন ঝুঁকে কিছুক্ষণ আগে, এখন চেয়ার ছেড়ে
পুরাণের পুরনো ট্যাপেস্ট্রি ছেড়ে আলোছায়াময়
নিজস্ব উঠোনে তিনি পায়চারি করছেন অত্যন্ত তন্ময়।
অকস্মাৎ হাঁস দুটি জব্দ পাখা ঝেড়ে
উঠল ভয়ার্ত ডেকে। কখন যে সুনামগঞ্জের ক্ষেতে পাকা
ধান-খেতে-আসা চকোলেট-রঙ হাঁসের বাচ্চাটা
(নতুন পালক তার এ শহরে হয়েছিল ছাঁটা)
হলো ক্ষিপ্রগতি নেউলের সহজ শিকার লতাগুল্ম ঢাকা।

কিঞ্চিৎ দুর্গম কোণে, তিনি কিছুই পাননি টের
বিকেল বেলায়, পরে পাখিপ্রিয় কনিষ্ঠ কন্যার জবানিতে
জানা গেল খুঁটিনাটি সকল বৃত্তান্ত। আত্মজার দু'চোখ পানিতে
ছিল খুব টলটলে। আকস্মিক এই হিংস্র ঘটনার জের
টেনে মনে তিনি ফের অন্য মনে উঠোনে হাঁটেন
নিরিবিলি থেকে-থেকে কখনো কাশেন।

কনিষ্ঠ কন্যার পোষা ময়নাটা দাঁড়ে বসে থাকে
বারান্দায়, ছোলা খায়, কখনো-বা তার
'শেবা, শেবা' ডাকে
বাড়ির স্তব্ধতা জব্দ হয় খুব এবং গোলাপ গাছটার
পাতা শিহরণে শব্দহীন গীত যেন মাঝে-মাঝে।
বসন্তের সাঁঝে
বাতি জ্বলে ওঠে ঘরে। প্রৌঢ় কবি তখনও উঠোনে;
ধাবমান যানপিষ্ট কুকুরের মতো
স্বীয় যাবতীয় অতীতের কথা ভেবে-ভেবে তিনি গৃহকোণে

আবার আসেন ফিরে অভ্যাসবশত।
অনন্তর অসমাপ্ত কবিতার চিত্রকল্প যমক অথবা
অক্ষরবৃত্তের সুর ভাবেন। উঠোনে হাস্যময়ী রক্তজবা।

পাড়াগাঁর অন্ধকার

হাওয়ায় মশারি ওড়ে পাড়াগাঁর অন্ধকার ঘরে।
ঐখানে ঘুমাত সে মশারির নিচে, মনে পড়ে
মাঝে মাঝে বসত ঠাণ্ডা দেয়ালে হেলান দিয়ে, ফিকে
অন্ধকারে কী সব দেখত আর শহরের দিকে,
আবছায়া শহরের দিকে দৃষ্টি ছিল প্রসারিত।
কখনও সে আচমকা উল্লসিত, কখনও-বা ভীত
লুকাত বালিশে মুখ। স্নেহের সৈকত থেকে দূরে
নির্বাসিত, কখনও সে উঠত নেচে কী ভৌতিক সুরে।
কোথায় থাকত পড়ে ময়লা জামা জুতো, শূন্য থালা
এলোমেলো। জানালার শিকে হাত; পাখি, গাছপালা,
হঠাৎ-পালিয়ে-যাওয়া বেজি তার মাথার ভেতরে
একাকার, উদ্দেশ্যবিহীন এক নিঝুম চক্করে
ছিল মেতে সর্বক্ষণ, কখনও-বা অতিশয় ঝুঁকে
কাগজের বিরানায় হিজিবিজি নিত কী-যে টুকে
কিংবা সব কিছু ফেলে-টেলে হতো সে ভ্রমণকারী
রুক্ষ কিংবা বৃষ্টিময় পথে একা সাততাড়াতাড়ি।
এখন চুলের গুচ্ছে তার চৈত্র শ্রাবণের স্মৃতি
মরহুম, কোনো দিন অতীতের হবে না বিস্তৃতি
তার অভ্যন্তরে আর। লোবান কি সুখাদ্যের ঘ্রাণ
কখনও জাগাতে তাকে পারবে না। কী যে পরিত্রাণ
না-ফেরায় আছে ভেবে চলে গ্যাছে দূর বিরানায়।
ছিল কি সন্ন্যাসে মন সারাক্ষণ? পানি বয়ে যায়,
হাওয়ায় মশারি ওড়ে বিজন নিবাসে নিরন্তর
পাড়াগাঁর অন্ধকারে। ভয়ানক স্বরহীন ঘর।

উচ্চারণ

কখনো কখনো মনে হয় আট কোটি লোক শোনে
আমার নিভৃত উচ্চারণ, কখনো-বা মনে হয়
আমর কথার জন্যে পিপাসার্ত একজনও নয়।

প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা অত্যন্ত একাকী গৃহকোণে
বসে শব্দ দাও শব্দ দাও বলে কী গহন বনে,
পর্বতে, পাতালে হই নতজানু, করি আয়ুক্ষয়
প্রতীকের প্রতীক্ষায়, কম্পমান একটি হৃদয়
বিজন সৈকতে সারাক্ষণ রহস্যের ঢেউ গোনে।

যে-কথা হৃদয়ে ফোটে, হৃদয়ের ধ্বনির মতন
অন্তরঙ্গ বেজে ওঠে, তা যদি না শোনে কেউ কান
পেতে কিংবা না বোঝে কখনো, ক্ষতি নেই, নেই খেদ।
তোমার উদ্দেশে আমি যখন যা করি উচ্চারণ,
সে ধ্বনি তোমার কানে সকল সময় হোক গান—
মাতাল ঋত্বিক আমি, প্রেমকথা আমার ঋগ্বেদ।

মহাপ্লাবনের পরেও

প্রত্যাশা থাকে না, তবু কিছু ঘটে যায় আকস্মিক—
যেমন খরায় বৃষ্টি, বিরতিবিহীন বৃষ্টিপাতে
কৌতূহলী স্মিত বালকের মতো রোদের ঝলক।
ভাবিনি কখনো পাব, অথচ নিঝুম অপরাহ্নে
আমাকে বিস্মিত করে এলো কার্ড এক অলৌকিক
তোমার ঠিকানা থেকে। শ্যামল মেদুর কার্ডে লেখা
বিদেশী ভাষায় শুধু তিনটি মায়াবী শব্দ, 'খুব
মনে পড়ে।' শব্দ এত চুম্বন-প্রবণ হতে পারে

কখনো জানিনি আগে। এই কার্ড যেন কোনো
জাহাজ ডুবির পর ভাসমান বোতলের বাণী,
গোপনে পাঠানো, কিংবা নূহের কপোত, যার ঠোঁটে
সুবাতাসে স্পন্দমান সবুজ আশ্বাস। জেনে গেছি
চরাচরব্যাপী মহাপ্লাবনের পরেও ভূভাগ
স্নিগ্ধ জেগে থাকে কিছু; তুমিই আমার সেই ভূমি।

স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের মতো

যখন নিঃশব্দে আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন মানুষের মতো
পেরিয়ে গেলাম গেট, তখন কি আগের মতোই

ফুলগাছগুলি ছিল অভ্যর্থনাপরায়ণ? তুমি
কতকাল পরে পুনরায় নিয়ে গেলে শান্ত ঘরে।
সোফায় বসেই আমি চকিতে নিলাম মৃদু ঘ্রাণ।
ড্রইং রুমের যেন অতীতের। যখন তাকালে
আমার চোখের দিকে তুমি, ফিরে এলো অপসৃত
যৌবন আমার নিমেষেই। যখন আশার সব

পায়রা নিশ্চিহ্ন, ঠিক তখনই আবার তুমি দিলে
ডাক, আমি ঝঞ্ঝাহত একা পথিকের মতো ফিরে
এলাম আপন ঘরে। দেখি সেই মুখ, সেই স্তন,
পবিত্র কপোতদ্বয়, যাদের করে না স্পর্শ কোনো
পুণ্যার্থী কখনও, আমি তোমার স্মৃতিকে চুমো খাই,
যেমন কায়েস খেত হরিণের মুখে বিরানায়।

নিমগ্নতা

আমাকেও বারাঙ্গ বারাঙ্গনা প্রলোভন অন্ধকারে ডেকে
নিয়ে দ্রুত দেখায় আগ্রাসী উরু, উন্মোচিত স্তন,
উন্মাতাল হাসির জহর হানে যখন-তখন।
তবে কি আমিও আজ দালালের মতো যাব হেঁকে
দিগ্বিদিক? স্বরচিত শামুকের ঠাণ্ডা খোল থেকে
বেরিয়ে সোৎসাহে ঘন ঘন করব মঞ্চারোহণ
ত্বরিত খ্যাতির মোহে? স্বতঃস্ফূর্ত করব লেহন
সাম্প্রতিক চটচটে চুষিকাঠি লজ্জা ব্যতিরেকে?

ভিড়াক্রান্ত আমি, চোখ-ধাঁধানো পসরা সবখানে;
অশ্লীল চিৎকার আর তুইতোখাড়ির তুবড়িতে
ঝালাপালা কান; শুদ্ধ বাণী নয়, বিটকেল কথা
নিয়ত পুলক আনে এমনকি ধীমানের কানে।
শিল্প পদ্মরাগমণি হয় স্তব্ধ তার অঞ্জলিতে,
তাই চটকিলা হল্লা নয়, চাই ধ্যানী নিমগ্নতা।

সহজে ফোটাতে গিয়ে

সহজে ফোটাতে গিয়ে অনিবার্য শব্দের কোরক
গোধূলি নিঃশেষ হলো দীর্ঘশ্বাসে। জন্মান্ধ ব্যর্থতা

উপড়ে ফেলতে চায় আমার মনের গুল্মলতা,
আমার পরাস্ত সত্তা জুড়ে নামে উদাসীন শোক।
হঠাৎ এলেন গুরু উদ্ভাসিত করে অন্তর্লোকে
রহস্যের মেঘ থেকে। 'যদি চাও তুমি অমরতা,
তাহলে সংহত করো বাক, থামাও প্রগলভতা',
বলে তিনি স্তব্ধতাকে সাক্ষী রেখে মুদলেন চোখ।

তারপর অদৃশ্য পদ্মের মতো তিনি, মনে হয়,
গহিনে বিরাজমান। আমি তাঁর দীক্ষার মঞ্জরি
অঞ্জলিতে নিয়ে মিতাক্ষরে পবিত্রতা আঁকি সাদা
পাতা জুড়ে চিদানন্দে। অমরতা সকল সময়
কুহকের মতো ডাকে, একজন গহন মেস্তরি
স্বপ্নে আসে বাঁশি হাতে; নিমেষে হৃদয় হয় রাধা।

পুনর্মিলনের আগে

আজ আমাদের দুজনের দেখা হবে পুনরায়
এই শতকের রাঙা অস্তরাগে বহুদিন পর।
তোমাকে দেখি না আমি কতকাল? তিনটি বছর
কেটে গেছে যোগাযোগহীন দুটি চোখের পাতায়
তোমার সত্তার ছায়া নিয়ে দিনরাত্রি বিরানায়।
আবার তোমার চোখে পড়বে আমার চোখ, ঝড়
বইবে শিরায় আর হবে ঘন ঘন স্পন্দিত অধর,
বুকের ভেতরে লুপ্ত সভ্যতা জাগবে নিরালায়।

তোমাকে দেখব আমি এতকাল পর, তবু আজ
কেন যে দ্বিধার শুঁয়াপোকা ঘোরে মনে। ভাবি মেয়ে,
যে-তোমাকে আগে আমি দেখেছি অনেক, ঠিক তাকে,
তাকেই তো দেখব আবার? নাকি ভিন্ন কোনো সাজ
রাখবে আড়ালে খুব প্রকৃত তোমাকে? মেদে ছেয়ে
যায়নি তো দেহমন? হৃদয় দিয়েছ ফের কাকে?

সুপ্রভাত

আমি তো সকাল-সন্ধ্যা থাকি নানা কাজে, ব্যস্ততার
ধুলো ওড়ে সত্তাময়। সময় খরচ হতে থাকে
যথারীতি, কিন্তু সময়ের কতটুকু কোন ফাঁকে

আমর নিজস্ব হয়? সময়ের মুঠো থেকে আকসার
স্বর্ণ চূর্ণ নয়, বালি ঝরে, একটি কি দুটি কণা, যার
উপস্থিতি হিরণ্ময়; তার আনুকূল্যে কিছু ঘটে
রূপান্তর বাস্তবের, ভিন্ন মাত্রা লাগে প্রেক্ষাপটে।
তবু সর্বদাই ভয় থাকে সবকিছু হারাবার।

বিশেষত মধ্যরাতে কালো নিঃসঙ্গতা আরও বেশি
ব্যেপে এলে মজ্জায় আমার নানা ধ্বনি, খাপছাড়া,
শুনে কন্টকিত হয় সত্তা, মনে হয়, অকস্মাৎ
কেউ যেন কবরে ঢোকার জন্যে দিচ্ছে খুব তাড়া।
খেচরের ডাকে রাত্রি আরও দীর্ঘ হয়; হে সুকেশী
তোমাকেই ভাবি শুধু তুমিই আমার সুপ্রভাত।

আবার যাবে কি চলে?

আবার যাবে কি চলে অভিমানে দীর্ঘ পরবাসে
আমাকে খরায় ফেলে? পথক্লেশ, না কি মতিভ্রম,
কী আমার দোষ
বুঝতে পারিনি ঠিক, তবু শেষমেশ
রেখেছি তোমারই প্রতি অঞ্জলি আমার। শূন্য রইলে করতল,
আমার সকল দিক হবে চির হাহাকারময়,
কংকালে-কংকালে যাবে ছেয়ে শূন্য ভূমি।

তুমিহীনতায় অবেলায়
আমার একান্ত অন্তর্গত অনল ফুরিয়ে গেলে
নিঃসঙ্গ থাকব পড়ে সীমাহীন শীতে
ভীষণ আহত।
কখনো বেগানা কোনো কুকুর শুঁকবে এসে ছেঁড়া
জামার রক্তের দাগ, শরীরের বর্ধমান ক্ষত।
অথচ এ-ও তো জানি, বসন্তমায়ায়
শহরের নিঝুম কবরখানাতেও
বেলা শেষে কোকিল ব্যাকুল ডেকে যায়।

দূরে আছি, তোমার নিকট থেকে বহুদূরে আছি–
যেমন আকাশ থেকে দুর্বল ডানার কোনো পাখি,
শস্যময় ক্ষেত থেকে উপদ্রুত চাষী,

অন্ধের নিকট থেকে জ্যোতি
কবির নিকট থেকে অভীষ্ট প্রতিমা শব্দেশ্বরী।

দূরত্বের অন্তহীন মরুর সিমুম ঝড়ে দিশাহারা আমি
রোজই ভাবি, দেখা হবে আমাদের কখনও আবার
বনানীর স্নিগ্ধতায়, দীর্ঘ গাঢ় লাল বারান্দায়।
যে-পথ সন্ধ্যার স্পর্শ পেয়ে কেমন মায়াবী হয়,
তার দিকে চোখ পড়ে হঠাৎ যখন,
যখন কোথাও দেখি অপরাহ্ণে নতুন ব্লেডের মতো ঝিল,
মনে হয় দেখা হবে আমাদের, দেখা হবে তোমার রূপের স্তব্ধতায়।

আবার যাবে কি চলে? এখনই যেও না,
ফিরিয়ে নিও না মুখ; তুমি
না তাকালে আমি হৃতদীপ্তি, হীনবল
ঈগলের মতো পঙ্গু ডানা নিয়ে হাওয়ার ধিক্কারে

ক্ষয়ে-ক্ষয়ে
নিষ্ফল ক্ষোভের ভারে শ্বাসকষ্টে ভুগি সর্বক্ষণ–
পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে, বহু নিচে
হয়তো কচুরিপানাময় এঁদো ডোবায় অথবা খানাখন্দে
খুব অসহায় মুখ থুবড়ে পড়ব ভেবে ভয়ে নীল হই।

তুমি না বাড়ালে হাত পণ্ড হবে যজ্ঞ সুন্দরের,
ঋত্বিক যাবেন ভুলে মন্ত্র, হোমাগ্নি না জ্বেলে দ্রুত
পুড়িয়ে দেবেন সুশ্রী মণ্ডপ বেবাক;
সুসৌম্য আলেম কোরানের পাতা না উল্টিয়ে ভ্রমে
ঐন্দ্রজালিকের কালো নিষিদ্ধ কেতাবে
দৃষ্টি বুলোবেন।

এখন থেকো না দূরে, এসো চলে এসো–
হে মেয়ে তোমার আশা করার মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধ ছায়া,
ফসলের আভা,
দীর্ঘ পরবাসে যোগাযোগহীন পত্রপ্রার্থীদের
সম্মেলনে অলৌকিক ডাকপিয়নের চিঠি বিলি,
অন্ধের ইশ্‌কুলে ব্রেইলির
ব্যাপক দেয়ালি, মৃত শহরের ধু-ধু স্তব্ধতায়
প্রবল আশ্বাসময় দৈব উচ্চারণ।

তোমার কুশল

তোমার কুশল আমি জানি না এখন। বড় যোগাযোগহীন
আছি ইদানীং
এ এমনই যুগ, যোগাযোগ ক্রমান্বয়ে হচ্ছে যত
সহজ ততই যোগাযোগহীন হয়ে পড়ছে মানুষ। তুমি
এ মুহূর্তে কী করছ, কোন শহরের ফ্ল্যাটে আছ

তোমার বিবাহোত্তর রূপ নিয়ে নিজস্ব সংসারে,
আগেকার মতো আজও আমাকে তোমার
মনে পড়ে কিনা,–

জানি না কিছুই। আগেকার মানে কবেকার? বলো
তুমি কি এখনও
আমাকে অত্যন্ত ভেবে রাত্রির চিতায় জ্বলজ্বলে
যৌবন পোড়াও হে সুচেতা?

এই প্রশ্নে কুয়াশার আবছায়া মেদুরতা আছে, অতিদূর
অরণ্যের হরিণের চঞ্চলতা আছে,

ঝিলের কোমল আলোড়ন আছে, আছে
পরিত্যক্ত বসতির স্তব্ধতা এবং
পুরনো আঙ্গারে কোনো গহনা নৌকার যাত্রাধ্বনি।

একদা আমিও ভাবতাম
কখনও আমাকে যদি ছেড়ে চলে যাও দূর দেশে
আমার সকল প্রত্যাশাকে মরীচিকা করে, তবে
আমি বন্ধ ঘরে মরে পড়ে থাকব একাকী
কিংবা উন্নত্ততা

আমাকে দখল করে ফেলবে নিমেষে,
অথবা আমার কাছ থেকে কর্কশ অংকের কর
আদায় করবে অসুস্থতা অবিরত। কিন্তু আমি
আত্মহননের আফিমে হইনি বুঁদ
নাবালক পুরুষের মতো।

হে দয়িতা সুচেতা আমার
সে কবে হয়েছে দেখা, রাত্রির প্রথম যামে কথোপকথন

আর লোকচক্ষুর আড়ালে

নাগরিক ক্ষণিক ভ্রমণ আর থরথর তোমার শরীর
কিছু কল্পনায় আর কিছুটা বাস্তবে
ছুঁয়ে ছেনে বাউণ্ডুলে কবির গভীর পঙ্‌ক্তিমালা আহরণ
কিছু তার মনে পড়ে, কিছু বিস্মৃতির কাছে আমি

রেখেছি বন্ধক। মনে পড়ে, মাঝে-মাঝে তোমাকেই
মনে পড়ে সকাল সন্ধ্যায়
দুপুরে কি মধ্যরাতে, অকস্মাৎ বাড়াই দু'হাত
তোমার একান্ত দিকে, কখনও-কখনও পদ্য লিখি

তোমারই উদ্দেশে, রাত জেগে তোমার মধুর নামে চিঠি
লিখে ডাকঘরে যাই বারেবারে, অথচ করি না
পোস্ট কোনো পত্র ঠিক ডাক-টিকিটের অভাবে কখনও।

যৌবসাজ খসে গেছে, আমার যৌবন সে কখন
আহত চিলের মতো আর্তনাদ করতে-করতে
অসহায় পড়ে গেছে জন্মান্ধ ডোবায়। আমি আজ
অতীত চিবোই শুধু যে অতীত আমরা দু'জন
অন্তরঙ্গ করেছি রচনা
কখনও ড্রইং রুমে, কখনও-বা খোলা মাঠে, লাল বারান্দায়,
কোনো-কোনো রাতে
স্বপ্নিল মোটরকারে সান্নিধ্যের বৈদূর্যমণির
বিপুল আভায় উদ্ভাসিত, চুম্বনের সঙ্গীতে অধীর হয়ে,
রাত্রির অসিত মখমলে গাল রেখে
বসে-থাকা, প্রকৃত হার্দিক কথা ভুলে যাওয়া আর
চুপচাপ চেয়ে-থাকা দিয়ে।
আজ ব্যর্থতার ভস্মরাশি আমাকে ফেলেছে ঢেকে,
আবার কখনও আমি ভস্ম ঝেড়ে অবিনশ্বর পাখির মতো
সূর্যোদয় আর পদ্মপ্রসূত আভার সম্মিলনে
গীতিময় হবো কিনা, স্পষ্টতই আমি তা জানি না।

সুচেতা তখন

যখন সহসা চোখ মেলে দেখি, কোরবানি-দেওয়া
ছাগলের ভেজা চামড়ার মতো আকাশকে দেখি
একলা কে পাখি উড়ে উড়ে ঘুরে ডানা ঝাপটায়,

সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।

যখন ঘরের পর্দায় লাগে হাওয়ার ঝাপটা,
দোলে দেয়ালের ক্যালেন্ডারের মদির-তন্বী
এবং ক্যাসেটে বিলায়েত খান নিজেই সেতার,
সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।
যখন আমার গলির ধুলায় জ্যোৎস্নামরাল
নিথর ঘুমায়, উড়ে যায় দূরে পুরনো কাগজ,
ঝরা পাতা আর কাঁপে মাঝে মাঝে ছায়ার নকশা,
সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।

যখন মধ্যরাত্রে গহননিদ্রার জাল
ছিঁড়ে যায় আর মগজের রাঙা উদ্যানে জ্বলে,
পূর্ণিমা-চাঁদ, বন্দনাময় রক্তগোলাপ,
সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।

যখন আমার ভাবনা মরণ বেলা-অবেলায়
ছন্দ মিলের চুমো খেয়ে হয় সংগীতময়,
যখন হৃদয়ে গীতবিতানের পাতা নেচে ওঠে,
সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।

যখন ব্যাপক আঁধারে হাওয়ায় দোল খায় খাঁচা
অন্ধ বাউল চা-খানায় বসে দোতারা বাজায়,
অচিন পাখির উদ্দেশে গায় নভচারী গান,
সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।

যখন রাতের বুক চিরে দূরে চলে যায় ট্রেন
বাজিয়ে বিরাগী হুইসেল তার, যখন ঘুমের
গহিন ভিতরে দুঃখ আমাকে নাম ধরে ডাকে,
সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।

যখন গভীর রাত্রির বুক বৃষ্টি-নখের
আঁচড়ে-আঁচড়ে বিক্ষত হয়, তৃতীয় প্রহরে
একা ভেজা পাখি এদিক-ওদিক আশ্রয় খোঁজে,
সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।

যখন একাকী বসে থাকি আপন বিবরে,
প্রেতায়িত ঘরে, অতীতের সাথে খেলি কানামাছি,
যখন হঠাৎ ভেসে আসে ধ্বনি শবযাত্রার,

সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।
যখন আমিও ক্রোশ ক্রোশ পথ পেরিয়ে ক্লান্ত
আবার আমার উঠোনে দাঁড়াই, যখন চকিতে
চরাচর বিসমিল্লা খানের সান্দ্র সানাই,
সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।

যখন অমল সুবে সাদেকের জাগরণী ধ্বনি
ভেসে আসে কানে, যখন প্রভাত পুণ্য আয়াত,
কাজল মাটির দূর্বার টানে ঝরে শত ফুল,
সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।

যখন নদীতে গ্রাম্যরমণী প্রদীপ ভাসায়
কারো কথা ভেবে সন্ধ্যাবেলায়, যখন বিপুল
বেড়াজালে দেখি ছটফট করে বন্দিনী মাছ
সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।

যখন ভগ্নসেতুর ওপারে ডাক দেয় কেউ,
ব্যাকুল সে-সুর বৈরী বাতাসে হারায় নিয়ত,
যখন স্রোতের ক্রূর চোরা টানে নৌকো লুপ্ত,
সুচেতা তখন মনে পড়ে মুখ, তোমার মুখ।

যাবার ভাবনা

রোজই ভাবি, এবার যাব অনেক দূরে।
একটি সুদূর পথের ছবি কবে থেকে
মগ্ন কবির আধফোটা এক ভাবনা হয়ে
আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে।
সেই অচেনা পথের ধারে হয়তো এখন
যুগল গাছের ছায়া কাঁপে, তিনটি ঘোড়া
যাচ্ছে ছুটে উড়িয়ে স্বপ্ন তীক্ষ্ণ খুরে,
কেশর-ঝালর মত্ত নাচে।
সেই অদেখা পথের ধারে সন্ধ্যা নামলে
নির্জনতা বাড়ে আরও, জ্বলজ্বলে ঐ জোনাকিরা
রহস্যময় খুশি ছড়ায় ঝোপেঝাড়ে,
ওষ্ঠ রাখে রাতের ঠোঁটে।
রোজই ভাবি সেই পথেরই প্রান্তে যাব।

কেউ কি গেছে আমার আগে? অঙ্গ-জোড়া
ধূসর ধুলো ঝেড়েঝুড়ে বলেনি কেউ–
এই তো এলাম জরিপ করে।'
বস্তুত কেউ আজ অবধি বলেনি তো–
'সেই পথেরই স্মৃতিগুলি সত্তা থেকে
ঝরছে শুধু লাল গোলাপের পাপড়ি যেন।'
সে-পথ কোথায়, জানে না কেউ।
হয়তো সে-পথ হয়তো শুধু আমার জন্যে
পথ চেয়ে রয় অধীর হয়ে সকল সময়।
হায় কখনও ফুরোবে তার প্রতীক্ষা কি?
ব্যস্ত হয়ে প্রস্তুতি নিই।
সাত-সকালে খানিক মাতি বাঁধাছাঁদায়,
অনেক দূরে যাব বলেই এটা-সেটা
ব্যাগের ভেতর ব্যাকুল পুরি, খানিক ঘুরি
মনের ভেতর সারস হয়ে।
উল্টোপাল্টা চিত্রকল্প জেগে ওঠে,–
তারপর কী মনে করে উপুড় করি
হলদে রঙের ব্যাগটি এবং সরিয়ে রাখি
শূন্য একটা খাদির ঝোলা।
জানলে দিয়ে তাকাই দূরে– হয় না যাওয়া।
ইচ্ছে হলেই যেতে পারি, যাই না তবু;
কোথাও ছুটে যাবার চেয়ে যাবার ভাবনা
মধুর বড়, দীর্ঘ ভালো।

ক্লান্ত তুই

তোর সাহসের গলাফোলা স্তব করবে না কেউ
কোনো দিন; ক্লান্ত তুই এ বিক্ষুব্ধ সমকালে ঢেউ
তুলিসনি, তোর ডাক শুনে কোনো অশান্ত তরুণ
ঝরায়নি বেপরোয়া তার দীপ্ত টগবগে খুন
রাজপথে, তোর জন্যে কস্মিনকালেও অনশন
ধর্মঘট করবে না কেউ কিংবা হবে না হরতাল
শহরে বন্দরে, কেউ বাজাবে না ট্রাম্পেট কর্তাল
স্বাগত জানাতে তোকে। দিকে দিকে উজ্জ্বল তোরণ
তুলবে না মাথা তোর নামে। পুষ্পিত বিগ্রহ তুই

নোস, তোর পায়ে কেউ করবে না অর্পণ কিছুই।

ক্লান্ত তুই, অবসন্ন শরীর ও মন নিয়ে তোর
কী ঝক্কি-ঝামেলা আজ। আধিব্যাধি বড়ই নাছোড়।
থাকিস একলা পড়ে অন্ধকার কোণে, দুষ্ট ক্ষত
চেটে বেলা যায়, কাদা ঘেঁটে কী খুঁজিস অবিরত
অমন ব্যাকুল হয়ে? হঠাৎ কখনও সূর্যোদয়
সুদূর দিগন্ত ছেঁড়া সূর্যোদয় দেখে মনে হয়—
মাথার ভিতরে তোর এখনও গুঞ্জন কিছু আছে
বাকি, সব ফাঁকি, সব ভ্রান্তি উজিয়ে এখনও নাচে
শিরায় আহত দেবশিশু। তবে কেন অকস্মাৎ
মধ্যপথে কোন ভুলে এমন অবশ তোর হাত?

আকাশে নতুন আলো ফোটার আগেই, ওরে বোকা,
ভুলে গেলি বাজাতে আশার ডুগডুগি। কেন ধোঁকা
দিল না অম্লান মুখে দশজন পড়শিকে? চেয়ে
দ্যাখ চারপাশে কত লোক কী উল্লাসে যাচ্ছে বেয়ে
তা ধিন তা ধিন বেয়ো, কাড়া-নাকাড়ার ধুন্ধুমার
শব্দে দিকগুলি দিনরাত্রি কম্পমান বারবার।
ছায়ায় আছিস মিশে, রোদ্দুরে অরুচি অতিশয়;
হেলায় বিকিয়ে দিলি বাস্তুভিটা, বিষয়-আশয়।
তুই ভীরু, বড় ভীরু, উদ্যমরহিত চিরদিন,
সঙ্গলিপ্সু তুই, তবু রয়ে যাবি নিঃসঙ্গ মলিন?

গুলিবিদ্ধ লাশের মতন

১
একটি দশক কেটে গেছে; যেন আমি এতকাল
ছিলাম সিনেমা হলে শ্বাসরোধকারী পরিবেশে।
কত দৃশ্য নৃত্যপর চোখের সম্মুখে, দিগ্বিদিক
ছোটে নানা কুশীলব। অনেকে নিষ্প্রাণ অতিশয়,
যেন কাকতাড়ুয়ার ধরনে দাঁড়ানো অন্ধকারে।
কেউ ছদ্মবেশে পথ হাঁটে আস্তিনে লুকিয়ে ছোরা,
সিঁদ কাটে কেউ মধ্যরাতে গেরস্থ পাড়ায়, কারো-
কারো হাত হতাশা ছড়িয়ে দেয় সম্পন্ন সংসারে।

কেউ-কেউ পুকুর চুরির পরে কাতলার মতো
ঝলসাতে থাকে রৌদ্রে বারেবারে; কেউ খুব ক্ষুব্ধ,
প্রায় ক্রুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধে হাতে অস্ত্র ধরেছিল বলে।
অন্তরাগে শ্মশানের ধারে চোরাগোপ্তা মাল টেনে
গলাগলি করে গড়াগড়ি যায় ডাকাত পুলিশ
কেউবা ফাঁসিতে ঝোলে, কেউ যায় দীর্ঘ নির্বাসনে।

২

একটি দশক গেছে, তবু কেন দৃশ্যাবলি হঠাৎ এমন
পাল্টে যায় বারংবার? কেন গাছপালা তছনছ,
অগ্নিদগ্ধ বাড়িঘর? কেন মৃত্তিকা উগরে দেয়
করুণ করোটি সংখ্যাহীন? অকস্মাৎ এ কেমন
পরাবাস্তবের লীলা শহরের আনাচে-কানাচে?
মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমার চোখের রেটিনায়
কী ব্যাপক বিভ্রমের ছায়া নাচে বেলা-অবেলায়।
নইলে কেন গাছে-গাছে সদ্য কাটা নরমুণ্ড দেখি,
দেখি দিনদুপুরেই শেয়ালে শকুনে ছেয়ে গেছে
পৌরপথ! এমনিতে মোটামুটি ভালো থাকি, মানে
খাই-দাই, প্রত্যহ কামাই দাড়ি। হঠাৎ আবার
সবকিছু উল্টা-পাল্টা, আমার দৃষ্টিতে বারংবার
একাত্তর ভেসে ওঠে গুলিবিদ্ধ লাশের মতন।

তূণে খুঁজি তীর

১

একদা আমার স্বপ্ন সুপ্রাজ্ঞ নূহের করতল
থেকে উড়ে-যাওয়া কপোতের মতো ছিল যার ঠোঁটে
পুষ্পল জলজ কণা সদ্য জাগা পল্লবের ঘ্রাণ।
একদা আমার স্বপ্ন নীলিমাকাতর ঊর্ধ্বচারী
পাখায় জড়িয়ে নিয়ে নির্বাসিত দান্তের ভাবনা
ক্লান্তিকালে খুঁজেছে নীড়ের ওম; একদা আমার
স্বপ্ন ছিল দ্য ভিঞ্চির অলৌকিক আঙুলের মতো;
একদা আমার স্বপ্ন মুক্তিযোদ্ধাদের নিত্যসঙ্গী
ছিল ঝোপঝাড়ে, বনবাদাড়ের আঁধারে, জলার-
সবুজ গ্রেনেডে, বন্দুকের নলে, ক্যাম্পে, পরিখায়।

এখন আমার স্বপ্ন ক্রাচাশ্রয়ী, একা-একা ঘোরে
দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাঝে-মাঝে; এখন আমার স্বপ্ন
চাঁদা আর ভাতা প্রার্থী, কখনও আবার নজরুলী
কবিতার মতো অগ্নি উদ্‌গীরণে ব্রতী হতে চায়।

২
তবু আমি নিজেকে বিপন্ন ভেবে করি না বিলাপ।
ক্রমশ কাদার চাকা দেবে যাবে, আমার শোণিত
মিশে যাবে অস্তরাগে, ভূলুণ্ঠিত শরীর দলিত
হবে আর শস্যশূন্য মাঠের মতন এ জীবন
ক্ষণকাল হবে উদ্ভাসিত দৃষ্টিপথে, অনন্তর
লুপ্ত গান, স্মৃতি সমুদয়, অতীত ও বর্তমান।
এখন যদিও স্বপ্ন রোগা ঈগলের মতো বাঁচে
উপহাস কুড়িয়ে সর্বদা, তবু স্বপ্নের টানেলে
কাটে বেলা মাঝে-মধ্যে। সম্প্রতি আমার নেই কোনো
সঙ্গী আর; একদা যাদের সঙ্গ দিত সুখ, তারা
তিন ডাইনীর প্ররোচনা মেনে অতি দ্রুত পাল্টে
নিয়েছে জীবন, আমি একা এখনও কুড়াতে যাই
ফুল বনবাদাড়ে এবং চাকা নাছোড় কাদায়
দেবে যাবে নিশ্চিত জেনেও আজও তৃণে খুঁজি তীর।

কীভাবে করব শুরু

কীভাবে করব শুরু ভেবেই পাচ্ছি না। প্রতিবার
সেই একই মুশকিল– অস্তিত্বের ঈষৎ কম্পন,
শব্দহীনতার মরুভূমি, ভ্রষ্ট চিন্তার গহ্বর,
তবে কি এখন আমি মুদ্রাদোষবশত খানিক
আমতা-আমতা করে নামতার মতো গড়গড়
বলে যাব কিছু, নাকি খাতা নিরক্ষর রেখে ফের
থাকব আলস্যে ডুবে অথবা আড্ডার লোভে যাব
বন্ধুর ডেরায় মেনে নিয়ে পরাজয়? কিন্তু আমি
পরমুহূর্তেই দেখি সারস আকাশ পাড়ি দেয়,
মৌলানা রুমির খিবকা কাঁপে, রক্তাপ্লুত যেশাসের
উনিশশো একাশিটি জন্মান্ধ পেরেক জেগে থাকে,
এবং সন্তের চোখ। একটি সোনালি সিংহ তার

মুখে গোলাপের তোড়া নিয়ে ছোটে নৈশ ফুটপাতে,
বাজে কারো কণ্ঠস্বর, মুশকিল কেমন আসান হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক

বাইরে হার্মাদ ঝড়। যেন খুব বদরাগী কেউ
বারংবার গর্জে উঠে গাছপালা, ল্যাম্পোস্ট ঘরের
চাল, খুঁট, পাখিদের ডেরা, বেবাক ফেলছে ছিঁড়ে
খুঁড়ে কাগজের মতো। তিনি, প্রাজ্ঞ একজন, একা
ঘরের ভেতরে বাতি জ্বেলে পড়ছেন ইতিহাস আর
মাঝে-মাঝে ঝাড়ছেন ছাই অ্যাশট্রেতে। অকস্মাৎ
দৃষ্টিপথে তাঁর ভাসে অগ্নিদগ্ধ বিপন্ন শহর–
এবং ছাড়ছে হ্রেষা চেঙ্গিসের ক্ষিপ্রগতি ঘোড়া
পাহাড়ে, প্রান্তরে, জনপথে। রণক্লান্ত, পরাভূত
নেপোলিয়নের তেজী ঘোড়ার শরীরে যত্রযত্র,
তুষার কামড় আর লাঞ্ছিতা পোল্যান্ড, হাঙ্গেরিতে
ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর আর একাত্তরে বাংলাদেশে ক্রূর
বর্বরের কী ব্যাপক নিপীড়ন, বই বন্ধ করে
ভাবেন প্রবীণ গবেষক, ইতিহাস তালেবর
তাস জোচ্চোরের মতো হাত সাফাইয়ের কেরদানি
দেখায় প্রচুর আর নমস্য গিবন বলে সাত
তাড়াতাড়ি খাতা খুলে তিনিও লিখতে বসে যান
অতীতের ছায়াতলে ফরমায়েসি ভ্রষ্ট ইতিহাস।

কে দেবে অভয়

কোনো কোনো দিন মধ্যরাতে ভয় পেয়ে জেগে উঠি।
দেয়ালে নিবদ্ধ চোখ, মগজের কোষে-কোষে জ্বালা,
কিসের নিঃশ্বাস লাগে চোখে-মুখে, প্রেতের ভ্রূকুটি
ঘরময় জেগে থাকে সারাক্ষণ, যেন বোবা-কালা
আমি, পড়ে থাকি ঠাণ্ডা শবগন্ধী কফিনের মতো
শয্যায় নিস্পন্দ, একা। অকস্মাৎ অগ্নিবর্ণ ঝুঁটি
নেড়ে কাকাতুয়া তেড়ে আসে শয্যাপার্শ্বে, অবিরত
চঞ্চু আর নখ দিয়ে আমাকেই ছেঁড়ে কুটি-কুটি।

দেয়ালের টিকটিকি বিশাল ডাইনোসর হয়,

উঠোনের গাছপালা খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ
হুনের মতন ধেয়ে আসে এই ঘরে কী দুর্জয়।
আমার ওপরে ঘোর কালো ফণিমনসার বন
সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ে, এমনকি যে শান্ত বেড়াল
আমার নিবাসে করে বসবাস, সে-ও চক্ষুদ্বয়
পাকায় গভীর রাতে। ঘোড়ার পায়ে ভারি নাল,
হাজার-হাজার, ঝরে সারা ঘরে; কে দেবে অভয়?

হঠাৎ ভয়ার্ত মধ্যরাতে তীব্র স্মৃতির মতন
তোমার মুখের দ্বীপ মনে পড়ে, তোমার সোনালি
শরীরের কথা ভাবি আর কী আশ্চর্য, এতক্ষণ
যে ভয় আমাকে কাটছিল অতিশয় ফালি-ফালি,
তার ছায়া নেই আর কোথাও এখন। তুমিহীন তুমিময়
এ ঘর আমার; তুমি চোখের তারার মতো তুমি
অন্তরঙ্গ তুমি, দেখি আমার হৃদয়ে চন্দ্রোদয়,
তোমার শিঞ্জিত কণ্ঠস্বরে গুঞ্জরিত মনোভূমি।

সন্ধ্যার খালুই থেকে

সন্ধ্যার খালুই থেকে লাফিয়ে উঠেছে চাঁদ দূরে
বহুদূরে, ঘাটে বাঁধা তন্বী নাও, একটি কি দুটি
নয়, কয়েকটি, নিচ্ছে বিশ্রাম এখন, মেঠো সুরে
মাঝি পড়ে সায়ফুল মুলুকের পুঁথি, লুটোপুটি
খায় নানারঙা মাছ পানির ভেতরে মাঝে-মাঝে,
যেন দ্যায় সায় ত্রিপদীতে। আমানি নকশি-কাঁথা
দ্যাখে মাঝি পাঠ সেরে। মনে পড়ে, মশলার ঝাঁজে
মনে পড়ে তাকে যে সেলাই করে রাতে কাঁথা মাথা
নিচু করে স্মৃতিময় কুপির আলোয়, খোকা কোলে
সুহাস আসবে বলে। পলাশতলীর বিছানার
কথা মনে পড়ে তার। দুটি পাখা ভর করে দোলে
সে আকাশে, ওড়ে দূরে মাছের নাছোড় পাইকার
ডাকে তাকে বহু নিচু থেকে তারস্বরে, কিন্তু মাঝি
শোনে না কিছুই, ভাবে এ দর-দস্তুর ছায়াবাজি।

দীর্ঘ কেঁদে যায়

কোনো কোনো নিদ্রাহীন রাতে জানালায়
গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তজবা ফুটে থাকে। ওরা
আমার টেবিলে-রাখা কবিতার খাতার ভেতরে
প্রবেশ করতে চায় নিরিবিলি, বলে–
বিজনে আমরা জ্বলি, দূরে কাঁদে কে একাকী নিঃসঙ্গ শয্যায়,
বিজনে জ্যোৎস্নাও কেঁদে যায়, কেঁদে যায়, কেঁদে যায়।
কিছু হাড়, কিছু শুকনো পাতার ওপরে
আহত পাখির মতো নিথর জ্যোৎস্নাও কেঁদে যায়।

মনে পড়ে
জনশূন্য নদী তীরে, নাঙ্গা আকাশের নিচে
ব্যাপক বিকেলে
কতিপয় বিষণ্ন নাবিক
নুনমাখা দাড়ি আর রাঙা চোখ নিয়ে দিগ্বিদিক
করেছিল ছুটোছুটি, খুব ক্লান্ত হয়ে

নিরাশায় স্নান করে সর্বদা গন্তব্যহীনতার ধু-ধু ভয়ে
শুয়েছিল মাটিতে সটান, তারপর
ওঠেনি কখনো– বহু দূরে কিছু বালির কবর,
এলোমেলো দাঁড়
দেখে যদি কেউ কোনো দিন
থমকে দাঁড়ায়, তবে করুণ সঙ্গীত, ভায়োলিন
কিংবা অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র থেকে নয়,
প্রকৃতির থেকে জেগে উঠবে সহসা, মনে হয়।
এখন আমার হাত থেকে সুর ঝরনার মতন
উৎসারিত ক্ষণে-ক্ষণে, সুরের ভেতর থেকে সুর
ঝরে যায় বনাবৃত নিরালয়। মন
ঘরের নিকটে যেতে চেয়ে ফিরে আসে, অশ্বখুর
বেজে ওঠে বারংবার হৃদয়ের খুব অভ্যন্তরে,
নাশপাতি বন দোলে, কার মুখ, চক্ষুদ্বয়, স্তন,
বসে-থাকা, হেঁটে যাওয়া আঁচল উড়িয়ে, মনে পড়ে।
আমার শয্যায় সারাক্ষণ
সে কার অস্পষ্ট ছায়া শুয়ে থাকে ছায়াময়তায়।
হা-হা স্বরে
আমার শয্যার জ্যোৎস্না কেঁদে যায়, দীর্ঘ কেঁদে যায়।

স্মৃতিময় উজ্জ্বল আঁধারে

খারাপ লাগছে এই নিস্তরঙ্গ সতেজ সকালে।
গুচ্ছ-গুচ্ছ পাতার আড়ালে
ফুল ফুটে আছে, পাখি সুন্দরের পাশে
বসে গান হয়, শৈশবের মতো কিছু মেঘ ভাসে
স্মরণমন্থনকারী আসমানে, অথচ আমার
খারাপ লাগছে খুব। যেন হৃদয়ের ঝোপঝাড়
ভীষণ বিশীর্ণ আর জোনাকিবিহীন। আপত
মুখ ধুতে রুক্ষ গালে ঘষতে বুরুশ কিংবা সুদীর্ঘ বিগত
রাত্রির জামাটা বদলাতে লাগছে না ভালো
কিছুতেই; মগজের রাশি রাশি কালো
আমাকে রেখেছে ঘিরে আপাদমস্তক, মনে হয়
ক্রমাগত যাচ্ছি ডুবে দীর্ঘ কৃষ্ণকায় ঘাসে; ভয়, তাই ভয়।

কত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে পট। শত-শত কুশীলব
নব্য নায়কের করে স্তব
বেজায় পুরোনো সুরে, হয় নতজানু সারি সারি
পুরুষ ও নারী
ইস্পাতি নির্দেশে, মাঝে-মাঝে ওরা কী যেন কুড়ায়
ডানে-বাঁয়ে, অকস্মাৎ যখন ফুরায়
মেকি সে উৎসব, জিভে তীব্র তেতো স্বাদ ঝুলে থাকে
সারাক্ষণ, ভাঙা দঙ্গলের ভেতরে কে কাকে ডাকে,
বোঝা যায়, এলোমেলো প্রেতারিত পদধ্বনি বাজে
চতুষ্পার্শ্বে, রুক্ষ শব্দরাশি মেশে আরও বেশি কর্কশ আওয়াজে।

খারাপ লাগছে এই নিস্তরঙ্গ সতেজ সকালে।
কী যে হয় চোখে পড়ে দূরে শুকনো ডালে
ঝুলছে তোমার জামা, যেন এক খণ্ড মেঘ, আবার হঠাৎ
প্রজাপতি হয়ে ওড়ে, ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে, শূন্য হাত
জামার ভেতরে কেলিপরায়ণ। আমার কাঁধের বারান্দায়
কে এক রঙিন পোস্টম্যান ভাসমান, ডেকে যায়
প্রহরে প্রহরে কখনও-বা পল্লবের ভিড় থেকে
সহসা বেরিয়ে আসে হলদে মসলিনে মুখ ঢেকে,
অথচ জরুরি খাম, টেলিগ্রাম, কিছুই করে না বিলি, শুধু
নাচায় বাদামি ব্যাগ ধু-ধু

দিগন্তের দিকে আর একজন দলছুট অন্ধ কবি জীর্ণ রাজবেশে
চলে নিরুদ্দেশে।
আমিও বেরিয়ে পড়ি মাঝে-মাঝে চোখ-কান বুজে
মায়াবী চপ্পল পায়ে, খুঁজে
বেড়াই তোমাকে রাত্রিদিন তুমিহীন
এ শহরে, কবেকার টেলিফোন পোল, ডাকবাক্স ম্যান্ডোলিন
সময়ে মলিন হতে থাকে আর ঘরে ফেরা মানে
নিজের কাছেই ফিরে-আসা জেনে অন্তর্গত টানে
বারংবার চলে আসি স্মৃতিময় উজ্জ্বল আঁধারে একা একা,
বিরূপ হাওয়ায় লুপ্তপ্রায় পদরেখা।

আমার কোনো তাড়া নেই

প্রথম প্রকাশ	২৫ বৈশাখ ১৩৯১ [৯ মে ১৯৮৪]
প্রকাশক	গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী	সৈয়দ ইকবাল
উৎসর্গ-পত্র	আহসান হাবীব

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার কোনো তাড়া নেই

জাভেদ, তোমাকে আমি ডাকছি এই সাতসকালে
ফুটপাতে দাঁড়িয়ে,
তুমি শুনতে পাচ্ছ না?
জাভেদ তুমি টইটম্বুর বাসে
বাদুড়ের ধরনে ঝুলে যাচ্ছ।
কী দরকার ছিল এত কষ্ট করার,
পরের বাসে গেলেই তো পারতে!

তোমার কি এতই তাড়া ছিল?
আর ক'টা মিনিট
অপেক্ষা করতে পারলে না।

জাভেদ তুমি কোথায় চলেছ সবুর বিহনে?
জাভেদ আমি তোমাকে মনে করে
অন্য কাউকে ডাক দিইনি তো? ইদানীং
এ এক দারুণ মুশকিল, বুঝেছ জাভেদ,
চটজলদি একজনের সঙ্গে
আরেকজনের তেমন তফাৎ
খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমন ঝানু নিকেরির ঝাঁকায়
একটি মাছকে খুব আলাদা ভাবা যায় না।

আমি তোমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছি জাভেদ,
ঐ চোখ, ঐ কপাল আর ঢেউখেলানো চুল–
কী করে ভুল হবে আমার?
তুমি আমাকে, এই উনিশশো তেরাশির আমাকে
চিনতে পারনি হয়তো।
আমি কি খুব বেশি বদলে গিয়েছি?
নইলে কেন তুমি একটু

থমকে দাঁড়ালে না, করলে না অপেক্ষা? নাকি
চিনতে পেরেও
পড়ি মরি করে বাদুড়ের ধরনে
ঝুলে পড়ছে বাসের হাতলে। জিমনাসটিকে
এত ভাল তুমি, আমার জানা ছিল না।
যাদের খুব তাড়া থাকে, তারা আশেপাশে
ভাল করে তাকায় না; উপরন্তু

চেনা মানুষকে ওরা অচেনা বানাতে পারে
চোখের পলকে।

জাভেদ, নিমেষের জন্যে তুমি আমাকে চিনতে পেরেছিলে,
মনে হলো। তারপর কী যে হলো, পাকা অভিনেতার মতো
তুমি আমাকে না চেনার ভান করলে। আমিও সাহস করে
ছুটে যাইনি তোমার দিকে,
পাছে বিব্রত হতে হয় আমাকে।

জাভেদ, আমি তোমার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা
অপেক্ষা করে থাকব।
তোমাকে দেখে আমি কারো পা মাড়িয়ে,
কাউকে গুঁতিয়ে অমন ঠেলেঠুলে
চলন্ত বাসে উঠে পড়ব না অথবা
চিনতে পেরেও বেমালুম না চেনার ভান করব না।

আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারব।
আমি অপেক্ষা করতে পারি
একটি গোলাপ কুঁড়ির উন্মীলন দেখার জন্যে,
পক্ষীশাবকের প্রথম ওড়া দেখার জন্যে,
আমি অপেক্ষা করতে পারি

শিশুর কচি মুখের প্রথম বুলি শোনার জন্যে;
কোনো মুমূর্ষুর চোখের তারার নিভে-যাওয়া দেখার জন্যে,
কবিতার হারানো পঙ্‌ক্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে
আমি অপেক্ষা করতে পারি।

হে আমার বাল্যবন্ধুগণ

শোনো তোমরা শোনো হে আমার বাল্যবন্ধুগণ–
শোনো আফজাল, তাহের, ফরহাদ, সূর্যকিশোর।
আজ পঞ্চাশের ডান দিকে ব'সে
ভাবছি তোমাদের কথা।
আফজাল, আমি জানতাম
সেলুলয়েডে একটা নির্মল কাহিনী রচনার সাধ ছিল তোমার।
তাহের, তুমি একটা বিরাট সেতু নির্মাণের স্বপ্ন দেখতে।
ফরহাদ, গ্রাম-থেকে-আনা তোমার গোলাপি রঙের টিনের

স্যুটকেস থেকে বেরিয়ে পড়েছিল
যাবতীয় চিরকুট, সবুজ শাল আর একটা রাজহাঁস।
সূর্যকিশোর,
প্রতিদিন সূর্যাস্তের দিকে হেঁটে যাওয়াতেই ছিল তোমার আনন্দ।

আফজাল, তোমার সেই সেলুলয়েডি সাধ, যদ্দূর জানি,
পূর্ণ হয়নি। এই তো সেদিন আমরা কতিপয় শোকার্ত মানুষ
গোলাপজল আর লোবানের ঘ্রাণময় হাতে
তোমাকে শুইয়ে দিলাম মাটির নিচে, যেখানে
কাঁকড়াবিছে আর পোকামাকড়ের ঘনিষ্ঠ গেরস্থালি।
প্রতিবাদহীন তুমি ছিলে অসম্ভব নিশ্চুপ, অথচ শার্টের কলারে
কিংবা জ্যাকেটের আস্তিনে একটা পিঁপড়ে
অথবা কাঁচপোকা আনাগোনা করলে তুমি
মাথা খারাপকরা অস্বস্তিতে ভুগতে, টোকা মেরে উড়িয়ে দিতে
তৎক্ষণাৎ। মনে পড়ে, আফজাল তোমার সঙ্গে দেখেছিলাম
জীবনের প্রথম জোনাকি আর তোমার স্মৃতি এখন জোনাকি।

তাহের তুমি সেতু তৈরির স্বপ্ন খারিজ করে
বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে একদিন পাড়ি জমালে সুদূর বিদেশে।

তুমি আজ ফেঁসে গিয়েছ ভিনদেশী এক শহরে, ডিপার্টমেন্টাল
স্টোরের ঝলমলে করিডোরে ব্যাংক এ্যাকাউন্টের ঝকমকিতে,
চকচকে এস্কেলেটারে।

ফরহাদ, তোমার সেই 'এলাহি ভরসা' খচিত
গোলাপি রঙের টিনের স্যুটকেস থেকে বেরিয়ে-পড়া রাজহাঁস
গ্রামীণ তেজারতির অন্ধকার গুদামে দম আটকে
মারা গ্যাছে। তুমি চটজলদি
তাকে দাফন করেছ জামতলায় হলদে পাতার নিচে।
সূর্যকিশোর, সেই যে তুমি দাঙ্গা-হাঙ্গামময় বেচারামের
দেউড়ির বাসা থেকে বেরিয়ে হেঁটে গেলে
সূর্যাস্তের দিকে মুখ করে, তারপর তোমার কোনো খোঁজখবর
আমি পাইনি। তুমি কি পশ্চিমবঙ্গের রাইটার্স বিল্ডিং-এ
কলম পিষছ? নিত্যদিন মিশছ চৌরঙ্গীর ভিড়ে? নাকি
ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছ মফস্বলি ট্রেনে?
সূর্যকিশোর, তুমি কি আজ খুচরো যন্ত্রাংশের কারবারি?
তুমি কি ধিকিয়ে-ধিকিয়ে-চলা খবর কাগজের

সংবাদ-শিকারি? তুমি কি ফাটকা বাজারে ঘোরো নিত্যদিন?
সূর্যকিশোর, হে বন্ধু আমার, তুমি এখনও
সূর্যাস্তের দিকে হেঁটে যেতে ভালোবাসো প্রত্যহ?
ইতিহাসের চেল্লাচিল্লি আর রাজনীতির হৈ-হল্লায়
তুমি বেঁচে আছো কিনা, আমি তা জানি না সূর্যকিশোর।

শোনো তোমরা শোনো, হে আমার বাল্যবন্ধুগণ,
পঞ্চাশের ডান দিকে ব'সে
এবং ভাবছি আমার নিজের কথা।
একদা সুকান্তের মতো গালে হাত দিয়ে
পুরোদস্তুর কবির কায়দায়

একটা ফটো তুলেছিলাম,
উই-খাওয়া সেই ফটো আজ
কোথায় হারিয়ে গ্যাছে। তোমাদের অলক্ষ্যে
কী রহস্যময় সখ্যে
অক্ষরের পরী ভর করেছিল আমার ওপর। এখনও
গায়ে-কাঁটা-দেওয়া প্রহরে প্রহরে
আমার নিভৃত ঘরে, পথে-বিপথে তার
অনির্দিষ্ট আনাগোনা।
শোনো তোমরা শোনো, হে বাল্যবন্ধুরা আমার, শোনো
আমার ঘরে নিমেষে বস্তুময়তার উপরিতলে পিছলে
অনেক রঙিন মাছ এসে যায়, সাঁতার কাটে, এসে যায়
জলাভূমির ধারে নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের
হাড়গোড়ের সারে মঞ্জরিত লক্ষ লক্ষ টাটকা গোলাপ।

পারিবারিক অ্যালবাম

এক মধ্যরাতে আমার পারিবারিক অ্যালবামের
গান শুনে জেগে উঠলাম
পুরোনো দিনের গানে নীলাম্বরী শাড়ির মন-কেমন-করা
ঝলসানি মেশকে আম্বরের ঘ্রাণ
হেমন্তের উদোম বিকেলে নববধূর চাউনি
আলবোলার ধোঁয়াটে গুড় গুড় ধ্বনি
আগদুয়ারে আতিথেয়তা খিড়কি পুকুরের
লাজনম্র সজলতা চিলেকোঠার নির্জনতা

সে গান নিয়ে যায় আমাকে ছায়াতুর এক পথে
হলদে পাতার ওপর বিছানো ডোরাকাটা
শতরঞ্জির প্রতি টিফিন ক্যারিয়ার আর ফলমূলের প্রতি
কয়েকটি কমলালেবু গড়াতে গড়াতে আসে
ডুবে যায় কবরখানার দবিজ ঘাসে
সে গান নিয়ে যায় আমাকে দূর
সমুদ্রতীরে ভেজা বালিতে পদচ্ছাপ দেখায়
দেখায় মুখচ্ছবির পেছনে সূর্যাস্ত

আমার পারিবারিক অ্যালবাম জলকন্যার মতো গান গায়
ঘুমায় তারা আর গুল্মময় স্বপ্নের ভেতরে কখনোবা
থমকে দাঁড়ায় প্রবাল সিঁড়ির ধাপে
সুদূর গ্রামের গোড়াবাড়িকে জানায় অভিবাদন
আমার কল্পনার গা চটে আস্তে সুস্থে
আমার অস্তিত্ব স্বপ্নের পাখির মতো
উড়ে যেতে চায় তার কাগুজে ঠোঁটে চুমো খেয়ে
বুকে জড়িয়ে ধরে।

সাদা কথায় বললে দাঁড়ায়
আমার পারিবারিক অ্যালবাম এক ঐন্দ্রজালিক যে
দেখাচ্ছে তার মোহসঞ্চারী বিরতিহীন খেলা
কাঠের পিঁড়িতে বসে বঁটিতে সবুজ কুমড়ো
কাটছেন আমার মা গ্রিনবোটে আব্বা বাবা আমার
তার গায়ে ওভারকোট দূর আকাশে হংসমিথুন
আর আবছা রুপোলি মটরশুঁটির মতো
একটি কি দুটি তারা প্রধান মাঝি হাল ধরেছে উজানে
বার্থডে কেকে ছুরি চালাচ্ছে আমার সাত বছরের কন্যা।
আমার নেই-যে পুত্র তার কপালে ব্যান্ডেজ ঠোঁটে হাসি
বর্ষার পানিতে সয়লাব উঠোনে সাঁতার কাটছে
যুগল হাঁস একটি গ্যাছে নেউলের পেটে
কয়েকটা সাদা লাল কালো মুরগি চরে উঠোনে
এখন ওরা গরহাজির
আমার একজন সুদর্শন তরুণ স্বজন চেয়ে থাকে নিষ্পলক যে
একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে আর ফেরেনি

আমি পারিবারিক অ্যালবামটির সঙ্গে ক্রমাগত
এমন আচরণ করি যেন সে যক্ষের ধন

কখনো তার ভেতরে বিধবার ধবধবে শাড়ির
মতো দুপুর কখনো অগাধ জ্যোৎস্না বিস্তার
কখনো তার ভেতর থেকে ভেসে আসে আকর্ণ হাসি
কখনো ডুকরে ওঠা কান্না
সেখানে কখনো ঈদের পোশাকের ঝলমলে উচ্ছ্বাস
কখনোবা কবরের বাতির ব্যথিত কম্পন

আমার একজন প্রতিবেশী

আমার প্রতিবেশী ভদ্রলোকটিকে বাতিকগ্রস্ত বলা
ঠিক হবে না, যদিও তিনি
কিছুটা উটকো ধরনের মানুষ আর হর-হামেশা
বলেন মাথা-খারাপ-করা কিছু কথা।
বরাবরই দেখে আসছি,
আমার প্রতিবেশীর চুল প্রায় সকল সময়
উষ্কখুষ্ক, অনবরত ঝাড়েন সিগারেটের ছাই,
আর কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে
মটকাতে থাকেন আঙুল। হঠাৎ কোনো কারণে আড্ডায়
তার মেজাজ সাপের ফণার মতো লাফিয়ে উঠলে,
আমি কোনো দ্বিরুক্তি না করে
সারা ময়দান তার হাতেই ছেড়ে দিই। ভদ্রলোক
ভীষণ আসক্ত নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতি। তাই বলতে যতটা
ভালোবাসেন, শুনতে ততটা নয়।

অনেকে তাঁকে পছন্দ করে না, কেউ কেউ করে বেজার
সন্দেহ। কারো কাছে তিনি সিআইএ-র
এজেন্ট, কেউ তাকে কেজিবি-র দালাল বলে
শনাক্ত করতে আগ্রহী। এই সন্দেহ সন্দেহ খেলা চলে
তাঁর আড়ালে। তিনি টের পান কিনা জানি না! তবে প্রায়শই
'কী জানেন, সোনার রেকাবিতে আরশোলা
নির্দ্বিধায় হেগে দিতে পারে' বলে আমার প্রতিবেশী
সিগারেটে তন্ময় সুখটান দেন। এই বাক্যটি তিনি,
বলা যায়, ধুঁয়ো হিসেবে ব্যবহার করতে পছন্দ করেন।

কোনো কোনো দিন আড্ডার মাঝখানে
তিনি বেমক্কা বলে বসেন, 'এ পাড়ায় একটি বাড়িরও

দেয়াল নেই, প্রকৃত কফিন আছে
প্রতিটি উঠোনে।' কারুর ভুরু কুঁচকে ওঠে কেউ হাসে
ফিচেল হাসি কেউবা
চেয়ারের হাতলে তবলা বাজাতে শুরু করে, দৃষ্টি
চালান করে জানলার বাইরে।

এ ধরনের কথা যে তিনি আসর মাৎ করার জন্যে বলেন,
তা নয়। এই তো সেদিন অফিসের দিকে
রওয়ানা হয়েছি, আমাদের ব্যাকাট্যারা গলির মোড়ে
দেখা হয়ে গেল আমার সেই প্রতিবেশীর সঙ্গে,
কাছে ধারে কেউ নেই; কুশল জিগ্যেস না করেই
তিনি বললেন, 'বুঝলেন রাহমান সাহেব, এ শহরের
প্রতিটি যুবতীর শরীরে মাছের আঁশের মতো
কিছু একটা গজাতে শুরু করেছে, আমি
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।' তিনি যে মাছের বদলে হিসহিসে
সাপ শব্দটি ব্যবহার করেননি,
সে জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম।
পরদিন তিনি বললেন,
'আমার টেবিলটা কাল সারারাত কেঁদেছে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আর মাঝে মাঝে গান গেয়েছে
মাথা-বিগড়ে-যাওয়া ওফেলিয়ার মতো।'

বলা নেই, কওয়া নেই, এক বিকেলে
সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে
'চঞ্চল টাকা আঁচলে বেঁধো না' ব্যাংকের এই বিজ্ঞাপনটি
তিনি এভাবে আওড়ালেন, যেন
কোনো ধ্রুববাক্য উচ্চারণ করছেন।

তাঁর আরও কিছু বেধড়ক উক্তি–
সেদিন দেখলাম চৌরাস্তায় একজন স্যুটপরা মাকুন্দ
গবাগব গিলছে সংস্কৃতির শালপাতা।
আমাদের এই শহর যদি পুরোদস্তুর একটা বার্থডে কেক
হয়ে যায়, তাহলে
নিশ্চয় ডগমগে চৈত পরব শুরু হয়ে যাবে চারদিকে।
আচ্ছা বলুন তো আপনারা কি কেউ
শহীদ মিনারের ওপর এক ঝাঁক ধাতব শকুনকে ওড়াউড়ি

করতে দেখেন না সব সময়?
আমার উঠোনে ক্লিওপেট্রার কালের জাহাজ
নোঙর ফ্যালে; কুরোসাওয়ার সাত সামুরাই
চকচকে তলোয়ারের চমৎকার খেলা দেখায় মধ্যরাতে;
প্রমেথিউসের টাইটনিক পায়ে গজিয়ে উঠেছে মস্ত গোদ।

আমরা ক'জন মেতেছিলাম ইতিহাসের
গতিপ্রকৃতি নিয়ে। আলোচনা যখন উত্তেজনার
চূড়ায় থরথর, তখন আমার প্রতিবেশী প্রায় কবিতা
আবৃত্তির ধরনে বললেন,
'ইতিহাস আঠার মতো আটকে আছে ঝকঝকে
কেতাদুরস্ত কূটনীতিকদের চটপটে পাছায় আর আ'মরি
নিতম্ব উঁচিয়ে-রাখা বিশ্বসুন্দরীদের
প্রতিযোগিতা-লোলুপ চুচিতে।'

সত্যি বলতে কি, মানব স্বভাবের কোন এলাকায়
আমার প্রতিবেশীর অবস্থান,
এ ব্যাপারে আজ অব্দি আমি মনস্থির করতে পারিনি।

বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো

জো, তুমি আমাকে চিনবে না। আমি তোমারই মতো
একজন কালো মানুষ গলার সবচেয়ে
উঁচু পর্দায় গাইছি সেতুবন্ধের গান, যে-গানে
তোমার দিলখোলা সুরও লাগছে।

জো, যখন ওরা তোমার চামড়ায় জ্বালা-ধরানো
সপাং সপাং চাবুক মারে আর
হো হো করে হেসে ওঠে,
তখন কালসিটে পড়ে সভ্যতার পিঠে।
যখন ওরা বুটজুতোমোড়া পায়ে লাথি মারে তোমাকে
তখন ধুলায় মুখ থুবড়ে পড়ে মানবতা।
জো, যখন ওরা তোমাকে
হাত-পা বেঁধে নির্জন রাস্তায় গার্বেজ ক্যানের পাশে
ফেলে রাখে, তখন ক্ষ্যাপাটে অন্ধকারে
ভবিষ্যৎ কাতরাতে থাকে
গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার জন্যে।

যদিও আমি তোমাকে কখনো দেখিনি জো,
তবু বাইবেলের কালো অক্ষরের মতো তোমার দু'ফোঁটা চোখ
তোমার বেদনার্ত মুখ বারংবার
ভেসে ওঠে আমার হৃদয়ে, তোমার বেদনা
এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকায় ব্যাপ্ত, জো।

আমি একজন ফাঁসির আসামিকে জানতাম,
যিনি মধ্যরাতে আবৃত্তি করতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা।
আমি এক সুদর্শন যুবাকে জানতাম,
যে দয়িতার মান রাখার জন্যে জান কবুল করেছিল
আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে,

আমি একজন যাবজ্জীবন কারাবন্দি তেজী
নেতাকে জানতাম, দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে
যিনি কোনো কোনো রাতে তার শিশুকন্যাকে একটু
স্পর্শ করার জন্যে, ওর মাথার ঘ্রাণ নেয়ার জন্যে উদ্বেল আর
ব্যাকুল হয়ে আঁকড়ে ধরতেন
কারাগারের শিক।

আমি এমন এক তরুণের কথা জানতাম,
যে তার কবিতায় আলালের ঘরের দুলাল, মেনিমুখো শব্দাবলি ঝেড়ে ফেলে
অপেক্ষা করত সেদিনের জন্যে,
যেদিন তার কবিতা হবে মৌলানা ভাসানী
এবং শেখ মুজিবের সূর্যমুখী ভাষণের মতো।

যখন তাদের কথা মনে পড়ে,
তখন তোমার কথা নতুন করে ভাবি, জো।
জো, যখন তোমার পাঁচ বছরের ছেলের
বুক থেকে রাস্তায় ওরা ঝরায় টকটকে লাল রক্ত,
যেমন পিরিচে ঢেলে দ্যায় কফি,
চো, যখন তোমার পোয়াতি বউ হায়নাদের
দৃষ্টি থেকে পালানোর জন্যে দৌড়ুতে দৌড়ুতে
মাঝপথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে,
জো, যখন তোমার সহদোরকে ওরা
লটকিয়ে দ্যায় ফাঁসিতে,
তখন কাঁচা দুধের ফেনার মতো ভোরের সাদা আলোয়
বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো আর্তনাদ করতে করতে
হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

একশ' চার ডিগ্রি জ্বর

কে যেন আমাকে মাছের মতো তেল ছাড়াই
ভাজছে ভাজছে ভাজছে হঠাৎ
কামারের হাপরের নিচে জ্বলজ্বলে পেটা লোহার কথা
মনে পড়ল আমার
এখন আমি বলা যেতে পারে টগবগে
আগ্নেয়গিরির তাপে ভয়াবহভাবে
ঝলসানো আদিম গুহামানবের মতো
আমার ভেতর সেদ্ধ হচ্ছে কিছু বনমুরগি আর রাজহাঁস
আমি আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে
প্রবেশ করেছি এক তন্দুরে
অঙ্গারগুলো তুতেনখামেনের মণিরত্ন হয়ে
নাচছে আমার চতুর্দিকে

বলা নেই কওয়া নেই কোত্থেকে এক সুন্দরী
দাঁড়াল আমার সামনে
তার চুল লাল
চোখ লাল
স্তন লাল
লাল তার উরু আর নিতম্ব
অগ্নিশিখা তার বগলের চুল
সেই লালচুল সুন্দরী আমার দু'চোখে হৃদ্যতাবশত
সামনে ছুড়তে থাকে এন্তার জ্বলন্ত রক্তজবা
দেখতে পেলাম সুন্দরীর শুধু একটিমাত্র স্তন এবং
তার সঙ্গী স্তনটি যে জায়গায় থাকার কথা সেখানে
জমাট হয়ে আছে বৃদ্ধার ফোকলা হাসি

অসহ্য উত্তাপের মধ্য থেকে
আমি বিকশিত হচ্ছি আগুন রঙের ফুলের মতো
আমার মাথাটা এখন রবারের বেলুন
চিল বালিহাঁস আর ঈগলকে নিচে রেখে দিব্যি
উঠে যাচ্ছে ক্রমাগত উপরে উঠে যাচ্ছে
বেলুনের সুতাগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার যোগাড়
এক ঝটকায় ঝরে গেছে আমার বয়স
যেমন খসে পড়ে পুরোনো দালানের চুনবালি

এখন আমি শিশু
বালিশের ফোকরে আটকানো আমার মাথা
ক'দিন ক'রাত্রি ধরে ক্রমাগত কখনো
এপাশ ওপাশ করছি ঝড়ে-পড়া নৌকোর মতো
কখনো কাতরাচ্ছি একজন রাগী ফেরেশতা
আমাকে ঘন ঘন চাবকাচ্ছে আগুনের চাবুক দিয়ে

ব্যাপক দাবানলে আমার সঙ্গে পুড়ছে আমার
অন্তর্গত এক পড়শী
আমার সঙ্গে পুড়ছে প্যারাডিসো হ্যামলেট গীতাঞ্জলি
ডাস ক্যাপিটাল বনলতা সেন পদ্মানদীর মাঝি
ইয়েটস-এর পত্রাবলি গোলাপসুন্দরী আর
আবদুল করিম খাঁর যমুনাকে তীর

আমার মাথায় ভেতরে আলতা বাদুড় চালতা বাদুড়
অসংখ্য বাদুড়ের ডানা ঝাপটানি ঢোসকা মাতালের
পদধ্বনি মস্তানের বিলা আওয়াজ
আমি শুনতে পাচ্ছি সুন্দরবনের চিতাবাঘের অট্টহাসি
প্রসব যন্ত্রণাবিদ্ধ এক নারীর গোলাপি হাসি
আমি শুনতে পাচ্ছি
সেপিয়া রঙের বিবর্ণ ফটোগ্রাফগুলো থেকে বেরিয়ে এসে
আমার চেনা আত্মীয়স্বজন তারস্বরে

আমাকে ডাকতে শুরু করেছে আমি শুনতে পাচ্ছি
আমার আগেকার দিনগুলোর এক দয়িতা আমাকে চটকাচ্ছে
আর আমার গৃহিণীর নির্ঘুম অসহায় হাতে
জ্বরের চার্ট বাতিল শাসনতন্ত্রের মতো কম্পমান

লেয়ার্টেস

এই ছিল তবে আমার ভাগ্যে মধ্যদুপুরে
বিনা মেঘে এই বিপুল বজ্রপাত?
পিতা হত আর পিতৃশোকেই ভগ্নী আমার
উন্মাদিনী সে হয়েছে অকস্মাৎ।

কত ঝঞ্ঝায় কত যে প্লাবনে কেটেছে আমার
মাতৃস্নেহের ছায়াহীন শৈশব।

বিকৃত শত মুখোশের ঢঙে নাচে অবিরত
অধিবাস্তব নাট্যের কুশীলব।

নাছোড় অশেষ দাবানল জ্বলে শিরায় শিরায়,
হৃদয়ের শত ফুলকি দু'চোখে ওড়ে।
তীক্ষ্ণ অসির সূচিমুখ আমি করছি পরখ,
শত্রু কোথায় কোন প্রান্তরে ঘোরে?

আমার নিরীহ বয়েসী পিতার লাশ ওরা খুব
তাড়াহুড়ো করে মাটিতে রেখেছে ঢেকে।
রক্তের ঋণ শোধার জন্যে মনে হয় তিনি
আর্তকণ্ঠে আমাকেই যান ডেকে।

আজীবন শুধু রাজসেবা করে জনক আমার
বার্ধক্যেই হলেন অসির বলি।
জঘন্য এই হত্যা আমাকে দেয় ধিক্কার,
আমি নিজস্ব ধোঁয়াটে নরকে জ্বলি।

ভগ্নী আমার কালের বৃন্তে স্বর্গ কুসুম,
মেলেছিল তার প্রতিটি পাপড়ি সুখে।
রাজার কুমার কী জানি কেমন বাজাল বেহাগ,
দুঃখ-ফলানো ঢেউ ওঠে তার বুকে।

চৈত্রী রাতের স্বপ্নে মগ্ন যুবরাজ তাকে
শোনালো ব্যাকুল মদির গুঞ্জরণ।
সোনালি নদীর মতো সেই স্বর শুনে হয়ে গেল
একটি মেলডি তরুণীর তনুমন।

দর্শনঘেঁষা বাক্যবিলাসী বুদ্ধিজীবী সে,
দিশাহারা যেন মননের সংকটে।
ভগ্নী শোনেনি বারণ আমার, রাখেনি মিনতি–
পড়ল জড়িয়ে ঊর্ণার ক্রূর জটে।

কোন ইঙ্গিতে অপাপবিদ্ধ তরুণীর প্রতি
কুমার করেছে নিষ্ঠুর আচরণ?
নিঃশ্বাসে তার পুষ্পপোড়ানো গ্রীষ্মের দাহ,
ভাষায় প্রাকৃত বৃশ্চিক-দংশন।

সারল্য তার পায়নিকো ক্ষমা, মগজের কোষে

অপ্রকৃতি গায় বড় এলোমেলো গান।
তন্বী শরীরে জলচুম্বন, নিখাদ পূরবী,
ভুঁইচাঁপা আর জলবিছুটির ঘ্রাণ।

রাজার বাগানে সাপ তোলে তার চক্কর-আঁকা
ফুটন্ত মাথা; ঘাতক, গুপ্তচর
আশপাশে ঘোরে, করে কানাঘুষো। মারী ও মড়কে
কংকাল হয় কত লোক লস্কর।

দশকে দশকে বাটপাড় আর ঘোড়েল দালাল,
লুটেরার পাল আসে পালটিয়ে রূপ।
ইতরজনের বহ্বারম্ভে সাধু সজ্জন
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আজ বড় নিশ্চুপ।

কানকথা শুনে মিত্রকে আমি শত্রু ভেবেছি,
সত্তা আমার হীন দ্বৈরথে মাতে।
যে-জাল নিজেই বিছিয়েছি ষড়যন্ত্রে ব্যাপক,
অসহায় আমি আটকা পড়েছি তাতে।

জোর যার তার মুলুক সত্য, দুর্ভোগ বাড়ে
গণমানুষের, শ্বরাকবলিত দেশ।
ঘুচাব দীনতা, এমন সাধ্য নেই একতিল,
আমি নগণ্য ব্যর্থ লেয়ার্টেস।

রাজার কুমার হয়তো পারত দুর্গ প্রাকারে
জ্বালাতে সূর্য অমাবস্যার রাতে,
কিন্তু এখানে কেবলি শবের ছড়াছড়ি আর
বীর যুবরাজ নিহত আমারই হাতে।

প্রলয়ান্তে

কংক্রীট বনে ঘেমো জনস্রোতে বলো
তোমাকে কোথায় কোন ঠিকানায় খুঁজি?
কবন্ধ এই শহরে সন্ধ্যা হলো,
এদিকে ফুরায় বয়সের ক্ষীণ পুঁজি।
সেই কবে থেকে চলেছে অন্বেষণ।
ক্লান্তি আমার শরীরে সখ্য গড়ে,

তোমার গহন ঊর্মিল যৌবন
আনে আশ্বিন এখনও বন্ধ ঘরে।

মনে পড়ে যায় শরীরে তোমার নাচে
খর বর্ষার তন্বী পাহাড়ি নদী।
তোমারই চুলের নিভৃত ছায়ার কাছে
চাই আমি চাই আশ্রায় নিরবধি।

দেয়ালের লেখা আমিও করেছি পাঠ–
জুটবে ভাগ্যে উপেক্ষা অবশেষে
সাক্ষী এ নদী, সোনা-ওগরানো মাঠ,
খুঁজেছি স্বর্গ তোমাকেই ভালবেসে।

নশ্বরতার প্রতাপ জেনেও আমি
করি সঞ্চয় স্বপ্নফলানো স্মৃতি,
তোমারই ছায়ার আজও আমি অনুগামী,
যদিও হারানো জানি জাগতিক রীতি।

ভেবেছি ক্রমশ বিস্মরণের লেকে
তুমি ডুবে গেলে হবে না কিছুই ক্ষতি,
কিন্তু তোমার স্মৃতির পীড়ন থেকে
আমৃত্যু নেই আমার অব্যাহতি।

বিরোধী কালের জতুগৃহে করে বাস
সত্তা আমার ভস্মে গিয়েছে ঢেকে;
মেলে না কোথাও এক কণা আশ্বাস,
রজ্জুও নেই সর্পের ব্যতিরেকে।

ধ্বংস বাজায় চৌদিকে তার ঢাক,
কোথায় মিলাল তোমার পায়ের রেখা?
বিপাকে লুপ্ত আমার ব্যাকুল ডাক,
প্রলয়ান্তেও পাবো কি তোমার দেখা?

আমার আঙুল কামড়ে ধরে

ব্যাপারটা কিছুতেই আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না
খুলে বলাই ভাল
ইদানীং আমি আমার একটা আঙুল নিয়ে
খুব মুশকিলে পড়েছি

হতো যদি অনামিকা কড়ে কিংবা বুড়ো আঙুল
তাহলে তেমন ক্ষতি ছিল না
আসলে আমি আমার তর্জনী সম্পর্কে
ভীষণ উদ্বিগ্ন কেননা
একটা সিগারেট ধরাতে কিংবা কলম ধরতে পর্যন্ত
আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে আজকাল

ভাল কথা নিজের বিষয়ে
একটা জরুরি তথ্য জানাতে ভুলে গিয়েছি
আমি এই শহরেরই একজন কবি
বইয়ের দোকানে আমার কিছু কাব্যগ্রন্থ কিনতে পাওয়া যায়
সমালোচকদের জহুরী নজর আছে
আমার ওপর
বলা যেতে পারে কবিতা সম্পর্কে নিজস্ব কিছু
ধারণাও আছে আমার
আমি চাই আমার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে
তরুণ পাখির ডানার ঝলসানি আর স্পন্দন
তন্বী স্তনের নিটোল সুষমা
বুদ্ধিমান যুবকের দিলখোলা হাসি এবং
বয়েসী দুঃখী মুখের কুঞ্চন
এবং
আমার ম্যানিফেস্টোর প্রথম লাইন হলো
কাব্যগ্রন্থ কস্মিনকালেও প্রচার পুস্তিকা হবে না
ধুত্তোরি আসল কথা থেকেই দূরে সরে এসেছি

যা বলছিলাম
ইদানীং আমি আমার একটা আঙুল নিয়ে
খুব মুশকিলে পড়েছি
একদিন আমি খুব রাত করে একা একা
হাঁটছিলাম রাস্তায়
রাস্তা তখন সান্নাটা আর মরা জ্যোৎস্না নিঃশব্দ
সোনাটার মতো ছড়িয়ে ছিল চারদিকে
হঠাৎ বলা-কওয়া নেই কোত্থেকে এক ঝাপ উঁচানো
গাউন পরা কসবীর মতো পরী দাঁড়াল আমার মুখোমুখি
এবং আমি ওকে রাস্তা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে যাঃ শালা
উদ্যত আমার তর্জনীটাকে

সে কামড়ে ধরল
অমন খাপ্‌চু চেহারার আড়ালে এই ধাষ্টামি
আমি ভাবতেই পারিনি
চিৎকার করে উঠলাম আত্মায় জ্বালা ধরানো
যন্ত্রণায়
অথচ আমার গলা থেকে এক ফুটকি আওয়াজও
বেরুল না আর ঐ পরী না ফরী
ওর ডানায় ভর করে ট্রাফিক আইল্যান্ডের ওপর দিয়ে
উড়তে উড়তে জয়নুলের পাইন্যার মা হয়ে গেল

আরেক দিন একটা ডালকুত্তা
আমার এই জখমি আঙুলটাকে কামড়ে ধরল
মানে তর্জনীটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে
ওর দাঁতের বেজায় সুখ করে নিল
অন্য একদিন ধোপদুরস্ত এক চাপটাবাজ
কামড়ে ধরল আমার আঙুল
দুনিয়াসুদ্ধ সবারই এক নাছোড় আক্রোশ
আমার এই আঙুলের ওপর
লোকে খামকা আমাকে ছিটেল বলে না

যখনই কোথাও আমি কোনরকম ধাষ্টামি বহুরূপী গব্বাবাজি
দেখতে পাই তখনই উদ্যত হয় আমার তর্জনী
আর যে পায় সে-ই যখন তখন
আমার আঙুল কামড়ে ধরে

জাভেদ তোমার কথা

জাভেদ, তোমার কথা বেশ কিছুদিন
ধরে আমি ভাবছি প্রত্যহ। কবে কোন সালে কোন সে শ্রীহীন
পাড়ায় জন্মেছ তুমি, কী যে নাম
সে বিদ্যালয়ের, ছিমছাম
সেনার কদমছাঁট চুলের মতন ঘাসময় অনুপম
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যার পড়েছিল তোমার প্রথম
পদচ্ছাপ, কবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
কতিপয় পুস্তকের জ্ঞানগম্যি চেখে
নিয়েছিলে সডিগ্রি বিদায়, তারপর

জুটিয়ে মাঝারি চাক্‌রি বেথা করে বেঁধেছিল ঘর–
যথারীতি পুত্র কন্যা এনে
বছর বছর, চোখ-বাঁধা বলদের মতো নিত্য ঘানি টেনে
অকালে পাকালে চুল,– এই সব কথা ইতস্তত;
বুঝেছ প্রায়শ ভাবি আজকাল। কত
ঝড়-ঝাপটা, কত যে জাহাজডুবি দেখছ জাভেদ
সচক্ষে, অথচ কোনো নিষ্কুল নির্বেদ
কখনো তোমাকে খুব ভুগিয়েছে বলে
জানা নেই; এড়িয়ে গিয়েছ ঠিক নিভাঁজ কৌশলে।

অনেক ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে
তুমি কি মাঝারিদের চেয়ে
কিছু উঁচু হতে চেয়েছিলে বাড়িয়ে নিজস্ব গলা
নিত্য জিরাফের মতো? ঊর্ধ্বারোহণের ছলাকলা
অনেকেরই আয়ত্তে সম্প্রতি। ধিক, ধিক
জাভেদ তোমাকে ধিক, তুমি বাস্তবিক
সর্বদা মাঝারি রয়ে গেলে। সেই আপিসের সিঁড়ি
বেয়ে ওঠা ক্রমাগত সপ্তাহে ছ'দিন, আর ভীষণ বিচ্ছিরি

গলিতে প্রত্যহ ফিরে আসা,
সুপ্রাচীন কংকালের মতো অস্থায়ী, ক্ষয়িষ্ণু বাসা
বিষণ্ণ পরিণামহীন ভাবনা এবং দূর স্মৃতি
অপ্রেমের খাটস্থিত কাঁথা মুড়ি দিয়ে যথারীতি
ঘুমানো, আবার জেগে ওঠা ভোরে, ছড়া
কাটা সন্তানের সঙ্গে আর জবর খবর পড়া
চা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে, আবার আপিস,
ঘড়ির শাসন, কালি ছিটানো খাতায় আর কিছু ফিসফিস,
কিছু হাপিত্যেশ, কিছু চুকলি খাওয়া, ওভার টাইম,
নিত্যদিন নিষ্প্রভ মাইম
দেখিয়ে জাভেদ তুমি নাছোড় লোলুপ ঊর্ণাজালে
বিপন্ন আটকে পড়ে এই মতো জীবন কাটালে।

যুগপৎ গবেষণা আর তদন্তের ঘোরে
বারংবার বিশ্লেষণ করে
দেখেছি আসলে
তোমার বৈশিষ্ট্য নেই কোনো, তুমি সাধারণ মাঝারির দলে

রয়ে গেলে আজীবন। কোনো স্বপ্ন, কোনো অভিলাষ
আনেনি খ্যাতির ছটা তোমার আঁধারে। দীর্ঘশ্বাস
হয়ে আছ শুধু
অত্যন্ত নেপথ্যে আর মরুর মতন অতি ধু-ধু
জীবনে চলেছ বয়ে চায়ের কাপের স্পষ্ট ফাটলের মতো
কিছু দাগ; জাভেদ যমজ ভাই আমার, সতত
তুমি কোন ত্রাসে
পুরাণ পুতুল হলে নড়বড়ে বিপন্ন নিবাসে
জীবনকে ব্যাধি ভেবে নিজেকেই রূঢ় উপহাস
করছ নিয়ত আর দেখছ কেমন
নিস্পৃহ বিবশ ছন্দে লক্ষ লক্ষ জাভেদের পঙক্তিতে আরও একজন
জাভেদ চলেছে মাথা নিচু করে, যেন প্রেতচ্ছায়া,
গন্তব্যের প্রতি উদাসীন, সম্মুখে বিস্তীর্ণ ইন্দ্রধনু মায়া।

আমার অসুখ

হ্যালো হ্যালো জাভেদ, তুমি
শুনতে পাচ্ছ?
এখানে কিছুই শোনা যাচ্ছে না।
অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি, শুধু হ্যালো হ্যালো
বলাই সার, ওপার থেকে
কোনো সাড়াশব্দ নেই টেলিফোনের ভেতর
একটা ভুতুড়ে আওয়াজ ছাড়া
অন্য কোনো ধ্বনি আমার কানে
বাজছে না আজ।
অথচ একজন মানুষের কণ্ঠস্বর
শোনার জন্যে আমি কী রকম তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছি
তুমি তা বুঝতে পারবে না জাভেদ।
ক'দিন ধরে আমি এই আমার একলা ঘরে
বিছানাবন্দি হয়ে আছি। আমার টিপয়ে এখন
সূর্যাস্তের রঙের মতো
এ্যান্টিবায়টিক ক্যাপসুল, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স,
থার্মোমিটার আর একটা পিরিচে
কয়েকটা বিস্কুট। বুঝতেই পারছ জাভেদ
এই ঘর থেকে বের হবার সামর্থ্য আমার নেই।

আজ ক'দিন ধরে আমি কোথাও
যেতে পারছি না। মাঝে মাঝে দেয়ালের টিকটিকির শব্দ
পাখিটাখির গান কিংবা কোনো উঠাইগিরা
কুকুরের ডাক শুনতে পাই। কিন্তু জাভেদ
এখন আমি সবচেয়ে বেশি শুনতে চাই
একজন মানুষের প্রকৃত কণ্ঠস্বর।

আমি সেই থেকে একটানা হ্যালো হ্যালো করে
ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কিন্তু তুমি
এখনও নিরুত্তর। কতদিন আমি তোমার ভরাট গলার
ওঠানামা শুনি না।
হাসপাতালের বেডে নয়, আমি আমার
নিজের ঘরেরই বিছানায় নিঃসঙ্গ শুয়ে আছি।
আমার শিয়রের অনিদ্রার হ্রদে ভেসে বেড়ানো
কোনো নার্স নেই, গলায় মালার মতো স্টেথিসকোপ দুলিয়ে
ডাক্তার আমার পালসবিট শুনছে না।
শরীরে নিদ্রার রজনীগন্ধা ফোটে না, জাভেদ। কারো
কণ্ঠস্বর, হোক সেই স্বর চেনা কি অচেনা, মধুর
অথবা কর্কশ, শুনতে পেলেই
আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠব।

জাভেদ, অসুখ তো একলা পথে ভ্রমণেরই মতো। এখন
আমি ভ্রমণ করছি এক বিশাল
মরুভূমিতে, যেখানে মরীচিকা আছে
মরূদ্যান নেই, সাপে ওগরানো বিষ আছে, নেই
এক ফোঁটা দ্রাক্ষারস। আমি এই মরুভূমির
বালিয়াড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ছি
বারংবার, রাশি রাশি বালুকণায় ভরে গিয়েছে
আমার মুখ, আমার কণ্ঠনালি। এখন আমি
প্রাণপণে চাই প্রত্যাবর্তন।
আমি চেয়ে আছি অস্পষ্ট দিগন্তের দিকে,
যেমন তীর্থযাত্রী আপন নিবাসে
ফিরে আসার তাগিদে তাকায় তার ফেরার পথে।
জাভেদ, বারবার দিনদুপুরে
রাতবিরেতে বেজে ওঠে আমার টেলিফোন। আর

রিসিভার তুললেই অনেকক্ষণ ধরে

একটা যান্ত্রিক ভুতুড়ে আওয়াজ হতে থাক,
কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই না।

বনে জঙ্গলে

এই তো আমার নাতি হাঁটি হাঁটি পা পা করে পার
করে দিল তিনটি বছর। এখনও অক্ষরজ্ঞান তার
হয়নি সঠিক। অবশ্য সে মাঝে-মাঝে আওড়ায়
অ-আ ক-খ, এ-বি সি-ডি, মাতে ছেলেভোলানো ছড়ায়
মায়ের, খালার সঙ্গে। নানান রঙের বই নিয়ে
কখনো সখনো বসে, পড়ে আস্তে ইনিয়ে-বিনিয়ে,
যেন সে পড়ুয়া মস্ত। কখনো আমার খুব পুরু
লেন্সের চশা পরে আর তাকায় টোলের গুরু
মশায়ের ঢঙে। তবে তার বড় বেশি পক্ষপাত
রঙিন ছবির প্রতি। গালিভার, সিন্দাবাদ, সাত
সমুদ্দুর তেরো নদী, সিংহ এবং রাক্ষুসে বাঘ,
গণ্ডার, ভালুক, বুনো হাতি, উটের পায়ের দাগ
বালিতে দেখতে ভালোবাসে। যখন টিভিতে বন
জঙ্গলের ছবি দ্যাখে, তখন সে খুশিতে কেমন
ডগমগে হয়ে ওঠে। হঠাৎ বায়না ধরে জঙ্গলে যাবার
ঝুলিয়ে বন্দুক কাঁধে, যেন আজই করবে সাবাড়
হিংস্র পশুদের, গোরে যারা জঙ্গলের আনাচে-কানাচে।
কী করে বোঝাই তাকে বস্তুত সে জঙ্গলেই আছে?

আজকাল খুব বেলা ক'রে

আজকাল খুব বেলা করে ঘুম ভাঙে আমার
অথচ এমন একদিন ছিল
যখন আমি অন্ধকার থাকতেই জেগে উঠতাম
শুনতে পেতাম অনেক দূর থেকে কোনো পাখির গান
অনেকক্ষণ ধরে বালিশে মুখ গুঁজে
পাখির চাউনি স্বপ্নে দেখা ঘোড়ার চমকিলা পিঠ আর
একটি মেয়ের সোমত্থ বুকের কথা ভাবতাম
দমকা হাওয়ায় উল্টে যাওয়া নীল পর্দার আড়ালে
জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে
একটি কি দুটি তারা চোখে পড়ত

আজকাল বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙ্গে আমার
ঘুম ভাঙ্গার পরও
বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না
দাড়ি কামাতে ভাল লাগে না
এক সময় খুব সিগারেট খেতাম প্যাকেটের পর প্যাকেট
এখন সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি
কিসসু আমার ভাল লাগে না
সকালবেলা মানে ন'টা-দশটার পর থেকেই
আমার মন খারাপ থাকে
আস্ত সকালবেলাটাকেই চুসকি মনে হয় বিছানার
চটকানো চাদরটার দিকে তাকাই
গিজগিজে দাড়িতে হাত বুলোই বাকরখানির ঘ্রাণ
ভেসে আসে কোত্থেকে রেডিওতে গান বাজে হাসন রাজার
একটা মেষপালক আর একটা গয়লানী জবর
জোড় খায় ঝোপেঝাড়ে কবে যেন কোন তৈলচিত্রে
দেখেছিলাম মনে পড়ে
চাটা বিস্বাদ লাগছে দাঁতে দিয়ে রুটি ছিঁড়ি
খেতে হবে বলেই খাওয়া অনেক আগে
একজন বুড়োসুড়ো খুব ফর্সা মানুষ যার নাক ছিল
ঈগলের চঞ্চুর মতো
চায়ের বাটির দেয়ালে লেগে থাকা চায়ের
ভেজা পাতার দিকে চোখ রেখে আমাকে
বলেছিলেন তোমার জীবন যাবে বুঝেছ হে ছোকরা
কালি ছিটোতে ছিটোতে
তা কালি নেহাৎ কম ছিটোইনি রবীন্দ্রনাথের মুখ
কাজী নজরুল ইসলামের মুখ
জীবনানন্দের মুখ বুদ্ধদেব বসুর মুখ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ
কমলকুমার মজুমদারের মুখ একরাশ ফুল হয়ে ভাসে
আমার চেতনা প্রবাহে

ইদানীং সকালবেলা থেকেই মন খারাপ থাকে আমার
দাড়ি কামাতে ভাল লাগে না
মাথায় চিরুনি চালাতে ভাল লাগে না
সেলুন যেতে ভাল লাগে না
অফিসে যেতে ভাল লাগে না

পরস্ত্রীর সঙ্গে দিল্লাগি ভাল লাগে না
টাইপরাইটারের আওয়াজ শুনতে ভাল লাগে না
পিকাসোর জীবনী পড়তে ভাল লাগে না
বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে ভাল লাগে না
স্ত্রীকে চুমু খেতে ভাল লাগে না
সাদা কাগজ দেখতে ভাল লাগে না
খবরের কাগজের হেডলাইনে
চোখ বুলোতে ভাল লাগে না
মায় কালি ছিটোতে ভাল লাগে না

এখন আমি সিগারেট খাই না
আবার ধরব কিনা ভাবছি
আমার রক্তের ভেতরে গোধূলি একটা স্তোত্র তৈরি করছে
আমার মগজের ভেতরে
এক ঝাঁক পাখি খড়কুটো জড়ো করছে দিনরাত
আমার বুকের ভেতরে ক্রমাগত
একটা রুপোলি গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে
এবং জীবন
কুষ্ঠরোগীর ফোলা ঠোঁট নিয়ে চুমো খাচ্ছে আমাকে

মাঝে মাঝে মনে হয় নিজেকে
ফাঁসিতে লটকে দিই কিংবা নিজের এই মাথাটা
পেতে দিই চলন্ত ট্রেনের চাকার নিচে
কিংবা সূর্যাস্তের রঙের মতো অনেকগুলো ট্যাবলেট খেয়ে
অসম্ভব লম্বা একটা ঘুম দিই
কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে যায় একজন বলেছিলেন
তোমার জীবন যাবে কালি ছিটোতে ছিটোতে
দেখি কালি আমাকে শেষ পর্যন্ত
কতটা ডোবাতে পারে কতটা
অথবা

রুটিন

তাঁকে চেনে না এমন কেউ নেই এ শহরে
তিনি থাকেন
সবচেয়ে অভিজাত এলাকায় হাঁটেন মোজে ইক করা মেঝেতে

বসেন ময়ূর সিংহাসনসুলভ গদিমোড়া চোয়ালে
খ্যাতি তাঁর পায়ের কাছে কুকুরের মতো
কুঁই কুঁই শব্দে লেজ নাচায়
হলফ করে বলতে পারি আমাদের আগামী
বংশধররা বাধ্যতামূলকভাবে পড়বে তাঁর সচিত্র জীবনী
স্কুল কলেজে সমাজ রাষ্ট্র জগৎসংসার বিষয়ক তাঁর হ্যান্ডবুক
সুকান্ত লাইনো টাইপে
প্রকাশিত হবে বছরের পর বছর
আর এও তো অবধারিত যে তাঁর জন্মাবার্ষিকী এবং
মৃত্যুবার্ষিকীতে আপামর জনসাধারণ
ভোগ করবেন সরকারি ছুটি

আমাদের এই পঙ্গু দেশ যাতে তিন লাফে এলাহি
পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারে
সেজন্যে রাত জেগে তিনি লেখেন বন্যায় ভেসে যাওয়া
ছাগলের পেটের মতো ফোসকা নিবন্ধ
ফজরে দশ মিনিট নামাজ পড়ার পর তিনি
পনেরো মিনিট তেলাওয়াত করেন কোরানপাক
খুরপি আর ঝারি হাতে
আধঘণ্টা বাগান করেন
দুর্লভ জাতের গোলাপ ফোটানোই তার লক্ষ্য
এক ঘণ্টা কাটে তাঁর
ব্রেকফাস্ট করে খবরের কাগজ পড়ে
আর ডেটারজেন্ট সুবাসিত সাফসুতরো বাথরুমে

তিনি দশটা পাঁচটা অফিস করেন নিয়মিত
ক্লাবের টেনিসকোর্টে কাটান ঘণ্টা দেড়েক
ছেলেমেদের আদর করেন পনেরো মিনিট
ঘড়ি ধরে ঘরের বউকে সোহাগ করেন ত্রিশ মিনিট
পরের বউকে নব্বই মিনিট
মাশাল্লা মজবুত তাঁর শরীরের গাঁথুনি
ইস্পাতি গড়ন অথচ
মাখনের মতো নরম তাঁর মন
প্রত্যহ তিনি গরিবগুর্বোদের জন্যে দুঃখ করেন
পাক্কা তিন মিনিট

তোমার সকল খেলা

না, এখন আর চুপচাপ ব'সে থাকা
যায় না, একটা কিছু করতেই হয়। ঐ তো সূর্যটা গা'ঢাকা
দেব দেব করছে কখন থেকে, সন্ধ্যা হয়ে এলো
বলে চতুর্দিকে এলোমেলো
কত কিছু ঘটছে নিয়ত। আর বেশি দেরি হলে·পাততাড়ি
নিশ্চিত গোটাতে হবে। তাই বেলা থাকতেই যতক্ষণ পারি
রাখব দর্শক ধরে। খালি
আসরে জমে না খেলা, মাঝে মাঝে যদি করতালি
ঝংকৃত না করে মঞ্চ, তবে
নিজেকে উজাড় করে এই খেলা দেখিয়ে কী হবে?
তোমার বকল খেলা, বলে লোকে, হয়েছে পুরোনো। বলো আর
কতদিন বারংবার
একই ভেলকি লাগাবে উৎসুক চোখে? মানে,
এখন সবাই জানে
তোমার আস্তিন থেকে ক'টা কবুতর অকস্মাৎ
আসবে বেরিয়ে আর কালো টপ হ্যাটে তুমি হাত
রাখলেই মঞ্চে হবে উদ্ভাসিত সহজে খরগোশ,
এবং কবুল করি এ আমারই দোষ।
একই খেলা দেখতে দেখতে সত্যি কেউ
মনের ভেতরে আর সম্প্রতি পায় না খুঁজে আনন্দের ঢেউ।
খেলায় যখনই
ম্লান মনোটনি
ব্যেপে আসে, তখনই দর্শক সিট ছেড়ে
দাঁড়ায়, হারায় ধৈর্য, সিটি দ্যায়, কখনো ভীষণ যায় তেড়ে
বেকুব স্টেজের দিকে, কখনোবা পচা ডিম,
টোমাটোর গোলা ছোটে। ঐন্দ্রজালিকের হাত-পা হয়ে যায় হিম।

যখন পুরোনো খেলা কোনো অর্থ করে না বহন
কারো কাছে, হে বন্ধু, তখন
কৌশল পাল্টিয়ে ফ্যালো, নিমেষে খাটাও
তাঁবু শূন্যে এবং পাঠাও
পা দুটো সুনীল আসমানে। নয় তো তুড়ি
মেরে দিব্যি নিজেই নিজের বুকে ছুরি
আমূল বিঁধিয়ে আনো রক্ত রঙের বদলে।

তাহলে বলবে লোকে, দ্যাখো কী কৌশলে
ঐ চটপটে
লোকটা লাগায় ধন্দ প্রত্যেকের চোখে, মজাদার খেলা বটে।

ফাটলসর্বস্ব এক দালান

আমার চাদ্দিকে হায়েনার
হাসির মতন
অজস্র ফাটল আজ আমাকে ভীষণ
শাসন করছে, মনে হয়। মনে হয় কথাটা খামোকা বেশি
বলা হলো; কবিতায় এ রকম বাড়তি কথার
ঠাঁই নেয়, থাকা অনুচিত। বরং বললেই হতো
প্রকৃতই আমি ভয়ানক ফাটলসর্বস্ব এক
দালানের পুরোনো বাসিন্দা আশৈশব।

আমার নিকট থেকে একে একে অনেকেই ক্রমাগত দূরে
সরে যাচ্ছ সম্প্রতি, যেমন
ঝড়-বাদলের গন্ধ পেয়ে হুঁশিয়ার
পিঁপড়েরা গা ঢাকা দেয় সাততাড়াতাড়ি।
বলা নেই, কওয়া নেই, এই যে হঠাৎ
সটকে পড়ল যারা, ধ্যেৎ,
সুহৃদ অথবা
আত্মীয়স্বজনদের বিষয়ে সটকে পড়া এই ক্রিয়াপদ
ব্যবহার করা আদপেই সমীচীন নয়। তাঁরা
বেহদ্দ গর্হিত কাজ করেছে, একথা
কস্মিনকালেও আমি বলব না। কেউ
ফাটলসর্বস্ব দালানের পতনের রূঢ় শব্দ
শোনার আশায়
শেষ অব্দি অপেক্ষা করে না।

অথচ সেদিনও
একসঙ্গে গুলজার করেছি নরক,
পুরোনো সড়ক বেয়ে হেঁটে
গিয়েছি সকালে

অথবা বিকেলবেলা। সন্ধ্যায় খেলেছি দাবা, একই
টেবিলে খেয়েছি আর কখনো সখনো
দিয়েছি চুমুক গ্লাসে মস্তির ঝালরে ঝলসিত,
প্রত্যহ নিবিড় হ্যান্ডশেক আর দু'বার দু'ঈদে
অন্তত করেছি কোলাকুলি খুব গোলাপি আহ্লাদে।

অজস্র ফাটলময় দেয়ালে খিলানে চেয়ে থাকি
নিষ্পলক যখন তখন,
যেন করি পাঠ অতিশয় মনোযোগে
আমার নিজস্ব ভাগ্যলিপি। মাঝেসাঝে
মধ্যরাতে ঘুরি দালানের
আনাচে-কানাচে, তারপর ভয় নিয়ে শুতে যাই,
ভয় নিয়ে জেগে উঠি প্রত্যহ আবার।
লোকটা উঠকো বড় আজব ছিটেল,
বলে কেউ; কেউবা বানায়
গল্প কিছু লতাপাতাসমেত বস্তুত–
এই দালানের নিচে নাকি
আছে সুপ্রাচীন গুপ্তধন, আমি যক্ষের মতন সর্বক্ষণ
রেখেছি নজর তাতে। নইলে এইমতো
বিপদ মাথায় নিয়ে কেউ কি এখানে করে বাস?

সুদূর নীলিমা থেকে ঢ্যাঙা পোস্টম্যান অকস্মাৎ
নেমে আসে এবং আমার
হাতে গুঁজে দেয়
সুনীল নোটিশ এক, ভাষা যার অবোধ্য নিছক আর সেই
পোস্টম্যানটিকে কিছু জিজ্ঞেস করার
আগেই সে তার ব্যাগ দোলাতে দোলাতে মেঘদলে
ভাসমান, শাগালের ছবিতে যেমন।

ব্যাপারটা তবে দেখাবার মতো। তাই,
নিজের সঙ্গেই আমি বোঝাপড়া করি বহুদিন
এবং নিজের অজান্তেই বারংবার
চমকে তাকাই, কাছেধারে
সামান্য শব্দ হলেই, ভাবি এই বুঝি
হুড়মুড় করে সব দেয়াল খিলান ঘুণেধরা কড়িকাঠ
পড়ল মাথায়। সত্যিই তো
এই যে এখনও আমি অনেকের নিন্দামন্দ সয়ে
দিনরাত্রি এই ভয়তরাসের মধ্যে আছি, এর

রহস্য কোথায়? কেন আমি এই ফাটলের
সম্মোহন ছেড়ে অন্য কোথাও যাই না? কেন? প্রশ্ন
আপাতত একটাই। উত্তর আমার
জানা নেই; কেননা আমি তো একা নয়,
আমার ভেতরে আছে বহু বহুজন। তাদের কেউই
উত্তর খোঁজার জন্যে আমার মতই গা করে না।

তসলিম রশিদের জীবনযাপন

এড়িয়ে পিতার দৃষ্টি যৌবনপ্রত্যুষে দরজায় খিল দিয়ে
কবিতা লিখেছি আমি আর মনেপ্রাণে
কবিতাকে করেছি গ্রহণ
পৃথিবীর সর্বোত্তম বস্তু বলে, অথচ জনক
কস্মিনকালেও জানাননি সমর্থন
আমার এ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের প্রতি। ভরা সূর্যাস্তের দিকে
মুখ রেখে তিনি
উঁচিয়ে বয়স্ক ছড়ি তাঁর
দিয়েছেন তাড়িয়ে বেবাক অলৌকিক
হরিণ এবং পরী ভাড়াটে বাড়ির
সংকীর্ণ চৌহদ্দি থেকে, আমি
অসহায় বক্ষ ঘরে মেরেছি সকালসন্ধ্যা কপালে চাপড়।

জননীকে বোঝাতে চেয়েছি কবিতাই প্রকৃত আবেহায়াত
অস্তিত্বের প্রশ্রয়ের হাসি হেসে গ্রীষ্মের দুপুরে
নিরিবিলি ঢেলেছেন মাটির সুরাই থেকে পানি,
যেমন শৈশবে তিনি আমাকে সাদরে
ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখে গৃহকোণে শাণিত বঁটিতে
কাঁটতেন রান্নাঘরে রুপোলি ইলিশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে দয়িতার কানে কানে, মনে পড়ে,
গোধূলি বেলায়
রমনা লেকের ধারে কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা আউড়ে বলেছি–
কবিতা তোমারই মতো অনিবার্য স্বপ্নভূমি আমার জীবনে।
অর্থনীতিকানা তুমি বলে সে যুবতী
জ্বলজ্বলে কূটনীতিকের
ঘনিষ্ঠ জীবনলগ্ন হয়ে দিল পাড়ি মার্কিন মুলুকে।
কারুর পিতাই নয় বস্তুত অমর। তাই পেনশনভোগী
জনক গেলেন পৌঁছে একদিন মায়াবী স্টেশনে

বিপন্ন সংসার ফেলে হাভাতে আঁধারে;
আমার কলেজ-পলাতক সহোদর রাত জেগে টকটকে
লাল কত আশার অক্ষরে
দিলখোলা অজস্র পোস্টার লেখে চোখের আড়ালে,
মাঝে মাঝে জেল খাটে এবং বিবাহযোগ্য বোন
প্রত্যহ শাপান্ত করে উদ্ভিন্ন বজ্জাত যৌবনকে।
আমি নিজে যেনতেন প্রকারে চাকরির খোঁজে
দিনে
অফিসে অফিসে ঘুরি আনকোরা গোয়েন্দার মতো,
রাতে
পরাবাস্তবের পিঠে তুমুল সওয়ার হয়ে ক্ষিপ্র
বলপেনে

ক্ষণজীবী বসন্তের এবং ফেরারি কোকিলের
জন্যে হা-পিত্যেশ করে ছিমছাম আঠারো মাত্রার
সুঠাম অক্ষরবৃত্তে কত তন্দ্রালু কবিতা লিখি
ঢুলু ঢুলু চোখে।
সন্ধ্যা নামে, নিরক্ষর সন্ধ্যা নামে শহরের বেল্লিক বস্তিতে।
আমার ভূতলবাসী অস্থির অনুজ আসে খুব
সন্তর্পণে

মায়ের হাতের রান্না চেখে নিতে মাঝে-মাঝে ফের
চকিতে গা ঢাকা দ্যায় কে জানে কোথায়।
আমার ধৈর্যের বাঁধে ফাটায় সে বোমা বেধড়ক,
গালমন্দ দিই ওকে, বিশেষত যখন অফিসী মহাপ্রভু
আমাকে শুনিয়ে দেন বাছা বাছা স্ল্যাং। ইতিমধ্যে
একটি নিখাদ চাকরি জুটিয়ে নিয়েছি দৈববলে। বোনটিকে

ফাঁকি দিয়ে মহল্লার মাশাল্লা যুবক
সটকে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। সহোদরা যৌবনের জতুগৃহে
পোড়ে দিনরাত।
আমার জননী তাকে সর্বদা রাখেন চোখে চোখে,
পাছে সে গলায় দ্যায় দড়ি কিংবা ঝাঁপ
লাখেরাজ জন্মান্ধ কুয়ায়।
কোনো কোনো মধ্যরাতে সঙ্গমান্তে গৃহিণী বলেন
চুপিসারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সারাটা জীবন যাবে
ভাড়াটে বাড়িতে,
আজও তো হলো না ছাই নিজের বসতবাড়ি কোনো।

আমি বিদূষক সেজে হাসন রাজার মতো গেয়ে উঠি–
কী ঘর বানামু আমি শূন্যের মাঝার।
যদিও বাসাড়ে আমি জন্মাবধি এই দুনিয়ায়,
রোজানা বানাচ্ছি দ্যাখো গায়েবি মহল।

আমার অনুজ জপে প্রত্যহ মাও সে-তুঙ আর
পড়ে কৃশকায় চারুবাবুর কেতাব,
যা নিশ্চিত পাইপগানের চেয়ে বেশি অগ্নিউদগীরণকারী।
আমার অনুজ সুকান্তের সংক্রামক প্রেরণায়
নিজেকেই ঠাউরেছে মহান লেনিন।
দিন যায়, মাস যায়, বছর গড়িয়ে যায়, তবু
কোথাও পাই না খুঁজে অনুজকে আর।

কখনো সখনো আমি কবিসম্মেলনে যাই, নামজাদা সব
কবিদের সঙ্গে মফস্বলি মঞ্চে সদ্য-লেখা পদ্য পাঠ করি।
খদ্দরের পুরোনো পাঞ্জাবি
উড়ন্ত ঘোড়ার ডানা; বিবর্ণ স্যান্ডেল
হোলি গ্রেল; কিছুক্ষণ শব্দের নিজস্ব ইন্দ্রজালে

পিঠচাপড়ানি পেয়ে, দিশি মাল টেনে
ভুলে থাকি বাস্তবের কচ্ছপ-কামড়।
তোতাপাখি বিবেক ছোলার লোভে সকল সময়
নিঃশব্দে ঘাপটি মেরে থাকে।
আমার বাঁদিকে ব'সে চোখের পিঁচুটি মোছে আর
হাই তোলে বারো বছরের স্বাধীনতা।

ইদানীং প্রায়শই পড়ি অনুজের বিস্ফোরক
পুরোনো ডায়েরি,
দাঁড়া-বার-করা হিংস্র পোকার মতন
ভাবনা মগজে ঘোরে। হতচ্ছাড়া জীবনকে কিছুতে পারি না
নিয়ে যেতে অন্য কোনো বাঁকে
শুধু পাল্টে দিই, ক্রমাগত দিতে থাকি
আমার নিজের কবিতার কিছু শব্দ রাগে, চরম ঘেন্নায়।

স্লোগান

হৃদয়ে আমার সাগর দোলার ছন্দ চাই
অশুভের সাথে আপসবিহীন দ্বন্দ্ব চাই।
এখনও জীবনে মোহন মহান স্বপ্ন চাই
দয়িতাকে ভালোবাসার মতোন লগ্ন চাই।

কবিতায় আমি তারার মতোন শব্দ চাই,
শান্তি এবং কল্যাণময় অব্দ চাই।
মল্লিকা আর শেফালির সাথে চুক্তি চাই,
সর্বপ্রকার কারাগার থেকে মুক্তি চাই।
মুক্তি চাই
মুক্তি চাই।

মধ্যজীবনের বৃত্তান্ত

এখন আমার মধ্যজীবন যিশুর মতন
ক্রুশকাঠে ক্রূর পেরেকময়;
তবুও হৃদয়ে প্রহরে প্রহরে মেঘবিস্তার,
এবং মোহন চন্দ্রোদয়।

গ্রীষ্মে কি শীতে দিন কাতরায় অফিস-গুহায়,
সন্ধ্যাবন্দি দাবার ছকে।
গেরস্থালির খোয়ারিতে মজে সোহাগ বিলোই
রাতে গৃহিণীর ঘুমেল বুকে।

হঠাৎ কখন কৃপণ কলের পানি থেমে যায়,
কাকস্নান সারি নিত্য আমি।
ক্যালেন্ডারের সুন্দরীগণ লিবিডো জাগান,
হয়ে যাই ক্রমে মর্ষকামী।

রেশনের কৃশ লাইনে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল
ভাবি, আওড়াই লোর্কা, শেলি।
চকিতে চেতনা প্রবাহে ধরায় গনগনে জ্বালা
কবেকার নববধূর চেলী।
কখনো ছুটির দুপুর কাটাই ভাতঘুমে আর
থ্রিলারে, শস্তা উপন্যাসে,
এবং বিকেলে চীনে বাদামের খোসা জমে ওঠে
খেলার মাঠের ধ্বস্ত ঘাসে।

মোরগের মতো গলাটা ফাটিয়ে দিইনি স্লোগান,
যাইনি যুদ্ধে একাত্তরে।
অবশ্য শত রাজা উজিরের শব উড়ে যায়
চায়ের কাপের তুমুল ঝড়ে।

মুখে বিপ্লবী বুলি লেগে থাকে আঠার মতন;
সমাজতন্ত্রে ঈমান আনি;

অথচ যখন জনকল্লোলে কাঁপে রাজপথ,
নিদ্রার মোহে চাদর টানি।

নিউজপ্রিন্টে মারি ও মড়ক, গুপ্ত লড়াই,
কে কোথায় কবে চড়ছে শূলে–
রাখি না খবর; আপাতত আমি কাতরাই শুধু
পুরোনো আমার দন্তশূলে।

ডাস ক্যাপিটাল জপি নিশিদিন, লেনিনের বাণী
করি মুখস্থ, তবুও হায়
আঁধি ও ব্যাধিতে দিশেহারা মনে ধর্মগ্রন্থ কেমন অলীক ছায়া বিছায়।

ভোরের আজান কী মায়া ছড়ায় ফাঁকা রাস্তায়,
ঘুমন্ত ঘরে, বিবশ কানে।
আধখোলা চোখে দেখি বৃক্ষের আইবুড়ো ডাল
কাঁদে কোকিলের গায়েবি টানে।

আমি বটে এক জাতস্বাপ্নিক স্বপ্নের ঘোরে
মায়াজাল বুনি বন্ধ ঘরে,
আজও আরব্য রজনী আমার মগজের কোষে
রঙিন কুয়াশা সৃষ্টি করে।
স্বদেশী মাটিতে ইদানীং আর টেকে না তো মন,
বাক্স প্যাটরা তৈরি থাকে।
মধ্যপ্রাচ্য স্বর্গরাজ্য, তাই ভিটেমাটি
বেচে ছুটে যাই ভিসার ডাকে।

মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি দেয়াল ঘড়িটা
পাখা নেড়ে যায় দূরের নীলে;
আমার ভেতর থেকে কার হাত বেরিয়ে চকিতে
ছিপ ফ্যালে ফিকে সবুজ ঝিলে।

বাথরুমটার বালতির জলে, দেখি দৈবাৎ,
ঝলমল করে কাস্পিয়ান;
এবং চলছে দূর শতকের ফিনিশীয় সাদা
পালতোলা এক সাগরযান।

রঙ-বেরঙের অজস্র পাখি ঠোঁট নিয়ে ওড়ে
একটি কফিন পুষ্পঢাকা।
শূন্যতাময় দহলিজে নাচে রাজনর্তকী
দূর অতীতের ভস্মমাখা।

সন্ধ্যার মতো অন্ধ দুপুরে আমার উঠোনে

রোমক সেনারা খেলছে পাশা।
ওপরে পেরেকবিদ্ধ শরীর ক্রুশকাঠে গাঁথা,
শিয়রে আমার সাপের বাসা।

আমার নিঃসঙ্গ চঞ্চু

জাভেদ এখন তুমি ভীষণ একাকী
আবেদনপত্রের মতন ঝুলে আছ মেঘের কেশর ধরে
জাভেদ তোমার গলা ফুঁড়ে
বেলফুল ঝরে রাশি রাশি
বুকে
বিশাল চোখের মতো ঘড়ি

জাভেদ কখনও তুমি সর্ষেক্ষেতে একজন অশ্বারোহী হয়ে
সবুজ লাগাম হাতে ছুটছ কেবল
ঘোড়ার জ্বলন্ত চোখ রণধ্বস্ত শহরের নিরালা জানালা
পা দগ্ধ মিনার আর গ্রীবা
খয়েরি গিটার
তুমি সেই গিটার আঁকড়ে ধরে অতল পাতালে
যাচ্ছ স্বপ্নবৎ মাছের সন্ধানে নাকি
তার খোঁজে যে একদা কোনো মধ্যরাতে
জলকন্যা হতে চেয়েছিল
জাভেদ নিঃসঙ্গ বন্ধু হে আমার তুমি
ফিরে আসো মুঠো মুঠো হীরে জহরত
মাথায় নীলচে জলচর পাখি আর
শিশ্নে লতাগুল্ম নিয়ে তুমি ফিরে আসো
জলকুমারীর মাছরাঙা স্মৃতি তোমাকে নিয়ত ঠোকরায়

তোমার জামার নাম বিষাদ জাভেদ
ট্রাউজার বিচ্ছিন্নতা গেঞ্জি বিবমিষা
তোমার জুতার ফিতা কখনো কখনো ম্রিয়মাণ
লাউয়ের ডগার মতো ঝুলে থাকে

আকাশে একটি পাখি যেন
উড্ডীন পেরেক
তুমি সে পাখির তীক্ষ্ণ চঞ্চুর উদ্দেশে
অক্ষর ছিটিয়ে খুব নিরাসক্ত চেয়ে থাকো আর
পাখিটির বুকের ভেতর থেকে সজীব পাতার
মতো হাত চকিতে বেরিয়ে আসে তুমি সেই হাত

হাতে নিয়ে শহরের সবচেয়ে উঁচু দালানের
নিঃসঙ্গ চূড়ায়
ঈগলের মতো বসে আছ

কী জন্যে এই মধ্যরাতে

কী জন্যে এই গ্রীষ্মকাতর অন্ধকারে
মধ্যরাতে জেগে থাকা?
কী জন্যে আজ আকণ্ঠ এক তৃষ্ণা কেবল
বুকের মধ্যে জাগিয়ে রাখা?

মাঝে-মধ্যে বাইরে তাকাই, দূর আকাশে
যায় না দেখা জাগর তারা;
গাছগাছালি নিথর নিঝুম, বন্য ঘ্রাণে
পাচ্ছি গতকালের সাড়া।

রাতদুপুরে পড়ছে মনে শীত দুপুরের
একলা শঙ্খচিলের ওড়া,
পড়ছে মনে অনেক আগের সাগর পারের স্বেদ ঝরানো
তেজী তরুণ সফেদ ঘোড়া।
অন্ধকারে মাঠের ভেতর আমরা দু'জন
ছিলাম প্রেমে পুলকিত–
প্রবেশ করে উষ্ণ মাংসে হীরের ছুরি, মদির চাপে
নীল ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত।

রাত্রি আমার চোখে মুখে নিশাস ফ্যালে
রমণরত প্রাণীর মতো;
স্মৃতির ঝাঁঝে হঠাৎ আমি হয়ে পড়ি
কেমন যেন অসংযত।

কী জন্যে এই গ্রীষ্মকাতর মধ্যরাতে
আজকে আমি নিদ্রাহারা?

অস্থিরতা পোকার মতো ঘুরছে মনে,
সত্তাজোড়া কিসের তাড়া?

চমকপ্রদ কত কিছুই ঘটে আমার চিত্তপুরে,
নেইকো কোনো লেখাজোখা।

রহস্যময় শব্দাবলি জ্বলে নেভে
যেন নিখুঁত জোনাক পোকা।

আমি কি এই মধ্যরাতে শ্মশানচারী
পদ্য লেখার আকর্ষণে?
ভবিষ্যতের কোন দেয়ালি মরীচিকা
দুলিয়ে দিল দগ্ধ মনে?

কৃষ্ণচূড়া গাছের মতো জ্বলছি একা
চৈতন্যের চৌরাহাতে,
নাম-না-জানা তীব্র দহন সইছি কিসের
আবছা মোহন প্রত্যাশাতে?

কবিতার প্রতি ঢ্যামনা

এখন নখরাবাজি ছাড়। লচ্ খাওয়া হয়ে গেছে
অনেক আগেই; সেই কবে থেকে জোমে আছি আর
তোমার জন্যেই আজ আমি এমন উঠাইগিরা।
তোমার অশোক ফুল ফোটা পড়েছে আমার চোখে
বহুবার, বহুবার দেখেছি ঝুল্‌পি, ছাতি। জিভ
ভ্যাঙচানো; বুলিয়েছি হাত ঝাপে। জোড়-খাওয়া তা-ও
হয়েছে অনেকবার হে চামর খেপ্‌লু আমার।
আমি তো কপাল ফেরে ভিড়েছি তোমার মারকাটারি

অন্দরখানায়। আচমকা থেকে পড়ি, ফের গোড়া
থেকে করি শুরু আর এক পা এক পা চলি; তুমি
কাছে না থাকলে বলো কী করে হাওয়ায় গেরো বাঁধি?
কেন তুমি মাঝে-মধ্যে খামোকা বাতেলা দিতে চাও?
আন্‌সান্ কথা রাখ চনমনে মেয়ে যদি তুমি
আমার এ খোমা-বিলা দেখে সবকিছু গুবলিট
করে দিতে চাও, তবে কেন নিয়েছ আমার ছললা
ঘন-ঘন কান্‌কি মেরে? চুস্‌কি তুমি, সাতঘাটে ঘুরে

ফিরে বেড়ানোই কাজ; স্থিতু হয়ে বসতে পারো না
কোথাও সামান্যক্ষণ। এখন হঠাৎ ঠাণ্ডা পানি
হবে তুমি, তা হবে না। কেননা হেকোরবাজ নই
আমি আজও, যদিও ঢ্যাম্‌না বলা যায় ইদানীং।

আমৃত্যু আমার সঙ্গী কবিতার খাতা

১.

লিখি আর না-ই লিখি, প্রতিদিন কবিতার খাতা
খুলে বসি পুনরায়, তাকে
টেবিলে সযত্নে রাখি মঠবাসী সন্ন্যাসীর মতো
ব্যবহারে। কবিতার খাতা, মনে হয়,
দূর অতীতের তাম্রলিপি,
কখনো প্রবাল-দ্বীপ। কবিতার খাতাটির স্মৃতি
নিয়ে একা একা পথ হাঁটি সারাদিনমান, বেলাশেষে
পৌঁছে যাই
সে-দেশে, যেখানে আজ হরিণ হরিণ নয় আর,
যেখানে পাখিরা নয় পাখি। তবু আমি
হরিণের বর্ণিল ভঙ্গিমা,
পাখির গানের ছায়া সঙ্গে নিয়ে আসি, নিয়ে আসি
কবন্ধে হাত থেকে ময়ূর-ময়ূরী।
যাবতীয় অনিন্দ্য গোলাপ, বিদ্যুল্লতাময় মেঘ,
বৃষ্টিভেজা মুখ আর মায়াবৃক্ষসহ
সেসব অর্পণ করি পুণ্যার্থীর মতো
আমৃত্যু আমার সঙ্গী কবিতার খাতাটির বুকে।

২.

সুদূর বৃষ্টির যুগে পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে
কিছু লিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
রবরবা মুসলিম লীগের আমলে কত কিছু শিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
বায়ান্নোর রক্তাপ্লুত ভাষা-আন্দোলন থেকে কিছু শিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
ভাসানীর সন্তোষের কুটিরের আর তাঁর পদযাত্রা থেকে
কিছু শিখে নিই।

আমি আর কবিতার খাতা।
রাজবন্দিদের নির্যাতিত জ্বলজ্বলে চোখ থেকে
কিছু শিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
শেখ মুজিবের স্বাধীনতা-ঝলসিত উদ্যত তর্জনী থেকে,
বজ্রমুষ্টি থেকে

কিছু শিখে নিই

আমি আর কবিতার খাতা।
সতত ভূতলবাসী তরুণ সিরাজ সিকদার আর তাঁর
সহযাত্রীদের কাছ থেকে
কিছু শিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
মুক্তিযোদ্ধা, হুইল চেয়ার আর ক্রাচ থেকে কিছু শিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
জীবনানন্দীয় পাতা থেকে আস্তেসুস্থে কিছু শিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
কমল মজুমদার পাঠ করে চণ্ডালের হাঁড়ি, শ্মশানের
তন্বী সতী, তার বানভেজা স্তন আর
গোলাপ সুন্দরী আর শ্যাম নৌকার নিকট থেকে
কিছু শিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
পথিকের মধ্যাহ্নভোজন আর ভগ্ন পান্থ নিবাসের কাছ
থেকে কিছু
পিছুটান শিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
এবং বৈচিত্র্যময় উপজাতীয় সংস্কৃতি থেকে
কিছু শিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
বাথরুমে-রাখা বালতির পানি আর কৈশোরের

নদীটির কাছ থেকে কিছু শিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
মেয়েদের হস্টেল এবং মাতৃসদনের কাছ থেকে
কিছু শিখে নিই
আমি আর কবিতার খাতা।
স্বপ্নপ্রসূ কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো থেকে,
পরাবাস্তবের সূর্যমুখী থেকে কিছু শিখে নেয়
আমৃত্যু আমার সঙ্গী কবিতার খাতা।
রৌদ্রদগ্ধ শস্যক্ষেতে কৃষকের অবস্থান থেকে,
বিবাহ বাসর আর কবরের বাতি থেকে কিছু শিখে নেয়
আমৃত্যু আমার সঙ্গী কবিতার খাতা।

হোমারের স্বপ্নময় হাত

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯১ [ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫]
প্রকাশক বইঘর, চট্টগ্রাম
প্রচ্ছদ-শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী
উৎসর্গ-পত্র সাইয়িদ আতীকুল্লাহ
বন্ধুবরেষু

স্মৃতিতে ধারণযোগ্য কিছু নয়

ন্যাকামোর শিরশ্ছেদ করেছি অনেক আগে আমি,
গলা টিপে মেরেছি কৈশোরে
গোঁড়ামির একচক্ষু দানোটাকে শিউলিতলায়
পাখি আর হাওয়া
আর নীলকমল ও লালকমলের চন্দ্রালোক চমকিত
গল্প সাক্ষী রেখে। ভাঙো, যত
ব্যবহৃত ছাদ ভেঙে ফেল বলে লোক জড়ো করি
চারপাশে, অথচ নিজেই
আরেক ছাদের দিকে এগিয়ে চলেছি সবান্ধব।
মধ্যবিত্ত মেজাজে চায়ের কাপে ঠোঁট রেখে দেখি
আশির দশক মাদী ঘোড়ার মতন পাছা দোলাতে দোলাতে
চলে যাচ্ছে, জরাগ্রস্ত বারান্দায় দাঁড়বন্দি, একা
তোতাপাখি বলে 'আমাদের
প্রভুর বছরে কত খড়কুটো, রক্তচিহ্ন মিশে আছে; বিদায় বিদায়।'

পুত্রদের তেতে-ওঠা মতবাদঝলসিত কথা শুনে ভয়ে
গলা কাঠ হয়ে আসে, কন্যাদের পতিগৃহে যাত্রা
চোখে তুলে নিয়ে
আমার ভেতর থেকে একজন ব্যথিত পুরুষ
বেরিয়ে সন্ধ্যায় ঘাটে গিয়ে
পানিতে নিজের ছায়া দেখে
ভীষণ চমকে ওঠে। পরিত্রাণ নেই ভেবে মগজের কোষে
কিছু মেঘ ভরে নিয়ে ফিরে আসে স্বগৃহে আবার।
কিছুটা বিভ্রান্ত বটে ইদানীং, তবু চোখ কান
খোলা রাখি, সমাজতান্ত্রিক প্রীতি নিয়ে ধান্দাবাজি
ঢের হলো আশপাশে, ধর্মযাজকের সত্তায় প্রবল শান
দেয় খর রাজনীতি। বিপ্লব ফ্যাশন কোনো-কোনো
গুলজার মহলে এবং
ধোপার কুকুর যারা, তাদের নিকট ভীতিটাই
মৌল অতিশয়; ছাগলের ছাল-ছাড়ানো কসাই নিয়মিত
গায় ওহো সাঁই-সাঁই গণতন্ত্রগীতি।
অকস্মাৎ ব্রোঞ্জের চওড়া প্লেট থেকে
বেমক্কা বেরিয়ে পড়ে সুশোভিত ড্রইংরুমের
গালিচায় তিন লাফ দিয়ে

রাঙা চোখ তুলে বিপ্লবের নান্দনিক
ব্যাখ্যা দাবি করে
মহেঞ্জোদারোর ষাঁড় আর
রাবীন্দ্রিক সন্ধ্যার উতল মেঘমালা
ফুঁড়ে চলে যায় স্তব্ধ পূর্ণিমায় পুলিশের গাড়ি।

হায় যৌবনেই বামপন্থা বানপ্রস্থে গেল বুঝি
গায়ে অস্তরাগ মেখে। নাকি
মাঝে-মাঝে রাগী সজারুর মতো কাঁটা খাড়া করে
ছোটে দিগ্বিদিক? আমি ভীষণ অস্থির
কম্পাসের মতো আচরণে
জীবনযাপন করি, পূর্ব-পরিচিতা কারো মুখ
ভেবে ভেবে স্ত্রীকে নিয়ে শুতে যাই; আতশী হৃদয়ে
স্বপ্নের কোলাজ ফোটে, আঁধারে তাকাই
কিছু আবিষ্কারের ব্যাকুল প্রতীক্ষায়।
কখনও-কখনও
লোকালয় আর উৎসবের স্তব করতে গিয়ে
কবিত্বের দিব্যতায় শ্মশান প্রান্তর এবং
ধ্বংসস্তূপ বিষয়ক স্তোত্র লিখে ফেলি।
অথচ আমার চৈতন্যের
খোলা পথে বুগেনভিলিয়া ফুটে থাকে থরে-থরে,
বাজে আনন্দিত রাগমালা।
কোনো-কোনো ঋতুতে এবং অমাবস্যা নেমে এলে
হরিণ লুকিয়ে রাখে মুখ লতাগুল্মে, কাটে তার
কাল, চেষ্টাহীন; শিকারির
পদশব্দে, উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে
নিয়তির ছায়া মিশে থাকে; প্রতীক্ষায় ত্রিকাল দোদুল্যমান।

ফাঁসির মঞ্চের আসামির মতো চাঁদ ঝুলে আছে
সেই কবে থেকে,
বেশ্যালয়ে একদা নতুন মুখগুলি
ক্রমশ পুরনো হচ্ছে এবং রবীন্দ্রনাথ একা
বড় একা আলখাল্লা দুলিয়ে নিশীথে
চলেছেন হেঁটে অ-বনেদী গলি দিয়ে নেয়ামত
দর্জির ঈষৎ বাঁকা উঠোন পেরিয়ে।
এদিকে দাঁতাল বর্বরেরা ঢুকে পড়ে মায়াবনে।

চাদ্দিকে খেমটা নাচ, হল্লাগুল্লা, অবিরত
কাজিয়া ফ্যাসাদ বাড়ে, হামেশাই হয় লোকক্ষয়
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, মহাপুরুষের বাণী শত-
শত ক্যানভাসারের কণ্ঠনালি বেয়ে নামে; জয়-
পরাজয় কাদা লেপে দেয় মৃত সৈনিকের হাতে,
স্থির চোখে, ছেঁড়া টিউনিকে। নানা দেশে রাজনীতি-
পরায়ণ ধীমানেরা ধু-ধু দৃষ্টি ও স্খলিত দাঁতে
কাটাচ্ছেন কাল কারাগারে, কোনোখানে নেই স্থিতি।

টিনোসোরাসেরা মাটি ফুঁড়ে দ্রুত বেরুচ্ছে আবার
পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্যকে তছনছ করে, শুরু হবে
সংহারের পালা, হয়ে যাবে নিমেষে কাবার
বিভিন্ন গর্বিত জাতি, পারবে না বিপুল অগুরু
ঢাকতে লাশের গন্ধ। কূলে-উপকূলে দেশান্তরি
মানুষের ভিড় বাড়ে ক্রমাগত। এত কোলাহল,
তবু কেন এমন নির্জন বাস্তুভূমি? ভ্রষ্ট তরী
কোথায় যে নিয়ে যাবে! চতুর্দিকে খলখলে জল।

স্বপ্নাদ্য সিংহের মতো হেঁটে যাই বিনষ্ট প্রান্তরে
হেঁটে যাই স্বপ্নভস্মময় চোখে উদ্দেশ্যবিহীন।
কুৎসিত মুখোশ আঁটা কতিপয় লোক ঘরে-ঘরে
ছড়ায় আগুন, ঘৃণা-বীজ; জানে নাকো চিরদিন
প্রেমই শুধু কীর্তনের অভীষ্ট বিষয়। যে ব্যথিত
কবি ছিল এ শহরে, মাথায় ছিল না শিরস্ত্রাণ
তার; ভুলে যাই রণরোল, জয়ীধ্বনি, অভিযান–
স্মৃতিতে ধারণযোগ্য কিছু নয় কবিতা ব্যতীত।

শুভবাদী রোদ চুমো খেয়েছিল

শুভবাদী রোদ চুমো খাচ্ছে লতাগুল্মে ঢাকা এই
রেস্তোরাঁকে, প্রাণে
পুরনো বৈভব নিয়ে বসে আছি, ছোট
টেবিলের ওপারে তরুণী, একা, গায়ে
টোমাটো রঙের পুলওভারের প্রগাঢ় মমতা।
সমুখে স্যালাড, বিফ স্টেক,
সোনালি সুরার পাত্রে ঠোঁট।

কখনও দেখছি তাকে বিদেশী সংকোচে, কখনওবা নিসর্গকে।

একটু একটু নিচ্ছি স্বাদ
বাদামি রুটির,
মুখের ভেতর গলে টাটকা মাখন;
উড়ন্ত বেগনি পোকা তার সোনালি আঙুলে বসে
খেলা করে, কিছুক্ষণ ডগালগ্ন থাকে, যেন
হয়েছে মাতাল তন্বী ত্বকের উত্তাপে।
—এ কিসের ছায়া মাঝে-মধ্যে দুলে ওঠে
মৃদু প্রসাধন-ধন্য মুখে?
পরা বাক্ পাক খায় বারবার মনের ভেতর। মনে হয়
এরকম বসে-থাকা, অ্যানিমার মুখোমুখি, বহু
শতাব্দী আগেও ছিল। ওর লাল বুটে
ঘাসের সবুজ স্মৃতি লুটোপুটি খায়, যাত্রী নিয়ে দূরে বাস চলে যায়।

একদা এখানে এই পুরনো মহলে আসতেন পুশকিন,
বাতাসের গুঞ্জরণময় ছায়াবীথি পেত কবি দৃষ্টি; তিনি
হেঁটে যেতে-যেতে
হেমন্ত বিকেলে
চকিতে পেতেন খুঁজে কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা
চৈতন্যের ঘড়জে নিখাদে।
গাছের শিকড়গুলি সর্পিল আবেগে
তাঁকেই জড়াতে চায় রক্তে যার আফ্রিকার গহন ঝংকার।
বেলা বাড়ে, চুল ওড়ে মৃদু;
অচিহ্নিত বেদনায় ছায়া জমে মনে, রেনকোট নিই
কাঠের চাকতি জমা দিয়ে
প্রৌঢ় সজ্জনের কাছে। কারুকে বিদায়
না বলে ট্যাক্সিতে উঠি, ফিরে যাই মাইল-মাইল
দূরে নক্ষত্রের নীড়-ছোঁওয়া হোটেলের কামরায়।
কালো কফি খেতে-খেতে ভাবি
উড়ন্ত বেগনি পোকা, রোদ-লাগা গোলাপি আঙুল,
কাঠের রেলিঙে ঝুঁকে-থাকা ডগার লতার কথা।
ক্রীড়াপরায়ণ পোকাটির প্রতি তার
প্রসন্ন দৃষ্টির মায়া বিলিয়ে কী কথা
ভাবছিল সেই মেয়ে? কারো সঙ্গে অভিমান করে
এসেছে একলা চলে? নাকি যে আসবে বলে কথা

দিয়েছিল, সে মেট্রোর টিকিট কাটেনি ভুলক্রমে?

ঝরনার পানির মতো সময় গড়িয়ে যাবে, ক্রমাগত ঘোলা
হবে জল দশ দিকে, রাশি রাশি মাঠ
কোথায় হারিয়ে যাবে ব্যাপক দূষণে।
বিস্মৃতির ধূসর ডাস্টার নির্বিকার
নিমেষে ফেলবে মুছে অনেক কিছুই। ভুলব না
সেই কবে দূর দেশে শুভবাদী রোদ
চুমো খেয়েছিল
লতাগুল্ম ঢাকা রেস্তোরাঁকে, একটি বেগনি পোকা
খেলা করেছিল সরু গোলাপি আঙুলে।
লাল বুটলগ্ন কচি ঘাসের ডগাকে ভুলব না কোনো দিন।

পর্যটন

কড়া নেই; ব্যস, এইটুকু যা তফাৎ। কিছুকাল
ছোট এক ঘরের ভিতরে
আছি, হয়তো
গভীর ভূতলাশ্রয়ী রাজনীতিপরায়ণ কেউ
ধূর্ত ফেউদের খরদৃষ্টির আড়ালে
এরকম করে বসবাস।
নিভৃতে নিজেকে ক্রমাগত
নিজের ভিতরে খুব গুটিয়ে নিয়েছি।

আমি কি কারুর ভয়ে ইদানীং এমন আড়াল
খুঁজি রাত্রিদিন?
আস্তেসুস্থে দু'পা
এগিয়ে গেলেই ছুঁতে পারি মল্লিকার শরীরাভা
এবং নিবিষ্ট বসা যায় গুঞ্জরিত
চাখানায় বুলিয়ে ব্যাপক ভ্রাতৃদৃষ্টি শুভবাদী
কথোপকথনে নাক্ষত্রিক নীড় খোঁজা চলে আর
সত্তাময় রাঙা ধুলো নিয়ে ফেরা নিভাঁজ সহজ।

কোথাও যাই না; মূর্তিমান সান্ত্রী নেই আশেপাশে,
তবু চতুর্দিকে কী নাছোড় কবন্ধ পাহারা।
মাঝে-সাঝে ইচ্ছে হলে পর্দাটা সরিয়ে

জানালার বাইরে তাকাই,
চোখ দিয়ে ছুঁই
গোলাপ, টগর, জুঁই, আকাশ-সাজানো
দূর সাইরেবিয়ার, গোধূলিমাতাল হংসযূথ।
সর্বোপরি পায়চারি নিজের ভেতরকার ছাঁদনাতলায়।

কোথাও যাওয়ার নেই, শুধু অন্তর্গত
পথের বিস্ময়মাখা হাওয়া
বয় ভিন্ন স্তরে, নীলিমার স্পর্শ লাগে; অন্ধকারে বিছানায়
শুয়ে ভাবি ভাসারির কথা,
সিস্টার্ন চ্যাপেল আর ইরাসমুজের মানবিক দীপ্তিমালা
দুলে ওঠে, অকস্মাৎ একজন পর্যটক, পায়ে তার বৎসরান্তিক
ধুলো, চুল এলোমেলো, খোলা গেরেবান,
দাঁড়ায় দরজা ঘেঁষে, বলে– চলো যাই।

কখনও হাটে নেই

কখনও হাটে নেই, মাঠেও নেই, শুধু
মগ্ন থাকে একা নিজের মতো।
গহন সত্তায় যেন কে মঠবাসী
পেতেছে আস্তানা, হৃদয়ে ক্ষত।

দিবস দাবানল, ক্ষুধিত আগুনের
হল্কা বয়ে যায় একলা ঘরে
ঘনিয়ে এলে রাত খরায় ছারখার
দগ্ধ আত্মায় বৃষ্টি ঝরে।

মানসে ঈগলের অহংকার-মণি,
সুদূর নীলিমার অন্ত নেই।
নীলিমা ছুঁয়ে ছেনে জমিনে ফিরে আসে
জীবনপরায়ণ সন্ত সেই।

করে না চেঁচামেচি, কণ্ঠস্বর তার
পড়শী শোনে পেতে আড়ালে আড়ি;
কখনও শৃঙ্খলা উচ্চারণে বাজে,
কথারা কখনও-বা এলোপাতাড়ি।

দৃষ্টি প্রত্যহ রেখে সে দূর পথে
রৌদ্রে, মেঘপুরে কাটায় বেলা;
ভ্রমণাতুর তার হৃদয় অজানায়
ভাসায় কুয়াশায় ভ্রষ্ট ভেলা।

যখন অন্তরে টানাপোড়েন নেই,
তখন মরশুম শূন্যতার।
ডুবলে নৈরাশে, হঠাৎ কাঁটাবনে
দ্বান্দ্বিকতা আনে দ্যুতিবিথার।

বার্ধক্যে জসীম উদ্‌দীন

গলায় জড়ানো তাঁর শাপলা রঙের মাফলার, কষ্ট পান
প্রায়শই বাতে, কফ নিত্যসঙ্গী, কখনো হাঁপান
সিঁড়ি ভেঙে। এ কেমন একাকিত্ব এলো ব্যেপে
অস্তিত্বের উড়ানির চরে? প্রহরে-প্রহরে শুধু দাগ মেপে
নানান ওষুধ খেয়ে ধু-ধু সময়ের খালে
লগি ঠেলা নক্ষত্রবিহীন এ গোধূলি কালে।

আপাতত কিছুতেই নেই মন, শিশু বৈকালী সাহিত্য সভা,
জয়নুলী চিত্রকলা, ইতল-বিতল, রক্তজবা,
দূর থেকে-আসা কবিয়াল, কিংবা বিশ্বের খবর–
কিছুই টানে না তাঁকে। মাঝে-মধ্যে নিষ্প্রদীপ দাদির কবর
ভেসে ওঠে, ভেসে ওঠে ছায়াবৃত মাঠ, খাল, বিল,
কবেকার বিশুদ্ধ কোকিল।
তাকান কখনও ভেজা চোখে
শিল্পিত শীতলপাটি শোভিত দেয়ালে। ঘরে ঢোকে
অকস্মাৎ চড়ুই দম্পতি, চঞ্চলতা
ছড়ায় ড্রইংরুমে। খয়েরি শালের খুঁট মেঝেতে গড়ায়, নীরবতা
হীরের মতন জ্বলে, একটি অনুপস্থিতি ঝুঁকে
থাকে তাঁর বিমর্ষ শিশিরময় বুকে।

কোথাও নিঝুম হ্রদে লাল পদ্ম ফুটে আছে আজ,
হঠাৎ ভাবেন তিনি। খ্যাতির আওয়াজ
অন্ধকারে খড়মের শব্দ যেন এবং জীবন
যুগপৎ অর্থময়, অর্থহীন, বেদেনীর শাড়ির মতন
ভাসমান গহিন গাঙের জলে। ঠোঁটে

বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ-সংকলিত হাসি ফোটে।

'আমাকে নিও না তুমি', কবিতা আবৃত্তি করবার
ধরনে বলেন যাকে, তার
হাত জানালার গ্রিলে, হাতে কালো পাখি ডেকে যায়
শব্দহীন অবিরত। আদিগন্ত ঘন কুয়াশায়
শূন্য নাও ভাসে,
চেয়ার অর্পিত শ্লথ হাতে অস্তরাগ নেমে আসে।
করোটিতে ছিল তাঁর কী ব্যাপক চর-থরথর
কাইজার চিত্রনাট্য, গাথার ছন্দের মতো সোনার গতর
গ্রাম্য যুবতীর, মাছলোভী মাছরাঙা, সারিগান।
স্বপ্ন-কণা-ধান
ঝরেছে করোটি জুড়ে, ডানা-অলা বাইসাইকেলে
চেপে কোন শাশ্বতের বনে গেলেন পেছনে ফেলে
সব কিছু? তাঁর সে চাকার কিছু নাক্ষত্রিক ধুলো
কেমন রাঙিয়ে দেয় আমার চোখের পাতা আর চুলগুলো।

এই রক্তধারা যায়

যেদিকে তাকাই শুধু ধ্বংসস্তূপ দেখি আজকাল।
এ আমার দৃষ্টিভ্রম নাকি
বাস্তবিকই চতুর্দিকে ধ্বংসস্তূপ পরাজিত সৈনিকের মতো
পড়ে আছে? এখন এখানে যুবকেরা রাত্রিদিন চক্রাকারে
গাঁজা খায়, মধ্যরাতে কানামাছি খেলে
কখনও-সখনও, এলোকেশী যুবতীরা
নিয়ত বিলাপ করে। কতিপয় বেড়াল ছায়ার মতো ঘোরে
আশেপাশে, খাদ্যান্বেষী ইঁদুরেরা ব্যর্থ হয়ে ঢোকে
গর্তের ভেতর পুনরায়, জরাগ্রস্ত মানুষের
সাধের যযাতি-স্বপ্ন চকিতে মিলায় প্রেতায়িত অস্তরাগে।

এখন এখানে সূর্যাস্তের রঙ ছাড়া
অন্য কোনো রঙ নেই,
এখন এখানে শোণিতের গন্ধ ছাড়া
অন্য কোনো গন্ধ নেই,
এখানে সাপের স্পর্শ ছাড়া আপাতত
অন্য কোনো স্পর্শ নেই,

এখন এখানে দৃষ্টিহীনতা ব্যতীত
অন্য কোনো দৃষ্টি নেই।

কাউকে দেখলে কাছে দূরে সরে যাই তাড়াতাড়ি
দৃষ্টিকটুভাবে,
কেননা বন্ধুর কাছে গিয়ে দেখেছি সে বন্ধু তার
মুখোশের আড়ালে শত্রুর ভয়াবহ মুখচ্ছদ
নিয়ে বসে আছে
মাছির প্রভুর মতো। কাউকে করি স্পর্শ, পাছে
সে নিমেষে পাথরের মূর্তি হয়ে যায়;
আমার নিজেরই প্রতি সেই আর পূর্ণিমা-বিশ্বাস ইদানীং।

দিনের অন্তিম রোদ ধ্বংসস্তূপে ব্যাপক বসায়
নখ কামুকের মতো। অদূরে চলছে ভোজ শকুনের আর
শেয়ালের ডাক
মাঝে-মাঝে অভিশপ্ত স্তব্ধতাকে করে
চুরমা; স্মৃতি আবিষ্কার করে আমি
বেনামি অস্তিত্ব খুঁজি পূর্বপুরুষের। ভস্মরাশি থেকে উঠে
শূন্যতায় ভাসে সাদা পিরহান, দাদার খড়ম।
অদৃশ্য অক্ষর লিখে অন্ধকারে আসা-যাওয়া করি;
আমার নিঃসঙ্গতায় মর্মরিত হয়
দূর শতাব্দীর হাওয়া, বয় নূহের কালের ঢেউ।

ধ্বংসস্তূপে ফুল কুড়াবার জন্যে ঝুঁকতেই মনে পড়ে যায়,
বিশীর্ণ ইথিওপিয়া ক্রমশ মরছে অসহায়
দু'চোখ উল্টিয়ে। বর্তমান জীবন-মৃত্যুর ভেদ লুপ্ত,
কর্কশ-বাঁশির তালে-তালে গলা ছেড়ে
আমাকে গাইতে হবে গান। সুর যত
ওঠে উচ্চগ্রামে, তত রক্ত ঝরে বুক থেকে; ধ্বংসস্তূপে গান
গাইলে নিশ্চিত বুকচেরা রক্ত ঝরাতেই হয়,
এই রক্তধারা যায় ছায়াপথে, নক্ষত্রের দিকে।

হোমারের স্বপ্নময় হাত

এখন আমার আশেপাশে কেউ নেই। ঘর অন্ধকার নয়, একটা
বাতি জ্বলছে। অনুগ্র আলো যেন জাল; আমি স্বেচ্ছা-
বন্দি হয়ে আছি সেই জালে। কেউ নেই আমার পাশে, মুখোমুখি

দাঁড়িয়ে নেই কেউ। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না এই মুহূর্তে। মুহূর্তগুলো থেমে আসা বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝরছে আমার ওপর। সময় বয়ে চলেছে একটানা, আমার আয়ুর পুঁজি ক্ষইয়ে দিয়ে। এখন কোনো বইয়ের পাতায় চোখ বুলোতে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না, অথচ বইয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র! প্রহরে-প্রহরে বই থেকে আমি শোষণ করে নিই আনন্দ, সমৃদ্ধ হয়ে উঠি দিনের পর দিন।

এখন আমার আশেপাশে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এখন যদি খাতা খুলে লিখতে শুরু করি, কেউ ঢুকে পড়বে না আমার ঘরে, কিংবা আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখবে না কি আমি লিখছি। কোনো উঁকি-ঝুঁকি মারবে না কেউ। চারপাশে এখন নিভাঁজ নিঃসঙ্গতা। আমার একাকিত্ব জলচর প্রাণীর মতো আলো পোহাচ্ছে। একটু আগে আমার বিচ্ছেদ ঘটেছে স্বপ্নের সঙ্গে, হয়তো এজন্যেই একটা শূন্যতাবোধ আপাতত দখল করে নিয়েছে আমাকে। স্বপ্ন ভেঙে গেলে খুব একলা লাগে। কী স্বপ্ন দেখছিলাম আমি? ঘুম যখন শরীরকে ত্যাগ করে যায়, তখন কোনো কোনো স্বপ্নের কথা খুব স্পষ্ট মনে থাকে, যেন চোখ বন্ধ করলেই সেই স্বপ্ন আবার দেখতে পাব। এমন কিছু স্বপ্ন দেখি যা স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে যায় অন্তহীন অস্পষ্টতায়।

আমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। যারা স্বপ্নকে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেয়, আমি তাদের কেউ নই। আমি স্বপ্নকে অর্থময় মনে করি। স্বপ্ন বিশ্লেষণে অপটু বলেই সকল স্বপ্ন আমাদের কাছে অর্থহীন। কী স্বপ্ন দেখছিলাম আমি? সব কিছু মনে নেই, আবছা হয়ে গেছে অনেক কিছুই। বহু পথ হেঁটে আমি প্রবেশ করেছি একটা পুরনো নিঝুম বাড়িতে। ঠিক প্রবেশ করেছি বলা যাবে না, বাড়িটার বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ছি অনেকক্ষণ থেকে; কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ আসছে না। তবে কি কোনো বাসিন্দা নেই এই নিঝুম বাড়িতে? দরজা খুলল না দেখে সেখান থেকে অন্য দিকে রওয়ানা হলাম। তারপর নিজেকে দেখতে পেলাম জনশূন্য, ধু-ধু প্রান্তরে। জমি ফেটে চৌচির। কোথাও এক ডগা ঘাস নেই, এক ফোঁটা পানি নেই। শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো একটা শব্দ উঠে আসছে মাটি থেকে। হঠাৎ

যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুল একটা কালো মানুষ। মানুষ
না বলে কংকাল বলাই ভালো। লোকটা মাটির ওপর
বসে পড়ল এবং কোত্থেকে যেন একটা শিশু এসে বসল ওর
কোল জুড়ে। হাড়-জিরজিরে শিশুটির দু'চোখে জীবনের
দ্রুত পলায়নের দৃশ্য। সেই লোকটা আর শিশুটিকে
দেখে মনে হলো যেন মৃত্যু শুয়ে আছে মৃত্যুর কোলে।
আর কী কী দেখেছিলাম। মনে পড়ছে না। কিছুতেই মনে
পড়ছে না।
স্বপ্নটির কী অর্থ দাঁড়ায় আমি জানি না। স্বপ্ন বিশ্লেষণের
ক্ষমতা থেকে আমি বঞ্চিত। এই স্বপ্ন কেন দেখলাম?
অনেকদিন থেকে একটা বাড়ি খুঁজছি বলেই কি সেই
পুরনো, নিঝুম বাড়িটা দেখা দিল আমার স্বপ্নে, যে বাড়ি
আমি আগে কখনও দেখিনি? সংবাদপত্রে দেখা
ইথিওপিয়ার অনাহারী মানুষের ফটোগ্রাফই আবার আমার
স্বপ্নে হানা দিল নতুন করে? এ প্রশ্নের উত্তর আমার
জানা নেই। জোর দিয়ে কিছুই বলতে পারব না। এই
স্বপ্নের অন্তরালে অন্য কোনো গূঢ়ার্থ কি নিহিত?
এই স্বপ্ন আমাকে একলা করে দিয়েছে। এখন আমার আশে
পাশে কেউ নেই। স্বপ্ন দেখতে আমার ভালো লাগে।
ঘুমের মরুভূমিতে স্বপ্ন তো মরূদ্যান। হারিয়ে-যাওয়া কিছু
চিত্রের খোঁজে স্বপ্ন দ্যাখে আমার কণ্ঠনালি, নাভিমূল,
বাহু, নখ, মাথার চুল। কখনও-কখনও স্বপ্ন আর বাস্তবের
মধ্যে আমি কোনো ভেদচিহ্ন খুঁজে পাই না। কুলুঙ্গিতে
তুলে রাখা কবেকার সবুজাভ দোয়াত ফেরেশতা হয়ে
আমার সঙ্গে কথা বলে যখন, তখন বুঝতে পারি না আমি স্বপ্নের
আচ্ছন্নতায় মজে আছি নাকি বাস্তবের চবুতরায় দাঁড়িয়ে
কবুতর ওড়াচ্ছি একের পর এক।
এখন আমার মাথার ভেতর সুকণ্ঠ কোনো পাখির মতো গান
গাইছে এই শহর। লোকগীতির এই শহর, ডিসকো
নাচের শহর, দোয়া-দরুদ আর মোনাজাতের শহর, ভিখারির শহর,
বেশ্যা দালালের শহর, রাশি-রাশি মিথ্যা বাগানের
শহর, ক্রুশবিদ্ধ সত্যের শহর, বিক্ষোভ মিছিলের শহর,
স্লোগান-ঝংকৃত শহর, কবির মৌচাকের মতো শহর,
শেষ রাত্রির বাইজীর মতো এই শহর। এই মুহূর্তে আমি
যা স্পর্শ করব তা উন্মোচিত হবে নতুন তাৎপর্য নিয়ে।

গাছের বাকল হবে তরুণীর ত্বক, পথের ধুলো রূপান্তরিত
হবে রাজা সোলেমানের খনির মণিরত্ন, ভিখারিণীর
কানি হবে সালোমের লাস্যময়ী পট্টবস্ত্র। এখন আমি নিজেকে
স্পর্শ করলে আমার ভেতর থেকে শত-শত ময়ূর
বেরিয়ে এসে পেখম ছড়িয়ে দেবে উঠোন জুড়ে। যদি এখন
আমি খাতার সাদা পাতা স্পর্শ করি, তাহলে সেখানে
বইবে অলকানন্দা, গড়ে উঠবে আর্ডেনের বন, লতাগুল্মে
ঝলসে উঠবে হোমারের স্বপ্নময় হাত।

কবর সাজাই

সেদিনও সকাল শহরের মুখে সতেজ আবির
কিছু দিয়েছিল মেখে। ময়লা গলির মোড়ে নিডর বালক
ডাংগুলি খেলতে-খেলতে
আইসক্রিমের প্রতি গিয়েছিল উড়ে
গাংচিল ভঙ্গিমায়। কেউ-কেউ পাবদা মাছের শুরুয়ায়
ডুবিয়ে আঙুল
ঘড়ির কাঁটার প্রতি রেখেছিল চোখ,
অফিসের তাড়া ছিল বলে।
সেদিনও কোথাও
দাম্পত্য কলহ ছিল, ছিল কিছু প্রেমের সংলাপ;
নিজউপ্রিন্টের বুকে ছিল
স্মরণমন্থনকারী ফাল্গুনের একরাশ উদ্ভিন্ন অক্ষর।

অকস্মাৎ কী-যে হলো, শহরের পথে
দুপুরেই সন্ধ্যা এলো নেমে, যেন রূপান্তরে গলগোথা ঢাকা
কেরানির কলমের গতি গেল থেমে
লেজারের উদাস পাতায়। ঝাঁকা মুটে, রিক্‌শা-অলা,
ফেরি-অলা আর চটকলের শ্রমিক
চমকে উঠল শিকারির গুলিবিদ্ধ পাখির ঝাঁকের মতো।
শহরের পথে
নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে শত রক্তজবা। ছিল যারা
সাধারণ এবং অজ্ঞাত,
যৌথ অবচেতনার পরিচর্যা পেয়ে
তারাই প্রকৃত অসামান্য হয়ে ওঠে স্বপ্নচারী পরাক্রমে

কিংবদন্তির মতো ধ্রুব এবং অপরিহার্য। ছিল না
হেলমেট, টিউনিক ওদের, অথচ
তারাও সৈনিক রৌদ্রজলে ঝড়ক্ষুব্ধ পরিখায়।
হৃদয়ে মায়ের ডাক খুব তীব্র পৌঁছেছিল বলে
বুকের ভেতর তার ঝড় হতে থাকে, বুঝি তাই
ছুটে আসতেই হয় পথে, হাটে-মাঠে,
শুনতেই হয় সেই গান, সুর যায় যাঞ্ঝা করে
আত্মবলিদান। ওড়ে তার খুলি, বুকে গর্ত হয়। কী বিস্ময়,
সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের স্মৃতির ভূগোলে
পতাকারই মতো দীপ্ত, বন্দনা-স্পন্দিত,
কেমন নিঃশব্দ প্রেমে, অথচ বাঙ্ময়!
সে নেই কোথাও
রঙিন ছবির পোস্টকার্ডে কিংবা দেয়ালে পোস্টারে
আছে আমাদের চৈতন্যের ল্যান্ডস্কেপে,
গল্পে আছে, যেমন গোলাপ থাকে পাতার ভিতর,
কবিতার পবিত্র পঙ্‌ক্তিতে আছে, যেন
চির বরাভয়,
আছে স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের চিদাকাশে,
তাই বর্ণমালা দিয়ে আজ তার কবর সাজাই।

এখন সে কথা থাক
(আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রীতিভাজনেষু)

আমার পিতামহের আমলের অনেক পুরনো
এক সিন্দুকের কথা জানি, যার ডালা
খুললেই চকিতে প্রাচীনতা
বিশীর্ণ আঙুল নেড়ে নেড়ে ডাকে রহস্যের স্বরে।
যেন তার অভ্যন্তরে খুব দীর্ঘ পথ আছে গাছগাছালির
সেরেনাদে খুব স্নিগ্ধ, চোখের পাতায় জমে ছায়া,
আছে কিছু তসরের শাড়ির সৌরভ,
ঘাসে ফেলে-যাওয়া কারো পশমের চটি,
সৌন্দর্যমাতাল রুগ্ন খর্বুটে কবির এপিটাফ,
বাছুরের ঘুন্টি-বাঁধা মেটে গলা, দাদার তসবিহ্–
এরকম ভাষাচর্চা করে সে সিন্দুক।
এখন সে কথা থাক।

সাতটি সোনালি মাছ আলোকিত কড়িকাঠ থেকে
নেমে পিয়ানোর রিডে নাচে,
আয়না বেয়ে উদ্‌বেড়ালের নাকের ডগার নিচে
ব্যালেরিনাদের মতো মোহন বিন্যাস তৈরি করে,
তারপর ঘর ছেড়ে উড়ে যায় দূরে
জানালার পর্দা দুলিয়ে
কুঁড়েঘর, টিনশেড ছুঁয়ে গায়ে মেখে
মেঘেদের রোঁয়া।
পাহাড়ি ঈগল সেই দৃশ্যের চকিত উন্মীলনে
ঈষৎ বিস্মিত হয়ে রহস্যের মর্মমূল স্পর্শ করে
নিজেও সঙ্গীতময় হয়।
সোনালি মাছের গান এখানেই লয়ে নিবিড় মিলিয়ে যাক।

প্রাচীন দুর্গের মতো একটি বাড়ির কাছে যাই
মাঝে-মধ্যে, দাঁড়াই সামান্যক্ষণ, এদিক-ওদিক লক্ষ্য করি,
দূর থেকে জেনে নিতে চাই
বাড়ির ভেতর কতটুকু অন্ধকার কিংবা কতটা আবির
তৈরি হয়। কখনও সে বাড়ি আশাবরী ধরে,
কখনও-বা গায় মধ্যরাতে
দরবারি কানাড়া। একজন থাকে সে বাড়িতে, যাকে
কখনও দেখিনি আমি, যার নরম পায়ের কাছে
শুয়ে থাকে এক জোড়া চিতাবাঘ, কতিপয় নীলাভ ময়ূর
ঘোরে সারাক্ষণ আশেপাশে; মাঝে-মাঝে
তার কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে ঝাড়লণ্ঠনের মতো,
সে-ভাষা বুঝি না।
আজ থাক, সে-বাড়ির কথা
একান্ত বিশদভাবে বলা যাবে কখনও আবার।

সাবান

পাড়ার দোকান থেকে একটি সাবান কিনে এনে
রেখে দিল নিজের দেরাজে। মোড়কের ভাঁজ খুলে
প্রায়শই ঘ্রাণ নেয়, আবার গচ্ছিত রাখে স্মিত
হেসে যথাস্থানে, সেই ঘ্রাণ তাকে ন্যালাক্ষ্যাপা করে
বারংবার, নিয়ে যায় সময়ের অন্য পারে। কার

গায়ে একরকম ঘ্রাণ ছিল? গোসলের পর খোলা,
ঈষৎ ফাঁপানো চুলে যে আসত নিঃশব্দে দ্বিপ্রহরে,
তার গায়ে? কখনও-সখনও সোনারুর মতো ঢঙে
চোখ রাখে সাবানের প্রতি, টেবিলে স্থাপিত হলে।
কখনও সে বানাবে না, তবু বস্তুটির খুঁটিনাটি
প্রস্তুতিপর্বের কথা ভাবে, আমদানি-রপ্তানির
হিসেব-নিকেশ করে। কেঠো দেরাজের ভেতরেও
সুঘ্রাণ; করে না এস্তেমাল তাকে, পাছে এ সাবান
পানির সংসর্গে জীবনের মতো দ্রুত ক্ষয়ে যায়।

আইসক্রিম

হঠাৎ পৃথিবীটাকে কেমন আলাদা মনে হয়
বালকের। ভেণ্ডারের কাছ থেকে তৃষ্ণার্ত দুপুরে
কিনেছে আইসক্রিম ছোট মাটির কলস ভেঙে
জমানো পয়সা বের করে। পৌরপথে হেঁটে-হেঁটে
বালক আইসক্রিম করছে লেহন; রূপকথা
থেকে এক রাজা এসেছেন এ শহরে, মনে হলো
তার; কিন্তু কী বিস্ময়, সে ব্যতীত কেউ তাকে ঠিক
লক্ষ্য করছে না, তাঁর পোশাকের বাহার ভীষণ
ব্যর্থ সাধারণ পোশাকের ভিড়ে। রাজার নিকটে
যাবে কি যাবে না ভেবে বালক আইসক্রিম হাতে
ফুটপাতে উঠে পড়ে, চলে আসে আবার গলির মোড়ে, একা।
রাজার আয়ত চোখ মনে পড়ে তার; রৌদ্র-লাগা
গোলাপি আইসক্রিম ক্রমশ গলতে থাকে তার
মুখের ভেতর, জিভ কেমন বিবশ হয়ে আসে।

বসে আছে

বেশ কিছুকাল থেকে বসে আছে পাথুরে বেঞ্চিতে।
সূর্যাস্ত বিছায় স্নেহ চোখে, মুখে, ভুরুতে, আঙুলে;
চুল ওড়ে, প্রশস্ত কপালে বৈরাগ্যের পথরেখা,
শ্মশানের কাঠ পোড়ে হৃদয়ের ভিতরে এবং
চক্ষুদ্বয় পাখির রঙের অন্তরালে ভিন্ন কোনো

বর্ণশোভা দেখে নিতে খুব স্থির। এ ভঙ্গিতে তার
ঈষৎ স্থাপত্য আছে, আছে শুদ্ধ সঙ্গীতময়তা।
স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিবর্গ, বয়েসী, এবং কতিপয়
চমকিলা যুবা তাকে দেখে হাসে, কেউ-কেউ শিস্
দেয়, যেন বৃক্ষাশ্রিত পাখিরা উদ্দিষ্ট, এই মতো
ভান করে হেঁটে যায়। কারুর দিকেই নেই তার
দৃষ্টি, শুধু নিজের ভেতরে চোখ সঞ্চরণশীল
অতিশয়; এখন সত্তায় তার ঠোনা দিলেও সে
নড়বে না এতটুকু, মনে হয়; যেন-বা পাথর।

বিছানা

গৃহকোণে খাটের ওপর সাবলীল শুয়ে থাকে
আমার বিছানা সারাক্ষণ। যদি কেউ ভালো করে
চোখ রাখে বিছানার ওপর, তাহলে সহজেই
নজরে পড়বে তার বাদামি চাদর, ফুল-তোলা;
চারটি বালিশ বেশ নরম এবং ঝকঝকে।
মশারি খাটানো হয় রাত্রিবেলা, পায়ের নিকট
শীতকালে নিভৃতে গোটানো থাকে লেপ। বেড়ালের
সঙ্গ ছাড়া বিছানার নেই কোনো প্রকাশ্য বাহার।

আমার গৃহিণী রোজ বিছানার পরিচর্যা করে
খুশি হন। কখনও চড়ুই বিছানায় খড়কুটো
ফেললে তিনি ছুটে এসে সরিয়ে ফেলেন আবর্জনা,
মৃদু গালমন্দ দেন পাখিদের। শয্যা রচনায়
আমার কৃতিত্ব নেই একরত্তি। শুধু আমি কিছু
প্রতীক এবং চিত্রকল্পে সাজাই বিছানাটিকে ॥

দালান

আমার বাসার চতুর্দিকে দালান উঠছে ক্রমে
মাতব্বরদের মতো মাথা উঁচু করে। ইদানীং
সচ্ছলতা, বোঝা যায়, শিস দিচ্ছে পাড়ায়-পাড়ায়।
অবশ্য একথা তত প্রাসঙ্গিক নয়; দশজন

আঙুল ডুবিয়ে ঘিরে বসবাস করলে টাটায় না
কখনও আমার চোখ। এ রকমভাবে অতি দ্রুত
দালান ওঠার ফলে আগেকার অনেক কিছুই
পড়ে না আমার চোখে আর। প্রতিদিন যে তরুণী
বারান্দায় দাঁড়াত উদ্দাম চুলে, যেসব বালক
একটি প্রাঙ্গণে ফুটবল খেলে হতো খুশি, আর
দেখতাম তালগাছে চিল, দাঁড়কাক, কতিপয়
ভিন্ন পাখি সহজে বিশ্রাম নিত, তারা সকলেই
অদৃশ্য সম্প্রতি; দুঃখ হয়। ল্যান্ডস্কেপের সন্ধানে
এখন মনের অভ্যন্তরে আমি দৃষ্টি মেলে দিই।

শেফার্স

কত দীর্ঘকাল আমি শেফার্স করি না ব্যবহার।
ফলত হাতের লেখা, মনে হয়, ক্রমশ খারাপ
হয়ে যাচ্ছে। এমনকি আমার লেখার সুচিহ্নিত
চরিত্র বদলে গেছে, বলা যায়। এরকম ক্রীড়া-
পরায়ণ ধারণা আমার মনে সিলমোহরের
স্পষ্ট ছাপ কেবলি বসাতে চায়। হয়তো এর কোনো
মানে নেই; সংস্কার পাখির মতো ডেকে ওঠে লাল
রক্তের ভিতরে। বলপেনে ভাষাচর্চা কী রকম
ফুলচন্দনের ঘ্রাণপায়ী হতে পারে, জেনে গেছি।
ধরেছি ঘরের ভাষা সুদূর প্রবাসে কাগজের
ব্যাপক সাদায়, পাই নিদ্রিত বনের বিষণ্নতা।
প্রকৃত রন্ধনশিল্পী যিনি তার কাছে কড়াইয়ের
আকার প্রকার স্রেফ অবান্তর। কোনো কোনো দিন
মনে হয়, একটি শেফার্স পেলে বড় ভালো হতো।

লেখার কাগজ

লেখার কাগজ ক্রমে ক্রয় ক্ষমতার সীমা থেকে
খুব দূরে সরে যাচ্ছে; অথচ আমার রোজই চাই
কিছু সাদা কাগজ, কেননা আমি, বলা যায়, প্রায়
প্রত্যহ কিছু-না-কিছু লিখি। উপরন্তু ভালো কাগজের

প্রতি, মানে সুশোভন কাগজের প্রতি বড় বেশি
আকর্ষণ বোধ করি। কাগজ কিনতে গিয়ে আমি
বেশ কিছু সময় কাটাই, উল্টে-পাল্টে বারবার
দেখি রাইটিং প্যাড, সযত্নে পরখ করে নিই।

আমাকে ছিটেল বলে ব্যঙ্গ করা অত্যন্ত সহজ;
কিন্তু আমি যা বলি স্পষ্টই বলি; সত্যি, ঢাক-ঢাক
গুড়-গুড় আমার স্বভাবে নেই। যদি কোনো দিন
কাগজ বাজার থেকে কর্পূরের মতো উবে যায়,
নিরুপায় আমি অনন্তকে শ্লথগতি কচ্ছপের
ছায়া ভেবে লিখে যাব ধুলো আর গাছের পাতায়।

কড়া নেড়ে যাবে

মারী ও মড়কে পুড়ে-পুড়ে হাড়
কালি হলো আর জটিল সড়কে
হেঁটে হেঁটে পায়ে ক্ষত বেড়ে যায়;
দান্তের মতো নরকে ভ্রমণ অব্যাহত।

খাঁ-খাঁ জ্যোৎস্নায় নগ্নিকা দেখি
শুকোতে দিচ্ছে ছেঁড়া শাড়ি তার।
বিশীর্ণ শিশু ঘন-ঘন করে
মায়ের শূন্য হাতের তালুতে দৃষ্টিপাত।

চরাচরব্যাপী হাহাকার শুনে,
অধিবাস্তব পালা দেখে আজ
রাত্তিরলোভী চাঁদ ওঠে না তো
রোগা কেরানির আপিস কামাই করার মতো।

মল্লিকা বনে দিনরাত্তির
কবর খুঁড়ছে শবসাধকেরা;
ছিঁচকাঁদুনের দল মর্শিয়া
গেয়ে এলেবেলে করে প্রস্থান অস্তাচলে।

আর কিছু আমি পারি না-ই পারি,
অন্তত আজ কথা দিতে পারি–
আমার কবিতা কড়া নেড়ে যাবে
ঘুমন্ত সব নিঝুম বাড়িতে একলা হাতে।

আমার অজ্ঞতা নিয়ে

এখন মাঝরাস্তায় আমি; শ্বাসরোধকারী নিঃসঙ্গতা
একটা মাকড়সার মতো হাঁটছে
আমার চোখে, গালে, কণ্ঠনালিতে,
বুকে, উরুতে আর
অন্ধকারের জোয়ার খলখলিয়ে উঠছে আমার চারপাশে।
অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। মনে হয়,
এখানে কোথাও তুমি আছ, ডাকলেই
সাড়া দেবে লহমায়। তলোয়ার মাছের মতো
তোমার কণ্ঠস্বর
ঝলসে উঠবে অন্ধকারে।
কণ্ঠে সমস্ত নির্ভরতা পুরে তোমাকে ডাকলাম,
শুধু ভেসে এলো আমার নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি।

অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেছি, যদি হঠাৎ
তোমার দেখা পেয়ে যাই।
ভেবেছি, আমার দিকে প্রসারিত হবে
অলৌকিক বৃক্ষশাখার মতো তোমার হাত।

কতকাল প্রতীক্ষাকাতর আমি
তোমার কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে, কত পাথর আ কাঁটাময়
পথ পেরিয়েছি তোমাকে একটিবার
দেখব বলে। অথচ আমার সকল প্রতীক্ষা আর
ব্যাকুলতাকে বারংবার উপহাস করেছে
তোমার নীরব অনুপস্থিতি।

অন্ধকারে আমি দু'হাতে আঁকড়ে রেখেছি
একটি আয়না যাতে দেখতে পাই
তোমার মুখের ছায়া। কিন্তু আয়নায় পড়ে না
কোনো ছায়া, লাগে না নিঃশ্বাসের দাগ।

এখানে কোথাও না কোথাও তুমি আছ,
এই বিশ্বাস কখনও-সখনও
আমাকে বাঁচায়
অক্টোপাশ-বিভ্রান্তি থেকে। কিন্তু সেই বিশ্বাস নিয়ে
আমি কী করব যা সমর্থিত নয়
জ্ঞানের জ্যোতিশ্চক্রে?

জ্ঞান আমার উদ্ধার, তারই অন্বেষণে
উজিয়ে চলি
স্বৈরিণীর মতো অন্ধকার। এজন্যে যদি তোমাকে খোঁজার সাধ
মুছে যায় কোনো রাগী পাখার ঝাপটে,
আমি প্রতিবাদহীন পা চালিয়ে যাব
জ্ঞানের বলয়ে আমার অজ্ঞতা নিয়ে।

ভাড়াটে

পুরনো ভাড়াটে চলে গেলে কোনো বাসা কোনো দিন
খালি পড়ে থাকে না এখন।
পুনরায় 'বাড়িভাড়া দেওয়া হইবে' ফলকটি
বসতে না বসতেই সরে যায়। অন্ধকার
ঘরে আলো জ্বলে, বারান্দায় হেঁটে যায় কেউ কেউ,
জানালায় পর্দা লাগে, শিশুর আনন্দধ্বনি বাজে
মাঝে-মাঝে; ক্যাসেট প্লেয়ারে
রবীন্দ্রনাথের চিরকালীন গহন ব্যাকুলতা।

এখানে সিঁড়িতে আগেকার কেউ যে-কথা বলেছে
প্রায় তারই প্রতিধ্বনি এখন আরেক
কণ্ঠে জাগে। অনেক পুরনো সিন্দুকের ডালা-খোলা
গন্ধময় স্মৃতি ঘোরে আনাচে-কানাচে। কার হাসি
সোনালি ঘণ্টার মতো বেজে ওঠে হেমন্ত-বিকেলে?
এখন যে ভায়োলেট-রঙ
শাড়ি পরে সাজাচ্ছে চায়ের সরঞ্জাম;
তার? নাকি আগেকার কারো?

পুরনো দেয়ালে কিছু দাগ জমা হয়, সাঁঝবাতি
জ্বালায় না কেউ;
অন্দরে বেদনা শুয়ে আছে সাবলীল ঘরে-ফেরা
নাবিকের মতো, বয়ে যায় খাওয়ার সময়, তবু
টেবিলে আসে না কেউ। ভোরে
দরজার কাছে এসেছিল ট্রাক, একটি কি দুটি কাক
ছাদের কার্নিশে উঠেছিল ডেকে। কোথায় যে গেল
ওরা লটবহর-সমেত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি রেখে?

নস্টালজিয়া

আবার সেখানে তুমি হুবহু আগের মতো সব
পেয়ে যাবে, এরকম ভাবা ঠিক নয়। বহু পথ পাড়ি দিয়ে
অখ্যাত স্টেশনে নেমে খানিক জিরিয়ে
হেঁটে যাবে, তারপর উঠবে নৌকায়, পালে হাওয়া
লাগবে, মেঘনার বুক চিরে,
যাবে তুমি বহুদূরে ভাটিয়ালি টানে।
ধান-রঙ অপরাহ্নে আলুঘাটা পৌঁছে
শহুরে পা রেখে ভেজা মাটিতে এবং
দৃষ্টি মেলে গাছগাছালির ভিড়ে, ছনছাওয়া ঘরে
কী তুমি প্রত্যাশা করো আজ?

কৈশোর ও যৌবনের মাঝখানে থমকে দাঁড়ানো
সেই মেয়ে আসবে কি ছুটে
শাড়ির কোঁচড়ে তার একরাশ বৈঁচি ফল নিয়ে?
কিংবা সে কিশোর, যাকে তুমি
এই তো সেদিন ভরা শ্রাবণের নিঝুম ধারায়
কী ব্যাকুল ছুঁয়ে
পরখ করতে চেয়েছিলে সে প্রকৃত
সজীব প্রতিভূ কিনা বাস্তবের, সেও কি আবার
তোমার সতৃষ্ণ বুকে পড়বে ঝাঁপিয়ে
নিরাশ্রয় পাখির ধরনে?

বাঁশঝাড় পেরুনোর সময় তোমার
পড়বে কি মনে কত উদাস দুপুরে
পাখির ডিমের লোভে ক'জন বালক দিত হানা জরাগ্রস্ত
কাচারি বাড়ির আশেপাশে থমথমে সান্নাটায়?
পড়বে কি মনে পূর্ণিমায় পুরনো পুকুর পাড়ে ঢ্যাঙা নাঙা
ফকিরের নিসর্গ-মাতানো নাচ? মধ্যরাতে বৈঠকখানায়
মাইজভাণ্ডারি গান?
পড়বে কি মনে সেই দৃশ্যাবলি, খুব ছলছলে
হাল-আমলের গ্রামভিত্তিক বঙ্গীয় উপন্যাসে
যে রকম থাকে?
কষ্ট দেয় প্রাচীনতা বড় কষ্ট দেয়, ভাব তুমি,
দরবারি কানাড়ার মতো। ত্রস্ত খরগোশ ঝোপ

থেকে ঝোপান্তরে ছুটে যাবে, ঝরবে পায়ের কাছে
আম জাম কাঁঠালের পাতা, দাওয়ায় দাঁড়ানো কেউ
উঁকি দেবে, ধরা যাক। পাখি
চকিতে উঠবে ডেকে সন্ধ্যাকে চমকে দিয়ে খুব।
হয়তো সেখানে গিয়ে দেখবে আগের মতো নেই
কোনো কিছু, হয়তোবা কোনো চোখের অনাশ্রয়
তোমাকে ফিরিয়ে দেবে শূন্য নদীতীরে, তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও
আজ হোক কাল হোক তোমাকে যেতেই হবে সুদূর সেখানে।

এ অতি সামান্য কথা

এ অতি সামান্য কথা, আপনারা নিশ্চয় জানেন–
দাঁত ক্ষয়ে গেলে বাঘ হয়ে যায় কিছুটা দুর্বল,
বনের পশুরা তাকে ফাঁকি দিয়ে নাকের তলায়
তার দিব্যি করে আনাগোনা, তাই সে প্রায়শ
মেটাতে দাঁতের সুখ, সুতীব্র জঠরজ্বালা দেয়
হানা শান্ত গেরস্ত পাড়ায়। অবশেষে দশদিকে
তুখোড় মানুষখেকো বলে খ্যাতি রটে তার। যারা
কবিতা লিখতে গিয়ে কাব্যলক্ষ্মীর ছাউনি থেকে
নির্বাসিত হয়, তারা যদি বাগিয়ে কলম নিত্য
সজারুর মতো রেগে ঝোপঝাড় তছনছ করে,
রাশি-রাশি পুঁথি ঘেঁটে, তথ্যের টিলায় হাঁটু গেড়ে
সমালোচনায় মাতে, কাব্যমীমাংসার ভার নেয়
নিজ হাতে তুলে, তবে ওরা সোনালি পদবি পায়
একাডেমি থেকে, আর কবি থাকে শত হস্ত দূরে।

একদিন দুপুরে

সজনে গাছের ডালে পাখি ডাকে ডবকা দুপুরে, গায় গান
পাড়ার মাস্তান,
নেশাভাঙ করে আর হিজড়া ধরনে
নাচে, যেন ওরা মায়াবনে
দেবদূত দেখে খুব প্রাণিত এখন।
গলি থেকে তরুণী বেরোয় একা, ফেরিঅলা ডেকে

যায় দুপুরকে চিরে-চিরে;
অকস্মাৎ কেমন চাঞ্চল্য জাগে মানুষের ভিড়ে,
ট্রাফিক পুলিশ উচ্চকিত, বাঁশি বাজে, কী বিপন্ন বিহ্বলতা
চতুর্দিকে, ট্রাকের তলায় চাপা পড়েছে উদোম মানবতা।

বাক্য খরায়

সেই কবে থেকে লিখছি কবিতা, তবু হামেশাই
ভীষণ আটকা পড়ি হতাশায় ঊর্ণাজালে।
কখনও-কখনও এমনও তো হয়, একটি কবিতা
মাঝপথে এসে স্মৃতিহীন ধু-ধু চড়ায় ঠেকে।

মগজের কোষে, শিরায় শিরায় জাগে ক্রমাগত
গোধূলি বেলায় প্রাক্তন কত প্রতিধ্বনি।
দূরের পাহাড় থেকে ভেসে আসে দিশেহারা কোনো
মেষপালকের আবছা ব্যাকুল কণ্ঠস্বর।

কখনও-কখনও শুরুতেই বাজে তালকানা সুর,
যেন সরগম কখনও আমার হয়নি সাধা।
চিত্রকল্প পাথরের ভাঙা মূর্তির মতো
ঘন কুয়াশায় কেবলি ফোঁপায় হাওয়ার স্বরে।

এরকম ঘটে, দেখি চিরচেনা গলিটার মোড়ে
আবর্জনার টিলাকে ছুঁয়েছে নীলিমা-চেরা
রঙধনু আর হাড়ের বাগানে পথ ভুলে ঢোকে
পঙ্গু হরিণ। অন্ধ রাজার ভাঙা বেহালা।

ছেঁড়া কাঁথাটায় আশ্রয় খোঁজে রাত তিনটের
নিম উর্বশী, বেহেড মাতাল মধ্যরাতে
নিজের বমিকে মণিরত্নের ঝলক ঠাউরে
উলঙ্গ পথে পড়ে থাকে একা অনাশ্রয়ে।

নিঃসর্গ আজ প্রলাপ বকছে, ইঁদুরে ছুঁচোয়
ভরেছে শহর, গ্রাম ডুবে যায় বানের ক্রোধে।
ঘোর উন্মাদ রাজার মতন হাসে অবিরত
অত্যাচারের সেয়ানা, দাঁতাল অস্ত্রগুলো।

এসব দৃশ্যাবলির আড়ালে যেসব দৃশ্য
স্থাপত্য হয়ে করছে বিরাজ ইতস্তত,
তাদের কিছুটা বাক্‌বিভূতির ছোঁওয়া দেব বলে
ভুরুতে চন্দ্রকলা নিয়ে জাগি দীর্ঘরাত।

কিন্তু আমার ব্যর্থতা শুধু সাদা কাগজের
খাঁ-খাঁ বুক জুড়ে বারবার জোরে বসায় নখ।
অন্ধ পাখির সঙ্গে এখন বসে আছি ঘরে
বাক্য খরায়; নগ্ন, তোতলা দেবতা যেন।

ইদানীং বঙ্গীয় শব্দকোষ

স্বীকার করাই ভালো, কিছুকাল থেকে
আমরা শব্দের ভুল প্রয়োগে ক্রমশ হচ্ছি দড়।
যেখানে আকাটা মূর্খ শব্দটি মানায় চমৎকার,
সেখান পণ্ডিত ব্যবহার করে আহ্লাদে আটখানা
হয়ে যাই। শত্রুস্থলে বন্ধু শব্দটিকে
হরহামেশাই
জিভের ডগায়
নাচাই এবং যারা অতি খর্বকায়
তাদের সপক্ষে দীর্ঘকায় বিশ্লেষণ
সাজিয়ে নরক করি গুলজার আর
মানুষের বদলে সম্প্রতি
ওরাংওটাং
বসিয়ে লাফিয়ে উঠি তিন হাত, খাই ডিগবাজি
করি সহবত বনচারীদের সঙ্গে দিনরাত।

বস্তুত স্বর্গত হরিচরণের বিখ্যাত নিষ্ঠার প্রতি বুড়ো
আঙুল দেখিয়ে দিব্যি শেয়াল-শকুন অধ্যুষিত
ভাগাড়কে স্বর্গোদ্যান বলি
সটান দাঁড়িয়ে চৌরাস্তায়,
এবং শব্দের ভুল প্রয়োগ-মড়কে নিমেষেই
যুদ্ধবন্দি বিনিময় হয়ে যায় মন দেয়া-নেয়া।

মানুষের মতো

ইদানীং মানুষের মতো কিছু বাঁদর দেখেছি,
অবিকল বাঁদরের মতো কিছু বিহ্বল মানুষ।
বাহিরকে করে ঘর ওরা আর ঘরকে বাহির;
রাজপথে, ফুটপাতে, বাস টার্মিনালে, ঘাসময়
পার্কে আর সিনেমায় জমকালো বাঁদরের ভিড়
দেখে করতালি দিতে সাধ জাগে। ইচ্ছে হয় ডেকে
সবাইকে বাতাসা খাইয়ে দিই শান্ত গোধূলিতে
বাঁদরের চেয়েও অধিক বাঁদরামি দেখে আজ।

কিছু-কিছু অতিশয় প্রকৃষ্ট বাঁদর অন্তরালে
সূক্ষ্ম কাজ করে চলে অবিরত, ঢালে লম্বা কানে
নানান ঘোরালো কথা, খাল কেটে আনে কুমিরের
বংশধর, কোনো বাঁদর সাজানো মঞ্চ থেকে
মঞ্চান্তরে অপরূপ ভেংচি কাটে, লাঙুলের শোভা
দেখিয়ে বেড়ায় আর কতিপয় ব্যথিত বাঁদর
বিচ্ছেদের পদ্য লেখে এবং তুখোড় বাঁদরেরা
কলম বাগিয়ে ইস্যু বানায় থিসিস মজাদার।

নিজের ছায়ার দিকে

আমার ভেতরে আছে এক ছায়া সুনসান; তার
ধরন বেখাপ্পা খুব, অন্তরালে থাকে।
সামাজিক তাকে বলা যাবে না, যদিও ভ্রমণের
অভিলাষ আছে তার এখানে-সেখানে অবিরাম।
কখনও-সখনও
নিজের ছায়ার দিকে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে
তাকাই রহস্যবাদী মানুষের মতো। সদিচ্ছার
অনটন নেই,
অথচ আমার ছায়া বাড়ালে উদগ্রীব হাত, আমার নিকট
নয়, অন্য কারো দিকে প্রসারিত হয়।

সকল সময়
আমার সমান্তরাল বসে, হেঁটে যায়,
নিদ্রায় আমার সঙ্গে দিব্যি মিশে থাকে হরিহর।

যখন সে দ্যাখে ধুরন্ধর বুদ্ধিজীবী
আর গোমূর্খের দল খাচ্ছে জল একঘাটে
তুখোড় কৃপায় কারো, মর্মমূলে তার
পরিহাস ফণিমনসার রূপ ধরে। নিজস্ব ভূমিকা নিয়ে
খানিক বিব্রত হয়, ফাঁদে-পড়া
পাখির মতোই
ডানা ঝাপটাতে থাকে প্রহরে-প্রহরে। আর ভাবে
মাঝে-সাঝে– কখনও প্রকৃত মানুষের চেয়ে তার
ছায়া বড় হয়ে যায়।

কলহাস্য-সংকলিত সজীব বাসরঘরে মরুর বিস্তার,
গেরস্ত ঘরের উর্বশীর প্রতি যযাতি-দৃষ্টির
লোলুপতা দেখে সে চমকে ওঠে আর
একটি যুগের অস্তরাগে
রঙিন বিহ্বল হয়ে আমার ভেতর থেকে তীব্র
বেরিয়ে পড়তে চায়, যেন
কোনো দূর হ্রদের কিনারে গিয়ে খানিক দাঁড়াবে,
নিমেষে ফেলবে ধুয়ে অস্তিত্বের ক্লান্তিময় ধুলো।

কখনও-কখনও বড় বেশি অস্থিরতা
পেয়ে বসে তাকে; আমি নিজে
যতোই ঘরের খুঁটি শক্ত হাতে ধরি,
আমার নিজস্ব ছায়া হতে চায় ততোই বিবাগী।

ধুলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৯২ [নভেম্বর ১৯৮৫]
প্রকাশক : বিউটি বুক হাউস, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী
উৎসর্গ-পত্র : আমার শিক্ষক অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ধুলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ

তোমার সয়নি তর, ভোরকেই কালসন্ধ্যা ভেবে
সাততাড়াতাড়ি বেপরোয়া
হাঁকালে চাবুক তুমি অস্থির ঘোড়ার পিঠে, গেলে
ছুটে দুর্নিবার
বৈশাখী হাওয়ার বেগে কেড়ে নিতে সোনার মুকুট
সুহৃদের মাথা থেকে। অনেকের ছিল জানা, তোমরা দু'জন
মানে সে রাজন আর তুমি ছিলে দস্তানা এবং
হাতের মতোই লগ্ন সকল সময়।

প্রতীক্ষা শেখোনি তুমি কিংবা শিখলেও
উচ্চাকাঙ্ক্ষা মোরগ-ঝুঁটির মতো হয়েছে ভীষণ আন্দোলিত
মাঝে-মাঝে। ফলত সফল
কোনো শিকারের পরে মোসাহেব আর
হুঁকোবরদার-পরিবৃত হয়ে ছিলে
যখন, তখন
সে কোন গুহার পেট চিরে এক ঝাঁক
অদ্ভুত নিরালা পাখি এসে কালো করে
তোমার আকাশ কী-যে বলল
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে, আস্তিনের সাপ
ছাড়া অন্য কেউ ঘুণাক্ষরে
বোঝেনি সে-ভাষা।

হঠাৎ শিউরে ওঠো কেন? রুটি টুকরো
করার সময়
রুটির ভেতর থেকে রক্ত ঝরে
বুঝি? নাকি মাছের ঝোলের
বাটি এক লহমায়
হয়ে যায় রক্ত সরোবর? একি, তুমি
নিজের ঘরের চার দেয়ালে খাটের
বাজুতে এবং পারসিক গালিচার
রক্তধারা দেখছ নিয়ত। আর যে ছুরি লুকিয়ে

রাখো তুমি সর্বদা কোমরে,
অষ্টপ্রহর সে যাচ্ছে বকে অবিরত
অসুস্থ প্রলাপ।

অবশ্য এখন তুমি বিভোর নিজের
মুকুটিত শোভা দেখে। দর্পণও তোমার, মনে হয় আজ্ঞাবহ
চাটুকার ইদানীং। যে ছবি দেখতে চাও তুমি
নিমেষে সে ছবি ফোটে জমাট পারদে। অতিশয়
বিজ্ঞ তুমি, উপরন্তু নিখুঁত তোমার চাল। তবে
এ-ও সত্য বলে জেনো, 'কোথায় মুকুট' বলে তুমি
অকস্মাৎ আর্তনাদ করে উঠবে একদিন দুঃস্বপ্নের ঘোরে,
দেখবে দু'চোখ মেলে কাঁটাতারে মৃত কালো পাখিটার সঙ্গে
ঝুলে আছে অস্তরাগে রক্তাক্ত গৌরব,
ধুলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ। ক্রমাগত রৌদ্রজলে জং ধরে
শিরস্ত্রাণে আর সেখানেই
দুলিয়ে দর্পিত মাথা হাসে রক্তজবা।

বেলা পড়ে আসে

সকালের খবর কাগজে পড়ি কতিপয় কৃষ্ণাঙ্গ অক্ষর
এবং একটি ফটোগ্রাফ দেখি প্রথম পাতায়।
সেই সব অক্ষরের অভ্যন্তর থেকে
এক ঝাঁক প্রজাপতি, মাছরাঙা, পুকুর পারের হাঁস আর
জলপিপি, সোনালি নূপুর,
অনেক পুরানো হলদে পাণ্ডুলিপি উড়ে
এসে বসে ছাদের কার্নিশে। বেদনার বনস্থলী
দৃশ্যত নিউজপ্রিন্টে ফুটে ওঠে চলিত ভাষায়।

তাঁকে চিনতাম, বলা যায়; তাঁর কীর্তিমালা ছিল
পরিচিত আমার নিকট,
সংক্ষিপ্ত জীবনী তাঁর জেনেছি নানান সূত্রে; কবি
ছিলেন, যদিও কাব্যলক্ষ্মী
অনেক আগেই তাঁকে নখের ঝামটা মেরে তাঁর
ভিটে ছেড়ে চলে যান। পরিত্যক্ত কেয়ুরের দিকে
কখনো কখনো তাকাতেন প্রেরণারহিত কবি বড় নীল
কুয়াশা-জড়ানো চোখে পড়ন্ত বেলায়।

মেজাজে চৈত্রের দাহ ছিল তাঁর, কেউ কেউ তাঁকে
দুর্বাসা বানিয়ে ভারি মজা পেত এবং রটাত
কেউ স্বাদ, আড্ডায়, সালুনে নুন কিছু কম হ'লে তিনি নাকি

রাঁধুনিকে করতেন তিরস্কার চার ঘণ্টা, সজারুর মতো
কাঁটা খাড়া করে উঠতেন মেতে যুক্তিতর্কে গল্পে। শোনা যায়,
ঢেঁড়স, গাজর, বীট, ফুলকপি, পালঙ ফলাতে গিয়ে তিনি
গোলাপ, টগর, জুঁই, রজনীগন্ধার প্রতি খুব
অবহেলা করেছেন অনেক ঋতুতে।

প্রাণবন্ত যৌবনের গোলদীঘিটির চতুর্দিকে
ঘুরেছেন তিনি যতবার,
ততবারই একটি পাকুড় গাছ তাঁকে দিয়েছে নির্দেশ
দীঘিতে গোসল সেরে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্যে যেতে
রহস্যের নিবাসে যেখানে কেউ থালা
সাজিয়ে রয়েছে ব'সে হাতপাখা নিয়ে;
মাধুর্যের প্রতি নয়, রুক্ষতার পঞ্চ ব্যঞ্জনের
প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেড়েছে নিয়ত।

যতদূর জানি,
শেষ অব্দি বাজত শরীরে তাঁর ঝিঁ ঝিঁর ডাকের মতো এক
শাক্ত ভাব, আশৈশব ভালোবাসতেন
দূর-থেকে-ভেসে-আসা ঘণ্টাধ্বনি, যার
কথা আছে তাঁর এপিটাফে। চরাচরে
একটি সোনালি ঘণ্টা বাজে শব্দহীন, কেবলি বাজতে থাকে
বুকের ভেতর, রেকাবিতে
শিউলি বিষণ্ণতায় ম্লান হয় প্রহরে প্রহরে।

না-খোলা একটি চিঠি, আধপড়া কবিতার বই
লেখার টেবিল পড়ে আছে; শেষ লেখা
ডায়েরির নিভৃত পাতায় ফ্যালে দীর্ঘশ্বাস, ঘরে
যেন গজিয়েছে বন অকস্মাৎ, তাঁর
ফটোগ্রাফে প্রজাপতি কী নির্ভার সময় পোহায়। এরপর
কখনো লেখার ফাঁকে চা জুড়াবে বলে
কেউ তাড়া দেবে না; এখন ঘরে হেমন্তের বেলা পড়ে আসে,
বেলা পড়ে আসে বৃদ্ধ কবির নমিত জানাজায়।

নন্দলাল বসুর সঙ্গে কিছুক্ষণ

খুব ভোরবেলা ঘুম ভাঙে অদৃশ্য পাখির গানে,
সে সুর ছড়িয়ে পড়ে ময়ূর রঙের আসমানে।

দূরে নন্দলাল বসুর ছবির মতো
দিগ্বলয় চোখে পড়ে; আমি অভ্যাগত
বত্রিশ বছর আগে যাচ্ছিলাম হেঁটে তাকে নিয়ে
রতন কুঠির পাশ দিয়ে,
অকারণ কত কিছু সযত্নে কুড়িয়ে চলে মন,
অমর্ত্য পাখির মতো গান গায় শান্তিনিকেতন।

খালি পায়ে পথ হাঁটি সকাল ন'টায়, মাটি-ঘাসে
মমতার স্পর্শ পাই, নন্দলাল বসুর নিবাসে
অত্যন্ত স্পন্দিত প্রাণে যাই,
শিল্পীর নিবাস যেন সাধকের ধ্যান, মেলে ঠাঁই
সকলের; জগত সংসার লগ্ন চৌহদ্দিতে। হেসে
তাকালেন, সময়-পেরুনো দৃষ্টি; সাদাসিধে বেশে
আছেন নিমগ্ন ব'সে সুজনি-শোভিত তক্তাপোশে। বসে পড়ি
আমরা ক'জন তাঁকে ঘিরে, দিলেন ভাসিয়ে তিনি শিল্পতরী।

সেই ঘর ভরা
আনন্দের স্বরে, দেখি তাঁর হাতে পোষা পাখির ধরনে ধরা
নিজস্ব প্রিন্টের অ্যালবাম। একটি একটি করে
ছবি মেলে ধরলেন তিনি, দৃষ্টির দুকূল ভরে
আমাদের কেমন সৌন্দর্য এলো– অমরাবতীতে
একটি ছাগল চরে, অজয় নদীতে
পা ডোবায় সাঁওতাল তরুণী; হঠাৎ
অ্যালবাম বন্ধ করে করলেন তিনি ঘরছাড়া দৃষ্টিপাত।

'আজ এখানেই শেষ, আবার কখনো যদি ফিরে
আসো কোনো দিন অজয় নদীর তীরে,
ছাতিম তলায়, তবে বাকি
ছবি দেখা যাবে ফের একসঙ্গে আরেক সকালে।' দূরে পাখি
ডেকে ওঠে, উৎসব ফুরাল লহমায়,
পান করে পদ্মবন, পলাশ ও শিমুলের মেলা,
গোপাল ক্ষ্যাপার নাচ পথ চলি, গাছের মধ্যেই দেখি শিব, বাড়ে বেলা।

এ কেমন খেলা দেখালেন শিল্পাচার্য? কিছু অন্তরালে রেখে,
নান্দনিক উন্মোচনে মেতে কিছু এঁকে
ফোটান ত্রিলোক তিনি; তবুও পায় না সম্পূর্ণতা
শিল্প চরাচরে; নদী, পাখি, তরুলতা,

বারবার ফিরে আসে রঙ ও রেখায়। আর কত
বছর কী দ্রুত কেটে গেল, নিজের ছবিরই মতো
এই তো আছেন ব'সে নন্দলাল নন্দন বাড়ির সিঁড়ি জুড়ে। চলো যাই,
কাছে ডাকে রোদের ঝালর প'রে ক্ষীণাঙ্গী খোয়াই।

ইন্দ্রাণীর খাতা

(নরেশ গুহ বন্ধু বরেষু)

একে একে অতিথিরা বিদায় নিলেন। অকস্মাৎ
মঞ্চ থেকে সব আলো নিভে গেলে, নাটকের কুশীলব আর
দর্শক প্রস্থান করলে যে স্তব্ধতা নামে
যবনিকা পতনের পর, সেরকম
স্তব্ধতা আমার ঘরে প্রতিষ্ঠিত রাত বারোটায়।
শেয়ালের মুখের রোঁয়ার মতো কিছু
চোখে মুখে লাগে
এবং শিশিরভেজা ঘাসের কিরীচ স্পর্শ করে
অনিদ্রাকে। অবসাদ নাভিমূলে পদ্ম রচনার অছিলায়
আমাকে চকিতে ঠেলে দ্যায় অন্তহীন, কানা গলির ভেতর।

কিশের আঁশটে গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে,
খাবারের প্লেটগুলি আগেই সরানো হয়ে গেছে
কিচেনে। খানিক বাদে
সেডাকশান খেয়ে গৃহিণী গেলেন শুতে,
একা বসে থাকি বারান্দায়। হঠাৎ কে নাড়ে করা
এত রাতে? ঝুঁকে দেখি একটি তরুণী
দরজায় একাকিনী, সাততাড়াতাড়ি
তাকে এনে বসালাম পাশের চেয়ারে। দেখে চেনা
মনে হলো, অথচ সঠিক
কোথায় দেখেছি তাকে এর আগে, মনে পড়ছে না।

অগাধ সৌন্দর্যে তার লেপ্টে আছে অতীতের আভা
তন্বী গাছে ডুক্‌রে-ওঠা কোজাগবী পূর্ণিমার মতো।
ক্যাসেট প্লেয়ারে
দরবারি কানাড়া গুমরে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে, আমি
অপলক চেয়ে থাকি তার দিকে, পেটরোগা মানুষ যেমন
তাকায় থালায় রাখা জ্বলজ্বলে সুখাদ্যের প্রতি।

'ভীষণ অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?' মধ্যরাতে
কে যেন সেতারে টোকা দিল। যদি বলতাম তাকে
বিস্ময়ের ঝালর কাঁপেনি
মনের ভেতরে এতটুকু, তবে ভুল বলা হতো।

'ইন্দ্রাণীকে মনে নেই?' এই প্রশ্ন আমার দৃষ্টিকে এ রাতের
অতিথির শরীরের অপরূপ রত্নদ্বীপ থেকে
চকিতে সরিয়ে আনে। কী করে ভুলব তাকে, মানে
ইন্দ্রাণীকে? তিপ্পান্নোর সাহিত্য মেলায়, মনে পড়ে,
গোধূলি বেলায় স্মিত হেসে
ইন্দ্রাণী একটি খাতা, সুখ-স্বপ্নের মতো আশ্চর্য সোনালি,
দিয়েছিল একজন বিশুদ্ধ কবিকে। আমি শুধু
দূর থেকে কাঙালের ধরনে দেখেছি সে অর্পণ। তারপর
হেঁটে চলে গেছি একা, বড় একা খোয়াইয়ের তীরে
ভাসাতে আমার হৃদয়ের কীটদষ্ট কিছু ফুল।

এতকাল পরে ফের কী ভেবে ইন্দ্রাণী
আজ ব্রহ্মচারিণীর ধরনে এসেছে এ শহরে সঙ্গে নিয়ে বীরভূমের
একরাশ শিমুল, পলাশ? প্রত্যাশায়
রক্তে বাজে সরোদের বোল,
আমি তাকে রুদ্রাক্ষের মালা খুলে নিতে
মিনতি জানাই, অথচ সে নিরাসক্ত কণ্ঠস্বরে তুলে নিয়ে
তিপ্পান্নোর রেশ বলে, 'আনিনি সোনালি খাতা, শুধু
আপনাকে দেখতে এসেছি।'

দুখিনী সাঁথিয়া

মধ্য মার্চ নগরবাড়ির ঘাটে কোকোকোলা, সাদা জিপে চড়ে
পড়ন্ত বেলায় পৌঁছে গেলাম দুখিনী সাঁথিয়ায়।
থানার পাশেই ডাকবাংলো,
মন-মরা, কেমন নিষ্প্রভ,-কিন্তু লহমায়
মানবিক আভা বিচ্ছুরণে, হাসি-গল্পে যেন আমি
একটি উজ্জ্বল দ্বীপে ছুটি পেয়ে যাই গোধূলি বেলায়।

কাজলা দিদির মতো সন্ধ্যা আসে আর
চকিতে ঘোমটা টেনে নিত্যকার লোডশেডিং এবং

হ্যাজাক ছাড়াল আলো মঞ্চে, নিমেষে রবীন্দ্রনাথ
নজরুল ইসলাম ব্যাপ্ত মীড়ে মীড়ে
সাঁথিয়ার ব্যাকুল হৃদয়ে। দীপকের কণ্ঠস্বরে
আধুনিক কবি ঠাঁই পান, চকোর কবিতা পড়ে, সুর
মাটি-ঘাস, আল ছুঁয়ে বিলে পৌঁছে যায়। রাত বাড়ে,
ভাটা পড়ে অলৌকিক কলরবে। স্তব্ধতার
মধ্য দিয়ে হেঁটে ফিরে আসি ডাকবাংলোয়। রাত
দেড়টায় শুতে যাই, কিছুতে আসে না ঘুম, চোখ পুড়ে যায়।

জানালার বাইরে আঁধারে কার চোখ জ্বলে? কোত্থেকে অঙ্গার
এলো এত রাতে? ঝোপ থেকে
মানুষখেকোর গন্ধ ভেসে আসে যেন,
আর ইজিচেয়ারে নিশ্চুপ
গা এলিয়ে দিয়েছেন জিম করবেট। সহচর
রাইফেল পাশে স্তব্ধ প্রহর পোহায়।
বিনিদ্র পাখির ডানা ঝাড়ার শব্দের মতো একটি আওয়াজ
ভেসে আসে, তাকে মনে পড়ে। কাকে? একটি দুপুর
এবং একটি সন্ধ্যা আমার অধীর অঞ্জলিতে
জমা রেখে যে এখন জিম্মি অন্য কোনোখানে, তাকে।
কোকিলের ডাকে ঘুম ভাঙে। কতকাল
শুনিনি কোকিলকণ্ঠ। রোদ এসে শিমুলের রঙে
রাঙিয়ে দিয়েছে ডাকবাংলোকে। বাসি
মুখ ধুই, ফিরে যাব। একটু পরেই
আসবেন ওরা– অধ্যাপক, ছাত্র, সাংবাদিক
কেউ কেউ, সাধারণ মানুষ কজন, সর্বোপরি
কৌতূহলী বালক-বালিকা। ফিরে যাব,
ক্যামেরায় স্নিগ্ধ গাছপালাসহ স্মৃতিময় ছবি, ক্লিক, কবি
এত তাড়া কিসের? বলিনি গাড়ি ঠিক
সময়েই এসে যাবে? কোনো দিন ফের দেখা হবে।

ঈশ্বরদীতে ধরব প্লেন। কিছু উদ্ভিদের স্পর্শ, কিছু
মেঠো ঘ্রাণ কতিপয় মুখ, গল্পে-গানে ঝলমলে,
হৃদয়ের শেকড়ে
থাকবে জড়িয়ে। সাঁথিয়ার প্রতি ওড়াব রুমাল যথারীতি।
আবার শহুরে আড্ডা, টাইপরাইটারের দ্রুত
চটপটে শব্দের মতো অস্থির ব্যস্ততা, অতিকায়

মৌচাকের গুঞ্জরণ, হেনরি মিলার সাক্ষী, এয়ারকুলার
দুঃস্বপ্ন ছড়িয়ে দেবে বহুতল দালানের আনাচে-কানাচে।
কখনোসখনো
হৃদয়ে কোকিল হয়ে ডেকে যাবে দুখিনী সাঁথিয়া।

ভোরের কাগজ

প্রত্যহ হকার এসে ভোরের কাগজ দিয়ে যায়।
কখনো কখনো
লোকটাকে দেখি একটানা কিছুদিন
সাইকেলে আসে,
আবার এমনও হয়, বহুদিন তার সঙ্গে দেখা
হয় না আমার আর কখনো কাগজ
দিতে দেরি করে যদি আমি হেঁটে গিয়ে কিনে আনি
স্টল থেকে। হকারের প্রতি বিরূপতা
মাঝে-মাঝে মাথা তোলে, কিন্তু ঝরে যায়
মাথার খুশকির মতো পুনরায়; ফলত এখনও
সে আমার দরজায় কড়া নেড়ে ভোরের কাগজ
বিলি করে রোজ।

এ-ও এক ভীষণ নাছোড় নেশা, মদ্যপের মতো
হয়ে যাই প্রত্যহ সকালে,
বিশ্ব পান করে
আখেরে কিছুটা স্বস্তি জোটে, শান্তি যদিও এখনও
গৃহত্যাগী পুত্রের ধরনে ঘোরে বিয়াবানে আর
প্রতিধ্বনিময় কত পর্বতগুহায়।

নিউজপ্রিন্টের বুক থেকে হেডলাইন সমেত
সকল খবর লুপ্ত, দেখি সারা পাতা জুড়ে খুব
জ্বলজ্বলে পতাকার মতো
ফেদেরিকা লোরকার রক্তাক্ত শরীর
সময় পোহায়। জীবনানন্দের হাতে গূঢ় পাণ্ডুলিপি
কিছু শঙ্খচিল হয়ে ঝরায় নীলাভ আচ্ছন্নতা,
কখনো আবার নক্ষত্রেরা চাঁদকে স্যালুট করে
কুচকাওয়াজের ঢঙে, নালন্দার প্রকোষ্ঠে একাকী
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আছেন ব'সে, চোখে তাঁর স্বপ্ন বুনে যায়

কার হাত, কখনোবা তাজিকস্তানের সুন্দরীর
কংকাল গোলাপ ফুটে থাকে বেশুমার, করোটির চক্ষুহীন
কোটরে ঝরায় গজলের অন্তরাগময় সুর
বিগত-যৌবন বুলবুল।

কখনো নজরে পড়ে নিউজপ্রিন্টের বুকে শামুক কুড়ায়
দেহাতি বালক আর বাদামি গোরুর শিঙে কাঁপে
স্বপ্নঝালরের মতো প্রজাপতি আর
রাত দেড়টায় হুড-ঢাকা রিকশায়
একটি অসুস্থ গোলাপের মতো অনিদ্র গণিকা পাক খায়
শহরের পথে পথে। কখনো আবার চোখে পড়ে
আমার না-লেখা
বেবাক অনিন্দ্য কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা,
কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুলে যাই শব্দাবলি, ছন্দ দোলা। তারপর
কী আশ্চর্য, ভোরের কাগজে দেখি, একি
দেবশ্রী লাইনো টাইপের অক্ষরের পরিবর্তে দশদিকে
ছড়ানো ছেটানো তপ্ত সিসের খইয়ের মতো অজস্র বুলেট।

আমার অভিযোগের তর্জনী

আমার অভিযোগের তর্জনী এখন তোমার দিকেই
উদ্যত। নিঃসঙ্গতা
জ্বলজ্বলে মণিহারের বদলে লোহার শেকল হয়ে উঠলেই
উত্তুঙ্গ চূড়া ছেড়ে নিচে
নেমে আসতে হবে, এ-কথা
কে বলেছিল তোমাকে? কেন তুমি
প্রাচীন ইরানি চিত্রকরের
ছবির মতো পাখার বৈভব আর চঞ্চুর কিরীচে
স্বপ্নের সওগাত গেঁথে এই নচ্ছার মৃত্যুমাখা
ভাগাড়ে নেমে এসেছিলে?

তোমার পাখায় ছিল নীলমণির মতো আকাশের
নিঃসীম উল্লাস, চারণ কবির
মেঠো গাথার মতো বন্দনা-মুখর সহজ সৌন্দর্য,
আর সুকণ্ঠ মুয়াজ্জিনের আজানের মতো অনাবিল আহ্বান।
তোমার চোখে আশ্রয় পেয়েছিল

সেই বিপ্লবীর অন্বেষা, যে তার চিরকালীন ঘর ছেড়ে
ঘুরে বেড়ায় পথে পথে ভ্রষ্ট পথিকদের
অভীষ্ট উদ্যানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

তোমার এই নিরুপম ঐশ্বর্য ভীষণ বেমানান
এখানে, এখন এ-কথা
তোমার বুঝতে বাকি নেই নিশ্চয়। মড়াখেকোদের ভিড়ে
কী গান গাইবে তুমি? ইতিমধ্যেই কি আবর্জনায়
রুদ্ধ হয়ে আসেনি তোমার কণ্ঠনালি?
তোমার হৃৎপিণ্ড কি বেরিয়ে আসতে চাইছে না
এক দুঃসহ চাপে,
যার উৎস দুর্বিনীতের আস্ফালন, নির্বোধের ক্রোধ?
ইচ্ছে হলেই এখন তুমি তোমার চিত্রিত পাখা মেলে
ফিরে যেতে পারবে না দূরের আকাশে,
যেখানে তুমি সাঁতার কাটতে পারো স্বচ্ছন্দে নানা রঙের
মেঘের রেণু ওড়াতে ওড়াতে,

যেখানে পবিত্রতার মতো শূন্যতা ছড়িয়ে আছে
তবকে তবকে। বস্তুত এই মুহূর্তে তোমার
পাখা দুটোকে ছন্দিল করে তোলার
কোন উপায় নেই। কেননা তোমার পদদ্বয়
আর পাখা শোচনীয়ভাবে আটকে গিয়েছে
রাশি রাশি তারের মতো নাড়িভুঁড়িতে।
আস্তে আস্তে চতুর্দিকে থেকে এগিয়ে আসছে
শেয়াল কুকুরে পাল,
আর তোমার বুকের ভেতর ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার,
যেমন কোন শহরে চড়াও হয় দখলদার সেনাবাহিনী।
এক্ষুণি ওরা ঘিরে ধরবে তোমাকে। এই আগ্রাসী
ব্যূহ ভেদ করবার সাধ্য তোমার নেই।
তোমার একদিকে মাথা-ডোবানো গলিজ জঞ্জাল,
অন্যদিকে ক্ষমাহীন শত্রুতা। বলো, হে স্বপ্নলালিত সৌন্দর্য,
কোথায় পালাবে তুমি? কোথায়
তোমার পরিত্রাণ?'

আমি দেখতে পাচ্ছি
ডানদিকে শোকের মতো ছড়ানো

তোমার ছেঁড়া-খোঁড়া যাবতীয় পালক, বাঁয়ে
গড়াগড়ি যাচ্ছে তোমার মুন্ড আর তখনও-স্পন্দিত
হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ শেয়ালের দাঁতে আর
নিষ্পত্র গাছে বসে হাসছে কতিপয় শকুন।
শ্মশানের ঠা ঠা রৌদ্রের মতো সেই অট্টহাসি
ব্যাপ্ত হলো দিগন্ত থেকে দিগন্তে
এবং আমার অভিযোগের তর্জনী এখন তোমার
ধ্বংসাবশেষের দিকে উদ্যত। কে তোমাকে
উদার আকাশের মেঘমালার সঙ্গ ছেড়ে,
পর্বতচূড়ার সখ্য ছেড়ে
এই ভাগাড়ে নেমে আসতে বলেছিল?

বুঝলে হে জগন্নাথ

হুম, বুঝলে হে জগন্নাথ,
আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আজ থেকে
তোমাকে কিছুই আর করতে হবে না। না, হঠাৎ
খেয়ালের বশে কিছু করিনি, অনেক ভেবেচিন্তে, নকশা এঁকে,
যাকে বলে সর্বসম্মতিক্রমে এই হলো, দেনা
শোধের বালাই নেই, ধার–
তা-ও আর বুঝলে হে জগন্নাথ, করতে হবে না।
এতে যদি কেউ বলে ফেলে তোমার মাথায় বাজ
পড়েছে, তাহলে বড্ড বাড়াবাড়ি হবে। সবই ফাঁকি, ফক্কিকার।

কী বললে? আপন হাতই জগন্নাথ? ছেঁদো কথা, ওসব চলে না
আর আজকাল।
নিজ চোখে দেখছ না এই জমানার হালচাল?
তোমার হাতের কাজ বন্ধ হলো বটে, তবে চোখ
দুটো তো আছেই, তুমি চেনা
সেই উপনিষদের দ্বিতীয় পাখির মতো শুধু চেয়ে চেয়ে
দেখবে, অন্যেরা সবকিছু করবে সকল ঋতুতে। যার ঝোঁক
রয়েছে যে-দিকে সেদিকেই যাবে দড়িবাঁধা রথ, তুমি মুখ
খুলবে, সে-পথ খোলা রাখিনি, বরং চুপচাপ খেয়ে দেয়ে
যাতে দিন নির্বিঘ্নে কাটাতে পারো, সুখ
চেখে তৃপ্ত হতে পারো, ব্যবস্থা নিয়েছি, অর্থাৎ যা যা পেতে

তা-ই পাবে অবিকল, এ ব্যাপারে পান থেকে চুন
খসবে না। ভাগ্যিস তোমাকে ঠা ঠা রোদে পুড়ে ক্ষেতে
লাঙল ঠেলতে বলা হয়নি, অথবা উঁচুনিচু পথে টেনে নিতে গুণ।

তাই বলি, অভিমানে মুখ অন্ধকার করে পথের কিনারে
একা বসে থেকো না, নিজের কর্মফল
ভেবে মেনে নাও সব। তোমাকে ভাগাড়ে
আমরা দিয়েছি ছুড়ে, এমন নাহক অভিযোগ
আমাদের পরম শত্রুও করবে না। আর ধর্মের কল
বাতাসে নড়ে না ইদানীং; উপরন্তু বাঘের ঘরেই ঘোগ
বাসা বাঁধে, এসবও তামাদি হয়ে গেছে বহুদিন।
এভাবে তাকাচ্ছ কেন? তোমার হাতের স্রেফ দুটো,
বুঝলে হে জগন্নাথ, কব্জি কেটে ঠুঁটো
বানিয়েছি বৈ তো নয়। মিছেমিছি মুখ তুমি করো না মলিন।

বিউটি বোর্ডিং

আজকাল কোনো কোনো বিকেলে হঠাৎ কী রকম
হয়ে যাই, কী রকম এলোমেলো, যেন
আমার ভেতরে
কালবৈশাখীর মাতলামি, ভুলে যাই ইদানীং
আমার মাথার তিন ভাগ চুলে সাদার পোচড়া
পড়েছে, চোখের আলো বিকেলবেলার
মতোই স্তিমিত। বাসনার স্বপ্ন-ধোওয়া চরে নামে
আচাভুয়া পাখি, মাটি খুঁড়ে বের করে প্রত্ন হরেক রকম।

মনে পড়ে, একদা যেতাম
প্রত্যহ দু'বেলা বাংলাবাজারের শীর্ণ গলির ভেতরে সেই
বিউটি বোর্ডিং-এ পরস্পর মুখ দেখার আশায়
আমরা ক'জন,
তখন তুমুল সময়কে
দিয়েছি গড়িয়ে স্রেফ চায়ের বাটিতে,
কখনো জ্বলন্ত পুণ্য ঝোপের মতন
মাথা আর জঠরাগ্নি নিয়ে
পড়েছি কবিতা শাপভ্রষ্ট দেবতার স্বরে। কখনও জুটেছে
ফুল চন্দনের ঘ্রাণ, কখনোবা হুল বেশুমার।

কোনো কোনো দিন ডাকে এলে দূর কলকাতা থেকে
বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' আমাদের চকচকে
চোখগুলি পড়ত হুমড়ি খেয়ে স্থল পাইকার
নান্দনিক ভিড়ে আর স্পন্দিত হৃদয়ে দেখতাম কার কার
কবিতা পেয়েছে ঠাঁই কিংবা কার পদ্য
স্বর্গচ্যুত হলো সদ্য-পাওয়া সেই স্বপ্নিল সংখ্যায়।

কাউন্টারে শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ তার একটি খাটো পা
দোলাতেন মৃদু স্বরবৃত্তের মতন, লিখতেন
কালো বেঁটে কলমে লম্বাটে
খাতায় হিসাব আর আমরা কানি বকের ছানার মতো
চায়ের পেয়ালা সামনে রেখে
উঠতাম মেতে
পাউন্ড স্পেংলার টোয়েনবি, মার্কস, উত্তর-রৈবিক
কবিতার দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে প্রত্যাগত
নাবিকের ধরনে এবং আমাদের
কত যে হাসির আলো মিশে গেছে গোধূলির বিনম্র আভায়।
একদিন হঠাৎ সকালে দশটায় শুনি বিউটির গৌর,
যুবক বেয়ারা, যৌন রোগী, ঝুলেছে ফাঁসিতে কাল মধ্যরাতে।

কতকাল যাই না সেখানে আর বিউটি বোর্ডিং-এ।
সেখানে যেতাম যারা আড্ডার সুরায়
চুর হতে, তারা কবে ছিটকে পড়েছে দশদিকে,
যেন ভালুকের থাবা
হঠাৎ ফেলেছে ভেঙে তন্ময় মৌচাক। আমি আর
দুরু দুরু বুকে
ঈষৎ কম্পিত হাতে সদ্যলেখা কবিতা কারুকে শোনাই না,
বরং নিজেই শুনি কোনো কোনো তরুণ কবির
আবেগার্ত পদাবলি কখনো-সখনো;
মহিলা কলেজে-পড়া তরুণীর সঙ্গে স্মিত হেসে
কথা বলি, অটোগ্রাফ খাতায় কলের
পুতুলের মতো সই দিই বিয়ে বাড়িতে অথবা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। হয়তো কেউ কেউ
আমার আড়ালে-আবডালে বলে ফিসফিসে স্বরে
'ভদ্রলোক তেমন যুবক নেই আর।'

যারা কথা ভেবে ভেবে একদা আমিও নীল প্যাডে
করেছি উজাড় থরথর
হৃদয় আমার আজ তাকে ভাবি ভাবলেশহীন,
দৈবক্রমে দেখা হলে তার পুত্র-কন্যার মাথায়
আদর ঝরাতে পারি অবলীলাক্রমে
ওদের পিতার কোনো সুহৃদের মতো।
ক্যান্সারের মতো দ্রুত বর্ধমান বয়স আমার।
কতকাল, কত দীর্ঘকাল
বিউটি বোর্ডিং থেকে নির্বাসিত আমি। কোনো দিন
আবার সেখানে ছুটে যেতে পারব কি
আষাঢ়ের বৃষ্টি-আঁচড়ানো অপরাহ্ণে কিংবা কোনো
গনগনে ভাদ্রের দুপুরে? যাই যাই
কোনো কোজাগরী পূর্ণিমায়,
করোটির মতো সেই বিউটি বোর্ডিং-এ,
কৈশোরে আঁধারে ভূত দেখার মতন
ভয়ানক ভয় পাব আমি?

ট্রেনের জানালা থেকে

সতেজ সকালবেলা সবুজ আড়ালে
ডুরে-শাড়ি-পরা
যৌবন দাঁড়িয়ে ছিল একাকিনী, খুব দ্রুতগামী
ট্রেনের জানালা থেকে দেখলাম। তার
গোড়ালির গন্ধ শুঁকে
একটি গুবরে পোকা ঢুকে পড়ে ঘাসের ভিতরে।
অকস্মাৎ ধবধবে বক উড়ে যায়
দাবার ছকের মতো ক্ষেতের ওপর দিয়ে, আসমানী প্রসাধন চলে
জলের আরশিতে। শূন্য নৌকা
ডাঙায় কুঁড়েমি করে, কী যেন কুড়ায় পথে বিশীর্ণ বালক।

পিত্রালয়ে ফিরোল্টা যাবার আশা পলাশের আভা।
ছড়িয়ে তার চোখে, নাকি
প্রবাসী স্বামীর প্রত্যাবর্তনের পথ-চেয়ে-থাকা
ফোটায় অজস্র তারা রক্তকণিকায়,
নাকি ওর হৃদয়ের গহন দুপুরে

মোহন চক্কর দিতে দিতে ডেকে যায় শঙ্খচিল।

হয়তো কেউ তাকে ডেকে নিয়ে গেছে নিকানো উঠোনে,
ধান ভানা বাকি আছে, আছে
ইঁদারার কাছে যাওয়া, বাসী কিছু বাসন-কোসন
মেজে ঘষে ধুয়ে মুছে
সাজিয়ে রাখতে হবে। শিকায় ঝোলানো
খয়েরি বৈয়ম থেকে গুড়
এখুনি নামিয়ে দিতে হবে, গাছ-পাকা
পেঁপে কেটে দিতে হবে
অতিথির পাতে, সে এখন মিশে যাবে সংসারের
শত কাজে, যেমন দিঘির সুনসান
পানিতে সহজে ভেসে যায়
মাটির কলস।

ভোরবেলাকার ট্রেন হুইসল্ বাজাতে বাজাতে
ছুটে যাচ্ছে, গাছগাছালির আড়ালবর্তিনী ডুরে-শাড়ি-পরা
যৌবন দাঁড়িয়ে আছে আমার ভিতরে।
কী-যে তার নাম,
বিবাহিতা অথবা অনূঢ়া,
নাকি উপস্থিত রজস্বলা নাকি সদ্য গর্ভধারিণী, এসব
কিছুই না জেনে দ্রুত চলেছি একাকী
শহুরে মানুষ। একদিন
সবুজ আড়ালে-থাকা ডুরে-শাড়ি-পরা
যৌবন নিশ্চিত মুছে যাবে,
যেন জলরঙ; আপাতত আমি খুব চুপচাপ
ট্রেনের জানালা থেকে লঙ শটে দেখে নিচ্ছি জলমগ্ন মাঠ,
নিবিড় লাঙল-ঠেলা কৃষকের রোদ্দুরে-পিছলে-পড়া পিঠ,
আনন্দ-বলয় থেকে আসা পাখি, তারে-বসা, শুদ্ধচারী মেঘ
এবং ভাবছি তাকে, বানাচ্ছি প্রতিমা তার স্মৃতির ভিতরে,
নাম ধাম যার
সর্বদা থাকবে ঢাকা বেজায় বেগানা কুয়াশায়।

এখন তো মৃতরাই প্রশ্নশীল

আমি কি এপ্রিলে মুগ্ধাবেশে

তোমাকে রঙিন পোস্টকার্ড, বহুদূর শহরের ছবিঅলা,
পাঠিয়েছিলাম? আজ রাতে
কিছুতেই মনে পড়ছে না। কখনও তন্দ্রার মেঘ
আমার অস্তিত্বে ছেয়ে এলে,
বহু ছবি, মূলত অস্পষ্ট, ভেসে ওঠে এলোমেলো
মনের নানান স্তরে বিমিশ্র স্মৃতিতে।
একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই, আপাতত
ধারাবাহিকতা খুঁজে মেলা ভার। এই সেই মুহূর্ত যখন
একদা যা ঘটেছিল তার
হদিশ মেলে না আর যা ঘটেনি কোনো দিন,
তাকেই নিভাঁজ সত্য ঘটনার প্রতিবিম্ব মনে হয় বস্তুত আমার।

তোমার বাগানে আমি ছিলাম সে-রাতে
গোলাপ গাছের কাছে? আমি কি তোমাকে স্পর্শ করে
উচ্চারণ করেছি শপথ
নিসর্গের নামে, নক্ষত্রের নামে, হৃদয়ের নামে
সে-রাতে বাগানে উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার পাশে দাঁড়িয়ে একাকী?
দেখেছি তোমার
বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে রুপালি পাখি চোখ
হয়ে গেঁথে গিয়েছিল আমার শরীরে? লহমায়
ফুরিয়েছে সে-প্রহর, গাড়িবারান্দায়
বিদায়ের ছায়াচ্ছন্ন ঠোঁটে জমেছিল
ক'ফোঁটা শিশির। নিসর্গের অন্তর্গত
ছিলে তুমি, ছিলে কোনো না-লেখা প্রেমের কবিতায়।
ছিল কি বাগান কোনো গোলাপে সাজানো? বাস্তবিক
ছিলে কি সেখানে তুমি সে-রাতে নবীনা? কে আমাকে বলে দেবে?

একদা জন্মেছি যে-শহরে তার হাড়-পাঁজরা সব
হয়েছে ঝাঁজরা হানাদারদের মর্টারের শেলে, শহরের
আনাচে-কানাচে
আজরাইলের তীক্ষ্ণ নখের আঁচড় অবিরত

পড়েছে ব্যাপক, এমনকি শহীদের কবরেও বয়ে গেছে
বুলেটের ঝড়। চৌরাহায় মধ্যরাতে
নেকড়ের চিৎকারের মতো
দুরন্ত হাওয়ায়

হাতে তুলে নিয়েছি পতাকা বেদনার্ত মহিমায়
গুলিবিদ্ধ আমি, নিইনি কি?

আমার গলিতে যে-বালক খুব উঠেছিল বেড়ে
তমালের মতো, তাকে ওরা একাত্তরে
চোখ বেঁধে নিয়ে গেছে কালো বধ্যভূমিতে এবং
যাকে আমি ফ্রক ছেড়ে শাড়ি প'রে হেমন্ত-বিকেলে
বারান্দায় দাঁড়াতে দেখেছি, সে তরুণী
হয়েছে ধর্ষিতা বারংবার
শত্রুর শিবিরে আর আমাদের প্রেমও
হয়েছে ভীষণ গুলিবিদ্ধ কোজাগরী পূর্ণিমায়।

অনেকের স্মরণের ল্যান্ডস্কেপে নেই যেন আজ
কোনো বধ্যভূমি, লক্ষ লক্ষ খুলি, স্মৃতিসৌধ কোনো।
আমারও কি নেই? কে আমাকে বলে দেবে?
এখন তো মৃতরাই প্রশ্নশীল বড়।

বহুদিন পর মাকে

সুরমা রঙের মেঘে রোদ্দুরের পাড়, চরাচরে
চকিতে ছড়িয়ে পড়ে সুর,
হৃদয়ের ভোরবেলাকেই ভরে তোলে, পিছুডাক;
আসমানে চিলের পাখার ঝলসানি।

বারান্দার জায়নামাজের মখমলে প্রজাপতি,
এককোণে তসবি ধ্যানস্থ,
হঠাৎ কী ভেবে তিনি ঘরের ভেতর
গেলেন আমার আম্মা। চৌকাঠে লুটায়
রোদ্দুর, শিশুর হাসি। বহুদিন পর
মাকে দেখলাম তাঁর
আলমারি গোছাতে, একটা ঘ্রাণ, পুরানো দিনের,
সারা ঘরে গুণীর তানের মতো ব্যাকুল ছড়ানো।

আমি অগোচরে;
নানা কাপড়ের ভাঁজে কী যেন তন্ময়
খুঁজছেন; ঘরে ওড়ে প্রজাপতি। ফটোগ্রাফ থেকে
আমার পিতার চক্ষুদ্বয়

হাতে তুলে নিয়েছি পতাকা বেদনার্ত মহিমায়
গুলিবিদ্ধ আমি, নিইনি কি?

আমার গলিতে যে-বালক খুব উঠেছিল বেড়ে
তমালের মতো, তাকে ওরা একাত্তরে
চোখ বেঁধে নিয়ে গেছে কালো বধ্যভূমিতে এবং
যাকে আমি ফ্রক ছেড়ে শাড়ি প'রে হেমন্ত-বিকেলে
বারান্দায় দাঁড়াতে দেখেছি, সে তরুণী
হয়েছে ধর্ষিতা বারংবার
শক্রর শিবিরে আর আমাদের প্রেমও
হয়েছে ভীষণ গুলিবিদ্ধ কোজাগরী পূর্ণিমায়।

অনেকের স্মরণের ল্যান্ডস্কেপে নেই যেন আজ
কোনো বধ্যভূমি, লক্ষ লক্ষ খুলি, স্মৃতিসৌধ কোনো।
আমারও কি নেই? কে আমাকে বলে দেবে?
এখন তো মৃতরাই প্রশ্নশীল বড়।

বহুদিন পর মাকে

সুরমা রঙের মেঘে রোদ্দুরের পাড়, চরাচরে
চকিতে ছড়িয়ে পড়ে সুর,
হৃদয়ের ভোরবেলাকেই ভরে তোলে, পিছুডাক;
আসমানে চিলের পাখার ঝলসানি।

বারান্দার জায়নামাজের মখমলে প্রজাপতি,
এককোণে তসবি ধ্যানস্থ,
হঠাৎ কী ভেবে তিনি ঘরের ভেতর
গেলেন আমার আম্মা। চৌকাঠে লুটায়
রোদ্দুর, শিশুর হাসি। বহুদিন পর
মাকে দেখলাম তাঁর
আলমারি গোছাতে, একটা ঘ্রাণ, পুরানো দিনের,
সারা ঘরে গুণীর তানের মতো ব্যাকুল ছড়ানো।

আমি অগোচরে;
নানা কাপড়ের ভাঁজে কী যেন তন্ময়
খুঁজছেন; ঘরে ওড়ে প্রজাপতি। ফটোগ্রাফ থেকে
আমার পিতার চক্ষুদ্বয়

চেয়ে থাকে, যেনবা আবৃত্তি করে জন্মদিন। কারুকাজময়
আলমারি থেকে
একটি গোলাপি বানারসী শাড়ি হাতে
নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন কিছুক্ষণ,
তাকিয়ে লাজুক চোখে এদিক ওদিক
জড়ালেন গায়ে।

অকস্মাৎ রঙধনু, তাঁর সমগ্র সত্তায়, যেন
তিনি পুনরায় নববধূ অতীতের
চন্দ্রিল বাসর ঘরে। বৈধব্যের গোধূলিতে একটি গোলাপি
বানারসী শাড়ি হাতে
দাঁড়ানো আমার আম্মা। চোখে
তাঁর বাইফোকাল চশমা,
এবং স্খলিত দাঁত, সময়ের নখের আঁচড়

উৎকীর্ণ অস্তিত্বময়, যেন কবিতা লিখতে গিয়ে
কিছু হিজিবিজি এঁকে ফেলেছি খাতায়। আজ এই
সত্তরেও দেখি
যৌবন আনন্দ তাঁর কাছে।
'এর আগে এমন সুন্দর আমি দেখিনি তোমাকে',
মনে মনে উচ্চারণ করে অন্তরালে
সৌন্দর্য লুণ্ঠনকারী সরে যাই সে বাসর থেকে।

সুরমা রঙের মেঘে রোদ্দুরের পাড়, কতিপয়
কবুতর রেলিঙ-এ আতিথ্য নেয়, গম
পাবে; মা আমার
দাঁড়ানো দরজা ঘেঁষে, তাঁকে
কী এক উৎসব
ত্যাগ করে গেছে, মনে হয়। আলগোছে
নেবেন কুড়িয়ে তিনি ফিরোজা তসবি
একটু পরেই–
কখন যে মদির গোলাপি বানারসী হয়ে যায়
পশ্চিম আকাশ আর তিনি
আছেন দাঁড়িয়ে
একাকিনী; প্রতীক্ষার কাতর প্রতিমা।

মোমবাতি

কখনো কখনো এরকম হয়, দেরাজ, কুলুঙ্গি
খুঁজে পেতে
একটি ডাগর মোমবাতি
বের করি, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে
পোড়াই সলতে তার, রাখি
লেখার টেবিলে কিংবা মোমবাতিটিকে
যেনবা সোহাগ ভরে হাতে নিয়ে করি
এঘর ও-ঘর, মাঝে মাঝে
বিচ্ছুরিত আলো দেখি একাগ্র দৃষ্টিতে,
যেমন রবীন্দ্রনাথ দেখতেন দিনের প্রথম আলোধারা।

মোমবাতি তপ্ত পানি ফেলে ফোঁটা ফোঁটা,
হাতে পড়লে হাত দ্রুত
সরিয়ে জমাট মোম যত্নে তুলে
ফেলে হাত বুলোই খানিক ছ্যাঁকা-খাওয়ার জায়গাটায়। কখনোবা
টপ-টপ-করে-পড়া জলের আড়ালে
কস্মিনকালেও
না-দেখা তাতার সুন্দরীর অশ্রুপাত লক্ষ্য করে
বড়ই উদাস হই। ঝড়
বইতে থাকে বুকের ভেতর, সেই রোরুদ্যমানা, এলোকেশী
সুন্দরীর কথা ভেবে বড় কষ্ট পাই।

লোডশেডিং-এর ফলে মোমবাতি মহার্ঘ এখন,
তবু কিনি নিয়মিত; অন্ধকারে মোমবাতি জ্বেলে চুপচাপ
বসে থাকা ঘরে,
শিখাটির দিকে অপলক চেয়ে-থাকা
কিছুক্ষণ, অথবা সিঁড়িতে, বারান্দায়, কম্পমান
আলোর সংসর্গে ঘোড়া গথিক উপন্যাসের কোনো
চরিত্রের মতো, ভালো লাগে। ভালো কোনো
মোমবাতি-প্রসূত আলোয়
গহন প্রহরে কবিতাকে ডেকে আনা, কবিতায়
তাকেই আবৃত্তি করা, যাকে ঈষৎ ভুলেছি সময়ের ধোপে।

গ্রন্থস্বত্ব

আমাকে চমকে দিয়ে কখনো কখনো
আমার ভেতরে কেউ একজন হো-হো হেসে ওঠে,
মাছে মাঝে নিঝুম গুমরে কাঁদে নিভৃত আড়ালে,
কাঁদে একা একা।

আমাকে কিছু না বলে অকস্মাৎ গহন রাত্তিরে
গৃহত্যাগী গৌতমের মতো
চলে যায় হেঁটে বহুদূরে, যেন সব
সম্পর্ক চুকিয়ে চলে যায়। কোথায় যে
যায় কত ধু-ধু বাঁক পেরিয়ে, জানি না।
যখন সে করে না বসত আর আমার ভেতর,
তখন স্মৃতিতে তার ছায়া
বড় বেশি আনাগোনা করে। দীর্ঘকাল
প্রতীক্ষায় থাকি তার; কিন্তু আসে না সহজে সেই পর্যটক
আমার ইচ্ছাকে দিতে একান্ত পুষ্পিত উপহার।

আবার এমনও হয়, এত্তেলা ছাড়াই
চুপিসারে একদিন ফিরে আসে আমার নিকটে অবেলায়,
ধুয়ে মুছে কায়ক্লেশ ওজু করে স্বপ্নের ভেতরে বেদনায়।
তার চোখে রহস্যের ভাষা
ভাষাতীত বোধ বুনে দেয়। অকস্মাৎ সে পড়শি
তর্জনী উঁচিয়ে
আমার সকল গ্রন্থস্বত্ব দাবি করে। আর গূঢ়
অনিবার্য উচ্চারণ শুনে
বিস্ময়ের পাখি ঠোকরায় আমাকে এবং আমি
ধন্দে পড়ে যাই।

আমার মৃত্যুর পরেও যদি

একটি পাখি রোজ আমার জানালায়
আস্তে এসে বসে, তাকায় আশেপাশে।
কখনো দেয় শিস্, বাড়ায় গলা তার;
আবার কখনোবা পাখাটা ঝাপটায়।

পালকে তার আঁকা কিসের ছবি যেন,
দু'চোখে আছে জমা মেঘের স্মৃতি কিছু;
নদীর স্বপ্নের জলজ কণাগুলি
এখনও তার ঠোঁটে হয়তো গচ্ছিত।

কাউকে নীড়ে তার এসেছে ফেলে বুঝি?
হয়তো নেই নীড়, আকাশই আস্তানা।
তাই তো চোখ তার এমন গাঢ় নীল,
মেললে পাখা জাগে নীলের উৎসব।

যখন লিখি আমি টেবিলে ঝুঁকে আর
পড়তে বসি বই, তখন সেই পাখি
চকিতে দোল খায় আমার জানালায়–
খাতার পাতা জুড়ে ছড়িয়ে দেয় খুশি।

আমার মৃত্যুর পরেও যদি সেই
সুনীল পাখি আসে আমার জানালায়,
আবার শিস দেয়, আমার বইখাতা
যদি সে ঠোকরায়, দিও না বাধা তাকে।

কেড়ে নেবে ওরা

তোর কাছ থেকে কেড়ে নেবে ওরা এক এক করে
সকল পালক। অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই
দশদিক ঘুরে যখন ক্লান্ত হয়ে যাবি তুই,
তখন সবাই দুয়ো দেবে তোকে। কেউ পদাঘাত
করবে হঠাৎ, কেউ ঘামে-ভেজা নমিত কেশর
লহমায় ছেঁটে তুড়ি মেড়ে ছুটে তারিফের বুড়ি
ছোঁবে আহ্লাদে আটখানা হয়ে। কেউবা হেলায়
তোর দিকে চোখ মেলে অবেলায় পর্ষদে পেশ
করবে নিখুঁত প্রস্তাব তার : 'এ বোঝা হটাও,
কবরে নামাও; তাহলেই চুকেবুকে যাবে সব।'
এই নিগৃহীত মুখ বুজে তুই

মেনে নিবি আজ?
এর জন্যেই ঊষর জমিনে ফোটালি গোলাপ,
জুঁই ও চামেলি? করলি শূন্যে এত কারুকাজ?

পুষলি বুকের রক্ত ঝরিয়ে সুবচনী হাঁস
এর জন্যেই? তুখোড়, চতুর কতিপয় লোক
খাঁচায় বদ্ধ জন্তুর মতো খুঁচিয়ে বেড়ায়
অসহায় তোকে যখন তখন, খুব ঝলমল
আড্ডায় তোর নিন্দা রটায় নিভাঁজ রগড়ে,
তুই শুধু পড়ে থাকবি ধুলায়। আজ পথে কাঁটা,
কাল মুখে ফের ফুল চন্দন। থোড় বড়ি খাড়া,
খাড়া বাড়ি থোড়, অবিরাম এই পুনরাবৃত্তি।

লোকে তার কথা বলে

লোকে তার কথা বলাবলি করে,
গ্রামে ও শহরে।

শোনা যায়, লোকালয় থেকে বহুদূরে নদীতীরে
এবং পাহাড়ে বন-বনান্তরে ঘুরে ঘুরে সে এসেছে ফিরে
আপন নিবাসে। ভেবেছিল নির্জনতা
শান্তি দেবে তাকে, লতা-
গুল্ম, নদী, পাখি, পাহাড়ের চূড়া তার সত্তা থেকে
ফেলবে গ্লানির কালি মুছে, দেবে ঢেকে
খানাখন্দ আহত মনের। মানুষের আচরণ, বলা যায়,
বড় বেশি ক্লান্ত করেছিল তাকে, তাই অসহায়
ব্যক্তির ধরনে
করেছে সে পর্যটন জনহীন মাঠে আর বনে।

আখেরে ভেঙেছে তার ভুল।
এবং সবাই দ্যাখে সে এখন লোকালয়ে ফুল
তোলে, কেনাকাটা করে দোকানে এবং ঝকঝকে
সেলুনের ছাঁটায় চুল, রকে
আড্ডায় শামিল হয়, বলে
নানা কথা বস্তুত সেসব কথা সঙ্গীদের কানের বদলে
মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। কারো কারো হাত
অকস্মাৎ
হয়ে ওঠে অতিশয় ঝোড়ো দাঙ্গাবাজ।
ফলত সে আজ

হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে, হয় না বিমুখ
তবু মানুষের প্রতি। ভাবে ভুলচুক
এই মর্ত্যবাসীদেরই হয়
আর ব্যান্ডেজের ঘেরাটোপ থেকে তার চক্ষুদ্বয়
স্বপ্নের মতোই জেগে থাকে, জ্বলজ্বলে। মাঝে-মাঝে গল্পচ্ছলে
শহরে ও গ্রামে লোকে তার কথা বলে।

আমার অজ্ঞতা নিয়ে

এখন মাঝরাস্তায় আমি; দমবন্ধ-করা নিঃসঙ্গতা
একটা মাকড়সার মতো হাঁটছে
আমার চোখে, গালে, কণ্ঠনালিতে,
বুকে, উরুতে আর
বেদেনীর ভলা যৌবন হয়ে
অন্ধকারের জোয়ার খলখলিয়ে উঠেছে আমার চারপাশে।

অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মনে হয়
এখানে কোথাও তুমি আছ, ডাকলেই
সাড়া দেবে নিমেষে। তলোয়ার মাছের মতো তোমার কণ্ঠস্বর
ঝলসে উঠবে অন্ধকারে।
কণ্ঠে সমস্ত নির্ভরতা পুরে তোমাকে ডাকলাম,
শুধু ভেসে এলো আমার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি।
অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেছি, যদি হঠাৎ
তোমার দেখা পেয়ে যাই।
ভেবেছি আমার দিকে প্রসারিত হবে
অলৌকিক বৃক্ষশাখার মতো তোমার হাত।

কতকাল প্রতীক্ষাকাতর আমি
তোমার কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে, কত পাথর আর কাঁটাময়
পথ পেরিয়েছি তোমাকে একটিবার
দেখব বলে। অথচ আমার সকল প্রতীক্ষা
আর ব্যাকুলতাকে বারংবার উপহাস করেছে
তোমার নীরব অনুপস্থিতি।

অন্ধকারে আমি দু'হাতে আঁকড়ে রেখেছি
একটি আয়না, যাতে দেখতে পাই

তোমার মুখের ছায়া। কিন্তু আয়নায় পড়ে না
কোনো ছায়া, লাগে না নিঃশ্বাসের দাগ।

এখানে কোথাও তুমি আছ, কখনোসখনো এই বিশ্বাস
আমাকে বাঁচায়
অক্‌টোপাস-বিভ্রান্তি থেকে। কিন্তু সেই বিশ্বাস নিয়ে
আমি কী করব যা সমর্থিত নয়
জ্ঞানের জ্যোতিশ্চক্রে? উৎপীড়িত মুতাজিলা-মন
আমাকে নিয়ে গেছে সংশয়ের সৈকতে। নুড়ি কুড়াতে কুড়াতে
জেনেছি জ্ঞান আমার উদ্ধার; তারই অন্বেষণে
স্বৈরিণীর মতো অন্ধকার
উজিয়ে চলেছি। এ জন্যে যদি তোমাকে খোঁজার সাধ
মুছে যায় কোনো রাগী পাখির পাখার ঝাপটে,
আমি প্রতিবাদহীন পা চালিয়ে চলে যাব
জ্ঞানের বলয়ে আমার অজ্ঞতা নিয়ে।

আমার দুঃখের দ্বারে

বারবার ভিড়ের ভিতরে গিয়ে প্রতিহত
ফিরে আসি, নত
মুখে গৃহ প্রবেশের অনুমতি চাই
নৈঃসঙ্গের কাছে; সকলেই করে নিরিখ, যাচাই–
পাঠায় আমাকে লখিন্দরের বাসরে,
যত বলি ঠাঁই দাও তোমাদের ঘরে,
ওরা তত সরে যেতে থাকে;
আমি ঘুরি একাকী মান্দাসে স্বত্বহীন বাঁকে বাঁকে।

ভর সন্ধ্যায় ফিরি জতুগৃহে, খর
নদী বয় মনের অতল নিচে, আমাকে জর্জর
করছে স্মৃতির কাঁকড়াবিছে, দোটানায় ভাবি–
কারুর কাছেই কোনো দাবি
করা ঠিক নয় আর। বিনাশ্রয়ে যাবে
দিন যাক; ক্ষতি নেই। আপাতত মারাত্মকভাবে
ছেঁটে-ফেলা নিসর্গের কাছাকাছি
ষড়জে নিখাদে বাঁচি।

যখন আমার প্রতি ভীষণ দন্তুর শত আক্রমণ তেড়ে
আসে, নিজ ভূমি ছেড়ে
যাই না; খরিদ করি অতি দীনবেশে
ফুল ও চন্দন আমি তাদের উদ্দেশে,
যারা ক্ষিপ্র আমাকে পাঠাতে চায় পাতালে, রৌরবে।
হৃদয় আচ্ছন্ন হয় বিবাগী সৌরভে,
প্রত্যাখ্যানে জতুগৃহে মিশে থাকে কৌশিক কানাড়া;
আমার দুঃখের ভারে নত হয় শুধু পড়শি ফুলের চারা।

ছায়াসঙ্গীর উদ্দেশে

শাবাস জনাব, আপনার ধৈর্যের মুখে
ফুল চন্দন পড়ুক। সেই কবে থেকে আপনি
আমার পেছনে পেছনে ঘুরছেন।
আমি বাড়ি থেকে পা বাড়ালেই
আপনি আমার সঙ্গে জুড়ে যান। সবসময় যে স্পষ্ট
আপনাকে দেখতে পাই, তা নয়।
তবে বুঝতে কষ্ট হয় না,
কেউ একজন আছে আমার পিঠের খুব কাছে,
কখনো কখনো তার নিঃশ্বাস এসে লাগে
আমার ঘাড়ে। ঘুরে দাঁড়ালেই দেখতে পাব তাকে।

আমি ডান দিকে ঘুরলে আপনিও ঘুরে দাঁড়ান ডানে,
যখন আমি বাঁ দিকে এগিয়ে যাই
হনহনিয়ে, তখন আপনিও
চমৎকার কায়দায় চলতে শুরু করেন বাঁয়ে।
আর এই তো সেদিন
রৌদ্রের ঝালরময় আরমেনিয়ান গির্জের কাছে আপনি প্রায়
ধরা পড়ে গেলেন আমার চোখে।
আর সেই মুহূর্তে চেহারায় এমন ভঙ্গি ফুটিয়ে
তুললেন, মনে হলো, আপনি আমাকে
এই প্রথমবারের মতো দেখলেন। কী জানেন,
এরকম মুখভঙ্গি শুধু পাকা অভিনেতাই আয়ত্ত করতে পারে।

দেখুন, কখনো কখনো ইচ্ছে
আপনাকে সাফ বলে দিই, 'আপনার নষ্ট করার মতো

প্রচুর সময় যদি থাকে,
তাহলে যত ইচ্ছে আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করুন
আমি বারণ করব না। ভিড় ঠেলে ঘেমো মানুষের
গন্ধ শুঁকে শুঁকে সকাল-সন্ধ্যা
কিংবা মধ্যরাত অব্দি আমার আশেপাশে
মনের সাধ মিটিয়ে
ঘোরাফেরা করুন, আমার একরত্তি আপত্তি নেই।

এই যে আপনি শিকারি কুকুরের ধরনে
আমার চলার পথ শুঁকে বেড়াচ্ছেন অষ্টপ্রহর,
কী এর উদ্দেশ্য
আমার একেবারে অজানা নয়। বিশ্বাস করুন,
আপনি আমার কাছে যা পেতে চান,
যা আমার কাছে আছে বলে আপনি এবং আপনার
প্রভুরা কল্পনা করেন–
আপনাদের কল্পনাশক্তি কবিদেরও হার মানায়–
সেসব কিছুই পাবেন না।
বরং আমার মুখোমুখি হলে
আপনাকে আমি চটজলদি একমুঠো বেলফুল,
কতিপয় রঙিন বেলুন,
কিংবা টাকার মতো চকচকে কিছু নক্ষত্র দিতে পারি।

দ্য গেম ইজ ওভার

অকুণ্ঠ স্বীকার করি, তুমি বেশ তুখোড় খেলুড়ে।
যারা উড়ে এসে জুড়ে
বসে তুমি তাদের কাপ্তান প্রতিনিধি নও; আমি
যে-দলে নিয়ত খেলি, সে দলেরই খুব অগ্রগামী
একজন হয়ে দিব্যি খেলে যাচ্ছ সকল ঋতুতে। কোন লক্ষ্যে
নিবদ্ধ তোমার দীপ্ত চোখ, প্রকৃত আমার পক্ষে না বিপক্ষে
খেলছ, বোঝাই মুশকিল।
অন্ধকারে ঢিল
ছুড়েছি অনেক; ঐন্দ্রজালিকের মতো
সহজে সেসব তুমি করেছ গায়েব ক্রমাগত।

সন্দেহের মেঘ তাই জমেনি কখনো মনে, বরং তোমার
ড্রিবলিং, ব্যাক ভলি, ডজ, পুশ দেখে গুলজার
করেছি নরক প্রশংসায়। তুমি হেসে,
কখনো একটু কেশে
পুড়িয়েছ এন্তার সিগ্রেট, আর ধূম্রকুণ্ডলীর
মতো পাকিয়েছ দল ধীর,
স্থির আর কখনো-বা কপট স্তুতির ঘোরে
বস্তুত করেছ নিন্দা আমার নিপুণ ঠারে ঠোরে।

অথচ তোমাকে আমি প্রায়শই জুগিয়েছি বল
বারংবার নিজেকে পেছনে রেখে, চেয়েছি উজ্জ্বল
হোক খেলা যৌথ ভাবে। কিন্তু তুমি একা
চেয়েছ অত্যন্ত ঝলসাতে, এমনকি ভব্যতার সীমারেখা
নিখুঁত দিয়েছ মুছে; শুনেও শুনিনি
উড়ো কথা, বরং তোমার কাছে ঋণী
ভেবেছি সর্বদা নিজেকেই।
এমন ছেড়েছ দান অন্তরালে, হারিয়েছি খেই।

কাকের কর্কশ ধু-ধু ডাকের মতোই খুব পুরানো এ খেলা
দেখে যায় বেলা।
চতুর্দিকে নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার;
দ্য গেম ইজ ওভার মাই ফ্রেন্ড, হে সখা আমার।

অনেকদিন থেকেই

অনেকদিন থেকেই ভাবছি একটা কিছু তাড়াতাড়ি
অদলবদল হওয়া চাই, অথচ এটাও জানি তাড়াহুড়ো
মানে খুব পাকাপোক্ত বাড়ি
বানানোর পুরো
পরিকল্পনায় খুঁত রেখে দেওয়া। তাছাড়া ব্যাপার
হলো এই : এ তো জামা নয়,
অথবা র‍্যাপার
তা-ও নয় যে ইচ্ছে হলেই বিন্দুমাত্র কালক্ষয়
না করে পাল্টিয়ে ফেলা যাবে
ঋতুর চাহিদা মেনে, প্রচলিত রুচির প্রভাবে।

অন্ধকারে মাথা গুঁজে যে ফুল ফোটাচ্ছে, আমি তার
ফুলে ঘ্রাণ পেতে গিয়ে বস্তুত কেবলি
প্রতিহত হই আর
যে ভাবছে আঁধারকে ব্যর্থ করে দিয়ে তারাগুলি
সাজাচ্ছে নিপুণ মুদ্রা এঁকে শূন্যতায়,–
আমি তার অঞ্জলিতে একরাশ রাংতার চকমকি দেখে
লজ্জানত ফিরে যাই। মুগ্ধাবেশে যে বাঁশি বাজায়
ক্রমাগত প্রকৃত নিজস্ব কোনো সুর ব্যতিরেকে,
কী করে বোঝাই তাকে একটা কিছু অদলবদল হওয়া চাই
এক্ষুণি? নইলে ধু-ধু দশদিকে উড়বে শুধু শ্মশানের ছাই।

আমি একটু ভিন্ন ধরনের ফুল ফোটানোর আশা
জ্বেলে প্রতীক্ষায় থাকি। চরাচরে প্রকৃতই তারা
নিমেষে উঠবে জ্বলে, এরকম ভাষা
নিয়ত প্রার্থনা করি। প্রতিদিন উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমার দোতারা
বাজাবে আলাদা সুর, আনন্দে নিকটে
ডেকে বন্য পশুপাখি, নুড়ি ও পাথর
করি দাবি; কত কিছু ঘটে–
শূন্যতায় করে ভর অলৌকিক ঘর।
যেখানে ছিলাম ঠিক সেখানে আছি,
যে রকম শুনেছি বিখ্যাত গল্পে মাঝি
গেছে বেঁধে কাছি
সারারাত দাঁড় টেনে গেছে অবিরত
তাহলে কি আজই
শুরু করতে হবে ফের প্রাথমিক বিদ্যার্থীর মতো?

পুরনো গয়নাগাটি খর নদীতে গচ্ছিত রেখে
যে-নারী নির্ভার হেঁটে যায় দেখি তার কাছ থেকে
কতটুকু শিখে নিতে পারি।
পারব কি? আমার বুকের মধ্যে আছে চিরনারী!

এরকম কিছু

বাড়িটা সেকেলে, কিন্তু বাসিন্দারা একালের নব্য
সামাজিকতায় ঝলমলে,
সান্ধ্য আসরের টানে অনেকেই আসে; গোলাপ ঠুমরী গায়,

শাণিত বুদ্ধির ঝলকানি লাগে কথোপকথনে।

সে ছিল নিঃশব্দে ব'সে এক কোণে তক্তপোশে, তার
রূপ রহস্যের মাতৃভাষা বলে; রত্নের ঝলক
ছিল চোখে, এ ঝলক
নিয়ে যায় বহুদূরে শতাব্দী পেরিয়ে কোনোখানে
দুর্গের দেয়াল-ঘেঁষা সিঁড়িতে এবং
দেখায় প্রাচীন হ্রদ রুশোর চিত্রের মতো রঙিন জঙ্গলে।

অনাবিল গণিতে উজ্জ্বলতা অত্যন্ত একাকী
খেলা করে তার মনের ভেতরে আর
কী এক শুদ্ধতা গান হয়ে
মনীষার আভায় জড়ায় তাকে। হয়তো এরকম
কাউকেই বলা যায়, 'তোমারই উদ্দেশে
আমার প্রতীক্ষা চোখ বিছিয়ে রেখেছে শূন্য পথে আজীবন।'

মনে পড়ে, তাকে ঘিরে সামাজিক মধুমক্ষিকার
গুঞ্জরন ছিল সারাক্ষণ, দৃষ্টির লেহন ছিল, ছিল বটে
বিয়ারের ভরা গেলাসের মতো উপচানো
আবেগ বিভিন্ন কণ্ঠস্বরে। আমি শুধু দূর থেকে
সৌন্দর্য করেছি পান; আমার দু'চোখ নিরলস
পর্যটক তার শরীরের পাণ্ডুলিপিতে, আমার অভ্যন্তরে
সাময়িক ভালোবাসা বল্মীকের মতো গড়ে ওঠে।

রাত বাড়ে, রাতের গুহায় যেন শেয়ালের ঘ্রাণ জেগে থাকে,
কিছু উদ্ভিদের জিভ ক্রমাগত চাটে আমাকে এবং আমি
কাউকে কিছু না বলে গোয়েন্দা ভঙ্গিতে
নেমে যাই গহন রাস্তায় বড় একা। শিস দিয়ে
তাড়াই মনের বাঘ, আমার ব্যাকুল
অস্তিত্বের ঝোপঝাড়ে অবিরত ডেকে যায় অনিদ্র কোকিল।

কী যে তার নাম, কিছুতেই মনে পড়ে না এখন। সে সন্ধ্যায়
তার সঙ্গে বলেছি কি কোনো কথা? আমিও কি ঝানু
বাচালের মতো আচরণে তার একাকিত্বে খুব
ধরিয়ে ছিলাম চিড় ঠুকরে ঠুকরে? মনে
নেই, ওর দুটি
চোখ ছাড়া আজ আর কিছুই পড়ে না মনে। কোনো

ভনিতা না করে বলি, মনে হয় পুনরায় সেই দুটি চোখ
দেখার আশায় বেঁচে থাকি,
বেঁচে থাকি কলরবময় এই পৃথিবীতে আজও।
সত্যি মনে হয়; নাকি এরকম কিছু ভাবতেই ভাল লাগে?

গাঁওবুড়াদের মুখে

সে-কথা প্রথম শুনি গাঁওবুড়াদের
মুখে; তাঁরা গোধূলিতে পুকুরের পাড়ে বসে প্রবীণ গলায়
গাজী কালু চম্পাবতী পুঁথি সুরের
আমেজ মিশিয়ে বলেছিলেন সে-কথা, মনে পড়ে।

বালক বয়সে সবকিছু সহজে বিশ্বাসযোগ্য
হয়ে ওঠে তাই
ওদের সে-কথা শুনে তাকাতাম উত্তরের দিকে।
কেননা সেদিক থেকে তিনি আসবেন,
এ ধারণা তাদের কথায়
প্রশ্রয় পেয়েছে বারবার। বহুদিন
আমি হেঁটে চলে গেছি বহুদূরে উত্তর দিকের
নিশানা স্মরণে রেখে। অনেক পুরনো দীঘি, জামতলা আর
পাতা-ছাওয়া পথ পাড়ি দিয়ে
আবার এসেছি ফিরে, যদিও পাইনি দেখা তার,
যার কথা বলে
গাঁওবুড়াদের চোখ হতো স্বপ্নাকুল গোধূলিতে
অথবা সকালবেলা। কেউ কেউ থাকতেন খুব চুপচাপ
হুঁকো হাতে, কেউ কেউ খড়মের শব্দ তুলে যেতেন অন্দরে।

শহরেও শুনেছি সে-কথা কিছুকাল পরে; যারা
চাখানায় কিংবা আস্তাবলে
মারতেন সরস আড্ডা দিনরাত, তাদের ভেতর
কেউ কেউ গল্পচ্ছলে বলতেন তাঁর কথা, যিনি
আসবেন উত্তরে পথ বেয়ে। কেমন দেখতে তিনি আর
কীরকম পোশাক-আশাক
শোভা পাবে গায়ে তাঁর, এসব কিছুই
থাকত না সেই প্রিয় কিসসায় তাদের।

কিস্‌সাই বলব একে, যেহেতু আসার কথা যাঁর
তিনি তো আসেননি আজও, শুধু

কিছু কথা ভ্রমরের গুঞ্জরণ হয়ে ওঠে ওঠে
ঘোরে মাঝে-মাঝে, আমি আগেকার মতো
গভীর আগ্রহে আর শুনি না সে-কথা।
কখনো নিঃশব্দে হাসি, উদাস তাকাই কখনোবা,
চায়ের পেয়ালাটিকে ঠোঁটের নিকটে নিয়ে যাই।
আমার সংশয়ী মন যদিও এখন
উত্তরের দিকে আর নজর করে না, তবু কোনো কোনো দিন
কী-যে হয়, আমি তাঁর কথা ভাবি, আসবেন যিনি,
যিনি এদেশের মৃত্তিকার মতো, নদীর পানির মতো,
চৌরাহায় বিশাল বৃক্ষের মতো। আমি
গল্পের ভিতরে ধৈর্য ধরে আরেক কাহিনী খুঁজি।

একটি নিষিদ্ধ মীড়

একটি নিষিদ্ধ মীড় জেগে ওঠে বারবার রক্তের ভিতর,
ডেকে আনে নীল ময়ূরের
শোভা চিত্রাংশে আর মোহান্ত বৃক্ষের
কাছে নিয়ে জপায় ফলের লোভনীয় বর্ণমায়া।

সে লোভ দমন করে বৈরাগ্যের গৈরিক ধুলোয়
পাখির ধরনের স্নান সেরে
চলে যাব কীর্তনীয়া আখড়ায়, তেমন ঔদাস্য
আজ অব্দি আয়ত্ত করিনি।

কী গুণ যাপিত মুহূর্তে, সে প্রসঙ্গ না টেনেও
সকালবেলার
অস্পষ্ট চাঁদের মতো কিছু স্মৃতি মনের কার্নিশে
ঝুলে থাকে এবং তুমিই স্মৃতি আজ।

মনে পড়ে, ছিলে দূরে, অত্যন্ত নেপথ্যে, বলা যায়।
কবিতা নিমেষে বড় অনাদৃত সেবাশ্রম থেকে তুলে এনে
তোমাকে আমার বাম পাশে।
বসিয়ে দিয়েছে।
বস্তুত তোমাকে স্বপ্ন-গোধূলিতে আলিঙ্গন করি, চুমু খাই

এবং তোমার হাত ধরে
বাগানে বেড়াই। শোনো, কখনো তোমাকে আমি বলি না মহিলা,
যা বলি কারো তা জানা নেই, তুমিও জানো না।

কী ব্যাপক লোভে

সবকিছু খুব শান্ত আশেপাশে; বারান্দায় হাঁটি
একা একা; গৃহকোণে নিমগ্ন গৃহিণী
ভোরের নিঃসীম প্রার্থনায়। কয়েকটি কবুতর
পাশের বাড়ির ছাদে ঘোরে ইতস্তত কিছু আহার্যের খোঁজে।

আকাশে অস্পষ্ট চাঁদ, নিঝুম প্রশান্তি শুয়ে আছে
মেষ পালকের মতো। যেন কেউ দিচ্ছে উপহার
স্মিত হাসি দূর থেকে, একটি তরুণী
খোলা ছাদে, মুখের ভেতরে তার সঞ্চরণশীল টুথব্রাশ।

অকস্মাৎ কী-যে হলো, কবুতরগুলি লহমায়
চৌদিকে ছড়িয়ে পড়ে কিসের ঝাপটায়,
কাকের চিৎকারে চিড় ধরে পরিবেশে;
দেখি, প্রতিবেশী ছাদে খাদ্যান্বেষী বানরের তুমুল দঙ্গল।

দালানের নিভৃত ফোকরে পায়রার গেরস্থালি
তছনছ, সাঁড়াশির মতো হাত ঢুকিয়ে বানর আনে ডিম,
খায় ক্ষিপ্ত ব্যস্ততায়। মনে হলো, আমার আহত কবিতাকে
গিলছে ক্ষুধার্ত কাল কী ব্যাপক লোভে!

তার সঙ্গে জানাশোনা

তার সঙ্গে জানাশোনা অনেক আগের। মনে পড়ে
প্রথম দেখেছিলাম তাকে
ছেচল্লিশ মাহুতটুলির ছাদে মেঘান্ধ প্রহরে।
তারপর একদিন হার্নি সাহেবের যত্নের বাগানটাকে
আলো করে হেঁটে গেল রক্তজবা গাছের নিকটে।
আরো একবার আহসান মঞ্জিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে
দেখলাম, তাকাল আমার দিকে খুব অকপটে;
এবং কিছু না বলে মেতে
উঠল সাঁতারে বুড়িগঙ্গা নদীটির বুক জুড়ে। জলকেলি

আমারই উদ্দেশে ভেবে উৎসবের প্রদীপের মতো
জ্বলে উঠে ক্ষিপ্র মুছে ফেলি
নৈরাশ্যের ঝুলকালি; সে দৃশ্যকে করেছি লেহন অবিরত।

মনে পড়ে, বায়ান্নর বুলেটে জখমি এ-শহরে
সে এলো বিষণ্ন অথচ কী তেজী ভঙ্গিতে, দাঁড়াল
এলোমেলো ঘরে,
আমার শয্যার পাশে মন্থর বাড়াল
পা, রাখল হাত জ্বরে-পুড়ে-যাওয়া আমার কপালে।
দেখলাম তাকে একদিন খারাপ পাড়ার মোড়ে
আশ্বিন-সকালে
স্বচ্ছ নগ্ন আকাশের নিচে, আবেগের তোড়ে
অন্ধ ভিখারির মুখে পুরে দিতে একটি সোনালি
মাছ; বহুকাল পর দেখা গেল তাকে প্রাণভয়ে
উদ্বাস্তু মিছিলে ত্রস্ত, খালি
পায়ে আর উষ্কখুষ্ক চুলে। দেখি সূর্যোদয়ে
কী সূর্যাস্তে বাহু তার বরাভয় আঁকে
শূন্যতায়; পুনরায় তার সঙ্গে হলো দেখা গায়ে
কাঁটা-দেয়া সময়ের বাঁকে।
ছিল সে লাশের ভিড়ে ব'সে খোলা চুলে, বনচ্ছায়ে
পাথুরে ভাস্কর্য যেন। মাথায় তন্ময়
করবীর গুচ্ছ নিয়ে পা দোলায় ধ্বংসস্তূপে ব'সে নিরালায়,

কখনো আমার ঘরে নিঃশব্দে টাঙিয়ে দেয় গাঁদাফুলময়
রবীন্দ্রনাথের পাশে মনস্বী মার্ক্সের ছবি। যায়, দিন যায়।

পড়ছে রাহুর ছায়া দীর্ঘ হয়ে আমার আয়ুতে ক্রমাগত,
কিন্তু দেখি তার স্বপ্ন-ধাঁধানো শরীরে
বয়স আশ্চর্য মঞ্জরিত স্থির বিদ্যুতের মতো,
প্রাত্যহিকতা অলৌকিক বেজে ওঠে চকিত মুদ্রায় তার মীড়ে মীড়ে।

কাল থেকে ফের

বেশ কিছুদিন থেকে এই বৃষ্টিই চাইছিলাম
দিগন্ত-ডোবানো বৃষ্টি। ভুরুতে ঠেকিয়ে হাত আমি
গনগনে আকাশের দিকে কতদিন
তাকিয়েছি বারংবার, পরখ করেছি

নানান রঙের নানা আকাশের মেঘ।
কোন মেঘ বৃষ্টি নামায় এবং
কোন মেঘ জলহীন তার
আন্দাজের মুখে ফুলচন্দন পড়ে না সহজে।

আকাশ যে কীরকম প্রতারক হতে পারে, ঘটা করে
মেঘ-মেঘালির খেলা দেখিয়েও মাটিকে তৃষিত
রাখে দীর্ঘকাল,
এ-কথা অজানা নয়। প্রতীক্ষার পাথর হৃদয়ে
অন্ধের চোখের মতো থাকে
সকল সময়।

এখন আবার আসমান দিয়েছে উপুড় করে তার ভরা
কলস বদান্যতায়। খরাপোড়া খেতে
দাঁড়ানো চাষীর মতো ভিজছি, আমার রোমকূপে
ঝরে বৃষ্টিধারা, গলে যায়
আমার হৃদয়
বৃষ্টির পানির মতো, এই বৃষ্টি আমার আশ্রয়।

বৃষ্টির নূপুর থেমে গেলে কুমড়ো-ফালির মতো
চাঁদ ওঠে, উঁকি দেয় একটি কি দুটি তারা আর
অকস্মাৎ একটি ভাবনা ঘুরে দাঁড়ায় ভয়ার্ত
পথিকের মতো– কাল থেকে ফের শুরু হবে না তো
একটানা ধূমায়িত খরা বহুকাল
আমার জমিতে?

কিছু কথা ছিল

চৈত্র সংক্রান্তির দুটি পাশাপাশি থাকা
ঘুড়ির ধরনে খুব কাছাকাছি ছিলাম দু'জন। আমাদের
একজন যে কোন মুহূর্তে সরে যেতে
পারি খর প্যাঁচে,
ছিল ভয় সারাক্ষণ। তোমার ভেতরকার ধু-ধু
নির্জনতা করেছি আকণ্ঠ পান সকল সময়।

যখনই তোমার চোখে চোখ
রেখেছি তখনই মৃত রাজার মিছিল নির্বাসিত

রানীদের মুখ আর রুপালি তাঞ্জাম
দৃষ্টিতে উঠেছে ভেসে। এমনকি রেকাবিতে রাখা
ফলের ভেতর আমি দেখেছি তোমার রূপ আর
সর্বদা তোমার
নামের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে কিছু ধ্রুবপদ
করেছি নিবিড় উচ্চারণ।

বেশ কিছু কথা ছিল তোমাকে বলার,
অথচ তোমাকে
ভালবাসি বলার আগেই
হৃদয়কে অমাবস্যা করে নিলে চকিতে বিদায়।

স্বপ্ন অভিভাবকের মতো

স্বপ্ন অভিভাবকের মতো আমার জীবনে তার
নিয়ন্ত্রণ রাখে প্রায় সকল ঋতুতে। হেঁটে যাই
অন্ধকারে, আদিম জলের গান শুনি, স্তব্ধতার
বুক-চেরা, পাথরের নানান গড়ন দেখে চোখ
শিল্পী হয় এবং পাথরে বসে গাঢ় স্পর্শ পাই
আত্মীয়ের, মনে পড়ে দূর কথা, ভুলি শত শোক।

স্বপ্নের ভেতর থেকে উঠে এসে কে আমাকে ডাকে
ছায়াচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরে? সুপ্রাচীন লতাগুল্ম ঢাকা
অবয়ব তার, ধু-ধু মাঠে, পাহাড়ে নদীর বাঁকে
কিংবা কোনো লোকালয়ে কখনো দেখিনি তাকে। মনে
হয়, ছিল বুঝি তার পরনে বিবর্ণ আংরাখা,
হয়তো তার সঙ্গে হয়েছিল দেখা অখ্যাত স্টেশনে।

এমনও তো হয় বসে আছি দপ্তরের কামরায়
বড় একা, স্মৃতিক্লান্ত– হঠাৎ কে একজন এসে
ঢুকে পড়ে এত্তেলাবিহীন আর দু'হাত বাড়ায়
সোজাসুজি আমার দিকেই, কী-যে বলে অনুরাগে
বুঝি না কিছুই, চেয়ে থাকি অপলক, স্বপ্নাবেশে
ভাবি, ঘনিষ্ঠতা ছিল বুঝি অনেক শতাব্দি আগে।

আমি কি নিদ্রার আকর্ষণে দপ্তরের ভেতরে দপ্তরে
নিভৃতে গিয়েছি চলে? স্বপ্নের গহন পথ বেয়ে

এসেছিল সে কি তবে এ ধূসর ঘরে স্তরে স্তরে
পদচ্ছাপ রেখে, প্রাণে জাগিয়ে অতীত শিহরণ?
প্রত্যহ যা দেখি তাতে কী সুদূর মায়া আসে ছেয়ে,
আজও জানি না তো নিদ্রা কাকে বলে, কাকে জাগরণ?

একজোড়া চোখ

একজোড়া চোখ, জ্বলজ্বলে, প্রাচীন রত্নের মতো,
ভেসে এলো ঘরের ভেতরে। চক্ষুদ্বয়
আমার শরীরে সেঁটে থাকে দীর্ঘস্থায়ী
চুমোর ধরনে।

কে যেন দাঁড়িয়ে থাকে দরজার কাছে খুব মৌন
সকল সময়; মনে হয়
আমার শয্যার পাশে বসবার অনুমতি চায়, হাত নেড়ে
ডাকলে চকিতে মিশে যায় বায়ুস্তরে।

একজোড়া চোখ পাখি হয়ে
লেখার টেবিলে বসে, ডানা ঝাপটায়; পালঙ্কের
ভাঁজ থেকে অতীত ছড়িয়ে পড়ে রাত্রির মেঝেতে
জুয়াড়ীর খুচরো পয়সার মতো। পাখি ওড়ে চোখের ভেতরে।

এখানে আমার জন্যে অপেক্ষায় ছিল যে কুকুর
তার লকলকে জিভ
আমার শরীর থেকে চেটে নিয়ে ক্লান্তি শুয়ে থাকে
দরজার কাছে, যেন সে অনন্তকালে পেয়েছে আশ্রয়।

কারো স্বপ্নে নেই জানি আমার নিবাস,
যে স্বপ্নে আমার ছায়া পড়ে তা নিমেষে ভেঙে যায়। মেঝে ফুঁড়ে
মাথা তোলে কালো গাছ, তার ছায়া থেকে ক'জন উন্মাদ ঢিল
ছোড়ে আর আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে একজোড়া চোখ।

আমি এক ভদ্রলোককে

আমি এক ভদ্রলোককে রোজ
দেখি। তিনি কখনো বসে থাকেন চুপচাপ
কাঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে, কখনো বারান্দায়
দাঁড়িয়ে কয়েকটি জালালী কবুতরের

আসা-যাওয়া দেখেন,
কখনোবা থাকেন ঘুমিয়ে।

এই যে ভদ্রলোককে দেখি, দেখে আসছি
দীর্ঘকাল থেকে, এর মধ্যে সত্যি বলতে কি
কোনো ঝলমলে
চমৎকারিত্ব নেই। যদি তাকে না দেখতাম,
তাহলে
ক্ষতির বান ডাকত বলে মনে হয় না।

ভদ্রলোক কী করেন,
কেমন করে তার সংসার চলে কিংবা
আদৌ তার কোনো সংসার আছে কিনা, এ বিষয়ে
আজ অব্দি আমি কোনো চড়ুই-চঞ্চল
ঔৎসুক্য দেখাইনি। তবে এই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে
আমি যে একেবারেই
মাথা ঘামাইনি, এমন নয়। এমনও হয়েছে
ভদ্রলোকের কথা ভাবতে গিয়ে
তার মুখের রেখাগুলিকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।
আর যে কথাটা বলতে গিয়েও
এখনও বলা হয়নি তার সারাৎসার হলো
ভদ্রলোককে দেখলে
আমার ভারি ভয় হয়। তিনি যখন হাওয়ার দিকে
মুখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন, অথবা
হাতে তুলে নেন রক্তজবা, তখন আমি ভয় পাই।

কেন এই ভয়, এই প্রশ্নের
কোনো সদুত্তর আমার জানা নেই।

তাকে আমি কোনোদিন কোনো মাহফিলে,
গানের জলসায় দেখিনি। কখনো
সানাই-গুঞ্জরিত বিবাহ মন্ডপে কিংবা
কোনো শবানুগমনে তিনি শামিল হয়েছেন বলে মনে পড়ে না।

একদিন চোখে পড়ল,
রোজ যেখানে
ভদ্রলোককে ব'সে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম,

সেই নির্দিষ্ট জায়গাটা ভীষণ সান্নাটা এবং
ধৃতরাষ্ট্র শূন্যতা আলিঙ্গন করল আমাকে।
এতদিন ভাবতাম, সেখানে সেই ভদ্রলোককে।
দেখতে না পেলেই
আমার ভয় কেটে যাবে। অথচ এখন
কাকতাড়ুয়ার মতো ভয় আরও বেশি ভয়
দেখাতে শুরু করল আমাকে, আমার নিজেরই জন্যে।

আপস

প্রতিদিন উদয়াস্ত খুঁজি আমি তাকে,
অন্তর্গত নিভৃত সত্তাকে,
যার মধ্যে পাঁচ জন ঘুমায় সতত
যুগ যুগ ধরে
অবচেতনের স্তরে স্তরে
আসহাবে কাহাফের মতো।
বস্তুত স্বরূপে খুঁজি
অস্তিত্বের প্রকৃত ঠিকুজি।
একদা কৈশোরে আমি গোল্লাছুট আর ফুটবলে
হুল্লোড়ে ছিলাম মেতে বিকেলের মাঠে
হাস্যময় ছেলেদের দলে।
একদিন দ্বিপ্রহরে খেলাচ্ছলে এক ডাকাবুকো
কিশোর একটি পাখি করল শিকার
ঢিল ছুড়ে। তারপর থেকে আর
তার ঘরমুখো
হইনি কখনো আমি। আমাদের সখ্য গেল পাটে।
সেকালের কিশোরেরা বস্তুত এখন
নানাভাবে করে নিত্য
জীবনযাপন।
কেউ বেশুমার বিত্ত
হেলায় করছে জড়ো বাণিজ্যের অশ্বমেধে, কেউবা অকালে
বার্ধক্যের শীর্ণ ডালে
ঝোলে, কেউ কেউ দশটা-পাঁচটা করে রোজ,
মাছি মারে লেজারের পাতায় পাতায়,
কেউবা হাতায়

গৌরী সেনী টাকা, কেউ হয়েছে নিখোঁজ
সেই কবে
আসমানী অলীক বৈভবে
মেতে, কারো কারো পেনশন
শুরু হলো বলে; ওরে মন,
প্রৌঢ় মন, এ এক বিস্ময়–
আমারও খুনির সঙ্গে আজ হাত মেলাতেই হয়।

ঘৃণা, তুই

ঘৃণা, তুই তোর ভ্রূকুঞ্চন,
ঠোঁটের বক্রতা আর দাঁত ঘষটানি
ফিরিয়ে নে। দ্যাখ চেয়ে গোলাপ কেমন
হেসে তোর দিকে
তাকিয়ে রয়েছে, বন পায়রার ঝাঁকি নম্র এসেছে নেমে
টিনশেডে, চকোলেট রঙের তরুণ পাখি তার
হৃদয় উজাড় করে সুর
ঢেলে স্নান সস্নেহে করাচ্ছে হৃদয়কে। এই তো দাঁড়াল বারান্দায়
কলেজ সুন্দরী, তার চুল ওড়ে উদ্দাম হাওয়ায়,
ঘৃণা তুই, তোর তূণ থেকে সব তীর ছুড়ে ফেলে দে মাটিতে।
ঘৃণা, তুই যাকে শত্রু ভেবে এতদিন বারবার
চোখ থেকে ঝরালি আগুন,
করেছিস খুন স্বপ্নে তৃতীয় প্রহরে আর দুর্বাসার মতো
কমণ্ডলু ছুড়ে তপোবনে অকস্মাৎ
ভীষণ ভয়ার্ত করে তুলেছিস হরিণ শিশুকে,
প্রকৃত প্রস্তাবে
কখনো সে নয় শত্রু তোর, বরং দয়ার কুঁড়ি
ফোটাবার জন্যে সে হয়েছে অন্তরালে
কিছুটা নির্দয়। শোন মিনতি আমার, পুনরায় ভালোবেসে
ঘৃণা তুই মুখ থেকে খুলে ফেল ঘৃণার মুখোশ।

নিরন্তর দোটানায়

নিরন্তর দোটানায় আজ আমি ক্লান্ত, হতাশ্বাস;
এক স্তূপ বেদনার মতো পড়ে আছি এক কোণে,
এবং আমার স্বপ্ন ছেঁড়া পাতা, মনের গহনে
ঘোরে শুধু প্রেতচ্ছায়া নিত্যদিন। সকল বিশ্বাস

ছিন্নমূল; দর্শনে পাই না স্বস্তি, বিজ্ঞানেও আর
নিখাদ উৎসাহ নেই, যখন সভয়ে দেখি, হায়,
জাগর বিজ্ঞানপুষ্ট শক্তির সংহারী মত্ততায়
দ্রৌপদী সভ্যতা দ্যাখে নিরুপায় সর্বনাশ তার।

পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে কোনোকালে,
এইমতো অর্বাচীন গালগল্পে ধরেছে ফাটল,
এ-কথা কবুল করি, অনেক আগেই। দ্বিধাহীন
বলি তবু, আমি বন্দি হয়েও ভ্রান্তির ঊর্ণাজালে
সৃষ্টির বন্দনা করি মাঝে-মধ্যে; কেননা অতল,
রমণীয় দৃষ্টি, ঝরনা, স্বর্ণচাঁপা আজও অমলিন।

উপোসী সন্তের মতো

হাতে আর তেমন সময় নেই, কী দ্রুত ফুরিয়ে
আসছে এবং আজকাল
সম্মুখে দেখার চেয়ে পেছনের দিকে
তাকাতেই বেশি ভালো লাগে। উঠোনের রোদ
চারাগাছ, লতাগুল্ম আর
দূর নীলিমায় মেঘে মেঘে বাল্যকাল লেগে থাকে।

কখনো নিজেকে দেখি আরশি নগরে
ঘুরি একা একা
পড়শির ব্যাকুল সন্ধানে।
হঠাৎ কখনো
গভীর ঔদাস্য নামে মনে বটের ঝুরির মতো
পড়ন্ত বেলার দিকে চেয়ে, কখনোবা
আকাঙ্ক্ষার রক্তজবা ফোটে পুনরায়
কিসের মোহন টানে। অনেক নারীর দুর্নিবার সম্মোহনে
সাজিয়েছি হৃদয়ের অর্ঘ্য বারবার,
তবু আজও প্রেমের কাঙাল আমি, নিঃসঙ্গ কাঙাল।

এখন প্রলয়াভাসে পৃথিবীর কোণে কোণে
ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে লুপ্তির অঙ্গার;
উপোসী সন্তের মতো তীব্র আকর্ষণে লাভাস্রোতে
ভেসে যেতে যেতে
বাড়াব যে-কোনো তরুণীর দিকে হাত,
যদি তার চোখে, শরীরের বাঁকে মঞ্জরিত হয় অনুরাগ।

আমার ক'জন সঙ্গী

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৯৩ [ডিসেম্বর ১৯৮৬]
প্রকাশক নিখিল প্রকাশন, ঢাকা
প্রচ্ছদ-শিল্পী কাজী হাসান হাবিব

উৎসর্গ-পত্র ডক্টর খান সারওয়ার মুরশিদ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

পড়েছে শীতের হাত

ফ্ল্যাট বাড়িটাকে মৃদু চাবকাচ্ছে ঘন ঘন এই
শীত, পঞ্চাশোর্ধ্ব ত্বকে দাঁত
বসায় তাতার হাওয়া। গৃহিণীর হাতে বোনা সোয়েটার গায়ে,
খাঁজময় গলায় জড়ানো
প্রেমিকার আদরের মতো কম্ফার্টার, বারবার
হাত ঘষে খানিক আরাম
পেতে চাই। সে কখন থেকে রোদ্দুরের প্রত্যাশায়
বসে আছি, জেগে আছি নাকি
তন্দ্রার গুহায়
ঢুলছি একাকী ক্রমাগত? বয়ে যায় চারপাশে
স্রোতের ধরনে কিছু। প্রাগৈতিহাসিক
পানি প্রত্যুষের
গাল বেয়ে নামে আর গাছের সবুজ
চোখ থেকে খ্রিস্টপূর্ব রূপসীর অশ্রুর মতোই
টপ টপ করে পড়ে শিশিরের জল।

হাওয়া বয়, হাওয়া বয়, বড় কষ্ট হয়
দু'পায়ে মাড়িয়ে যেতে ভোরের শিউলি,
মমতা জড়িয়ে আছে ঝরে-পড়া শিউলির ঘ্রাণে।
আশেপাশে আড়চোখে তাকিয়ে ঈষৎ
কে বালিকা বধূ
কুড়ায় শিউলি তার সলজ্জ আঙুলে,
যেন সে নিঃশব্দে নিচ্ছে তুলে নিরিবিলি
নিজেরই শৈশব।

টিনের পাতের মতো কুয়াশা রয়েছে
পাতা এক ফালি মাঠে আর
ফুটপাত-ঘেঁষা ঘাসে কে যেন দিয়েছে রুয়ে টলটলে ফুল,
কী শুভ্র জলজ। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একা-একা হেঁটে যেতে
আজও ভালো লাগে। এরকম ভোরবেলা
শাল মুড়ি দিয়ে একা নিঃশব্দে কে যায়?
তুখোড় ঘাতক নাকি হঠাৎ শহরে চলে-আসা
দেবদূত, খেয়ালী, অপটু। হয়তোবা
পেটরোগা, স্বাস্থ্যান্বেষী প্রৌঢ় কোনো, ঘরে যার আছে

আইবুড়ো মেয়ে, যাকে পাড়ার বখাটে যুবকেরা
করেছে ক্রমশ খর জিভের খোরাক, আল্লা যার
চোখে ঢেলে দেন
ঘড়া ঘড়া পানি, স্বপ্ন যার সেরামিক
তৈজসের মতো হয়ে যায় খান খান।
শিশির-নিমগ্ন ঘাসে রোদের ঝিলিক দেখে তার
মনে পড়ে শৈশবের গ্রাম।

স্মৃতি ওড়ে ঝাঁক ঝাঁক, যেন
অন্তহীন পথ
নির্ভুল পেরিয়ে-আসা পরিযায়ী সবুজ খঞ্জনা। মনে পড়ে
শীতভোরে ফজরের নামাজের পরে
নানা ভাই রেহেলে কোরান রেখে ঘন কুয়াশার
নেকাব-সরানো
প্রথম আলোর মতো আয়াতের শুদ্ধ উচ্চারণে
দুলে দুলে কোঠাবাড়িটাকে
কেমন সঙ্গীতময় করে তুলতেন,
আমার রূপসী নানি হ্যারিকেন নিভিয়ে যেতেন
রান্নাঘরে, টাটকা পিঠের ঘ্রাণে জিভে
ঝরনাধারা যেত বয়ে আর মাতামহের পবিত্র
আয়াতের সুরে সুরে আমার চোখের পাতা জুড়ে
সাইবেরিয়ার
সোনালি বাটান পাখি বসত কোমল, আজ আমি
সেই সুর থেকে দূরে, বহুদূরে। শুধু মনে পড়ে
সেকালে হিমেল
সকালে কবিতা তার কুঙ্কুমের দাগ অগোচরে
আমার কপালে রেখে গ্যাছে।

কুয়াশার ঘেরাটোপে ঢাকা এ শহর
ঢাকায় হঠাৎ
সুজাতাকে মনে পড়ে। তার
ঘরে শীত আজ
মৃত্যুর ঠোঁটের মতো জমে থাকে, ঘরের ভেতরে
এতটুকু তাপ নেই, গরম পানির
ব্যাগ কাছে টেনে নিয়ে সুজাতা এখন বড় একাকিনী
শুয়ে আছে বেগানা পশ্চিমে। হাড়ে তার

চুপিসারে হিম ঢুকে পড়ে,
যেনবা সিঁধেল চোর, রাত্রির তৃতীয়
প্রহরেও সুজাতার চোখ জ্বলে অনিদ্রায়
সুলেমান বাদশার রত্নের মতন।
কী এক যন্ত্রণা তাকে সেঁকছে ভীষণ কড়া আঁচে
বারবার। কেবল চুম্বন নয়, নবজাতকের মুখও চায়
শেষমেশ মেরুন রঙের তার স্তনের বোঁটায়।

সৌন্দর্যের দিকে হাত বাড়াই, অথচ মধ্যপথে
হাত, বলা যায়, প্রায়
শিলীভূত, এই শীতে, প্রিয়
ওষ্ঠে ঠোঁট রাখবার মুকুলিত সাধ
তুষারের নিচে
চলে যায় অকস্মাৎ, যে-পাখি গাইতে
আসে গান আমার উদ্যানে
নিমেষে কবন্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, আমি
কাঁদতে গিয়েও
কান্না ভুলে যাই, শুধু হি হি কেঁপে উঠি
নিজেকেই
কবরে শায়িত দেখে। মেয়ে হস্টেলের
অনূঢ়া ছাত্রীর হু হু যৌবনের মতো
শীতের দুপুর ঢলে পড়ে
বিকেলের কোলে।
আমি যেন সেই শীতকাতুরে একাকী
ভগ্নকণ্ঠ পাখি,
যে প্রাচীন ধ্বস্ত নগরীর বিরানায় গান গায়
অত্যন্ত বেসুরো,
ঘোরে না খাদ্যের খোঁজে আনাচে-কানাচে,
মেদমজ্জা ক্ষয়ে গ্যাছে, হাড়
পুড়ে পুড়ে হয়ে গ্যাছে কালি, মরা ঘাস
ওড়ে কালো ধ্বংসস্তূপে বেহাগের সুরে।

পড়েছে শীতের হাত গাছগাছালিতে, শস্যক্ষেতে,
পুকুরের ঘাটে, হাটে, হাই-রাইজ দালানে
সংসদ ভবনে, রক্তাপ্লুত কসাইখানায়, লঞ্চ
টার্মিনালে.

দোকানে, সাইনবোর্ডে, কলোনির বারান্দায়, সোফাসেটে আর
ফুটপাতে পশুর ধরনে
শুয়ে-থাকা মানুষের বিপন্ন কাঁথায়,
কুলিকামিনের
আগুন-পোহানো রাতে, নেশামগ্ন মেথরপট্টিতে।
কেবল পড়েনি
আমার হৃদয়ে, নইলে কী করে এমন
হিমাতুর রাতে
হৃদয়ের তন্তুজালে বসন্ত মল্লিকা সারাভাই
হয়ে যায় আর তার মুদ্রা থেকে পবিত্র তাপের
বিচ্ছুরণে সেজে ওঠে আমার গোপন
কবিতার খাতা?

আমার ক'জন সঙ্গী

আমার নিজস্ব কিছু সঙ্গী আছে যারা কস্মিনকালেও ভুলে
টেপে না কলিংবেল, দরজা খোলার
অপেক্ষায় থাকে না কখনো, নিজেদের
খেয়ালখুশিতে আসে যায়
বিনা এত্তেলায়, এই সব সঙ্গীর অদ্ভুত আচরণে আমি,
বলা যায়, উঠেছি অভ্যস্ত হয়ে রীতিমতো কয়েক বছরে।

একজন, অমাবস্যা রাত্রির রঙের
মতো শাল মুড়ি দিয়ে দাঁড়ায় আমার পাশে হাতে
নিয়ে গ্লাস, বলে 'দাও তিনটি চুমুক।' হতাশার
ঘ্রাণময় পানীয় আমার
কণ্ঠনালি বেয়ে নামে, আমি তার দিকে বিস্মিত তাকিয়ে থাকি
থমথমে স্তব্ধতায় নিরুপায়, গৌরববিহীন।

অন্যজন এসেই বাধিয়ে দ্যায় খুব
হুলস্থুল; টেবিলে চায়ের কাপ, পেলিক্যান কালির দোয়াত
যায় গড়াগড়ি
আহত যোদ্ধার মতো, জানালার কাচ
গুঁড়ো হয়, পর্দা ফালা ফালা, পলস্তারা খসে পড়ে
দেয়ালের, রেডিও হঠাৎ
উন্মাদের মতো কোলাহল করে ভয়ানক বোবা

বনে যায়, লণ্ড ভণ্ড সবকিছু, যেমন দাংগায়
হিংসার তাণ্ডবে
তছনছ বাগান, বসতবাড়ি, দেখি শুধু দেখি।

আরও একজন আছে, যার যাতায়াত এই ফ্ল্যাটবাড়িটায়
বেড়ে গ্যাছে ইদানীং। আমার শোবার ঘরে ঢুকে
রাগে গর গর করে সারাক্ষণ ডালকুত্তার ধরনে, দ্রুত
টুঁটি চেপে ধরবার নিখুঁত কৌশল,
তার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, যেন
জানা আছে, আমার রক্তের স্বাদ পেলে শান্ত হবে। ভয়ে ভয়ে
থাকি, পাছে আমাকে সে ন্যাকড়ার ফালির মতন
করে ফেলে। তার প্রতি আনুগত্য জানাতে ভুলি না।

কায়ক্লেশে হেঁটে আসে অপর একটি লোক, যেন
বহুদূর থেকে
তার আসা; বলা-কওয়া নেই সটান সে ধুলো পায়ে
লম্বা হয় আমার শয্যায়, চোখ বুজে
আকাশ-পাতাল ভাবে, বিষাদের কামড়ের সুতীব্র চিৎকার
সারা মুখে। সে আমাকে তার
কাছে ডেকে নিয়ে
পাশে শুতে বলে, লীন হতে চায় আমার ভেতরে।

বাকি একজন, চটপটে, সর্বদাই হাসির ঝিলিক চোখে,
জ্যোৎস্নাময় কলাপাতা বিছায় আমার
সমুখে সযত্নে
শিল্পের আঙ্গিকে, যেন পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে খুব
নিরিবিলি করাবে ভোজন
এবং আমার চার দেয়ালে নিমেষে
নিপুণ টাঙিয়ে দেয় কেমন আলাদা সূর্যোদয়,
আমার চলার পথে পাতে স্বপ্নখচিত উদার
রঙিন গালিচা।

আমার সঙ্গীরা যার
যখন যেমন খুশি আসে আর যায়, যায় আর
আসে, আমি শুধু
অভ্যর্থনাকারীর ধরনে বসে থাকি গৃহকোণে বড় একা।

আমার ফসল

এমনই হবার কথা, অনেক আগেই জানতাম
এরকম ঘটবে হঠাৎ। তুমি নিরাসক্তভাবে
আমাকে রাত্তিরে বিদায়ের কাফনে বিশদ মুড়ে
চলে যাবে। আমার ভেতরে কী প্রচণ্ড ভাংচুর
হলো আর শত শত আর্ত কোকিলের কণ্ঠ-চেরা
রক্তধারা গেল বয়ে সেসবের প্রতি উদাসীন
তুমি দু'চারটি খুব লৌকিকতাময় বাক্য বলে
সেরেছ বিদায়পর্ব। সার্কাসের খেলা চুকেবুকে
গেলে বয়েসী যে রঙমাখা সঙ ভয়ানক একা
বৃত্তের ভেতরে স্তব্ধতায় বিষণ্ন দাঁড়িয়ে থাকে,
আমি সে ধরনের থেকে যাব ততক্ষণ, যতক্ষণ
না তুমি একটি বিন্দু হয়ে মিশে যাও দৃশ্যান্তরে।

আমার নিথর নীরবতা নিয়েছে বরণ করে
তোমার শিল্পিত কথকতা, কোনো বিবরণ কোনো
নামের উল্লেখ একজন কবির হৃদয়ে কত
ক্ষত তৈরি করেছে তা লক্ষ্যই করোনি, এরকম
মগ্ন ছিলে অতীতের ঝালরের ভ্রষ্ট দ্যুতি নিয়ে।
যে অর্ঘ্য সাজিয়ে আমি রেখেছিলাম সুন্দরীতমা
তোমার উদ্দেশে তাকে অবহেলে ছুঁয়ে চলে গেছ,
তা বলে আমার গানে অভিযোগ হবে না ধ্বনিত।

এভাবেই শেষ হোক, চেয়েছিলে? আমিও কি ঠিক
এমন প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষা করেছি? সদুত্তর
জানা নেই; নিশ্চয়তা কোনো দিন নেয়নি দত্তক
ভুলেও আমাকে, বিস্মৃতির ঘাটে ভরসন্ধ্যায়
তোমাকে চেয়েছি দিতে বিসর্জন, অথচ প্রতিমা
অধিক জাজ্বল্যমান হয়ে মেলে আয়ত দু'চোখ।

অনেকেই বলে, শোনো, কৃষক মাটির বুক চিরে
ঘরে আনে রাশি রাশি শস্যকণা, তুমি শুধু এত
রাত জেগে, সারাদিনমান রুক্ষ পথে ঘুরে ঘুরে
আখেরে কী পেলে? আমি স্মিত হেসে বলি—
আমিও ফিরিনি শূন্য হাতে। আমার হৃদয়ে দ্যাখো
ক্ষতের গোলাপ ফোটে, যন্ত্রণাই আমার ফসল।

অধিষ্ঠান

সেদিন যাবার আগে বলে গিয়েছিলে,
'তাড়াও দুঃখের মেঘ, এই যে যেখানে
বসে আছি, থাকতাম দুপুরে বিকেলে,
সেখানে গেলাম রেখে আমার নিজস্ব প্রতিনিধি–
একটি নির্জন ছায়া, তাকে
নিয়ে দিব্যি কেটে যাবে তোমার সময়।'

কিছুই না বলে
আমিও নিলাম মেনে তোমার বিধান। সেই থেকে
ছায়াটিকে পরাই প্রত্যহ
অর্চনার মালা। কত খরা, কত বর্ষা আসে যায়,
ছায়াটি যায় না মুছে এতটুকু, বরং ক্রমশ
গাঢ় হয়।

বহুকাল পর তুমি এসে
বসতে চাইলে সেই প্রতিষ্ঠিত পুরোনো জায়গায়।
ছায়ায় দীক্ষিত আমি তোমাকে বরণ করে সেখানে বসাতে
যাবার আগেই ছায়া তর্জনী উঁচিয়ে বলে তোমাকে কঠোর
আদেশের স্বরে, 'ফিরে যাও তুমি সুদূর পশ্চিমে।'

কে যেন দিয়েছে রুয়ে

বেশ কিছুকাল অস্থিরতা আমাকে কয়েদ করে
রেখেছে সকাল-সন্ধ্যা। অভিযুক্ত মানুষের মতো
অন্নজল বড় উদাসীনতায় প্রত্যহ গ্রহণ
করি, নড়ি-চড়ি নিজ ঘরে, সহজে যাই না কারো
নিবাসে এবং গালে সেফটি রেজরের ব্যবহার
মাঝে-মধ্যে আলস্যে স্থগিত রাখি। দেখি আসমানে
থরে থরে সফেদ গোলাপ ফোটে, রাত্রিবেলা চাঁদ
অর্ধভুক্ত কুলি কামিনের ঘুমে মমতা ছড়াতে
চলে যায়। দূরে ঘণ্টা কোলাহল করে, মধ্য যামে
চক্ষুদ্বয় ঘুমের আঠায় বন্ধ হতে চায়, যেন
ফাঁসির আসামি সেলে চোখ বোজে নিদ্রার আশায়।
শিশুর মতন সাদা সারল্যের পথে ক্রীড়াপ্রিয়

কখনো, কখনো রঙধনু ছড়াতে ছড়াতে আমি,
সঙ্গমজনিত পুলকিত ক্লান্তি আসে, শয্যা খুঁজি–
বিছানায় কে যেন দিয়েছে রুয়ে আগুনের বীজ।

কোথায় দাঁড়াবে?

অতিকথনের পরগাছাময় ঝুঁটি
হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে খুব কুটি কুটি
মানিক বাড়ুজ্জে তাঁর একটি গহন উপন্যাসে
বলেছেন শিল্পিত বিন্যাসে–
ওরা টের পায়।
কোন অপচ্ছায়া শিলীভূত মূর্তির মতন ঠায়
কোথায় দাঁড়িয়ে থাকে, বাসুকি কখন ফণা তুলে।
দেবে দোলা শ্যামল মাটির মর্মমূলে,
কখন হাওয়ায় বিষ গচ্ছিত অথবা
অকস্মাৎ নিসর্গের শোভা
হবে তছনছ, ওরা ঠিক জেনে যায়, ওরা মানে পশুপাখি,
তখন আমরা বড় বেখেয়াল থাকি।

পাথরের নিচে থাকে
খাদ্যান্বেষী পিচ্ছিল যে-কীট কিংবা ডালে বসে ডাকে
যে-চন্দনা তারাও বাঁচাতে প্রাণ করে
ছোটাছুটি এদিক ওদিক সকলের অগোচরে।

তাণ্ডবের ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীতে অসহায় শিশুরা কীভাবে
কোথায় দাঁড়াবে?

বেদেনীর জন্যে

তন্বী বেদেনী বউটি তোমার হারাল কোথায়?
কোথায় উজাড় করলে তোমার ভরা ঝাঁপি?
ফোলা ঠোঁট দেখে উদ্বেগ গ্রীবা বাড়ায় কেবলি,
শত শত ঘোড়া খুর ঠোকে মনে, ভয়ে কাঁপি।

হৃদয়ে আমার গোধূলি বেলায় জ্বেলেছে দেয়ালি
তোমার অমন চোখের দু'ফোটা কালো আলো।

তন্বী বেদেনী এ শহরে তুমি কেন এসেছিলে?
তোমার সংগে দেখা না হলেই ছিল ভালো।

মনে পড়ে আজ তোমার শরীর থেকে উঠে আসা
নদীর এবং গাছগাছালির বুনো ঘ্রাণ;
অঙ্গ তোমার কালো বিদ্যুৎ, প্রতিটি ঝলকে
চমকে উঠছে খুব সহর্ষ এই প্রাণ।

তোমার বুকের বাটিতে কটির মালায় এবং
নাভির কোটরে বসন্ত রাগ কী নিবিড়।
খোঁপার কৃষ্ণ মধুকোষ থেকে ঝরে মধু, তুমি
সে-মধু মিশিয়ে ছুড়েছ আমার দিকে তীর।

তোমার পাছাটা, কুমোরের গড়া পুরুষ্ট ঘড়া,
ভাসে জ্যোৎস্নায়, যখন এ-পথে যাও হেঁটে।
আকাশের নীড় ছেড়ে জ্বলজ্বলে অজস্র তারা
চুমো খেয়ে যায় তোমার উদোম তলপেটে।
আমার দৃষ্টি তোমার আতশী সত্তার তটে
শামুকের মতো চলে অবিরাম ঢিমে তালে।
নির্যৌবন আমি বড় একা, ভরা যৌবন
তোমার বেদেনী, যেনবা লেগেছে হাওয়া পালে।

নীল আয়নায় বিকীর্ণ শোভা, ভেসে ওঠে মুখ
তোমার আমার। ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গেলে
গোলাপ বাগানে; চুম্বনে ছিল পাখিদের গান,
হৃদয়ের তাপ সেখানে এসেছি কিছু ফেলে।

চকচকে, চুল, ঠোঁটে ছিল স্বাদু পানের সোহাগ,
কথায় কথায় দুলছিলে, তুমি গোধূলিতে,
যেন তরঙ্গে চিকন নৌকা। আমার সমুখে
ধরেছিলে মেলে রঙিন রুমাল ঘ্রাণ নিতে।

সে রুমালে ছিল অদ্ভুত এক নকশা কেমন;
মনে হয় বুঝি, অথচ যায় না কিছু বোঝা।
হাজার সূর্য ডুবে যাবে শুধু অর্থ খুঁজতে,
খুঁজেছি অনেক এবং চলছে আজও খোঁজা।

রুমালের রঙে মিশেছিল রঙ কিছুটা যেনবা

গোলাপের মতো আর জহরের মতো কালো;
তোমার মদির আশ্লেষে আছে মৃত্যুর ফণা,
তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই ছিল ভালো।

ওরা চলে যাবার পরে

এবারও আমি ওদের নিরাশ করলাম।
যখন আমার ভাই-বোনেরা বলল, ক'দিনের জন্যে
আমরা সবাই পাড়াতলী
যাচ্ছি, চলো তুমিও যাবে,
তখন আমার নীরবতায় অনিচ্ছার এক কাদাখোঁচাকে ওরা
প্রত্যক্ষ করল ওদের মুখোমুখি, এমনকি শীতবিকেলে
আম্মার কথাও সেই হতকুচ্ছিত
পাখিটাকে তাড়াতে পারল না কিছুতেই।

বছরে দু'তিনবার ওরা যায় পাড়াতলীতে, আমাদের
দেশ-বাড়িতে। সেই যে একাত্তরে তাড়া-খাওয়া পাখির মতো সেখানে
গা ঢাকা দিয়েছিলাম, তারপর থেকে
একবারও আর আমার আমাদের গ্রামে
যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এক ধরনের অকৃতজ্ঞতাবোধ আমাকে
মাঝে-মধ্যে কামড়ে ধরে
কচ্ছপের মতো, তবু পারিবারিক আড্ডায়
পাড়াতলীর প্রসঙ্গ আমি
এড়িয়ে চলি, অথচ একটা টলটলে পুকুর, পুরোনো দালান,
আম-কাঁঠালের গাছ
সর্ষে ক্ষেতে প্রজাপতির ওড়াউড়ি, দিঘিতে
মাছের বুড়বুড়ি আর
গভীর রাতে দীর্ঘদেহী বড় চাচার জজবার আওয়াজ
আমার স্মৃতিতে হাঁসের মতো সাঁতার কাটে প্রায়শই।

সবাই গেল, শুধু আমি রয়ে গেলাম এ-শহরে।
অল্প-স্বল্প নিয়ে থাকা এই আমির
সময় কাটে ক'জন সহকর্মীর সঙ্গে গল্প করে,
ঔপন্যাসিক বন্ধুর সহৃদয়
বাসায় রবীন্দ্রনাথের আসা-যাওয়ার পথের ধারে
কিংবা বিলায়েত খানের

সেতারে ইমন শুনে, তরুণ বুদ্ধিজীবীদের আস্তানায়,
মধ্যরাত অব্দি বই পড়ে।

ওদের যাবার তিনদিন পর
এক রাতে মনের চোখে দেখি—
পাড়াতলীতে আমাদের পুরোনো দালানের টানা বারান্দায়
সবাই গল্প-গুজব করছে, এলেবেলে বাগান থেকে
ভেসে আসছে হাস্নাহেনার ঘ্রাণ। ট্রানজিস্টারে বাজছে
রক্তে দোলা-জাগানো পপ গান।
আমার দাদাজান, যাঁকে আমি কখনো দেখিনি, দাদী, নানা ভাই, আব্বা, বড় চাচা,
মাস্টার চাচা, মোমেনা খালা আর আমার তেরো
বছরের ছেলে কবর ফুঁড়ে
একে-একে উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই, যেন ইস্রাফিলের
শিঙ্গা শুনে। আরবি-ফার্সি জানা দাদাজান সটান হেঁটে চলে গেলেন
মসজিদের ভেতরে, বড় চাচা তার জজবার আসরে,
মাস্টার চাচা অন্ধকার ঘরে
হাতড়ে বেড়াচ্ছেন নেসফিল্ডের গ্রামার,
নানা ভাই কালো আচকানটার বোতাম লাগাতে লাগাতে
ডাকছেন আমার নানিকে,
মোমেনা খালা দীর্ঘ চুলে চালাচ্ছেন চিরুনি
আর আমার ছেলে পুকুর পাড়ে
বসে আছে একলা, ওর মুখে অভিমানের থম-ধরা
একটুকরো মেঘ আর আব্বা ট্রানজিস্টারের
পপ গান থামিয়ে
গমগমে গলায় আম্মাকে বললেন,—
'কই তোমার ছেলে এখনও বাড়ি ফিরল না,
যেমন বলতেন ছত্রিশ বছর আগে,
যখন আমি এক অচিকিৎস্য উড়নচণ্ডী, ঢাকা শহরের
পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আওড়াচ্ছি কবিতার পঙ্‌ক্তি
এবং ভাবছি কোনো এক গলির দোতলার ঘর-আলো-করা
তরুণীর কথা অনেক রাত অব্দি।
চেয়ারে বসেছিলাম আমি, আমার হাত থেকে অকস্মাৎ
খসে পড়ল কলিন উইলসনের
দ্য অকাল্ট, আর আমার বুকের ভেতরে
কে যেন আমার কোনো দূর পূর্বপুরুষের

মতো আর্তকণ্ঠে বলে উঠল,
'সময় হলেই, আপনি না ডাকলেও আমি বাড়ি ফিরব আব্বা।'

নায়কের প্রতীক্ষায়

বারবার ঘোষকের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, 'সুধীবৃন্দ,
একটি নাটক হবে মুক্তাঙ্গনে, একটু অপেক্ষা
করুন নিঃশব্দে ধৈর্য ধরে; দয়া করে
কোনো বিশৃঙ্খলা
সৃষ্টি করবেন না; কোনো ভাংচুর যেন
না হয় এখানে। আমাদের নায়কের
সুলুক সন্ধান
এখনও মেলেনি, ফলে নাটকের কাজ
শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। আরও কিছুক্ষণ দর্শকমণ্ডলী
আমরা আপনাদের একান্ত সহযোগিতা চাই।'

সাজঘরে ধড়াচূড়ো সবই আছে ঠিকঠাক, চোগা
চাপকান, গলার মুক্তোর মালা, টুপি কিংবা তাজ
অথবা সেলিমশাহী জুতো,
অথবা সাফারি স্যুট, বুট
কিছুরই কমতি নেই; রয়েছে গচ্ছিত, শুধু আজ নায়কের দেখা নেই,
এ তল্লাটে কোথাও নায়ক নেই কোনো।

যারা মুখ্য পাত্রপাত্রী নয়,
তারা যার যে রকম ইচ্ছে মাঝে-মাঝে
নাটকের কিঞ্চিৎ মহড়া দিচ্ছে আর নিজ নিজ গরিমার
রোদ পোহানোর
ফাঁকে ফাঁকে দর্শকের চোখের সম্মুখে
ফেলছে ধোঁয়ার জাল। এরকম শান্ত, আলাভোলা
দর্শক কখনো
কোথাও দ্যাখেনি কেউ। নায়ক বেপাত্তা
জেনেও তাদের মধ্যে কেউ
টুঁ শব্দটি করছে না। বেড়ালের ডাক নেই, তীক্ষ্ণ সিটি নেই;
পচা ডিম অথবা টোমাটো
শূন্যমঞ্চে ছুড়ছে না কেউ। মনে হয় থমথমে গোরস্থান।

এরকম ভাবলেশহীন যারা, তারা
হয় মৃত,
নয়তো কলের পুত্তলিকা সব, হঠাৎ যাদের
ফুরিয়ে গিয়েছে দম। হ্যাজাক জ্বালানো
হয়েছে সে কবে,
নায়কের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে না এখনও।

সময় ঠোকর দিচ্ছে ক্রমাগত, যেরকম গাছে
দ্যায় কাঠঠোকরা; অধিকারী
দিশি মদে চুর, প্রম্পটার নেপথ্যে ঝিমোয় আর
নোংরা ড্রেন, ঝোপঝাড়, ডোবা থেকে-আসা ঝাঁক ঝাঁক
মশা ভণে নাট্যকথা অমৃত সমান
এ ভবের হাটে। দিন যায়, রাত কাটে, দর্শকেরা
সেই কবে থেকে অসহায়
প্রতীক্ষায় আছে,
প্রতীক্ষায় আছে,
প্রতীক্ষায় আছে
কখন নায়ক এসে গৌরবের বেশে
স্তব্ধতাকে কাচের মতন
টুকরো টুকরো করে
অকস্মাৎ মুক্তাঙ্গনে ঝোড়ো বেগে প্রবেশ করেন।

রোমকূপ কেঁদে ওঠে

হৃদয়ে আমার তুমিই গড়েছ
নয়া আঙ্গিকে
স্বপ্নের টেরাকোটা;
তৃষ্ণাকাতর জীর্ণ শাখায়
প্রহরে প্রহরে
ঝরে অমৃতের ফোঁটা।

আমার সময় খুব বেশি নেই,
এই পর্যায়ে
সব কিছুতেই তাড়া।
বাকি পথ আমি কীরকম ভাবে

পাড়ি দেব বলো
সুজাতা তোমাকে ছাড়া?

মহাজাগতিক তন্তুজালের
রহস্য কত
এখনও রয়েছে ঢাকা।
তারও চেয়ে বেশি রহস্যময়
তোমার গহন
সুনিবিড় চেয়ে-থাকা।
তুমি যাকে ভালোবাসতে একদা
তার ছায়া কেন
আমাদের মাঝে পড়ে?
সেই ছায়াটির মৃদু কম্পনে
আমার নতুন
স্বপ্নেও ঘুণ ধরে।

এই অবেলায় হৃদয়ে আমার
পড়েছে তোমার
ফুল্ল পদচ্ছাপ।
তোমার হাতের স্পর্শে এবং
উষ্ণ চুমোয়
ভুলেছি মনস্তাপ।

নিসর্গে আমি তোমাকেই দেখি,
তোমাতে প্রকৃতি
পেয়ে যায় অবয়ব।
তোমার শরীরে আজো জ্বলে ওঠে
যখন তখন
বর্ণিল উৎসব।

পেয়েছি তোমাকে, ভাবি কৃপণের
সঞ্চয়ী টানে,
পাখি হয়ে নাচে মন।
কিন্তু তবুও না পাওয়ার ধু-ধু
আঁধিঝড় কেন
প্রাণে তুলে আলোড়ন?

শারদ দুপুরে, হেমন্ত-রাতে
আমার প্রতিটি
রোমকূপ কেঁদে ওঠে।
অন্ধ কাঙাল পথে চেয়ে থাকি;
ব্যর্থ ওষ্ঠে
বিষাক্ত ফুল ফোটে।

ফুলচোর

অন্যের বাগান থেকে যে-বালক সাততাড়াতাড়ি
ছিঁড়ে নেয় কিছু ফুল, নই যদিও লুণ্ঠনকারী,
তারই মতো চুরি করে ফেলি
বেলাবেলি
তোমাকে অন্তত
দু'চার ঘণ্টার জন্যে। ঠিক প্রথামতো
চৌর্যবৃত্তি আখ্যা দিয়ে একে
আমাকে পরাতে কেউ পারবে না হাতকড়া। বেঁকে
বসলে পাড়ার পাঁচজন, যদি বসে
সত্যি সত্যি, তাদের স্ববশে
আনব স্মৃতির সরোবরে চকিতে নামিয়ে আর
জানিয়ে সালাম পাঁচবার।

ফুটে আছ দূরে তুমি, এই দুটি হাত
পৌঁছে না সেখানে কোনোমতে, হায়, এমনই বরাত–
তবু রাত্রি এলে
আমার নিবাসে কারা মোমবাতি জ্বেলে
জুড়ে দেয় ঘূর্ণি নাচ এবং আমাকে ফুলচোর
খেতাবে ভূষিত করে। তিনটি নাছোড়
নারী চন্দনের টিপ আমার কপালে
এঁকে শুধু বিবাহ বিবাহ বলে উড়ে গিয়ে উঁচু মগডালে
বসে দোলে অর্চনার মুদ্রাঙ্কিত সত্তায়, পাখিরা
জেগে উঠে সোলেমান বাদশার আংটির হীরার মতো হীরা
কেবলি ঝরাতে থাকে চোখ
থেকে, যেমনটি ঘটে রূপ-কাহিনীতে, যত অসম্ভবই হোক।

অন্ধকার ঘরে একা বসে ভাবি–
আমার সকল চাবি
স্বেচ্ছায় আন্ধারে ফেলে দিয়ে বন্দি হয়ে আছি স্মৃতির নিবাসে
কতকাল, যে শব্দই আসে
কানে, মনে হয় তার পদধ্বনি। নিজেকেই ফুলচোর মেনে
এ কেমন বেড়ি ক্রমাগত যাচ্ছি টেনে?
রাত্রির তৃতীয় যামে শুনে অচিন পাখির শিস
হঠাৎ চমকে ওঠে সশস্ত্র পুলিশ।

অন্তত এটুকু থাক

অন্তত এটুকু থাক, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে
হাসিমুখে ঈষৎ তাকানো ফিরে, একটি কি দুটি
কথা কিংবা অত্যন্ত বাঙ্ময় নীরবতা সহকারে
বিদায় সাজানো; এলে চলে যেতে হয়, তবু যেন
প্রস্থানের আগে শূন্য ঘরে আনন্দ টাঙিয়ে হেসে
অসামান্য নীলপদ্ম ফুটিয়ে হৃদয়ে দিগন্তের
দিকে হেঁটে চলে যেতে পারি, অন্তত এটুকু থাক।
অন্তত এটুকু থাক, দেখা হলে হাতের ঝাঁকুনি,
আলিঙ্গন, প্রিয়তমা রমণীর ঠোঁটে চুমু এঁকে
প্রহরকে বন্দি করা, কবিতার পঙ্‌ক্তির মতোই
শুয়ে থাকা বেড়ালের পশমে ডুবিয়ে হাত একা
কথা বলা কিছুক্ষণ, নাগরিক কাঠবিড়ালির
চঞ্চলতা, ঝোপঝাড়ে জোনাকির নির্ভার উৎসব;
রাত্রি হলে যে শাড়ি ব্লাউজ খুলে মোহগ্রস্ততায়
নেবে তাপ স্বামীর অধীর নগ্নতার, তাকে ভাবা;
অন্তত এটুকু থাক আপাতত প্রাণের খরায়।

বোধ

ফ্ল্যাট বাড়িটার তেতলার জানালায়
চুড়ি পরা হাত, দীর্ঘ খোলা চুলে চিরুনি-আদর, দাঁত
মাজতে মাজতে তরতাজা যুবক বেরিয়ে আসে

গলির ভেতর থেকে, টগবগে তেলের কড়াইয়ে
ভাজা হচ্ছে ডালপুরি, মগে গরম চা,
বুড়োসুড়ো একজন, গায়ে
শাল, লাঠি হাতে
একলা হাঁটেন পথ, এক ঝাঁক সাদা-কালো
কবুতর গম খায়
আলোময় মাটিরঙ ছাদে, জানালার
পর্দা চমকায়
হাওয়ায় ছোঁওয়ায়, কিছু বাসন-কোসন
হচ্ছে ধোওয়া; কলতলা গুঞ্জরণময়,
পুরনো দেয়াল থেকে ঝুলে-পড়া নৌকা, নির্বাচনী পোস্টার, বাতিল,
নৌকো হচ্ছে বালকের হাতে, পোস্টম্যান
দূর থেকে-আসা চৌকো খাম, ম্যাগাজিন দিয়ে যায়; দীর্ঘকাল পরে
ফিরছে হাসপাতাল থেকে ঘরে রোগী,
বেনারসী শাড়ির মতন
রোদ বস্তিটার ছাদে–
ঘর দোরে প্রজাপতি, কে মেয়েলি কণ্ঠে 'মতি মতি'
বলে ডেকে ওঠে,
অগাধ বিস্ময়ে দেখি, পাখি ওড়ে
ছড়িয়ে আমার মনে জ্যোতির্ময় বোধ।

তুমি তো চলেই যাবে

তুমি তো চলেই যাবে শেষতক, আজ নয়তো কাল।
আমার সকাল
পরবে সন্ধ্যার সাজ, যেদিন হাওয়ায় তুমি উড়িয়ে আঁচল
খুব ছলছল
চোখে একা দাঁড়িয়ে পথের ধারে নেবে, হায়, চকিতে বিদায়।
বিষণ্ন দ্বিধায়
একাকী থাকব পড়ে ফ্ল্যাটে এবং ক্ষণে ক্ষণে
প্রাণের গহনে
উঠবে ব্যাকুল ডেকে অন্তরালে বিচ্ছিন্ন কোকিল,
বেদনায় নীল।
তোমার যাবার পরে অকস্মাৎ হবে

মনে, কী বৈভবে
ছিলাম নিমগ্ন কী সৌন্দর্যে এতদিন, আগে কেন ওরে মন
হয়নি স্মরণ?

সকাল থেকে সন্ধ্যা

সকাল থেকে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা থেকে সকাল একজন লোক
কী-যে করে, সবাই
ভারি তাজ্জব। বোঝা যায়, ওর ঝোঁক
কেবলি পালিয়ে বেড়ানোয়;
কিছু একটা খোঁজা ওর চোখ দুটোয়
মানচিত্র দিয়েছে এঁকে। 'এই ভাই
কেন তোমার এমন স্বভাব' এ-কথা কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে
গিয়েও থম। কলতলায় পানি ভরতে
তাসা আইবুড়ো মেয়ে,
যার গা বেয়ে
যৌবন ঝরছে ব্যর্থতায়, চা-খানার ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট-পরা
ছেলেটা, মনিহারি দোকানদার
আর ছেলেভোলানো ছড়া
কেটে বেড়ানো বুড়ো, যার
হাওয়া-ওড়া চুলে
মেহেদির ছোপ,
'এই দুনিয়া পায়রার খোপ
বৈ তো নয়' শব্দগুলো যে ফকিরের কণ্ঠে বাজে,
তারা প্রত্যেকেই লোকটার গতিবিধিকে প্রশ্নাধীন করে তুলে
ফের মন দ্যায় নিজ নিজ কাজে।

লোকটা কখনো ফুটপাতে, কখনও টানেলে,
কখনোবা ময়দান ছেড়ে নক্ষত্র-ছাওয়া পথে খুব একা
চুপিসারে পা ফেলে
এগোয়, যাতে কারো সঙ্গেই দেখা
না হয়, কখনো ভোঁ দৌড়ে গলির ভেতর
উধাও বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায়। অষ্টপ্রহর সবার চোখে ধুলো
দিয়ে খোঁজে ঘরের ভেতর ঘর।
পাড়ার রঙ-বেরঙের লোকগুলো
জানে লোকটা কারো কোনো ক্ষতি

করবে না কিছুতেই। হাতে কখনো লাঠি
নেয় না তুলে, দা কুড়োল নদারৎ,
গলায় খেলিয়ে স্বর্ণচাঁপা জাগানো গৎ
পথ হাঁটে, নাড়ে না তুখোড় ভঙ্গিতে কোনো কলকাঠি;
তবে বোঝা দায় তার মতিগতি।

লোকটার মুখের আদলে,
কেউ কেউ বলে, রহস্যের তুলি বুলিয়ে দিয়েছে অচিন
রঙ, আসলে
সে লোকচক্ষু থেকে সারাদিন,
সারা রাত কষ্টেসৃষ্টে আগলে রাখে
ধুকপুক বুকে নিজস্ব কিছু স্বপ্ন, যেমন বিপদে কান-খাড়া পাখি
তার শাবকগুলোকে ঢাকে
পাখায়। আমি, সত্যি বলতে কী, নিগেটিভ ছবির মতো
লোকটার পাশেই থাকি,
আমার হাতের চেটোয় তার বুকের রক্ত ঝরে অবিরত।

প্রত্যাখ্যান

বেড়ে যায়, বেড়ে যায় কেবলি চাহিদা আমাদের।
অকস্মাৎ করতলে এটা ওটা এসে গেলে ফের
অনেক কিছুর জন্যে বাড়ে কাতরতা; দশ কাঠা
জমি জুড়ে বাগানসমেত বাড়ি চাই, তক্‌মা-আঁটা
চাপরাশি চাই, ধনী শ্বশুরের সবচেয়ে সুন্দরী
কন্যাটিকে পাশে নিয়ে শোওয়া চাই, চাই তড়িঘড়ি
মায়াবীর জাদু বলে বেড়ে যাক কারবারি পুঁজি,
সিঁড়ি নক্ষত্রের নীড়ে পৌঁছে গেলে সুখ। আজ বুঝি
ক'দিন বৃষ্টির পরে ঝকঝকে রৌদ্রের কাতান
কেন মনে হয় মুণিবধূ মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান।

তুমি আছ

ভেবেছিলাম ঠিক তুমি আছ তুমি তো আছই
এ শহরে যেমন পুণ্য আলো থাকে
গির্জায় পূর্ণ মহিমায়

ছিল না

ছিল না, এখনও নেই। শত খোঁজাখুঁজি
করলেও কোনো দিকে পাবে না হদিশ।
থমকানো মেঘের ধরনে বসে আছে। ফিসফিস
কী যেন বলছে হাওয়া কানে
তার, বোঝে না সে কিছু। যা নেই, ঠিকুজি
তার পাবে কোথায় এখন?
মনের ভেতরে নদী বয়ে চলে অজানার টানে;
স্রোতে খড়কুটো, তীরে কী আদিম বন।

চায় কায়মনোবাক্যে, শূন্যতার মরু
সয় না তৃষ্ণার্ত চোখে, কাকে
চায় জানা নেই তার, কে অজ্ঞাতনামা সাঁওতালি পুরুষ ডমরু
বাজায় হৃদয়ে সারাক্ষণ, সেই ধ্বনি
পারবে কি ফোটাতে শ্বেত-পাথরের মূর্তি এই পাঁকে
অথবা সাজাতে নীলকান্তমণি
দরজার মাথার অক্লেশে? এরকম
না-ই হলো, ক্ষতি নেই। বরং সে চায়
নিমেষে কনকচাঁপা এবং শরম–
ছাওয়া চোখে মানবী উঠুক ফুটে খাতার পাতায়।

তিনি বোধ করলেন

দেখতে দেখতে খুব সকালবেলার সূর্যটাকে
পাকা স্ট্রাইকারের ধরনে
গড়িয়ে গড়িয়ে কেউ অতি দ্রুত পশ্চিম আকাশে
নিয়ে গেল। ঘরে
থই থই ছায়া, সারি সারি অক্ষরের অবয়ব
চোখে পড়লেও ঠিক কাউকেই আর
তেমন আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না, অথচ বেলা
গেল, পাখি তার
ক্লান্ত ডানাদ্বয় পাতাময় ডালে গুটিয়ে ফেলার
সঙ্গে সঙ্গে। খাতা বন্ধ করে তিনি চোখ বুজলেন।

জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন কিছু ক্রীড়াপরায়ণ

ছেলে মাঠ ছেড়ে
ঘরমুখো, পথপ্রান্তে যুবক-যুবতী হেঁটে যায় কবিতার
যুগল পঙ্‌ক্তির মতো। তাদের উদ্দেশে
আশীর্বাদ ঝরে তাঁর ঠোঁট থেকে, যদিও জানেন
তিনি এসবের আদপেই কোনো মানে
নেই শেষ অব্দি, কত দৃশ্য ফোটে পটে, মুছে যায় অগোচরে,
কার আর মনে থাকে ছায়ার আঁচড়?

উড়ে-যাওয়া বেলুনের পেছনে পেছনে
ধাওয়া করে বালকেরা। কিয়দ্দূরে র‍্যাফায়েল রমণীর মতো
কেউ ঘন দীঘল সোনালি
চুল আঁচড়ায়, জানালার ধারে কেউবা দাঁড়ায়,
ফেরি-অলা শাকসব্জি বয়, বারান্দায়
দু'জনের মধ্যে এলেবেলে কথা হয়–
এই সব ক্ষণিক বুদ্বুদ ভেবে তিনি একটি পুরনো চিঠি
ডায়েরির ভেতরে গচ্ছিত রাখলেন।
যুদ্ধের বাতিল কার্তুজের মতো চিন্তা নিয়ে তিনি
কী করবেন ভেবে দিশেহারা।
বেলা তো যাবেই, এই খুব একা-একা থাকা তাঁর
মাঝে-মাঝে ভারি হয়ে ওঠে
সিসের মতন; ঘরে বাতি জ্বালবেন নাকি অন্ধকার ঘরে
থাকবেন বসে চুপচাপ
কোনো পূর্বপুরুষের তৈলচিত্রের মতন, এই দ্বিধা
তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখল কিছুক্ষণ
ঘরের মেঝেতে, অকস্মাৎ তিনি বোধ করলেন
পাতি বুর্জোয়ার বিবমিষা।

পোড়ায় আমাকে

ব্যাপারটা এ-রকম– আমার পাড়ায় একজন
সংগীতসাধক, বুড়ো, বহুদিন থেকে
করছেন বসবাস, অত্যন্ত একাকী। নিত্যসঙ্গী তাঁর শুধু
একটি সরোদ; কেউ কেউ
আসে কোনো কোনো দিন সুরে স্নাত হতে
অথবা তালিম নিতে। যখন সে প্রবীণ সাধক কোলে নিয়ে

সরোদ করেন স্পর্শ তার,
তখন আঙুল তাঁর হয়ে ওঠে নিমেষে তরুণ। সুরে সুরে
জীর্ণ ঘরে মেঘ জমে, ডুমুর পাতায়
রোদ ঝলসায়, হরিণের মখমলী চোখ ভাসে,
ঝরনা বয়, পাতা ঝরে, থরে থরে ফোটে
রাজনর্তকীর মতো গোলাপ এবং
সাধক সরোদে লীন। এভাবেই ক্রমে নটে গাছ
মুড়োয়, অথচ ফুরোয় না সুর সাধা।

একদিন ভোরবেলা প্রবীণ সাধক বাজাচ্ছেন
জগৎ সংসার ভুলে গভীর ভৈরবী। সেই সুরে
খুলে গেল পথ, জ্যোতির্ময়,
দূর আকাশের দিকে। অকস্মাৎ পাড়াটা চেঁচিয়ে
ওঠে, যেন বাজের আওয়াজ চতুর্দিকে
ফেটে পড়ে বারবার। পাড়া থেকে নামে মানুষের ঢল পথে,
ব্যাপক ছড়িয়ে পড়ে, মাতে হৈ হল্লায়, তামাশায়।
নিজেই সরোদ হয়ে বেখবর সরোদীয়া বেজে চলেছেন অবিরাম,
অথচ নিভৃত রাগমালা
ডুবে যায় শহর-কাঁপানো কোলাহলে। আমি সেই
প্রবীণ শিল্পীর সাধনার শ্বেতপদ্মটিকে বুকে
নিয়ে একা রাস্তায় দাঁড়াই,
অরণ্যে রোদন শুনে গহন বেহাগ হয়ে যাই অগোচরে।
যত ভাবি, সেই ঘটনার ভস্ম বারবার
মাখব না গায়ে,
তত এক নাছোড় আগুন
দীপকের মতো খুব অন্তরালে পোড়ায় আমাকে।

আদিম স্মৃতির মতো

এখন নিশুত রাত, ঝিঁঝি ডাকে; দোর এঁটে একা অন্ধকারে
বসে আছি, কে জপায় মন্ত্র চুপিসারে
বারে বারে? ক্রিসমাস গাছের মতোই অগোচরে
কী যেন একটা দ্রুত বেড়ে ওঠে আমার ভেতরে
এবং চৌদিক থই থই
পবিত্র অনলে; কে আমাকে ডাকে দূরে? থাকবোই

যথারীতি অনড় অটল,
এ-কথা যাবে না বলা। আমি তো স্ববশে নেই; জল,
পাথরের বুক চিরে আসে
কী উদ্দাম, কে রুখবে তোড়? মোহন বিরোধাভাসে
মজে আমি ভিজিয়ে শরীর
দেখি লোকচক্ষুর আড়ালে জাগে পুণ্য প্রতিমা নিবিড়
নক্ষত্রের নীড়ে; তবে
আমি কি গড়েছি তাকে অন্তর্লীন অচিন বৈভবে?
নাকি অন্য কেউ,
আমার ভেতরে যার বসবাস, জাগিয়েছে ঢেউ
চড়াময় মরা গাঙে পূর্ণিমার বিশুদ্ধ প্রভাবে?

সাঁতার কাটছি বলে মনে হয়; প্রকৃত প্রস্তাবে
একটি স্রোতের চোরা টানে উদ্দাম চলেছি ভেসে
নিরুদ্দেশে।
অন্তর্গত দেবতা না ছলনাপ্রবণ শয়তান
বীণার ঝংকারে তোলে তান
যখন যেমন খুশি? যার কণ্ঠস্বর
আমাকে নিজের মধ্য থেকে টেনে আনে, ঢের বেশি শক্তিধর
সে আমার চেয়ে; যুগ-যুগান্তের শত কণ্ঠ জাগে
তার কণ্ঠস্বরে, যা ছড়িয়ে পড়ে নদীস্রোতে, ফুলের পরাগে,
পাহাড় চূড়ায়, রূপ তার ক্রমাগত
আবছায়া থেকে সমুত্থিত আদিম স্মৃতির মতো।

দেবে না, তোমরা দেবে না

দেবে না তোমরা দেবে না।
ক্ষুধা মেটানোর জন্য
দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন
দেবে না, তোমরা দেবে না।
দেবে না, দেবে না, দেবে না।

দেবে না তোমরা দেবে না
মাথা গুঁজবার ছাপড়া
নগ্নতা-ঢাকা কাপড়া
দেবে না তোমরা দেবে না।

দেবে না, দেবে না, দেবে না।

দেবে না, তোমরা দেবে না।
দুস্থ শিশুর পাত্রে
গুঁড়ো দুধ দিন রাত্রে
দেবে না তোমরা দেবে না।
দেবে না, দেবে না, দেবে না।

দেবে না, তোমরা দেবে না।
ক্ষুধার্ত যারা কাঁদবে,
শিকলে তাদের বাঁধবে,
দেবে না কাঁদতে দেবে না।
দেবে না, দেবে না, দেবে না।

দেবে না, তোমরা দেবে না।
পারি না এ-কথা ভুলতে,
আমাদের মুখ খুলতে
দেবে না তোমরা দেবে না।
দেবে না, দেবে না, দেবে না।

দেবে না, তোমরা দেবে না।
চলে শুধু ষড়যন্ত্র,
ভাঙা হাটে গণতন্ত্র
দেবে না, তোমরা দেবে না।
দেবে না, দেবে না, দেবে না।

দেবে না, তোমরা দেবে না।
স্বপ্নের দ্বীপে হাঁটতে,
সোনালি শস্য কাটতে
দেবে না, তোমরা দেবে না।
দেবে না, দেবে না, দেবে না।

কে দেবে জবাব?

কথা দিয়েছিলে বাঁধতে পারব স্বপ্ন-মুখর
শান্তির ঘর, আমার বাগান সাজানো থাকবে
জুঁই চামেলীতে এবং গোলাপে। পাখি দোল খাবে
ভোর সূর্যের আবির জড়ানো ডালে আর গানে

ভরবে প্রহর। আমার শিশুর দোলনায় ঝুঁকে
দাঁড়াবে না কোনো কবন্ধ প্রেত, প্রেম-নিমগ্ন
যুগলের চুমো খাওয়ার প্রহরে পড়বে না ছায়া
হাড়-হাভাতের, কথা দিয়েছিল স্বাধীনতা তুমি
কথা দিয়েছিলে মেহেদি-রাঙানো রমণীয় হাত
উষ্ণ রক্তে কোনো দিন আর উঠবে না ভিজে,
কোনো যুবা আর গুলির আঘাতে, রাজপথে পড়ে
আজরাইলের ডানার ঝাপটে হবে না উধাও।
অথচ এখন স্বাধীনতা তুমি নিজেই একাকী।
পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার মতো ক্রাচে ভর করে
হাঁটছ তিমিরে। চোখের পাতায় কোন স্বপ্নের
ভস্ম জমছে, এই অবেলায় কে দেবে জবাব?

ডালিমতলায়

হিসেব রাখে না কেউ আর। আজকাল
দেশ থেকে দেশান্তরে দিচ্ছে অনেকে উড়াল।
কারো ছুটি কাটে ইউরোপের শৈলাবাসে,
কারো মন্টিকার্লোতে রুলেটে ভাগ্য হাসে
অকস্মাৎ। কেউ ফ্রাঙ্কফুর্ট, কেউ কেউ
সুনীল ভূমধ্য সাগরের শান্ত ঢেউ
গুনে গুনে কাটায় সময় নীলচক্ষু সঙ্গিনীর মভরঙ
বিকিনির ঘ্রাণ শুঁকে, কারো পুঁজি বাড়ে হংকং
আর সিঙ্গাপুরে, কেউ কুয়েতি বিমানে
চলে যায় পেট্রো ডলারের ক্ষিপ্র টানে;
কারো কারো চলায়-বলায়
কিসের মিশোল লাগে। আমি আস্তে হেঁটে যাই ডালিমতলায়।

ঘুড়ে দাঁড়ালাম

কিছুকাল ধরে কী ভীষণ মনোভার
নিয়ে আছি। জীবনকে অগাধ কাদায় ডোবা কোনো
শুয়োরের মতো মনে হচ্ছে ইদানীং। ভালো লাগবার
মতন কিছুই আর নজরে পড়ে না। ঘরবাড়ি,

সারি সারি গাছ, ঝিল, নারী, উড়ে যাওয়া
পাখির মনে আনে না খুশির ঢল। শুধু
ধু-ধু মরুভূমি চোখে ভাসে,
মরীচিকা সকল কিছুই যেন, জনমনিষ্যির
সঙ্গ বিষবৎ, রবিশঙ্করের সেতারের গৎ
কেমন অসার ঠেকে, এমনকি শাগালের ছবি
দেয় না ছড়িয়ে
স্বপ্নাভা আমার চেতনায়।

ভাবি মাঝে-মাঝে–
যে আমার পেছনে পেছনে হাঁটে, থেমে
যায় হাত রেখে দরজায়,
তার প্ররোচনা মেনে নিয়ে মাথা রাখি
ট্রেনের চাকার নিচে, ঝুলে পড়ি ফ্যানে
অথবা সেবন করি প্রচুর ঘুমের বড়ি প্যাঁচা-ডাকা রাতে।

একদিন কোনো এক হাই-রাইজ দালানে পৌঁছে
বারো তলা থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়ার মৃদু ইচ্ছাটিকে অনেক গোঁয়ার
করে তুলে সিঁড়ি খুব কায়ক্লেশে ভাঙতে ভাঙতে
দ্বাদশ তলায় উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার
মুহূর্তে তোমার মুখ মনে পড়ে গেল
অকস্মাৎ, না পড়াই ছিল বাঞ্ছনীয়–
কে যেন আমার ঘাড় ধরে টেনে জমিনে নামিয়ে নিয়ে এলো
আর আমি তক্ষুণি আবার
জীবনের দিকে তীব্র ঘুরে দাঁড়ালাম।

ফিরে তাকাব না

শপথ নিলাম, কিছুতেই ফিরে তাকাব না আর।
পেরিয়ে এসেছি বহু দীর্ঘ পথ, পায়ে বহু ক্ষত,
দগদগে, তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই
শুকোবে এ ক্ষত, মুছে যাবে এই মুখের আঁধার।
তুমি এসো, অতিশয় শীতল কুয়াশা ফুঁড়ে দ্রুত
তুমি এসো; ভয় নেই, কিছুতেই ফিরে তাকাব না।

আমি কি অচেনা কেউ? এখনও কি চিনতে পারোনি?
আমার হাতে কি তুমি দেখতে পাওনি কোনো বাঁশি?
এখনও তুলতে পারি কত সুর সামান্য বাঁশিতে,
সেই সুর শুনে পাখি এখনও সান্নিধ্যে আসে, নুড়ি
গড়াতে গড়াতে চলে আসে কাছে, পশুরা হিংস্রতা

ভুলে যায় নিমেষেই এবং বাঁশির সুরে সব
নরখাদককে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি, প্রত্যেকটি
প্রহরীর দৃষ্টিপথে মায়াপুরী তৈরি করে আমি
এখানে এসেছি মেয়ে, তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।
কিন্তু তুমি দূরে সরে যাচ্ছ কেন? কেন ছায়া হয়ে
মিশে যাচ্ছ অধিক গভীরতর ছায়ার ভেতর?
ধাবমান হোন্ডায় আজরাইল, তুমি তার ব্যাক
সিটে ভাবলেশহীন, যেন অতিশয় সাদা এক
মুখোশ রয়েছে সেঁটে মুখে, বুকে হিম স্রোত বয়।
তবে কি তোমাকে দেখে ফেলেছি হঠাৎ পুনরায়
সর্বনাশা লোভে? ফিরে এসো, আর ফিরে তাকাব না।

সকালবেলা চেয়ে দেখি

একটি মেয়েলি কান্না আমাকে ছিনিয়ে
আনে অকস্মাৎ
ঘুমের প্রবালদ্বীপ থেকে। তড়িঘড়ি জানালার ধারে যাই
চোখ রগড়াতে রগড়াতে, বিরক্তির
পিঁচুটি হাতের চেটো দিয়ে
মুছে ফেলে; একটি লোককে ঘাড় ধরে
হিঁচড়ে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে ক'জন যুবক। তার,
মানে লোকটার, গা উদোম,
সমস্ত শরীরে ওর ঘুম
হাল্কা শুয়ে আছে
কুয়াশার মতো
তখনো, রাস্তায় কিছু লোক, যুবা, প্রৌঢ়,
দাঁড়ানো কেমন নির্বিকার
এবং আমিও
ফ্ল্যাট বাড়িটার জানালার ধারে পাথুরে পুরুষ,

অনীহা, আলস্যে বুঁদ।

লোকটা কে? কারা তাকে ওরকমভাবে
নিয়ে গেল? কোথায় এবং কেন? লোকটা কি অপরাধী? কার
কাছে ওর অপরাধ?
সেই যুবকেরা,
কেন একজন মানুষকে
কোরবানির পশুর মতন
ঘষটাতে ঘষটাতে পাড়ার নাকের তলা দিয়ে নিয়ে যাবে?
মনে মনে শহরকে মগের মুল্লুকে আমি অনুবাদ করে নিই।

যে মেয়েলি কান্না ভোরে আমার ঘুমের
দ্বীপটিকে ভীষণ গুঁড়িয়ে দিল তা কি লোকটার
মায়ের হৃদয় চিরে এমন ডুকরে উঠেছিল, নাকি ওর
গৃহিণীর বুক থেকে? বালবাচ্চা আছে
তার? সে কি ঘরে ফিরে আসবে কখনো?
সাত-পাঁচ ভেবে
বাথরুমে গিয়ে টুথব্রাশে দাঁত মাজতে মাজতে
রবীন্দ্রনাথের গান গুন গুন করি!

আমরা কি যেতে পারি

আরিচার ঘাটে পৌঁছতেই
পাক্‌না ফলের মতো সূর্য পড়ে গেল
নদীর পানিতে।
মাছের আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে, দূরে
নৌকা চলে যায়। বিশ্রামের
ছায়াটুকু পোহাচ্ছে টয়োটা নিরিবিলি।
নড়েচড়ে বসে
ফ্লাস্ক থেকে তুমি ঢাললে চা,
মুখের ভেতরে
পেস্ট্রির সুঘ্রাণ গলে যায়।
বয়সিনী ভিখিরিনী জানালার ফ্রেমে, ওর শীর্ণ খড়ি-ওঠা
প্রসারিত হাতে তুমি তুলে দিলে স্ন্যাক্‌স হে সুজাতা।

আবার শহরমুখী, সন্ধ্যার ঘোমটা-পরা আসমান, আর
বৃক্ষময় পিচপথে ধাবমান যান,
একটি একাকী লোক, হয়তো হাট-ফেরা
ডোবে কুয়াশায়।

তোমার সোনালি বাহু মাছের ধরনে ঝলসিত
বারবার; ঈষৎ রঙিন ঠোঁটে, চুলে,
কর্ণমূলে, গ্রীবার ঢালুতে ক্যাসেটের
সংগীত ছড়ায় রঙধনু
এবং আমার হাত ডাকে
তোমার হাতের উষ্ণতাকে মতিচ্ছন্ন মানুষের
মতো কী ব্যাকুল।
আমার ভেতরকার স্বেচ্ছাচারী পাঁজর, পাঞ্জাবি
ফুঁড়ে লুটোপুটি খায় আমারই সত্তায়।
তোমার পাঁচটি আঙুলের স্রোত বেয়ে
একজন নারী, বড় একা, তারার আগুনে গড়া,
আমার ভেতরে
গোপনে প্রবেশ করে অন্তরাল ছিঁড়েখুঁড়ে, স্পিডোমিটারের
কাঁটা উর্ধ্বগতি;
রাত বাড়ে, আমার মুঠোর মৃদু চাপে
তোমার আঙুল হয়ে যায় কণিকার কণ্ঠস্বর।

ফিরে এসে টিপি
সফেদ কলিংবেল, ঘরে ঢুকে শুই বিছানায়।
তখনও তোমার ঘ্রাণ, রাত্রির গহন
জঠরের নিবিড় নরম,
দূরগামী নৌকা,
হাট-ফেরা লোক, ঝোপঝাড়,
তোমার বিচ্ছিন্ন চলে-যাওয়া,
নির্জন পথের হাহাকার
জেগে থাকে সত্তাময়। কী যেন আমার মধ্যে জ্বলে আর নেভে
জোনাকিপ্রতিম
বারংবার; ইচ্ছে হয়, আবার সেখানেই যাই এই মুহূর্তেই।
আমরা কি যেতে পারি একই স্থানে পুনরায় একই মন নিয়ে?

বৃক্ষ বৃত্তান্ত

এখানে একটি গাছ, শোনা যায়, বহুকাল থেকে
দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায় সন্ন্যাসীর মতো। লোকে বলে,
একদা এক গাছে ছিল ফলের বিস্ময়
ঋতুতে ঋতুতে, আজ আর
তার কোনো ডালকে হাসিয়ে থরে থরে দূরে থাক,
ধরে না একটি ফলও। পথচারী যারা,
তারা কিছুক্ষণ
দাঁড়ায় গাছের নিচে ছায়ায় ভিজিয়ে
নিতে বড় রোদপোড়া শরীর তাদের। কিন্তু নাকে
আসে না ফলের ঘ্রাণ। তাই
বিশ্রাম ফুরালে ওরা চলে যায় নাক সিঁটকিয়ে,
কেউ কেউ প্রস্থানের আগে
কৃতজ্ঞতাবশত তাকায়
গাছটির দিকে স্নেহশীল চোখে একবার, বলে
মনে মনে, 'থাকুক সে এমন অক্ষয়
শতেক বছর আরও'।
পাড়ার উঠতি যুবকেরা।
ক্রমে গাছটির নিষ্ফলতা নিয়ে বড়
অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। একদিন ওরা ঢাকঢোল
বাজিয়ে গাছের নিচে পঞ্চায়েত ডেকে–
মাঝে মধ্যে দুলে ওঠে ছায়ার চামর অগোচরে–
শাণিত কুড়ুলে
বহু বছরের ঝড়জল সয়ে যাওয়া
গাছের শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলার সম্মিলিত
জোরালো প্রস্তাব করে পাঠ। একজন নিরক্ষর, বুড়োসুড়ো
লোক প্রস্তাবের প্রতি উদাসীন, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গাছের
শেকড়বাকড় তুল্য, নিবু নিবু চোখে
দেখেন গাছের
সমগ্র অস্তিত্ব থেকে চুইয়ে চুইয়ে
সবার অলক্ষ্যে ঝরে ক্রমাগত মূক অশ্রুজল!

এই যে শুনুন

এই যে শুনুন, আপনি যখন ঝকমকে চামচে স্যুপ খান
চমৎকার, তখন আপনার
সাফসুতরো হাতে, ধবধবে শার্টের আস্তিনে এতটুকু
রক্তচিহ্নও চোখে পড়ে না কারো। আপনি যখন হাসির জুঁই
যত্রতত্র ঝরিয়ে দেন,
কে বলবে আপনি আতশ মেজাজ? গোস্তাকি মাফ করবেন
হুজুর নামদার, আপনাকে জালিম বলবে
এমন বেহুদা তালিম কেউ পায়নি এ তল্লাটে।

স্বদেশের জন্যে আপনার দরদের কমতি নেই,
প্রিয় দেশবাসীর প্রতি হে গরিব পরওয়ার, আপনি
হরহামেশা বে-এন্তেহা মেহেরবান
এবং নাদান আমরা তাজ্জব হয়ে দেখি, হে সাহেবে কামাল,
ঝাড়ফুঁকে আপনি দূরে, বহুদূরে হটিয়ে দিতে চান
পোড়া দেশের আলাইবালাই।

অসাধারণ আর ভয়ঙ্কর শক্তিমান
আপনি, ঝড়ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো কিংবা সুন্দরবনের
রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো আপনার শক্তি
গর্জে ওঠে যখন তখন। হলফ করে বলতে পারি,
সারাদেশ অন্ধকার করে দেয়া আপনার শক্তির মেঘ
যত গর্জে ততই বর্ষে।
ইচ্ছে হলেই আপনি যে কোনো বই, পুস্তিকা
অথবা ইস্তাহার
নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন, পারেন যে কোনো
মানুষকে পাঠাতে তয়খানায়। আপনার খেয়ালের
রঙ-বেরঙের ঘোড়াগুলোর
গা মালিশ করার জন্যে করজোড়ে এক পায়ে
দাঁড়িয়ে থাকে নানা সহিস। চোখের পলক না পড়তেই
আপনার যে কোনো হুকুম তামিল হয়ে যায়।
কিন্তু হে লৌহমানব
আপনি খেয়ালখুশির খেয়া ভাসালেই

নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে না সূর্যোদয় কিংবা পূর্ণিমা,
প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বন।
আপনি প্রাণভরে গার্ড অব অনার নিতে পারেন আর
একজন কবিকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন
ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে,
বহ্ন্যুৎসব করতে পারেন তার গ্রন্থরাজি দিয়ে,
পারেন আপনি পারেন;
তবু তার কবিতাবলি বন্দুকের ধমককে
উপেক্ষা করে ঈগলের মতো উড়তে থাকবে,
উড়তে থাকবে, উড়তে থাকবে।

পর্যটন

'যাবেন তো ঠিক' বললে মৃদুল
কণ্ঠের তারে এস্রাজি ছড় টেনে।
কলকাতা থেকে মুখ ফেরালাম,
প্রাতরাশ সেরে চাপলাম দ্রুত ট্রেনে।

বলাবলি হয় বৃক্ষের কথা,
শ্যামা পাখি গায়, নাচে হৃদয়ের ক্ষতে,
কখন যে মৃদু দুপুরের রোদে
পৌঁছে গেলাম তোমার বাড়ির পথে।
বললেন হেসে দেয়ালে টাঙানো
সেই কবেকার তোমার মায়ের ছবি–
'কেমন অতিথি এনেছিস খোকা
এতকাল পরে? কবির উঠোনে কবি?'

মেহগনি কাঠে তৈরি খাটের
সুজনিতে বসি ঈষৎ পদ্মাসনে;
কিছু দূরে যেন মন্দিরা বাজে,
করি খণ্ডিত সঙ্গীত মনে মনে।

মৃদুল তোমার পিতার কথায়

পিছুটান আর অতীত বলার ঝোঁক।
এক লহমায় হয়ে যান তিনি
সেই কবেকার যোগী নগরের লোক।

দিনেমারদের গির্জা অথবা
গঙ্গার তীরে দেখিনি চন্দ্রলেখা।
আরেকটি দিন থেকে গেলে মানি
ইতিহাসময় কত কিছু যেত দেখা।

আমার এমন পর্যটনেই
ফুল চন্দন পড়ে খুব অগোচরে।
আমি তো পঞ্চ ব্যঞ্জন পেয়ে
সোজা চলে গেছি তোমার রান্নাঘরে।

বিদায় জ্ঞাপনে অনিচ্ছা বাজে,
সিক্ত হৃদয় ভাসে বেহাগের সুরে;
পাখির বিলাপ ধুলায় গড়ায়
কেরি সাহেবের, তোমার শ্রীরামপুরে।

মরণোত্তর

লোকটাকে দেখতে সুন্দর বলা যাবে
কিনা, এ বিষয়ে
মতভেদ থাকা
বিচিত্র কিছুই নয়। তবে সকলেই
সমস্বরে এ-কথা বলবে, তার কথা বলবার
ধরনে একটা কিছু আছে, যা সহজে
টেনে আনে ভিড়, ওর কথা
শোনে লোকে কান পেতে ঝাল মুড়ি, ছোলা ভাজা আর
চীনে বাদামের মজা চিবোতে চিবোতে। আজনবি
বহুদূর থেকে
এসেছে এখানে রহস্যের ঘ্রাণ নিয়ে। ছিল তার
পোশাক-আশাকে কিছু দূরত্বের ছাপ।

তাকিয়ে ভিড়ের দিকে পাখির ধরনে
যখন সে আকাশের দিকে
তর্জনী উঁচিয়ে বলল, এই দারুণ খরায় আমি
চোখের পলকে
নামিয়ে আনতে পারি শ্রাবণের ফুলঝুরি; এই
ভয়ানক পুষ্পহীনতায়
এক্ষুণি ফুটবে ফুল হরেক রকম,
যদি আমি ফোটাই আমার হাতে একটি বিশেষ
মুদ্রা, ভাইসব,
তখন অনেকে তার উচ্চারণে ধ্রুবতারার ঝলক দেখে
শিহরিত হলো, কেউ কেউ খুব জোরে
হেসে উঠে অবিশ্বাসী প্রকরণে হলো মনোযোগী।
চতুর্দিকে থমথমে নীরবতা। লোকটা হাতের
যাবতীয় মুদ্রা কী সহজে ফোটাল, অথচ তার
সকল উদ্যম ফলহীন
গাছের মতোই সে বিশাল জনসভায় থমকে
থাকে; দুয়ো ছুটে আসে তার
দিকে দশদিক থেকে, পাথর ও নুড়ি
ভীষণ ছুড়তে থাকে অনেকেই। রক্তাক্ত শরীরে
নিষ্প্রাণ সে পড়ে থাকে ভয়ানক ভেঙে-যাওয়া পুতুলের মতো।

যখন প্রান্তর
জনহীনতায় ফের রহস্যজনক হয়ে ওঠে,
তখন হঠাৎ নাচে খই বৃষ্টির এবং রঙ-
বেরঙের ফুল ফুটে ওঠে বন্ধ্যা মাটিকে হাসিয়ে।

কেবল একটি শব্দ

যাবতীয় মনোহারি সুখ-সুবিধার
পাঁচালি শুনিয়ে ওরা তাকে তাড়াতাড়ি
কার যেন বাগানবাড়িতে
পাঠাতে চাইল সগৌরবে, জয়ঢাক
বাজিয়ে, সাজিয়ে

আপাদমস্তক তাকে জরির পোশাকে।

নিজেকে অত্যন্ত ভারি
মনে হলো তার, বিশেষত এরকম ধরাচূড়ো
এর আগে কোথাও দেখেছে
বলে তার কিছুতেই মনে পড়ল না।

হঠাৎ কী মনে করে এক ঝটকায়
মহামূল্যবান পোশাকটা ছেড়েছুড়ে
উলঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকে লোকটা অটল।
তারপর কণ্ঠস্বরে
সমুদ্র-কল্লোল এনে বলে,
কস্মিনকালেও আমি কারো কোনো বাগানবাড়িতে
যাবো না এবং অস্তিত্বকে করব না
কলংকের চন্দনে চর্চিত।

'না' শব্দটি বোমার ধরনে
ভীষণ পড়ল ফেটে সভাগৃহে; কেননা সেখানে
যারা দণ্ডমুণ্ড কর্তা আর যত কর্তাভজা, তারা
'না' শব্দটি শুনতে কখনো
তেমন অভ্যস্ত নয়, কেবল একটি শব্দ সে ঘরের সব
আসবাবপত্র আর ঝাড়লণ্ঠনকে ভীষণ দুলিয়ে দিল,
যেরকম আচানক ভূমিকম্পে ঘটে।

সৌন্দর্যের গুণ গেয়ে

সৌন্দর্যের গুণ গেয়ে দিন
কাটাতে আমার ভালো লাগে। তাই আমি
তোমার প্রশংসা করি একজন ধার্মিকের ধরনে এবং
যে তোমার সৌন্দর্যে কখনো
অভিভূত নয়, তাকে মিত্র বলে গ্রহণ করতে সর্বদাই
সাত হাত
সতর্ক পিছিয়ে থাকি। সঙ্গীতের মূর্ছনায় তোমার রূপের

বন্দনা আমার কৃত্য নিত্যদিন আর
তোমার আসার
প্রত্যাশায় আমার দু'চোখ
এভাবে পথের দিকে চেয়ে থাকে, যেমন সহিষ্ণু টিকটিকি
তার শিকারের প্রতি। কখন আসবে
তুমি ফিরে আমার নিবাসে? সারাক্ষণ
অর্চনায় মগ্ন থাকি। তোমার দুর্নাম
রটনাকারীকে দুর্বাশার
ক্রোধে ভস্ম করি পাঁচবার, চারটি পাখিকে আমি
টুকরো টুকরো করে
ছুড়ে দিয়ে পাহাড় চূড়ায় ডেকে আনি পুনরায়
স্নেহের ছায়ায়। ভাগাড়ের কাছাকাছি
বাজপোড়া নীড়ে করি অবেলায় একা তোমার রূপের স্তব।

এ আমার খেলা

এখন সে থাকে না শহরে; দিনভর রাতভর
খুঁজলেও আজ
এখানে যাবে না পাওয়া তাকে। প্রস্থানের
আগে সে আমাকে ছাদে নিয়ে গিয়েছিল
কী খেয়ালে; আধখানা চাঁদ
মাছের কাঁটার মতো আকাশের গলায় আটকে ছিল। তার
মাথা ছিল ঝুঁকে
আমার স্পন্দিত বুকে; এলোমেলো কথা কতিপয়
উড়ন্ত মাছের মতো মিশেছে হাওয়ায়। সে কি কিছু
বলেছিল বিদায়ের আগে?
আমি তার কিছু কথা বুঝেছি, অনেক
বাক্য থেকে গ্যাছে রহস্যের ঘেরাটোপে। রহস্যের
ঘোমটা সরিয়ে
এখন দেখতে চাই প্রকৃত রূপের বর্ণচ্ছটা তারাজ্বলা
আকাশের নিচে; এখন সে নেই; ডান পাশ থেকে
কতিপয় অক্ষর বাঁ দিকে
এনে আর বাঁ দিকের কয়েকটি শব্দকে দক্ষিণে

সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে শব্দসমূহকে
সুন্দরের ঝালর পরিয়ে চেয়ে থাকা–
এ আমার খেলা ইদানীং।

চর্যাপদের হরিণী

ভুল বোঝাবুঝি, ঘেন্না, বিবাদ–
এ কেমনতরো কাহিনী?
ফ্ল্যাটবাড়িটায় হানা দেবে জানি
মিশ্র স্মৃতির বাহিনী।

নকল সোনার সিংহাসনের
অধিকারীটিকে দেখেছি;
তার অকারণ তাচ্ছিল্যের
ভস্ম শরীরে মেখেছি।

চক্রান্তের জাল সব দিকে
বলো তোপা রাখি কোথায়?
কারো কারো ক্রূর বিষথলি, হায়,
নিমেষে উজাড় কথায়।

তবে কি আমিও ফিরে আসব না
শুভার্থীদের ডেরায়?
চলে যেতে হয়, শেষমেশ তবু
আনন্দ ফোটে ফেরায়।

কার্তিকে পাই একটি কদম
ফুলের শিহর শিরায়,
হাসিঝলসিত দৃষ্টি বুলায়
প্রলেপ মনের পীড়ায়।

হাতে মৃদু চাপ, চোখের কোণায়
হৃদয়াবেগের বেহাগ।

বুকডোবা পাঁক থেকে উঠে দেখি
মনোজ পদ্ম বেদাগ।

যাবার সময় বস্তুত কারো
দোষক্রটি আমি ধরিনি;
বৈরী ঋতুতে কোমল তাকায়
চর্যাপদের হরিণী।